তপোভূমি নর্মদা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

তপোভূমি নর্মদা

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল শাস্ত্রী

উৎসর্গ

কাশীর দশাশ্বমেধ ঘাটস্থিত কামরূপ মঠাধীশ যথার্থ
সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী ঁভোলানন্দ তীর্থজী মহারাজের
শ্রীচরণকমলে লেখকের আন্তরিক ভক্তি শ্রদ্ধার
অর্ঘ্যস্বরূপ তপোভূমি নর্মদার দ্বিতীয়
খণ্ডটি উৎসর্গীকৃত হইল।

লেখক-পরিচিতি

দি বৈদিক রিসার্চ ইনষ্টিট্যুট-এর ডিরেক্টর, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যায় বহু অধীতী সুপণ্ডিত, বেদাধ্যায়ী শ্রীশৈলেন্দ্রনারায়ণ ঘোষাল ১৯২৮ সালের ৫ই মার্চ দোল-পূর্ণিমার দিন মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কালিয়াড়া নামক গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা অগ্নিহোত্রী ব্রাহ্মণ ঁশশিভূষণ ঘোষাল ও মাতা ঁপ্রভাবতী দেবীর ইনি মধ্যম পুত্র।

পিতার ইচ্ছানুসারে বেদাধ্যয়ন ও 'ভারতকে জান' এই আদেশ শিরোধার্য করে কৈলাস, মানস-সরোবর, শতপন্থ, কেদারবদ্রীসহ কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ চারবার পরিভ্রমণ করেন।

১৯৫৭ সালে প্রথম গ্রন্থ 'আলোক-তীর্থ' প্রকাশিত হয়। সেই গ্রন্থে তিনি বেদ-বিরোধী মূর্তিপূজা, ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত সম্বন্ধে সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণাদি খণ্ডন করেন এবং নতুন আলোর পথ দেখান।

রক্ষণশীল এবং গোঁড়া পণ্ডিতসমাজ প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হয়ে এই গ্রন্থের প্রতিবাদে কয়েকটি পুস্তক প্রকাশ করলেও বিশ্ববিশ্রুত দার্শনিক শ্রী জগদীশ চট্টোপাধ্যায়, ঐতিহাসিক ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ কালিদাস নাগ, মনীষী চিন্তানায়ক শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ডঃ সুকুমার সেন প্রমুখ পণ্ডিতগণ, এই সৎ প্রচেষ্টায় উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

তথাকথিত পণ্ডিতসমাজের সমালোচনার এবং অপযুক্তির অক্ষরশঃ খণ্ডন করেন 'আলোক-বন্দনা' (১৯৫৯) নামক দ্বিতীয় গ্রন্থে।

পিতামাতাই শিব-শিবানী — প্রত্যেকের জীবনে পিতামাতাকেই আরাধ্য দেবতা হিসাবে পূজা করা উচিত — এই তত্ত্বই প্রকাশ করেন তাঁর 'পিতরৌ' (১৯৮০) গ্রন্থে।

ঋষি-পিতার শেষ আদেশানুসারে মাত্র চব্বিশ বছর বয়সে নর্মদার উৎসস্থল মধ্যপ্রদেশের অমরকন্টক থেকে গুজরাটের ভৃগুকচ্ছ (যেখানে নর্মদা সমুদ্রে গিয়ে মিলেছেন) পর্যন্ত উভয়তট নগ্নপদে পরিক্রমাকালে যেখানে যা দেখেছেন তার পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করেছেন তাঁর 'তপোভূমি নর্মদা' গ্রন্থে। কয়েক খণ্ড প্রকাশিতব্য এই গ্রন্থে রয়েছে উচ্চকোটি সাধু-মহাত্মাদের সাধন-পথ, শ্বাপদ-শঙ্কুল গভীর অরণ্যের পথঘাট ও আরও সব বিচিত্র অভিজ্ঞতার কথা।

১৯৮৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরের রাত্রি ১২টায় পিতৃপক্ষের পুণ্যক্ষণে সমাধিস্থ হয়ে লেখক শিবতনু প্রাপ্ত হন।

তপোভূমি নর্মদা

ওঁ

।। হর নর্মদে হর।।

মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের অত্যাশ্চর্য জলমগ্ন পীঠস্থান লুকেশ্বর ও নন্দিকেশ্বর অতিক্রম করে সুমেরদাসজী ও আমি দ্রুত হেঁটে চলেছি, হেঁটে চলেছি নর্মদার উপলঝঙ্কৃত গতিপথ অনুসরণ করে। পথ পার্বত্যময় হলেও, মাঝে মাঝে ছোট চোট রমনীয় অরণ্য এবং নর্মদার উভয়তটে ঘনবসতি চোখে পড়ছে। নর্মদা কখন পাহাড়ের গা বেয়ে কখন পাহাড়ের চূড়া স্পর্শ করে, অরণ্যের ঢালকে কোথাও বাঁদিকে কোথাও ডানদিকে রেখে আপনমনে বয়ে চলেছেন। মাঝে কোথাও চুলের কাঁটার মত রোমহর্ষক বাঁক, কোথাও ছবির মত জংলী গ্রাম, কোথাও পথের পাশে বা পথের উপর দিয়েই বয়ে চলেছে কুলকুল ঝর্ণাধারা।

নর্মদার দুই পাড়েই কত যে মন্দির! আমরা নাদিয়াঘাটে এসে পৌঁছলাম। এখানে স্নানপূজা সেরে সুমেরদাসজী তাঁর ঝোলা থেকে একখণ্ড কন্দমূল বের করে নিজেও খেলেন, আমাকেও খেতে দিলেন, বললেন — ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহুঁ, আজ ইসী মূলসে হমলোগ বীতা দেঙ্গে। আজ যতটা পারি পথ অতিক্রম করব, আরও পনের মাইল পথ যদি হেঁটে ফেলতে পারি তাহলে রবিতীর্থের ঘাটে আমার এক গুরুভাই-এর আস্তানায় পৌঁছে যাবো। রাত্রে ঐখানেই থাকব। হাঁটতে তোমার কি খুব কষ্ট হচ্ছে? তোমার মুখ শুকনো কেন? আমি তাঁকে কি আর বলি? এই বৃদ্ধ বয়সে তিনি যদি হাঁটতে কোন ক্লান্তিবোধ না করেন, তাহলে আমি বয়সে তরুণ হয়েও কি করে বিশ্রামের কথা মুখে বলি?

আমি বললাম — হাঁটতে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে না, তবে লুকেশ্বরের সেই মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের কথা আমি কিছুতেই ভুলতে পারছি না। পুরীতে সমুদ্রতীরে সূর্যোদয় দেখেছি, মনে হয় সহসা সূর্য যেন সমুদ্রগর্ভ থেকেই উঠে এলেন! একবার আমি দেশে মামাবাড়ীতে পুকুরধারে সন্ধ্যেবেলায় একটা হিজল গাছের তলায় দাঁড়িয়েছিলাম। হঠাৎ পুকুরের জলের তলায় দেখতে পেলাম চাঁদের কিরণের ঢেউ খেলছে। হিজলতলার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি পূর্বাকাশে শুক্লপক্ষের দ্বিতীয়ার চাঁদ উঠেছে, তারই স্নিগ্ধ ছটায় প্রতিবিম্ব পড়েছে পুকুরে।

এইসব দৃশ্যের সম্ভাব্য কারণ বুদ্ধি দিয়ে বুঝা যায় কিন্তু ঘোর অমাবস্যার রাত্রিতে সূর্যনারায়ণজীর মন্ত্রপ্রভাবে নর্মদাগর্ভে যে মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গের অলৌকিক প্রকাশ দেখে এলাম, তার তুলনা কোথায়? সূর্যনারায়ণজীর কাছে শুনে এসেছি — পৌষ মাসের পূর্ণিমায় এবং বৈশাখী পূর্ণিমায় নাকি ওখানে বড় মেলা বসে। হাজার হাজার গৃহী ও সাধু দূরদূরান্ত

হতে এসে জমায়েৎ হন, লুকেশ্বরের পূজা ও জপের জন্য। পৌষ পূর্ণিমা আসতে ত আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। পৌষ পূর্ণিমা পর্যন্ত থেকে এলেই পারতাম কিন্তু বিপুল মহিমামণ্ডিত একটি মঠের জীর্ণদশা দেখে এবং মহর্ষি মধুমঙ্গলজীর ঋষিজীবনের ঐরকম বিয়োগান্তক পরিণতির কথা ভেবে দিনে বা রাতে দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি। কেবলই মনে হচ্ছিল যেন ঐ ভাগ্যহত ঋষি এবং তাঁর দুর্ভাগিনী পত্নীর আত্মা যেন আমাকে গ্রাস করে ফেলেছে, আমাকে যেন তাড়া করে ফিরছে। কেন — কেন আমার এরকম মনে হচ্ছে বলতে পারেন? সুযোগ পেলেই ঐ মধুবনে বা নর্মদাতীরবর্তী জঙ্গমবাটিকাতে আবার আমার আসার ইচ্ছা রইল।

সুমেরদাসজী বললেন — বেশক্ আপ্ আ সক্‌তে হো, পহেলে তো আপ্‌কা পিতাজীকা আজ্ঞানুসার পরিক্রমা সমাপ্ত করিয়ে। আপ্‌কা সাথ উস্ স্থানকা জরুর কোঈ পূরব জনমকা সম্বন্ধ থে, এ মালুম হোতা হৈ। ইয়া নর্মদামায়ীকী কৃপাসে আপ্‌কা ভাবশুদ্ধি হোনেকা কারণ আপ্ দুসরাকো দুঃখ আপনায়া। যৈসে কবীরজীনে কহা হৈ — কহে কবীরা ইহাঁ ভাববসৎ হ্যায় শুদ্ধ রহে হরজনকী। অর্থাৎ যাঁর হৃদয়ে ভাবশুদ্ধি ঘটেছে তিনি অপরের দুঃখ শোককে নিজের বলে গ্রহণ করতে পারেন।

আরে ছোঃ, ছোঃ, এক ভ্রষ্টাচারিণী কামিনীকে লিয়ে মহর্ষিকো ভি জীবন বরবাদ হো গয়া। ইহ্ কভি শুনা হ্যায়?

আমি বললাম — কেন, মহর্ষি ভৃগুর মত উগ্রতেজা লোকের পত্নী পুলোমাকে পুলোমা নামক এক রাক্ষস অপহরণ করেছিলেন, মহর্ষি গৌতমের পত্নী অহল্যাকেও ত ইন্দ্র ছদ্মবেশে এসে সম্ভোগ করে গেছলেন। সে সব ক্ষেত্রে ঐসব ঋষিপত্নীই কি সর্বাংশে দোষী, তাঁদের উৎকট কাম প্রবৃত্তিকে দায়ী করে রায় দিলেই কি পুরুষপ্রবরদের বিবেক গ্লানিমুক্ত হল? ঐসব ঋষিপত্নীরা যদি দিনের পর দিন উপেক্ষা বা ঔদাস্য সহ্য করতে না পেরে জৈব প্রবৃত্তির বশে কোন ক্ষণিক ভুল করে বসেন, তার কি কোন ক্ষমা নাই? তপস্বীদের তপস্যার তেজ আপন আশ্রিতা ও অনুগতা অসহায় নারীদেরকে ঐ দুরপনেয় গ্লানির কবল হতে কেন রক্ষা করতে পারল না?

সুমেরদাসজী কোন উত্তর দিলেন না। রাত্রি নয়টা নাগাদ রবিতীর্থের ঘাটের সন্নিকটস্থ তাঁর গুরুভাই এর বাড়ীতে গিয়ে পৌঁছে গেলাম। তিনি আদর্শ গৃহী। হাতপা ধোওয়ার জন্য গরমজলসহ আমাদের দুধ ও ফল ভোজনের ব্যবস্থা করে দিলেন। আমাদের বারবার বারণ করা সত্ত্বেও তাঁর ছেলেরা এসে হাত-পা টিপে দিলেন। আগুন জ্বেলে ঘর গরম করার ব্যবস্থা করলেন। বড় আরামেই রাত কাটল। পরদিনও গৃহস্বামী কিছুতেই যেতে দিলেন না। নর্মদা এখানে আর সহস্রধারা বা লুকেশ্বর ঘাটে যেমন, তেমন প্রশস্তা নন। সাতপুরা পর্বতমালা ভেদ করে এখানে যেন কন্দফল-মূলাশী তপস্বীর ধ্যানে কোন বিঘ্ন না ঘটে সেইজন্য বোধহয় ক্ষীণকায়া হয়ে প্রবাহিতা।

ভালভাবে রোদ উঠার পর আমরা দুজনে রবিতীর্থের ঘাটে স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে ঘাটের কাছেই শিবমন্দিরে ঢুকলাম শিবপূজা করতে। যাঁর বাড়ীতে আমরা আতিথ্য গ্রহণ করেছি, সুমেরদাসজীর সেই গুরুভ্রাতাই এই মন্দিরের পুরোহিত। এই অঞ্চলে রাজপুত, ব্রাহ্মণ ও গোঁড়দের বসতি। কাজেই ভক্তদের বেশ ভীড় আছে মন্দিরে। পুরোহিত

মশাইকে জিজ্ঞাসা করলাম, এই ঘাটের নাম রবিতীর্থ কেন? তিনি বললেন — শ্রীকৃষ্ণের গুণধর পুত্র শাম্ব অতিরিক্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণতার দোষে কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হয়ে নর্মদাতটের এই ঘাটে সূর্যের উপাসনা করেছিলেন। একপায়ে দাঁড়িয়ে দীর্ঘকাল তপস্যা করার পর শ্রীসূর্যনারায়ণ তাঁকে দর্শন দিয়ে রোগমুক্ত করেন। শাম্বই তাঁর সূর্যভক্তির স্মারকস্বরূপ এই মন্দির স্থাপন করে গেছেন। লক্ষ্য করুন এখানে কোন শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত নাই। এখানে অত্যুজ্জ্বল যে স্ফটিকের গোলকটিকে দেখছেন, ইনি ভগবান ভাস্করের প্রতীক।

তিনি মন্দিরের দুদিকে দুটি ছিদ্র দেখিয়ে বললেন, সূর্য পূর্বাকাশেই থাকুন আর পশ্চিমাকাশেই থাকুন, সারাদিনই সূর্যকিরণ এই মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করে গোলকটিকে ভাস্বর ও জ্যোতির্ময় করে তুলে। এই বিগ্রহে শিবপূজাও করা হয়। শিব ও সূর্যনারায়ণে ত কোন ভেদ নাই। ভগবান আদিত্যনারায়ণ শাম্বকে বর দিয়েছিলেন যে তিনি নর্মদার এই উত্তরতটের মন্দিরে স্বীয় অংশে সর্বদা বিরাজিত থাকবেন —

স্বাংশেন ভাস্করস্তত্র তিষ্ঠতে চোত্তরে তটে।
সর্বব্যাধিহরঃ পুংসাং নর্মদায়াং ব্যবস্থিতঃ॥

এই অঞ্চলের সবাই বিশ্বাস করেন যে এখানে পূজা জপ করলে রোগমুক্তি ঘটে। এইজন্য নর্মদার দূর দূর অঞ্চল হতেও লোক আসে সর্বরোগহর এই দেবতার পূজা করতে। কোন সুদূর অতীতে এই মন্দির স্থাপিত হয়েছে তার কোন সঠিক সাল তারিখ নির্ণয় করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়, তবে এই মন্দিরের দুদিকে দুটি ছিদ্রের এমনই নির্মাণ কৌশল দেখে অবাক হতে হয়।

মধ্যাহ্নভোজন করে গৃহস্বামীসহ সকলেই আমরা রোদ পোয়াচ্ছি , এমন সময় একতারা ও একটি ত্রিশূল হাতে এক সন্ন্যাসী এলেন। গৃহস্বামী জানালেন যে ঐ মহাত্মার নাম হরভজনদাস, সাতপুরা পর্বতাঞ্চলের পরশুরিয়া গ্রামে তাঁর ভজন আশ্রম। কর্ণালী, বরকাল, মালসর এবং রাণাপুর পর্যন্ত তিনি সর্বত্র গান গেয়ে বেড়ান। বেশভূষায় বাংলাদেশের বাউলের মত, তফাৎ কেবল তিলকে। এঁরা কপালে ত্রিপুড্র আঁকেন।

সুমেরদাসজীর অনুরোধে তিনি একতারাটি হাতে নিয়ে নেচে নেচে গান গাইতে থাকলেন —

তব গুণ ক্যা জগৎগুরো জৌ পাপ করম ন নাশে।
সিংহ শরণ কত্ যাইয়ে জৌ জম্বুক গ্রাসে॥
এক বুদ্‌বুদ্‌কে কারণ চাতক্ নিত দুঃখ পাবে।
প্রাণ গয়ে সাগর মিলে কুন্ কাম ন আবে॥
মৈঁ নহি প্রভু হৈ নহি কুছ নেহি হ্যায় মেরা।
আবসর লাজ রাখ্‌লে হরভজনদাস তেরা॥

এখানে ভক্ত ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলছেন — যদি পাপ-কর্মের নাশই না হয়, তবে হে জগৎগুরু! তোমার মহিমা কি? যদি জম্বুকেই গ্রাস করে অর্থাৎ সিংহের ভোগ্য বস্তুকে যদি শেয়ালেই টেনে নিয়ে যায় তাহলে সিংহের শরণ নিয়ে তার লাভ কি ? একবিন্দু জলের জন্য চাতক পাখী নিরন্তর কষ্ট পায়। যদি তার প্রাণ বিয়োগ হয় আর তখন যদি সাগরও মিলে তাতো কোন কাজে আসে না! আমি কিছু নই , আমারও কিছু নাই , হে প্রভু ! 'আমার' বলতে

শুধু তুমিই আছ; আমার এই সঙ্কট সময়ে এই লজ্জা হতে আমাকে রক্ষা কর, হরভজনদাস তোমারই।

গান শেষ হলে আমি সুমেরদাসজীর দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলালম — ক্যা জী, ঋষিপত্নীয়োঁকো বারে মেঁ আপ্ জো মন্তব্য কিয়ে থে, ইহ্ গানামেঁ উস্‌কো জবাব মিলা?

নেহি জী, রাজা শ্রীবৎসকো কিস্‌সা ইয়াদ করিয়ে। শ্রীবৎসের উপর শনি রুষ্ট হয়েছিলেন কিন্তু পুণ্যশ্লোক রাজাকে কিছুতেই জব্দ করতে পারছিলেন না। একদিন রাজার ভোজনকালে অসাবধানতা বশতঃ তাঁর পায়ে একটি উচ্ছিষ্ট ভাত পড়ে যায়। ভুল করে রাজা আহারান্তে পা ধুয়েন নি। এই ত্রুটি বা ছিদ্র পেয়ে সেই রন্ধ্র পথেই ক্রূর শনি রাজার পুণ্যদেহে প্রবেশ করলেন। ফলে শ্রীবৎস রাজ্যভ্রষ্ট ও নিঃস্ব হলেন, এমন কি ধর্মপত্নী চিন্তার কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়াতে বাধ্য হয়েছিলেন।

শ্রীবৎস-রাজার প্রসঙ্গ এনে সুমেরদাসজী মন্তব্য করলেন — শৈলেন্দ্রনারায়ণজী, তুমি হয়ত ভাবছ, মহর্ষি ভৃগু, গৌতম ও মধুমঙ্গলজীর ধর্মপত্নীগণ সিংহস্বরূপ উগ্রতেজা মহর্ষিদের শরণ বা আশ্রয়ে ছিলেন, এজন্য তাঁদেরকে সর্বতোভাবে রক্ষা করা তাঁদেরই দায়িত্ব অর্থাৎ তুমি ভ্রষ্টাচারিণী ঋষিপত্নীদের দোষ লঘু করে দেখতে চাইছ। কিন্তু আসল ব্যাপার তা নয়। ঐসব কামিনীর হৃদয়ে কামভাবই প্রবল ছিল। কামভাবে বিহ্বল হয়েই তাঁরা কোন-না-কোনভাবে পরপুরুষকে প্রশ্রয় দিয়েছিল বলেই সিংহের আশ্রয় থেকে তাদেরকে টেনে নিয়ে যাওয়া জম্বুকদের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। উচ্ছিষ্টের ছিদ্র পথে যেমন শ্রীবৎসের পুণ্যদেহে শনি প্রবেশ করেছিল, তেমনি উৎকট কামেচ্ছার ছিদ্র পথে পাপ প্রবেশ করেছিল ঐসব কামিনীদের মনে। তাঁরা তাতেই বুদ্ধিভ্রষ্ট হয়ে বিপর্যয়ের পথে পা বাড়িয়েছিলেন, স্বামীদের জীবনেও ডেকে এনেছিলেন সর্বনাশ। আমি সুমেরদাসজীর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। হয়ত মহাত্মার ব্যাখ্যাই ঠিক। কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললাম — এ বিষয়ে কোন অবিচলিত সিদ্ধান্তে আসা বোধহয় কারও পক্ষে সম্ভব নয়। মহাভারতে বেদব্যাস ভীষ্মের মুখ দিয়ে যুধিষ্ঠিরকে যে তত্ত্ব বলে গেছেন, মনে হয় সেই মহর্ষি বাক্যকেই স্মরণে রেখে এ বিষয়ে চুপ করে থাকাই বোধহয় ভাল। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ দিতে গিয়ে মনু রচিত ধর্মশাস্ত্র হতে একটি শ্লোকে বলেছিলেন যে —

ঋষীণাংচ নদীনাংচ সাধুনাংচ মহাত্মনাম্।
প্রভবো নাধিগন্তব্য স্ত্রীণাং দুশ্চরিতস্য চ॥ (অনুশাসন পর্ব, অধ্যায়২০)

অর্থাৎ ঋষি, নদী, সাধু, মহাত্মা ও স্ত্রীলোকের দুশ্চরিত্রের উৎপত্তির কারণ যথাযথভাবে জানা যায় না।

গানের পর হরভজনদাস বিদায় নিয়ে চলে গেলেন, আমি রবিতীর্থের ঘাটে বেড়াতে গেলাম। নর্মদার কাকচক্ষু নির্মল জলে অত্যধিক বাতাসের ফলে ঢেউ উঠছে। প্রচণ্ড শীত পড়েছে, কম্বল মুড়ি দিয়েও কাঁপছি, কিন্তু নর্মদার শোভা এবং অস্তাচলগামী সূর্যের শেষ রশ্মি নর্মদাতে পড়ে যে অপরূপ শোভা সৃষ্টি করেছে, সেই দৃশ্য ছেড়ে অতিথিপরায়ণ ব্রাহ্মণের গৃহে ফিরে আসতে মন চাইছিল না। এদিকে সন্ধ্যে হয়ে আসছে বলে স্নেহময় সুমেরদাসজী তাঁর বন্ধু-পুত্রকে পাঠিয়েছেন আমাকে নিয়ে যাবার জন্য। হায়রে, দুদিন পরে কোথায় থাকবে তাঁর এই উদ্বেগ ও কাতরতা। আমি যে পরিক্রমার শপথ নিয়েছি। আমার আর তাঁর কাছে থেকে যাবার উপায় নাই! আমার চোখে চোখে থাকবেন নর্মদা, এগিয়ে

চলবার পথ, ঝাড়ি জঙ্গল পাথর ছাড়া আমার জন্য আর কেউ অপেক্ষা করছে না। মন্দিরের পাশ দিয়ে আসার সময় সূর্যদেবতার স্ফটিক-গোলকের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, অস্তগামী সূর্যের শেষ রশ্মি পড়ে, গোলকটিকে আকাশমণ্ডলস্থ সূর্যের মত জ্যোতির্ময় দেখাচ্ছে। একজন ভদ্রমহিলাকে দেখলাম নর্মদাতে স্নান করে এসে মন্দিরের চাতালে সাষ্টাঙ্গ হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমার সাথী জানালেন — এই মহিলার স্বামী ইন্দোর শহরে কাজ করতেন, ডাক্তাররা বলেছেন, লোকটির লিভারে ক্যানসার দেখা দিয়েছে, স্বামীর আরোগ্য কামনায় ভদ্রমহিলা 'হত্যা' দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম — এঁর স্বামী এতে কি রোগমুক্ত হবেন? অটুট বিশ্বাসে সাথী জবাব দিলেন — এ্যায়সা হম বহোৎ দেখা হ্যায়। জরুর উনকী আদমীকা রোগমুক্তি হোগাই হোগা।

পরদিন ভোরে উঠেই সুমেরদাসজীর সঙ্গে যাত্রা করলাম নর্মদার উত্তরতট ধরে। মনোরম পার্বত্যপথ, মুণ্ডমহারণ্যের সেই দুর্গম অরণ্যের বিভীষিকা আর কোথাও নাই , আমাদের বাংলাদেশের গ্রামের শোভার মত নর্মদার এই উপত্যকা অঞ্চলও নানা ফল ফুল ছোট-বড় নানারকমের গাছ ও শস্যক্ষেত্রের শোভায় অপরূপা। বাংলাদেশে জল কাদা নালা ও পুষ্করিণী আছে , মাটি কাদার পথ কিন্তু এখানে পরিষ্কার পার্বত্যপথ — এইটুকু যা তফাৎ। মান্দালা থেকে এ পর্যন্ত এই দীর্ঘপথে একটি পুষ্করিণী বা ডোবা চোখে পড়ে নি। বেলা বারটা নাগাদ আমরা একস্থানে একটি শিবমন্দির দেখে স্নান সেরে নিলাম। সুমেরদাসজীর ঝোলায় কলা, পেয়ারা ও খোয়া তাঁর গুরুভাই পথে খাবার জন্য দিয়েছিলেন, আমরা তাই দিয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম। শিবমন্দিরটি নতুন তৈরী হয়েছে বলে মনে হল। বলতে ভুলে গেছি , আমরা সাতপুরা পর্বতাঞ্চল দিয়ে হেঁটে চলেছি। নর্মদা ইতিমধ্যেই সাতপুরা পর্বতাঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করে উদ্দাম বেগে বয়ে চলেছেন। রাত্রি নয়টা নাগাদ আমরা রবিতীর্থ থেকে সতের মাইল হেঁটে গোয়ারীঘাটে গৌরসংগম অতিক্রম করে জব্বলপুরের ভিড়াঘাটে সুমেরদাসজীর সেই 'অবধূত-আশ্রমে' পৌঁছে গেলাম।

মেহেরদাস ও অন্যান্য আশ্রমিকরা আমাদেরকে দেখে অবাক। বাবার দেহান্তের পর আমার জীবনে যে এত বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে গেছে তা তাঁরা জানবেন কি করে? তাছাড়া সুমেরদাসজী মেহেরদাসকে আশ্রমাধ্যক্ষ নির্বাচন করে বলেই গেছলেন, তিনি আর ওখানে আসবেন না। মান্দালাতে তাঁর গুরুর নামাঙ্কিত 'ভীষ্মাশ্রমেই' বাকী জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু সহসা তাঁকে এভাবে উপস্থিত হতে দেখে সবাই অবাক হয়ে গেছেন। সুমেরদাসজী কৈফিয়ৎ দিয়েছেন — ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহুঁ, শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকো এ্যায়সা ভেখ্ দেখকর হম্ বহুৎ বিচলিত হো গঈ। বুড্ঢা হো গঈ, রেবা সংগম তক্ যানে নেহি সেকেগা। তবভি বাঁদরাভান তক্ সাথমেঁ যাকর্ পরিক্রমাকা পথ দেখলা দুংগা, উসকা বাদ আপস্ আকর মান্দালামেঁ ফিন্ আসন লাগায়েগা।

অবধূত আশ্রম আমার নিজের জায়গা, পুরাতন জায়গা। কাজেই খুব আনন্দে এবং আরামে থাকলাম। সকালে স্নানপূজা সেরে বিকেলের দিকে অল্পবিস্তর নর্মদাতটে হেঁটে, সন্ধ্যাকালে আশ্রমাগত ভক্ত এবং আশ্রমবাসীদের কাছে মহাভারত ও উপনিষদ্ পাঠ করে সময় কেটে যেতে লাগল। সুমেরদাসজী আমাকে দশ বারোদিন ঐখানে বিশ্রাম নিতে বলেছিলেন কিন্তু পাঁচদিনের দিন নিজেই বিকেলের দিকে কোথাও হতে এসে বললেন — ইস্লিয়ে হম্

ক্যা কহুঁ, নর্মদামায়ীকা কৃপাসে এক মোকা মিল গয়া। অব বিহানমেঁ আপ্‌কো হম্‌ জলেরীঘাটমেঁ লে চলুঙ্গা।

তিনি যা বললেন তার সারমর্ম এই যে নর্মদাতীর্থের প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক কমলভারতীজী যিনি হাজার হাজার সন্ন্যাসীর জমাত্ সঙ্গে নিয়ে মার্কণ্ডেয় মুনি প্রবর্তিত নর্মদা পরিক্রমার ধারাকে নূতন করে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন, তাঁরই এক প্রশিষ্য শংকরভারতীজীর চারজন শিষ্য বর্তমানে গৌরসংগমে অবস্থান করছেন। বিহানমেঁ অর্থাৎ পরদিন সকালে তাঁরা ওঁকারের পথে যাত্রা করবেন। তাঁদের সঙ্গে গেলে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব।

তাঁর কথা শুনে মনে হল, সেই সাধুদের সঙ্গে আমি নিশ্চিন্তে যেতে পারব কি পারব না, সে তো ভবিষ্যতের কথা, তিনি যে অনেকখানি নিশ্চিন্ততা বোধ করবেন, সে বিষয়ে তিনি নিঃসন্দেহ। তিনি প্রসঙ্গক্রমে আরও জানালেন যে কমলভারতী ও গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীজীর মত শংকরভারতীও প্রতি বৎসর জমাত্ নিয়ে অমরকন্টক পর্যন্ত যাতায়াত করে থাকেন। মার্কণ্ডেয় মুনি ওঁঙ্কারেশ্বরে যে শিলাতে বসে তপস্যা করেছিলেন সেই মার্কণ্ডেয় শিলার কাছে দীর্ঘকাল কাটিয়ে কমলভারতীজী 'চব্বিশ অবতার' নামক স্থানে চলে যান। সেখান থেকে যান মর্কটি সংগমে। মর্কটি সংগমেই সেই সিদ্ধযোগী নর্মদার সঙ্গে লীন হন। চব্বিশ অবতার ও মর্কটি সংগমে তাঁর নামে দুটি আশ্রম আছে। সেই আশ্রমের বর্তমান মোহান্ত ঐ শংকরভারতীজী।

সুমেরদাসজী আশ্রমে সবাইকে হাঁকডাক করে হৈ হৈ ফেলে দিলেন। পথে খাবার জন্য পাঁচজনের উপযোগী লিট্টি পাকাবার হুকুম দিলেন, জব্বলপুর পাঠালেন একজনকে সাবু কিস্‌মিস্ আনার জন্য। মুণ্ডমহারণ্যে ঠিকরনাথীরা আমার টর্চটা আত্মসাৎ করেছিলেন, একটা টর্চলাইটসহ আলাদা আরও চারটা ব্যাটারীও কিনে আনার হুকুম দিলেন। আমার কোন বাধাই তিনি মানলেন না। মেয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে বা কোন প্রবাসী পুত্র ভোররাতে কর্মস্থলে যখন ফিরে যায় দীর্ঘকালের জন্য, তখন যেমন মা বাবা তালপাটালি থেকে আমসত্ব সব কিছুই ছেলেমেয়ের সঙ্গে দেন, সুমেরদাসজীও তেমনি আমার জন্য বন্দোবস্ত করতে উদ্যোগী হলেন। যে সাধুটি জব্বলপুর যাচ্ছিলেন, তিনি প্রায় দুহাজার গজ এগিয়ে গেছলেন। সুমেরদাসজী হাঁক পাড়তে পাড়তে দৌড়ে গিয়ে বলে এলেন আমার জন্য কিছুটা তালমিছরীও কিনে আনতে।

রাত্রি আটটা নাগাদ তিনি আমাকে নিয়ে চললেন নর্মদার ঘাটে। নর্মদার জল স্পর্শ করিয়ে আচমনাদির পর একটি মন্ত্র শিখিয়ে দিয়ে বললেন — জঙ্গলে উন্মুক্ত স্থানে রাত্রিবাস করতে বাধা হলে আমি যেন অতি অবশ্য এই মন্ত্র পড়তে পড়তে দণ্ড দিয়ে একটা গণ্ডি টেনে তার মধ্যেই বাস করি, তাহলে 'শের, ভাল্লু, সাঁপ, বিচ্ছু কুছ্ আপকো নেহি কাটেগা। গণ্ডিকা অন্দরমেঁ উনোনে ঘুস্‌নে নেহি সেকেগা।'

মন্ত্রটি শিখিয়ে তিনি হাতজোড় করে নর্মদার উদ্দেশ্যে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলেন — মায়ি! সুমেরদাস জীন্দেগী ভর আপকা পাশ কুছ নেহি মাংগা। আভি হম্ মাংগতা হুঁ, ইস্ লেড়কাকো আপ্ আচ্ছিতরেসে দেখ্‌ভাল করেঁ। ইহ্ হামারা বিনতি হৈ। অবিরলধারে কাঁদতে থাকলেন তিনি। নর্মদার দিকে তাকিয়ে যুক্তকরে এমন কাতরভাবে নিবেদন করতে থাকলেন যে মনে হল তাঁর সামনে নর্মদার জলধারা নাই, স্বয়ং নর্মদাই যেন মূর্তি পরিগ্রহ করে তাঁর

সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

পরাশর ঘাটে দেখেছিলাম, নর্মদা থেকে কুড়ানো একটি শিবকে আমি গৃহীর পক্ষে অমঙ্গলজনক বলায় মহাত্মা শোভানন্দজী সেই শিবলিঙ্গটিকে নর্মদার জলে ছুঁড়ে ফেলে এমনভাবে রোষকষায়িত লোচনে নর্মদার দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে বকছিলেন যে, সেদিনও আমার মনে হয়েছিল, নর্মদা যেন ইচ্ছা করে 'দিল্লাগী' করে তাঁকে অশুভ শিবলিঙ্গটি দিয়েছিলেন এবং ধরা পড়ে গিয়ে অপরাধী মেয়ের মত হেঁটমুখে দাঁড়িয়ে ক্রুদ্ধ সাধুর ভর্ৎসনা শুনছেন। এ রহস্য আমার কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবে উভয়ক্ষেত্রেই অনুভব করতে পারছি, এই দুই সাধুর কাছে নর্মদা যেন নিত্যপ্রকটিতা।

আশ্রমে ফিরে এসেও ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির নানা বিপদসঙ্কুল স্থানে কিভাবে সাবধানে থাকতে হবে, প্রতিনিয়তই কিভাবে রেবামন্ত্র জপ করে করে এগিয়ে যেতে হবে সে সম্বন্ধেও কিছু উপদেশ দিলেন। আমার জন্য তাঁর উদ্বেগের অন্ত নাই। সকালে উঠেই খাবারের পুঁটলিটি হাতে নিয়ে আমাকে সঙ্গে নিয়ে শাহপুরার দিকে হাঁটতে লাগলেন। একে একে তিলওয়ারা ঘাট রাজেশ্বরী ঘাট ইত্যাদি অতিক্রম করে আমরা বেলা নয়টা নাগাদ জলেরীঘাটে এসে পৌঁছলাম। গোয়ারীঘাটের কাছে 'গৌর' নামে একটি ছোট্ট উপনদী পাহাড়ের উপর থেকে বয়ে এসে নর্মদার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। তাই এই স্থানের নাম হয়েছে গৌরসঙ্গম। এই জলেরীঘাটের উপরেই নর্মদার ধারে একটা টিনের আটাচালা এবং পাথরের একটা ঘর আছে। সেই আটাচালার মধ্যে চারজন সাধু বসে আছেন। তাঁরাই শংকরভারতীর শিষ্য। তাঁরা যাত্রা করার জন্য তৈরী হয়েই বসে আছেন। সুমেরদাসজী তাঁদের হাতে লিট্টির পুঁটলিটি দিয়ে বললেন — ইয়ে আপ্‌কো লিয়ে পারসাদী হ্যায়। তাঁদের কাছে আমার অল্পবিস্তর পরিচয় দিয়ে প্রত্যেকের হাত ধরে ধরে সাশ্রুনয়নে অনুনয় করতে লাগলেন, তাঁরা যেন দয়া করে আমার দেখ্‌ভাল করেন। আমি তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠলেন। আর কোন কথা বলতে পারলেন না।

আমি তাঁকে ধরে বসিয়ে দিলাম। পুনরায় প্রণাম করে বাবাকে স্মরণ করে সাধুদের সঙ্গে যাত্রা করলাম। পরিক্রমার ব্রত নিয়েছি — নর্মদাতীর্থের পথ আমাকে ডাকছে। বন্ধুবিহীন বন্ধুর পথে আমাকে যাত্রা করতেই হবে।

এ আমি কি বললাম? বাবার আশীর্বাদে বা নর্মদামায়ীর দয়ায় অমরকণ্টক হতে যাত্রা করে মুণ্ডমহারণ্য অতিক্রম করে এতদূর যে এলাম, পথ দুর্গম, ভয়ঙ্কর ও বন্ধুর হলেও বন্ধুবিহীন ত আমি কখনও হইনি! মহাত্মা শংকরনাথ, শোভানন্দ, সূর্যনারায়ণ সবাই ত আমার বন্ধুর কাজ করেছেন। আর এখনও পিছন ফিরলে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, উনি? ওঁকে কেবল হিতাকাঙ্খী বন্ধু বললে ছোটই করা হবে। ওঁর উদ্বেগাকুল চিত্তের যে ভালবাসার স্বাদ আমি পেয়েছি, তার ঋণ কি কোনদিন শোধ করতে পারব? সূর্যনারায়ণজী বলেছিলেন তাঁর সঙ্গে আমার নাকি পূর্বজন্মের সম্বন্ধ আছে। তাঁর কাছেও আমি অনেক সেবা-যত্ন পেয়েছি, সুমেরদাসজী কখনও দাবী করেন নি যে তাঁর সঙ্গে আমার কোন জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ আছে। তিনি মুখে না বললেও আমার সমগ্র অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করি, তিনি আমার কোন একান্ত আপনজন ছিলেন কিনা, তা দেখার জন্য ত্রিকুটীতে ধ্যান 'ধরতে' হয় না। কুকুরামঠে ঋণমোচনেশ্বর শিব দেখে এসেছি, তাঁর কাছে দেড় কিলো অড়হর ডাল সমর্পণ করলে নাকি

সমস্ত ঋণ শোধ হয়ে যায়। শুনেছি, ওঁকারেশ্বরেও এক ঋণমোচনেশ্বর শিব আছেন, সেখানেও নাকি দেড় কিলো অড়হর ডাল দিয়ে ঐহিক পারলৌকিক সকল প্রকার ঋণের দায় থেকে মুক্ত হবার ব্যবস্থা আছে। কোন মানুষের বিবেক কি এতে সায় দিতে পারে? হোক শাস্ত্রবাক্য বা ঋষিবাক্য তবুও ঐ কথা স্বীকার করলে ভালবাসাকে অপমান করা হয়। মাতৃঋণ যেমন অপরিশোধ্য তেমনি যে কোন নিঃস্বার্থ ভালবাসার ঋণও অপরিশোধ্য। দেড় কিলো + দেড় কিলো = মোট তিন কিলো কেন, তিনশ কোটি কিলো ডালও শিবের কাছে সমর্পণ করলে ভালবাসার ঋণ শোধ করা যায় না।

'হমলোগ শাহপুরামে পৌঁছ গয়ি' সঙ্গী সাধুদের কথায় চমকে উঠলাম। এতক্ষণ নিজের চিন্তাতেই বিভোর ছিলাম। এখন হুঁস এল। দেখলাম মনোরম একটি উপবনের ভিতর দিয়ে হাঁটছি। ঘাটে স্ত্রী-পুরুষ স্নান করছে। কাছাকাছি লোকের বসতিও আছে।

— ঔর দো ঘন্টা চলেগা তো পত্রেশ্বর তীর্থ মেঁ পৌঁছ যায়েগা। উধরই হাম্‌লোগ স্নান-পান করেঙ্গে।

আমি বললাম — তথাস্তু। এখন আপনারাই ত আমার পথপ্রদর্শক। যে পথে যেমনভাবে যাবেন, আমি সুবোধ বালকের মত আপনাদেরকেই অনুসরণ করব।

এই চারজন সাধুর মধ্যে একজন মৌনী, দুজন এমন খোড়িবলি ভাষায় কথা বলেন যে তার বিন্দুবিসর্গ বুঝতে পারি না। চতুর্থ জনের নাম চেতন ব্রহ্মচারী। আমারই মত বয়স চব্বিশ বা পঁচিশ হবে, ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ফেল হয়ে ব্রহ্মচারী হয়েছে। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — ভাই, মুণ্ডমহারণ্যের মধ্যে আমি জমায়েৎ দেখে এসেছি। কোন এক কাশিকানন্দ ব্রহ্মচারীর শিষ্য কালিকানন্দ ব্রহ্মচারী সেই জমায়েৎ পরিচালনা করে নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে আপনাদের কি কোন পরিচয় আছে?

উত্তরে ব্রহ্মচারী জানালেন যে তাঁরা গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীর দল। হোসেঙ্গাবাদের কাছে কোকসর নামক স্থানে তাঁদের মূল গদী; কোকসরেই গৌরীশংকরজীর সমাধি-মন্দির আছে। গৌরীশংকরজীর আমলে একত্রে আমাদের জমায়েৎ পরিক্রমায় যেত। কিন্তু কমলভারতীর ধারা থেকে সেই জমায়েৎ এখন পৃথক হয়ে গেছে। আমাদের গুরুমহারাজ শংকরভারতীজী পৃথকভাবে জমায়েৎ নিয়ে প্রতি বৎসরই পরিক্রমায় বের হন। তিনি এতদিনে বোধহয় পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছেন, সঙ্গে নিশান, তাম্বু, ছড়ি এবং ভোজ্যবস্তু বহন করার লোকজন ছাড়াও প্রায় দুই হাজার সাধু আছেন। জব্বলপুরের অনেক ধনী শেঠ আমাদের গুরু মহারাজের ভক্ত। তাঁরা যাতে এই বিরাট জনতার সেবা বা ভাণ্ডারের জন্য আগে ভাগে বিধিমত ব্যবস্থা করে রাখেন, সেইজন্য আমরা জব্বলপুরে তাঁদেরকে খবর দিতে এসেছিলাম। পথে যেখানে জমায়েতের সঙ্গে দেখা হবে সেইখান থেকে আপনাকে একলা পথে চলতে হবে।

আমি বললাম — নর্মদামায়ীর যা ইচ্ছা তাই হবে।

বেলা প্রায় দুইটা নাগাদ আমরা পত্রেশ্বর তীর্থে পৌঁছে গেলাম। নর্মদা এখানে বেশ চওড়া। ঘাটের উপরেই একটি পাথরের শিবমন্দির। আমরা স্নান করে সকলেই মন্দিরে ঢুকলাম শিবপূজা করতে। একটি কালো রঙের শিবলিঙ্গ। শিবলিঙ্গের মাথায় প্রচুর ফুল এবং বেলপাতা। তার মানে কেউ এসে পূজা করে গেছেন। চেতন ব্রহ্মচারী বললেন, এতদঞ্চলে বহুলোকের বসতি। ঐ দেখুন, দূরে দূরে পল্লী দেখা যাচ্ছে। গৃহীরা অনেকেই এই মন্দিরে এসে

শিবপূজা করে যান। স্কন্দপুরাণ পড়ে গুরুজী এই শিবের কথা প্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন যে, চিত্রসেন নামক এক গন্ধর্বের পুত্র ছিলেন পত্রেশ্বর। তিনি অসাধারণ রূপবান এবং বীর। দেবরাজ ইন্দ্রের খুব প্রিয়পাত্র ছিলেন। কিন্তু স্বর্গে দেবগণের সভায় নৃত্যশীলা অপ্সরা মেনকাকে দেখে তিনি কামভাবে জর্জরিত হয়ে মেনকার মর্যাদা লঙ্ঘন করেন। তাতে দেবরাজ কুপিত হয়ে বলেন —

সত্যশৌচরতানাঞ্চ ধর্মিষ্ঠানাং জিতাত্মনাম্।
লোকোহয়ং পাপিনাং নৈব ইতি শাস্ত্রস্য নিশ্চয়ঃ।।

যাঁরা সত্যনিষ্ঠ, শৌচপরায়ন, জিতেন্দ্রিয় এবং ধর্মাত্মা, এই স্থান তাঁদেরই জন্য। ইন্দ্রিয়পরায়ন পাপীদের স্থান স্বর্গে নাই। তুমি মর্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করে বার বৎসর কাল ইন্দ্রিয় সংযম করে যদি রেবাতটে শান্ত শিবের উপাসনা করতে পার, তবেই পুনরায় সদ্‌গতি প্রাপ্ত হতে পারবে —

নর্মদাতটমাশ্রিত্য দ্বাদশাব্দং জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আরাধয় শিবং শান্তং পুনঃ প্রাপ্সসি সদ্‌গতিম্।।

এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা সেই পত্রেশ্বর। তাঁর নামানুসারেই এখানে শিবের নামও পত্রেশ্বর।

পত্রেশ্বর ঘাটে সুমেরদাসজী প্রদত্ত লিট্টি খোয়া এবং ফল পাঁচজনে ভাগ করে খেয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। নদীর ধারে ধারে শালবন, সাজা শালাই-এর গাছ এখানে বিশেষ চোখে পড়ছে না, তবে মাঝে মাঝে সেগুন গাছ দেখতে পাচ্ছি। আমলকী এবং বহেড়ার গাছ বোধহয় সর্বত্র। পাথুরে রাস্তায় হাঁটতে যেটুকু কষ্ট তাছাড়া আর কোন কষ্ট নাই অর্থাৎ জঙ্গলের বিভীষিকা নাই। পর্বতের উপর আড়াই হাজার বা তিনহাজার ফুট উঁচুতে অরণ্য দেখা যাচ্ছে, কিন্তু নর্মদা কৃপা করে এতদ্ঞ্চলে উপত্যকা পথে বয়ে যাচ্ছে বলে হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। তবে প্রচণ্ড শীত। শীতকালের বেলা ছোট, তাই তাড়াতাড়ি সন্ধ্যা হয়ে গেল। মণিময় জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনের রাত্রে আমাকে এক রেণু শঙ্খিয়া খাওয়ানো হয়েছিল তার গুণে কিনা জানিনা পাথরের রাস্তা শিশির পড়ে ভিজে গেলেও আমি চারজন সাধুর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জোর কদমে হেঁটে চলেছি। আমার সঙ্গীরা তো এরই মধ্যে একবার গাঁজা খেয়েছেন। গাঁজার গুণে তাঁদের বোধহয় শীত লাগছে না। চেতনদাস ব্রহ্মচারীকে আমাদের মধ্যে যিনি বয়োজ্যেষ্ঠ তিনি ঠেট্ হিন্দীতে কিছু বললেন, আমি শুধু বুঝতে পারলাম — কল্‌হড়ি, কল্‌হড়ি। চেতন ব্রহ্মচারী আমাকে বললেন আরও দুতিন ঘন্টা হাঁটলে কল্লোড়ীঘাটে গিয়ে পৌঁছতে পারব, সেখানের মন্দির বড়, মন্দিরের মধ্যে পাঁচজনেই রাত্রে থাকতে পারব। আমি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম। শুক্লপক্ষ চলছে, আকাশে চাঁদ উঠেছে, চাঁদের কিরণে নদীতীর পাহাড় সব ঝলমল করছে, নর্মদার স্বচ্ছ জলে জ্যোৎস্না পড়ে জলের ঢেউগুলিকে মনে হচ্ছে জ্যোৎস্নার ঢেউ। অপরূপ! অপরূপ!

রাত্রি আটটার পর হাঁটা গেল না। হিমের প্রচণ্ডতায় আমাদের প্রত্যেকের অবস্থাই কাহিল। কিছুদূরেই দেখতে পেলাম, তিনজন লোক হেঁটে আসছে। তাদের মুখে বিড়ির আগুন দূর থেকেই জোনাকি পোকার মত জ্বলছিল আর নিভছিল। কাছাকাছি হতেই বিড়ির উৎকট গন্ধ নাকে ভেসে এল! 'আপ্‌লোগ পরিক্রমাবাসী হ'? চেতন ব্রহ্মচারী 'হাঁ' বলেই জিজ্ঞাসা করল — কল্লোড়ী ঘাট কেত্‌না দূর বা?

নজদিগ, নজদিগ, আপ্ লোগ আ গয়া — এই বলেই টর্চ টিপে পথ দেখিয়ে আমাদেরকে নর্মদার ঘাটের কিনারেই একটি মন্দিরে নিয়ে উপস্থিত হল। তাদের কারও হাতে লাঠি, কারও হাতে টাঙ্গি । ধবধবে জ্যোৎস্নায় চারদিক দেখা গেলেও মন্দিরের গায়ে একটি অশ্বত্থ এবং কয়েকটি আমলকী গাছের জন্য আমরা মন্দিরটি দেখতে পাই নি। আমরা মন্দিরে ঢুকে যে যার গাঁঠরী থেকে কম্বলাদি বের করে শয্যাসন পাততে থাকলাম, একজন লোক টর্চ টিপে দাঁড়িয়ে রইল। পরিক্রমাবাসী সাধুদের জন্য এখানকার পল্লীবাসীরা প্রায় প্রতি মন্দিরের বাইরেই কিছু কাঠ জড় করে রাখে। সঙ্গের দুজন লোক সেই কাঠে দেশলাই এর কাঠি জ্বেলে আগুন ধরাবার চেষ্টা করতে লেগে গেল। শিশির পড়ে কাঠগুলো প্রায় ভিজে গেছল, অনেকক্ষণ ধরে অনেক কষ্ট করে তারা আগুন ধরিয়ে আমাদের হাত পা সেঁকার ব্যবস্থা করে চলে গেল। যাওয়ার আগে তাদের সভক্তি দণ্ডবৎও মনে রাখার মত। অতি সাধারণ লোক, কিন্তু সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা! এই শ্রদ্ধাই ভারতের মাটিতে এখনও তপস্যার প্রেরণাকে জাগ্রত রেখেছে। তাদের সঙ্গে চেতন ব্রহ্মচারীর বাক্যালাপ থেকেই জানতে পেরেছি, তারা এখানকারই স্থানীয় লোক। এখান থেকে বার মাইল দূরে রৈকপন গ্রামে এক বৈদ্যের কাছে গেছল 'দাবাবুটি' আনতে। ক্লান্ত শরীরে আপন মহল্লায় ফিরে এসে দেখছে পাঁচজন পরিক্রমাবাসী রাত্রির আশ্রয় খুঁজছেন। নিজেদের ক্লান্তি উপেক্ষা করে তারা আমাদের রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিয়ে তবেই ঘরে ফিরল। ভারতবর্ষ ছাড়া এ দৃশ্য আর কোথায় দেখা যাবে?

এক ঘুমেই রাত্রি কাবার! ঘুম থেকে উঠে দেখি প্রত্যেকের বিছানা খালি। গাঁজার গন্ধ থেকে অনুমান করলাম তাঁরা বাইরেই আছেন। মন্দিরস্থ মহাদেবকে প্রণাম করে বাইরে বেরিয়ে দেখি, তাঁরা কাঠে আগুন ধরিয়ে তার ধারে বসে আছেন। তখনও চারদিক কুয়াশায় ঢাকা। চেতন ব্রহ্মচারী বললেন — কুয়াশা কাটলে যাত্রা করা হবে। বেলা আটটা হবে, সেই সময় দেখলাম গত রাত্রির সেই চারজন লোক দুধ, আটা ও কলা ইত্যাদি এনেছেন আমাদের সেবার জন্য। সেবার ব্যবস্থা দেখে তাঁরা রায় দিলেন — ঠাকুরজীকে পূজা ও ভোগ নিবেদন করে রওনা হবেন। রেবাখণ্ড খুলে কল্লোড়ী তীর্থের বিবরণ খুঁজে বের করলাম। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় এই তীর্থের পরিচয় দিতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলছেন—

ততো গচ্ছেত্তু রাজেন্দ্র কল্লোড়ীতীর্থমুত্তমম্।
রেবায়াশ্চোত্তরে কুলে সর্বপাপবিনাশনম্ (আবন্ত্যখণ্ডে রেবাখণ্ডম্)।।

অর্থাৎ হে রাজেন্দ্র! অনন্তর কল্লোড়ী তীর্থে গমন করবে, সর্বপাপনাশন এই কল্লোড়ী তীর্থ রেবার উত্তরতীরে বর্তমান। হিতার্থং সর্বভূতানাম্ ঋষিভিঃ স্থাপিতং পুরা — পুরাকালে সর্বভূতের হিতকামনায় ঋষিগণ প্রভূত তপস্যা করে এই তীর্থ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। জাহ্নবী পশুরূপেন তত্র স্নানার্থম্ আগতা — জাহ্নবী পশুরূপ ধারণ করে এই তীর্থে নর্মদা স্নান করতে এসেছিলেন। ত্রিরাত্রং কারয়েৎ তত্র পূর্ণিমায়াং যুধিষ্ঠির — হে যুধিষ্ঠির এই কল্লোড়ী তীর্থে পূর্ণিমার ত্রিরাত্র বিধানে জপপূজা করলে শিবলোকে গতি হয় — শাম্ভবং লোকমাপ্নুয়াৎ।

পুঁথিতে দেখলাম বাবা এই 'ত্রিরাত্রং'এবং'পূর্ণিমায়াং' — এই দুটি শব্দে লালকালিতে দাগ দিয়ে রেখেছেন। উপস্থিত সাধু ও গৃহীদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম, সেইদিনই পূর্ণিমা। আমি চেতন ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে সঙ্গে আমার সংকল্প জানিয়ে দিলাম যে আমি এখানে

তিনদিন বাস করতে ইচ্ছা করি। ব্রহ্মচারী বললেন যে তাঁদের থাকার উপায় নাই, কারণ তাঁদের গুরুমহারাজ জমায়েৎ নিয়ে বেরিয়ে পড়বেন। অগত্যা তাঁরা স্নান পূজা সেরে দুধ, ফল ইত্যাদি খেয়ে বেরিয়ে পড়লেন। গৃহীভক্তদের আনা আটা তাঁদেরকে নিয়ে যেতে বললাম, কারণ আমি রুটি তৈরী বা কোন রকমের রান্না করতে জানিনা। আমার সম্পূর্ণ আকাশবৃত্তি। এ কয়দিনে ব্রহ্মচারীর সঙ্গে হৃদ্যতা গড়ে উঠেছিল, সে আমাকে আমলকী গাছের তলায় ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল যে — এখানে থাকুন, আপনার কোন কষ্ট হবে না কিন্তু এখান থেকে বার মাইল দূরে রৈকপন মহল্লায় কিছুতেই রাত্রিবাস করবেন না। কারণ ঐখানে পিশাচ থাকে। নানা বিভীষিকার ভয়ে পরিক্রমাবাসীরা সযত্নে রৈকপন মহল্লার মন্দির এড়িয়ে চলেন। বিদায় নিয়ে তাঁরা চলে গেলেন। আমি স্নান করে মন্দিরে শিবলিঙ্গের কাছে গিয়ে বসলাম। কমণ্ডলুর জলে ঘষে ঘষে শিবলিঙ্গটিকে ধুলাম। জলে কুলালো না, আবার নর্মদা থেকে জল এনে ঘষতে লাগলাম, পাথরের যোনিপীঠের উপর প্রায় একফুট দীর্ঘ লিঙ্গটি ধূম্রবর্ণের। ভিতরে কোন একটি চিহ্ন দেখা যাচ্ছে, কিন্তু স্পষ্ট নয়। ভক্তদের আনা দুধ সাধুরা সকালে খেয়ে আমার জন্য একটা বড় ভাঁড়ে রেখে গেছেন, আমি সেই দুধ এনে ঢেলে ঢেলে ঘষতে লাগলাম, তখন দেখলাম লিঙ্গের মধ্যে একটা পতাকার চিহ্ন। খাতার সঙ্গে মিলিয়ে সিদ্ধান্তে এলাম, এটি বায়ুলিঙ্গ। শিলাচক্রার্থবোধিনী হতে বাবা খাতায় যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন, তাতে বায়ুলিঙ্গের এই লক্ষণ লেখা আছে —

কৃষ্ণং ধূম্রং নবারুচ্যং ধ্বজাভং ধ্বজমূষল
মস্তকে স্থাপিতং তস্য ন্যূনন্যূমিতস্ততঃ॥

পূজা সেরে মন্দিরের পিছন দিকে পাহাড়ের উঁচু দিকটায় গিয়ে বসলাম, সেখান থেকে থাকে থাকে শালগাছ উপরে উঠে গেছে। একটু রোদ দেখে বসে রইলাম। বেলা এগারটা থেকে মন্দিরে ভক্ত সমাগম শুরু হয়ে গেল। কেউ দুধ, কেউ ফুল, ফল নিয়ে মহাদেবের মাথায় ভক্তিসহকারে নিবেদন করে গেল। বেলা একটা নাগাদ মন্দির ফাঁকা দেখে নেমে এলাম। বেলা তিনটা নাগাদ হাঁটতে হাঁটতে একটা সেগুন গাছের বনে এসে বসলাম। দেখলাম ঐ বনে অনেক ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে। এ দৃশ্য সুন্দর। কিন্তু কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে সহসা অনুভব করলাম, মনটা অবসাদে, একটা অদ্ভুত বিষাদে ভরে গেছে। এই অবসাদ বা সহসা বিষাদের কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। ভাবলাম এই বিদেশ বিরাজ্যে একা আছি বলেই হয়ত মনের এই ভাবান্তর। আমি সেগুন বন হতে মন্দিরে ফিরে এলাম। ভক্তরা পরিক্রমাবাসীর জন্য দুধ, ফল রেখে গেছে। দুধ, ফল মহাদেবকে নিবেদন করে প্রসাদ পেলাম। পূর্ণিমার রাত্রি কাটল, জপ সেরে মধ্যরাত্রে বাইরে এসে একবার নর্মদার দিকে, একবার পাহাড়ের দিকে তাকালাম। নির্জন নিস্তব্ধ রাত্রিতে অমল ধবল জ্যোৎস্না বিধৌত এই কল্লোড়ী তীর্থ যেন কোন সূক্ষ্মলোকের স্তর — এ যেন আমাদের পৃথিবীর কোন ভূ-ভাগ নয়, একটা অপার্থিব রাজ্যে আমি পৌঁছে গেছি। চেতনা এলে দেখলাম, দুজন লোক মন্দির থেকে আমার কুশাসন এনে তাতে শুইয়ে দিয়েছে, কাঠের আগুনে আমার হাত পা সেঁকছে। সকাল হয়ে গেছে। আমি ধীরে ধীরে উঠে বসলাম।

— 'আপ্ মন্দরকা বাহারমে ক্যায়সে আ গয়া। কোঈ প্রেত বেগারা দেখা হৈ?'

— নেহি জী, শিউজীকা মন্দিরমেঁ প্রেত ক্যায়সে আয়েগা?

'আ সকতে হৈ, কেঁওকি, ভূতপ্রেত তো ভূতনাথকা অগলবগলমেঁ রহবৈ করেগা।'

আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম, প্রচণ্ড শীতে অস্থির হয়ে এইখানে এসে কাঠ জ্বালাতে চেষ্টা করেছিলাম, ঠাণ্ডার চোটে হয়ত অজ্ঞান হয়ে গেছলাম। আমার কিছু হয় নি। তবিয়ত আচ্ছাই হ্যায়।

মনে পড়ল প্রেমিক সাধু সূর্যনারায়ণজীর কথা। নর্মদার সর্বত্র ঐ রকম দরদী সাথী কোথায় পাবো যে, কোথাও হতে যেকোন ভাবে হোক একটা ভাঙা কড়াই এনে মন্দিরের মধ্যেই আগুন পোহাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। কিছুক্ষণ পরে লোকদুটি চলে গেল। আমি ধীরে ধীরে নর্মদার ঘাটে স্নান করে এলাম। শিবলিঙ্গে শুধু জল ঢেলে পূজা করছি, এমন সময়ে এক বুড়িমা কিছু ফুল এবং একলোটা দুধ এনে মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন। তাঁর ভাষা কিছু বুঝতে পারলাম না, আকারে-ইঙ্গিতে তিনি ফুলগুলো শিবের মাথায় ছড়াতে বলছেন। দুধের লোটা নিয়ে তিনি মন্দিরের দ্বারে বসে রইলেন। দুধের লোটা যখন শিবের কাছে রাখলেন না, তখন তা শিবের মাথায় ঢালার জন্য চেয়ে নেওয়ার কথা চিন্তা করাও অবান্তর। ফুল ছড়িয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই বুড়িমা বললেন — পিয়ো। ব্রাভ্মন (ব্রাহ্মণ) হুঁ।

দুধ খেতে গিয়ে দেখি গরম দুধ। সমস্ত দুধটা পান করিয়ে লোটা নিয়ে তিনি বিদায় নিলেন। তাঁর কথা থেকে অনুমানে বুঝলাম নিকটেই জঙ্গলের মধ্যে কোন পল্লীতেই বাস। আজও বেলা দুটা নাগাদ বেরিয়ে একটা শালবনে গিয়ে বসলাম। দূরে জঙ্গলের দিকে একটা চিতল হরিণকে দৌড়ে যেতে দেখলাম। শালবনে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর নিজের মনে ভাবান্তর অনুভব করলাম! একটা অদ্ভূত ঔদাস্য বা উদাসীনতা এসে মনকে ধীরে ধীরে গ্রাস করল। তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে বেজে উঠল বৈরাগ্যের ঝঙ্কার। মনের মধ্যে করুণ সুরে বেজে চলেছে —'সমাজ সংসার মিছে সব, মিছে এ জীবনের কলরব'! প্রকৃতির রাজ্যে এ কী ভাবের খেলা। এর পরেও আমি বিভিন্নস্থানে শালবনে বৈরাগ্যের ঝঙ্কার এবং সেগুন বনে বসলে বিষাদের সুর স্পষ্টতঃ বহুবার অনুভব করেছি। বন-প্রকৃতিতে এই ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব আমার পরীক্ষিত সত্য। যে কেউ শুধু শাল বা শুধু সেগুন বনে গিয়ে এটি উপলব্ধি করে আসতে পারেন।

তৃতীয় দিনে অর্থাৎ কৃষ্ণ-তৃতীয়াতে পূজা করে উঠে দেখি, প্রথম দিনে যে লোকটি টর্চ টিপে আমাদেরকে মন্দিরে প্রবেশ করতে সাহায্য করেছিল সে আমাকে শিবের একটি প্রসাদী ফুল দিতে অনুরোধ করল। তার ছেলেটি জ্বরের ঘোরে প্রলাপ বকছে, তিনচারবার ফিটও হয়েছে। বৈদ্যের 'দাবাবুটি' নিয়মিত খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কোন উপকার হচ্ছে না। আমি শিবের মাথা থেকে ফুল এনে তার হাতে দিলাম।

পরদিন ত্রিরাত্র-বিধানের ব্রত শেষ করে বসে আছি, দেখলাম সেই লোকটি আরও চার পাঁচজন স্ত্রী-পুরুষ সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হল। শিবের প্রসাদী ফুলে তার ছেলে সুস্থ হয়ে গেছে। তার সঙ্গের লোকজনও আমার কাছে নানা ব্যাধির ঔষধ চাইতে এসেছে। আমি তাদেরকে বুঝিয়ে বললাম, বৈদ্যের ঔষধেই কাজ হয়েছে, কাকতালীয়বৎ শিবের প্রসাদী ফুল আমার হাত থেকে নিয়ে গেছ বলে ভেবো না যে আমার হাতের কোন গুণ আছে। আমি একজন পরিব্রাজক মাত্র, আমার কোন সাধনভজনও নাই, কোন কেরামতিও নাই। যদি কিছু হয়ে থাকে, তোমাদের কল্লোড়ীনাথ মহাদেবের গুণেই হয়েছে। কিন্তু কে কার

কথা শুনে! তাদের কাকুতি মিনতিতে বাধ্য হয়েই সকলের হাতে শিবের ফুল দিয়ে বিদায় দিলাম। তারা অনেক ফল দুধ খোয়া প্রভৃতি এনেছিল, সব দুধ ফল মিষ্টি শিবের মাথায় চাপিয়ে দিয়ে ফল মিষ্টি সকলকেই শিবের প্রসাদ স্বরূপ নিঃশেষে বিলিয়ে দিলাম, নিজের খাবার জন্য ফল মিষ্টি রাখতে অনেক অনুরোধ করেছিল তারা, কিন্তু আমি মনে মনে বিচার করে নিলাম, তারা রোগমুক্তি কামনায় ঐসব বস্তু এনেছে। কামনা-মাখানো বস্তু অশুদ্ধ। নিষ্কামভাবে স্বেচ্ছায় শ্রদ্ধাপ্রদত্ত অন্নভোগেই পরিক্রমাবাসীর ব্রত হওয়া উচিত। এটাই শাস্ত্রের নিয়ম।

ঝুলি হতে সাগু বের করে কিস্‌মিস্‌সহ ভিজিয়ে তাই খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করলাম। মনে মনে ভাবলাম, এইবার এখান হতে সরে পড়বার সময় হয়েছে। নতুবা বিড়ম্বনা বাড়বে। পরদিন সকালেই ঝুলি-কম্বল নিয়ে রওনা হলাম নর্মদাতীরের পথে পথে। চেতন ব্রহ্মচারীর কাছে আগেই শুনেছি এখান হতে বার মাইল দূরে পড়বে রৈকপন মহল্লা।

কুয়াশার মধ্য দিয়ে হেঁটে চলেছি, নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে। পাহাড়ী পথে এখন হাঁটা অনেকখানি আমি রপ্ত করে নিয়েছি, কিন্তু কষ্ট হচ্ছে, এই রাস্তার দুপাশেই লজ্জাবতী লতার মত একরকম ছোট ছোট লতা, কাঁটায় ভর্তি, পথকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। লোকজন যা চলাফেরা করে তাদের পায়ের নাগরা জুতার চাপে যেখানে যেখানে একটু পিষ্ট হয়ে গেছে, লাফিয়ে লাফিয়ে সেখানে পা ফেলে হাঁটতে লাগলাম, কোথাও বা হাতের লাঠি দিয়ে সাবধানে লতাগুলি সরিয়ে দলে মেড়ে এগোতে লাগলাম। মনে জাগল, এই যে এভাবে হাঁটার সুবিধার জন্য লতাগাছ নষ্ট করছি, এই বুঝি পাহাড় থেকে নেমে এসে কোন ঋষি এই বলে ধমক দেবেন — অন্তঃসংজ্ঞা ভবন্তি এতে সুখদুঃখ সমন্বিতা — যুবক ! এইভাবে লতাগুলিকে দলে পিষে ফেলো না, এদের মধ্যেও চেতনা আছে, জীবন আছে, এদেরও মানুষ বা অন্যান্য জীবজন্তুর মত সুতীব্র সুখ-দুঃখের অনুভূতি আছে!

এইভাবে প্রায় চারঘন্টা সময় লাগল দুই মাইল রাস্তা হাঁটতে। একে হাঁটা বলে না, এর নাম লাফিয়ে লাফিয়ে খঞ্জ মানুষের মত কোনভাবে পথ চলা। যাইহোক তারপরের পথ কাঁটালতা মুক্ত। কিন্তু জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে গেলাম। পথের দুপাশেই নানাজাতীয় বড় বড় গাছ, অশ্বত্থ, শিরীষ নিম, মহানিম ছাড়াও শাল ও সেগুন গাছই বেশী। প্রায় মাইলখানিক হাঁটার পরেই আবার মানুষজনের বসতিসহ শস্যপূর্ণ উপত্যকায় পড়লাম। সূর্যরশ্মি দেখে অনুমান করলাম, মধ্যাহ্নকাল অতীত প্রায়। তারই মধ্যে একটা পরিষ্কার ঘাট দেখে স্নান করতে নামলাম। পথে আসতে আসতে পাহাড়ের অনেক উপরে দুটি শিবমন্দির চোখে পড়েছিল, কিন্তু এই ঘাটের উপরে ত কোন শিবমন্দির নাই। আজ কি তাহলে স্নানের পর শিবপূজা ভাগ্যে ঘটল না। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল, শিব তো কেবল একটি লিঙ্গমূর্তির মধ্যে আবদ্ধ নাই, পঞ্চমহাভূত, মন, বুদ্ধি, চিত্ত, এই অষ্টপ্রকৃতিই তো তাঁর অবয়ব! গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজার মত নর্মদার জলে নর্মদা ও নর্মদেশ্বরের পূজা সারলাম।

বহুদূর হতে চোখে পড়ল বৃদ্ধ এক সন্ন্যাসী হেঁটে আসছেন। তাঁকে আমি জিজ্ঞাসা করলাম — রৈকপন মহল্লা আর কত দূরে? তিনি উত্তর দিলেন — আমো গুরুকুঁ সাপ কামড়িছি , দেখিবাকু যিব। সন্ন্যাসীকে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন ও দণ্ডবৎ জানাতে হয়, তাই তাঁকে যুক্ত করে বললাম — নমো নারায়ণায়, তিনি উত্তর দিলেন — সবু শিবঙ্ক দয়া, সে

রাখি পারন্তি মারি পারন্তি।

বদ্ধকালার সাথে বাক্যালাপ বৃথা, তাঁকে অতিক্রম করে হাঁটতে লাগলাম। তাঁর ভাষা শুনে বুঝলাম তিনি পূর্বাশ্রমে উৎকলবাসী ছিলেন। সুদুর উড়িষ্যায় জন্মগ্রহণ করলেও সন্ন্যাস গ্রহণ করে হয়ত গুরুর প্রভাবে মধ্যপ্রদেশের এই জঙ্গলে নর্মদাতটে তপস্যা করতে এসেছেন।

অনেকক্ষণ হেঁটে যাওয়ার পর ছয়জন লোককে একসঙ্গে হেঁটে আসতে দেখলাম। তাঁদের বেশভূষা দেখে বুঝলাম, বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ। তাঁদেরকে রৈকপন কতদূরে জিজ্ঞাসা করতে একজন বেশ চোস্ত্ হিন্দীতে জবাব দিলেন রৈকপন মহল্লার মধ্যেই আপনি দাঁড়িয়ে আছেন। ঐ দূরে যে শিব-মন্দির জঙ্গলের মধ্যে দেখতে পাচ্ছেন, ঐটি জানশ্রুতির মন্দির। কিন্তু ওখানে ত আপনি থাকতে পারবেন না, বেলা পাঁচটা বাজার পর কোন লোকই ঐখান দিয়ে হাঁটে না, পরিক্রমাবাসীরাও ওখানে কোনদিন রাত কাটায় নি।

—'কেন? ওখানে কি বাঘ ভালুকের ভয়'?

—'না, ওখানে পিশাচ আছে, ভূতের উপদ্রব খুব বেশী। পা চালিয়ে দ্রুত হেঁটে যান, মাইলখানিক দূরেই মহল্লা আছে, সেখানেই রাত্রিবাস করা ভাল।'

আমি বললাম, কাঁটালতায় পা ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। ভূতনাথের ত দর্শন পেলাম না, অন্ততঃ ভূতকেই চোখে দেখি! আমার তপস্যার অভাবে দেবতা যদি দর্শন না দিতে চান, অপদেবতার দর্শনই বা মন্দ কি? আমি ঐ মন্দিরেই থাকব।

লোকগুলি আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। আমি তাদেরকে অতিক্রম করে মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। বেলা তখন বোধহয় তিনটা হবে। মন্দিরের চত্বরে দেখলাম দুজন লোক বসে আছে। মন্দিরের মধ্যে একজন ব্রাহ্মণ কর্পূর জ্বেলে আরতি করছেন। আরতির শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমি পরিক্রমাবাসী, পায়ে কাঁটা ফুটে পা দুটো ক্ষতবিক্ষত হয়েছে, আমি এখানেই রাত্রে থাকতে চাই, আপনার কোন আপত্তি নাই ত? আমার কথা শুনে তিনি আঁতকে উঠলেন। বললেন — এ কাজ আপনি কদাচ করবেন না। দেখছেন না, সন্ধ্যার বহুপূর্বেই আমি সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাচ্ছি। একা আসিনি, সঙ্গে আমার ছেলে এবং ভাইপো এসেছে। আমরা সাজোত শ্রেণীর ব্রাহ্মণ, গুজরাটের আদি বাসিন্দা। পুরুষানুক্রমে আমরা এই মন্দিরের সেবাইত। মহাভারতে আছে, জানশ্রুতি রাজা এই রৈকপন শিবের প্রতিষ্ঠাতা, শিবের বহু সম্পত্তি আছে। সকাল আটটায় পূজা করতে আসি, বেলা তিনটা নাগাদ সন্ধ্যারতি সেরে চলে যাই। দুবেলাই লোক সঙ্গে নিয়ে আসি। তার চেয়ে বরং আপনি আমার বাড়ীতে চলুন সেখানেই রাত্রিবাস করবেন।

আমি বললাম — আপনি যে কথা বলছেন তা আমি রাস্তাতে শুনেই এসেছি। আজ আর আমি হাঁটতে পারছি না, আমি এখানেই থাকব। কিছু চিন্তা করবেন না, সকালে এসে আমাকে জীবিতই দেখবেন।

আমার দৃঢ় সংকল্প দেখে প্রদীপে রেড়ির তেল ভর্তি করে দিলেন। তাঁর ছেলেকে বললেন, শিবের সামনে যে প্রশস্ত হোমকুণ্ড তাতে কিছু কাঠ দিতে। খুব উদ্বিগ্ন চিত্তে তিনি চলে গেলেন।

নর্মদাতে হাত পা ধুয়ে এসে আমি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে বিছানা পাতলাম। পৌষমাস শেষ

হয়ে আসছে , হয়ত দু-একদিন পরেই মাঘ মাস আরম্ভ হবে। কমণ্ডলুর মধ্যে সাগুদানা ও মিছরী ভিজানোই ছিল, তাই খেয়ে নর্মদা থেকে কমণ্ডলুতে জল ভরে নিয়ে এলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেল। মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে হোমকুণ্ডের পাশে বসে শিবের স্তোত্র পাঠ করে বিছানায় গিয়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হাতের কাছে টর্চ রাখলাম। কর্পূরের গন্ধে মন্দিরের অভ্যন্তর এখনও সুরভিত।

মহাভারতে কোথায় রাজা জানশ্রুতির কথা আছে, তা শুয়ে শুয়ে ভারতে লাগলাম। মনে মনে পর্বের পর পর্ব স্মরণ করতে লাগলাম, কিছুতেই স্মরণে এল না। কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না।

'ঠক্ ঠক্ ঠক্' ঘুম ভেঙে গেল, বাইরে থেকে দরজায় কেউ টোকা দিচ্ছে। উঠে বসলাম, গায়ের রোম এই প্রচণ্ড শীতেও খাড়া হয়ে উঠেছে। মনে মনে স্থির করলাম, শক্ত আবলুয কাঠের দরজা ভেঙে না পড়া পর্যন্ত আমি দরজা খুলছিনে। কেউ যেন দরজার বাইরে অট্টাট্ট হাসিতে ফেটে পড়ল। আমি বাবাকে একাগ্রচিত্তে স্মরণ করতে থাকলাম। উপরে পাহাড়ের মধ্য থেকে একটা বিকট 'গুম্গুম্' শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের পাশ দিয়েই যেন একটা বড় পাথর গড়িয়ে গড়িয়ে নর্মদার জলে গিয়ে পড়ল। মনে হচ্ছে, কেউ যেন নর্মদার ঘাটে স্নান করে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করছেন, মন্ত্রের ভাযা বুঝছি না, কিন্তু মন্ত্রের গুরুগম্ভীর ধ্বনি কানে যেন মৃদুঙ্গের বোল তুলছে। ভয়ে কাঁটা হয়ে রইলাম।

কোনমতে সকাল হল, দরজা খুলে ঘোর কুয়াশার মধ্যে মন্দিরের চারপাশটা একবার দেখে এলাম, পাথর গড়িয়ে পড়ার কোন দাগ কোথাও দেখতে পেলাম না। মন্দিরে ঢুকে কম্বল মুড়ি দিয়ে জানশ্রুতির কথা কোথায় পড়েছি ভাবতে লাগলাম। মহাভারতে নাই এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ, অথচ নামটা খুব চেনাচেনা মনে হচ্ছে।

ক্রমশঃ কুয়াশা কাটতে লাগল। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখি, মন্দিরে চারজন লোক দাঁড়িয়ে আছে, কালকের সেই পুরোহিত মশাই দরজা ধীরে ধীরে ঠেলে উঁকি মেরে দেখছেন, আমি ভেতরে আছি কি না। পেছন দিক থেকে আমি সাড়া দিলাম — আভি তক্ হম্ জিন্দা হ্যায়!

চমকে উঠে পিছন দিকে চাইলেন। আমি ঘাটের দিক থেকে আসছি দেখে সে কি আনন্দ তাঁর। বললেন যে, তাঁরা এই স্থানকে বড় ভয় করেন, এর পূর্বে বহু কাণ্ড ঘটে গেছে, তাঁর বাবার আমলে তিনজন সাধু এই মন্দিরে বাস করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন। তাঁর পিতামহের আমলেও এইরকম ঘটনা ঘটেছিল, এখানে গভীর রাতে কিছু বিভীযিকাময় কাণ্ড ঘটে থাকে, সেজন্য পরিক্রমাবাসীরাও এ মন্দির এড়িয়ে চলেন। আমি আজও এখানে থাকব কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি বললাম — আমার পায়ের ব্যথা এখনও সারেনি, কাজেই দুচারদিন এখানে নিশ্চয়ই থাকব। আপনারা কিছু ভাবনা করবেন না। তিনি বললেন — আপনি থাকতে পারলে আমাদের কিছু বলার নাই। রৈকপনেশ্বর মহাদেব আপনাকে রক্ষা করুন। আমি পূর্বেই বলেছি, এই ঠাকুরের বহু দেবোত্তর সম্পত্তি আছে, পরিক্রমাবাসীদের সেবার জন্যও আমরা জমির উপসত্ত্ব ভোগ করি, কিন্তু ভয়ে কোন পরিক্রমাকারী বা কোন জমায়েৎ এখানে রাত্রিবাস করেন না। কাজেই আমরা সেবা করার কোন সুযোগও পাই না। আপনি আনন্দে যতদিন ইচ্ছা থাকুন, আমিই এই অঞ্চলের মুখিয়া, প্রতিদিন মধ্যাহ্নে আপনার

সেবার উপযোগী রুটি চাপাটি ফল দুধ পৌঁছে দিব, ভাববেন না যে আপনি কোন গৃহীর সেবা গ্রহণ করছেন, এই ভোগ রৈকপনেশ্বরজীর সম্পত্তি থেকেই আসবে জানবেন। পূজা করে তিনি সাথীদেরকে নিয়ে চলে গেলেন।

বেলা বোধহয় একটা নাগাদ পুরোহিত মশাই একজন লোককে সঙ্গে নিয়ে আমার জন্য চাপাটি ডাল ফল দুধ নিয়ে এলেন। সঙ্গের লোকটির হাতে একটি টাঙ্গি, তাকে তিনি বললেন, নিকটের জঙ্গল হতে কাঠ এনে রাতের আগুনের জন্য ব্যবস্থা রাখতে। শুধু সেদিনই নয়, আমি যে কয়দিন ছিলাম, প্রত্যেক দিনই তিনি আমার জন্য খাবার আনতেন, গোটা রাত্রি প্রদীপ জ্বালবার উপযোগী রেড়ির তেল এবং তুলার তৈরী সল্‌তে এনে মন্দিরে রেখে যেতেন।

দ্বিতীয় দিন রাত্রেও পাহাড় হতে আগত 'গুম্‌গুম্‌' শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। দুড়্ দুড়্ দড়াম্ শব্দে একটা পাথর পূর্বদিনের মত গড়িয়ে এসে ছলাৎ করে নর্মদার জলে পড়ল আমি শুনতে পেলাম, একটু পরেই পূর্ব রাত্রির মত দরজায় শব্দ হল — ঠক্ ঠক্ ঠক্। কেউ যেন হেঁটে ঘাটের দিকে গেলেন। 'আচ্ছা, কোন হিংস্র শ্বাপদ-বাঘ বা বুনো মহিষ তো হতে পারে' — এই ভেবে দরজার কাছে কান পেতে দাঁড়িয়ে রইলাম — পূর্বদিনের মত সেই রকম গুরুগম্ভীর মন্ত্রধ্বনি, যেন তালে তালে বোল উঠছে — ডমড্ ডমড্ ডমড্।

সেই মন্ত্রের ব্যঞ্জনায় এক অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল আমার শিরা ও ধমনীতে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে। স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে নতজানু হয়ে রৈকপনেশ্বরের কাছে স্তোত্রপাঠ করতে লাগলাম —

জটাটবী-গলজ্জল-প্রবাহ-প্লাবিত-স্থলে, গলেহবলম্ব্য লম্বিতাং ভূজঙ্গ-তুঙ্গ-মালিকাম্।
ডমড্-ডমড্-ডমড্ ডমন্নিনাদ-বড্ ডর্মবয়ং, চকার চণ্ডতাণ্ডবং তনোতু নঃ শিবঃ শিবম্॥

(রাবণকৃত শিবতাণ্ডব)

হে প্রভু শিবসুন্দর! তোমর জটার অরণ্য হতে গঙ্গার ধারা গলগল করে বেয়ে এসে তোমার গলদেশকে প্লাবিত করছে, সেই গলদেশ আবার সর্পমালায় বিভূষিত, তুমিই একবার ডমরু বাজিয়ে ডমড্ ডমড্ ডমড্ ধ্বনি তুলে তাণ্ডব-নৃত্যে ত্রিভুবনকে কম্পমান করেছিলে, তুমি আমাদের মঙ্গল বিধান কর।

জটাকটাহসম্ভ্রমভ্রমন্নিলিম্পনির্ঝরী — বিলোলবীচিবল্লরীবিরাজমানমূর্দ্ধনি।
ধগদ্ ধগদ্ ধগদজ্জল-ললাটপট্টপাবকে কিশোরচন্দ্রশেখরে রতিঃ প্রতিক্ষণং মম॥

(ঐ)

জটারূপ কটাহ হতে বেগে বহমান গঙ্গার চঞ্চল তরঙ্গমালায় যাঁর মস্তক শোভিত এবং যাঁর ললাটে ধগদ্ ধগদ্ শব্দে অগ্নি দেদীপ্যমান, সেই তুমি কিশোর চন্দ্রশেখরু! তোমার চরণকমলে আমার প্রতিক্ষণ রতি হোক।

নতজানু হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজার বাইরে লোকের কোলাহল শুনে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দিলাম। বললাম — ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, দরজা খুলতে দেরী হয়ে গেল।

— কোঈ বাত নেহি। ডর নাহি লাগা ত? আট বাজ গিয়া।

— বিলকুল নেহিজী।

বিছানা গুটিয়ে আমি স্নান করতে গেলাম। পুরোহিত মশাই পূজা করতে ঢুকলেন। আজ

তাঁর সঙ্গে ছয়জন লোক, সঙ্গে তাঁর বৃদ্ধা মাতাজীও এসেছেন। তাঁরা সবাই এমনভাবে আমার দিকে তাকাচ্ছে যেন আমি গ্রহান্তরের মানুষ, পথ ভুলে তাঁদের দেশে এসে পৌঁছেছি। বাক্যলাপ করা বৃথা, তাঁদের ঠেট্ হিন্দী আমার বোধগম্য হবে না। পুরোহিত মশাই কিছুটা সংস্কৃত জানেন, চোস্ত্ হিন্দীতে কথা বলতে পারেন। তাঁরই সঙ্গে কোনমতে কথাবার্তা বলতে পারি। পূজার পর তিনি তাঁর মাকে দেখিয়ে বললেন — মায়ের খুব ইচ্ছা আপনি যদি আমাদের বাড়ীতে পদার্পণ করেন। দুপুরবেলা যখন 'রোটি' দিতে আসব, তখন যদি আমার সঙ্গে যান, তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব। আমি বললাম — আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না। একটু অপেক্ষা করুন, আমি আপনাদের সঙ্গেই যাবো। ঐখানেই খেয়ে আসবো।

পূজাপাঠ সেরে আমি তাঁদের সঙ্গেই গেলাম। পুরোহিতমশাই-এর পাথরের দোতলা বাড়ী। গম, বাজরা, অড়হর, ছোলা প্রভৃতির কতকগুলি মরাই এবং বহু গরু বাছুর এবং মহিযাদি দেখে বুঝতে পারলাম, তিনি এই পাহাড়ী অঞ্চলের এক ধনী গৃহস্থ। একটি ছোট শিবমন্দিরও আছে। শিবমন্দিরেই আমাকে বসতে দিলেন। একটা আটচালাতে তাঁর গোমস্তা বসে কতকগুলো খতিয়ান ও নক্সা উল্টাচ্ছেন।

খুব সমাদর করে তাঁরা আমাকে চাপাটি, অড়হর ডাল এবং একবাটি দুধের সর এনে দিলেন, আমি যতক্ষণ খেলাম, কাউকে সেদিকে আসতে দিলেন না। খাবার পরেই কিন্তু তাঁর মহল্লার বহুলোক এসে ভীড় করল। কথাবার্তায় বুঝলাম, তাদের মধ্যে এ কথাটা রটে গেছে যে আমি শিবমন্দিরে যখন নিরাপদে রাত কাটাতে পেরেছি, তা'হলে হয় আমি নিজেই পিশাচসিদ্ধ নয়ত আমি কোন বড় সাধক। নানারকম রোগের 'দাবাবুটি' সবাই জেনে নিতে চায়, বিশেষ করে তাদের বাচ্চাদের মাথায় হাত বুলিয়ে যাতে আর্শীবাদ করি, সকলেই এই বায়না ধরল। আমি অনেক কষ্টে তাদেরকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে পরিত্রাণ পেলাম। পুরোহিত মশাই তাঁর পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে আমার সঙ্গে মন্দিরে এলেন, বেলা তিনটাতে সন্ধ্যারতি সেরে ফেলবার জন্য।

আজ তৃতীয় দিন। সন্ধ্যার পর মন্দিরের দরজা বন্ধ করে বসে আছি। প্রদীপ জ্বলছে , হোমকুণ্ডের আগুনে পর্যাপ্ত কাঠ দেওয়াই আছে। চুপ করে ভাবতে ভাবতে রৈকপন ও জানশ্রুতির রহস্য মনে পড়ল। পুরোহিতমশাই বলেছিলেন, মহাভারতে জানশ্রুতির কথা আছে, তাই মহাভারতের মহারণ্যে জানশ্রুতিকে খুঁজতে গিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিলাম। এখন মনে পড়ল সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে জানশ্রুতি ও মহর্ষি রৈক্কের কথা আছে। মহর্ষি রৈক্ক দীর্ঘকাল তপস্যা করে ব্রহ্মজ্ঞ হয়েছিলেন ; ব্রহ্মানন্দে বিভোর হয়ে তিনি একটা গরুর গাড়ীর তলায় শুয়ে থাকতেন জঙ্গলের মধ্যে। তাঁর ব্রহ্মতেজের ঊর্জস্বল দীপ্তির প্রভাবে স্বয়ং দেবতারা এমন কি বনের পাখীরাও পুড়ে মরবার ভয়ে তাঁকে লঙ্ঘন করতে সাহস করত না। রাজা জানশ্রুতি তাঁর সংবাদ জানতে পেরে পরমতত্ত্ব উপলব্ধি করার আকাঙ্খায় তাঁকে গিয়ে বলে — ঋষি! আমি আপনার জন্য ছয়শত গাভী, এই কণ্ঠহার এবং একটি অশ্বতরীবাহিত রথ এনেছি, হে ভগবন্, আপনি যে দেবতার উপাসনা করেন তাঁর সম্বন্ধে আমায় উপদেশ দিন — এতাং ভগবো দেবতাং শাধি যাং দেবতামুপাসস্ ইতি।

আমাদের প্রাচীন ভারতের এই ধারা ছিল যে, ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে হলে গুরুগৃহে ব্রহ্মচর্য পালনের ব্রত নিয়ে দীর্ঘকাল গুরুর সেবা বা পরিচর্যা করতে হয় নতুবা বিপুল

অর্থসম্পত্তি বা গোধন দান দ্বারা সন্তুষ্ট করতে হয়। সেবা দান ও দাক্ষিণা দ্বারা তুষ্ট করতে পারলে তবেই ব্রহ্মজ্ঞ গুরু শিষ্যের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সঞ্চারিত করে দিতেন, তাতেই শিষ্যের ঘটতো মহাসচেতন সমুত্থান।

প্রৌঢ় বয়সে রাজা জানশ্রুতির পক্ষে গুরুগৃহে বাস করে গুরুর অক্লান্তভাবে সেবা পরিচর্যা করা সম্ভব ছিল না। তাই তিনি দানের দ্বারা রৈক্ককে তুষ্ট করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মহর্ষি রাজার এই দানকে যথেষ্ট বলে মনে করলেন না। তিনি বিরক্ত কণ্ঠে বলে উঠলেন — হারেত্বা শূদ্র গোভিঃ সহ তব এব অস্তু ইতি। অর্থাৎ 'ওরে ও শূদ্র, তোর এই হারের সহিত রথ — তোর গোধন তোরই থাক্।'

সর্বস্ব দিয়েও যদি ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করা যায় তাও মহাভাগ্যের কথা! রাজা জানশ্রুতি কেবল স্বল্প অর্থের বিনিময়ে দুর্লভ ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করতে উদ্যত হয়েছিলেন বলে মহর্ষি তাঁকে 'শূদ্র' বলে ধিক্কার দিয়ে প্রত্যাখান করলেন।

প্রাচীন ভারতে ঋষিদের জীবন অনুধাবন করলে দেখা যায়, তপঃসিদ্ধির অন্তে হয় তাঁরা আমৃত্যু নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী থেকে ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হয়ে বিশ্বের মঙ্গলচিন্তা করতেন নতুবা গার্হস্থ্য ধর্ম গ্রহণ করে দেশ, জাতি ও সমাজের মঙ্গলসাধনের ভার নিয়ে গৃহকেই ব্রহ্মাঙ্গনে পরিণত করার ব্রত নিতেন। রৈক্কও তপস্যা শেষে, গার্হস্থ্যজীবনে প্রবেশ করারই সংকল্প নিয়েছিলেন, কিন্তু জানশ্রুতি যে উপহার এনেছিলেন তাতে তাঁর সারাজীবন সুখে স্বচ্ছন্দে থাকার সম্ভাবনা ছিল না, তাই ঋষি তাঁর অপূর্ণ দান গ্রহণে আপত্তি জানিয়ে রাজাকে বিদায় দিলেন।

রাজা তখনকার মত চলে গেলেন বটে কিন্তু কিছুদিন পরে একহাজার ধেনু, বহুমূল্য সেই কণ্ঠহার, সেই অশ্বতরীবাহিত রথ এবং তাঁর প্রিয়তমা সুন্দরী কন্যাকে এনে মহর্ষির কাছে নিবেদন জানালেন — প্রভু ! এই সমুদয় বস্তুসহ , এখন আপনি যে গ্রামে অধিষ্ঠিত আছেন, এই রৈক্কপর্ণ গ্রামও আপনাকে দান করলাম, এখন আপনি দয়া করে আমায় ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ দিন — মা ভগবঃ শাধীতি।

এক সুন্দরী যুবতী রাজকন্যা পিতার আত্মজ্ঞানলাভের সহায়তা করার জন্য পিতার আজ্ঞায় এক প্রৌঢ় ঋষিকে পতিরূপে বরণ করতে এসেছেন, এই দৃশ্য ঋষিকে মুগ্ধ করল। কন্যার পিতৃভক্তি এবং আত্মত্যাগ দেখে ঋষি এবারে রাজাকে আর বিমুখ করতে পারলেন না। তিনি ভেবে দেখলেন তপস্যার অন্তে তিনি গৃহী হবার ইচ্ছা করেও যথোপযুক্ত আশ্রয় ও সম্পদের অভাবে অতি কষ্টে গাড়ীর তলায় দিন কাটাচ্ছিলেন। রাজা জানশ্রুতি রৈক্কের অভাব বুঝেই ঋষিকে পত্নী দিলেন, বাসস্থান দিলেন, সুখে জীবন কাটানোর উপযোগী অর্থ-সম্পদও দিলেন। এককথায় রাজা তাঁর পার্থিব জগতের সব অভাবই মিটালেন। জানশ্রুতির যে অন্তরের অভাব তা মিটানোর জন্য এইবার তাঁকে অপার্থিব জগতের সন্ধান দিয়ে রাজাকে পূর্ণত্বে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য ঋষি তৎপর হয়ে উঠলেন।

তিনি রাজাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন — দেখ রাজা! বায়ুর্বাব সম্বর্গো — বায়ুই সম্বর্গ। অগ্নি যখন নির্বাপিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন। সূর্য যখন অস্তগমন করেন তখন বায়ুতেই লীন হন, চন্দ্র যখন অস্তমিত হন, তখন বায়ুতেই লীন হন। বায়ুই হচ্ছে মূল সঞ্চালন-শক্তি। প্রলয়কালে তেজোরূপী সূর্যাদি স্বীয় কারণবায়ুতে লীন হন, বলে বায়ুকে সম্বর্গ বলে জানবে। যখন জল বিশুষ্ক হন, তখন বায়ুতে লীন হন, কারণ বায়ুই বাহ্য-

জগতের সর্বকিছুকে আত্মসাৎ করেন — বায়ু র্হি এব এতাম্ সর্বান্ সংবৃঙ্ক্তে।

ঋষি এইভাবে দেবতাগণের মধ্যে সম্বর্গ-দর্শনের রহস্য ব্যাখ্যা করে অনন্তর শরীর মধ্যে সম্বর্গ-দর্শনের তত্ত্ব বলতে লাগলেন — দেখ রাজা! প্রাণই সম্বর্গ। জীব যখন নিদ্রা যায়, তখন বাগিন্দ্রিয় প্রাণে লীন হয় ; চক্ষু প্রাণে লীন হয়, শ্রোত্র প্রাণে লীন হয়, মন প্রাণে লীন হয়, কারণ প্রাণই এই সমুদয়কে আত্মসাৎ করে। এই দুইটি তত্ত্বই অর্থাৎ দেবতাদের মধ্যে বায়ু এবং ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে প্রাণ — উভয়েই সম্বর্গগুণশালী —তৌ বা এতৌ দ্বৌ সম্বর্গৌ বায়ুরেব দেবেযু প্রাণঃ প্রাণেযু। (ছান্দোগ্য উপনিষদ চতুর্থ অধ্যায়)

রাজা জানশ্রুতি রৈক্কমুনির কাছে এই সম্বর্গবিদ্যা লাভ করে কৃতকৃত্য হলেন। তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করলেন। সম্বর্গ শব্দের অর্থ হল — সম্যক বর্গ অর্থাৎ সজাতীয় বস্তুকে সম্যকরূপে একশ্রেণীভুক্ত-করণ অর্থাৎ একীকরণ। জীবাত্মা ও পরমাত্মা সজাতীয় বস্তু, যেটুকু ভেদ আছে তা শুধু সজাতীয়ভেদ, একই গাছের বড়পাতা ও ছোটপাতার মধ্যে যে পার্থক্য সেই পার্থক্যকে দর্শনশাস্ত্রের পরিভাষায় সজাতীয় ভেদ বলে। পরমাত্মা ও জীবাত্মা — একই চিন্ময় বস্তু, পরমাত্মা সর্বব্যাপক, কিন্তু জীবভাবের আবরণ পড়ায় জীবাত্মা দেহের গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে। জীব ভাব খসে পড়লে আত্মা পরমাত্মার একীকরণ ঘটে।

সংস্কৃতে সমপূর্বক বৃজ্ ধাতুর উত্তর ঘঞ প্রত্যয় করে সম্বর্গ পদ সিদ্ধ হয়। বৃজ ধাতুর অর্থ বর্জন বা ত্যাগ করা। যে অলৌকিক বিদ্যার সাহায্যে জীবাত্মা স্থূলাকাশ ত্যাগ করে সূক্ষ্মাকাশে, সূক্ষ্মাকাশ বর্জন করে কারণজগতে, ক্রমে কারণজগত ত্যাগ করে মহাকারণে লীন হয়, আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেই সজাতীয় ভেদ রহিত পরমাত্মার সহিত একীকরণ পদ্ধতিই হল এই সম্বর্গবিদ্যা — ঔপনিষদিক যুগের ঋষিদের অতি প্রিয় গুহ্যতত্ত্ব।

জানশ্রুতি যে গ্রামে বসে রৈক্কের কাছে এই পরাবিদ্যা লাভ করেছিলেন, সেই গ্রামের নাম রৈক্কপর্ণ, চলতি ভাষায় অপভ্রংশে এখন নাম হয়েছে রৈকপন।

মা নর্মদা আমাকে পথে সঙ্গীহীনভাবে ঘোরাতে ঘোরাতে সম্বর্গবিদ্যার পীঠ এই রৈক্কপর্ণ তথা রৈকপন গ্রামে এনে তুলছেন! আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল।

সকাল হয়ে গেছে, কাক কোকিলের প্রভাতী ডাক শুনতে পাচ্ছি। গোটা রাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি। দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে বসে বসেই জানশ্রুতি ও রৈক্কের কথা ভাবতে ভাবতেই সকাল হয়ে গেল। রাত্রে সেই বিকট গুম্ গুম্ বা হুড়্ হুড়্ ছলাৎ শব্দও শুনতে পাইনি। ঘুম হয়নি কিন্তু এজন্য শরীরে কোন অবসাদ নাই। মন্দিরের দরজা খুলে প্রভাত-সূর্যের উদয়রশ্মিকে প্রাণভরে প্রণাম ও অভ্যর্থনা জানালাম।

পুরোহিত এলেন পূজা করতে। আমি কিছু বলার আগে তিনি নিজেই বললেন — আজ আপনার মুখে চোখে খুব স্ফূর্তির ভাব দেখছি যে!

— তাহলে বুঝতেই পারছেন, কোন ভূত বা পিশাচ এসে আমার ঘাড় মটকিয়ে যায় নি! আপনি দয়া করে বলুন দেখি এখানে মহাবৃষদেশ নামে কোন মহল্লা আছে কি?

তিনি বললেন — মহাবৃষদেশ নামে কোন অঞ্চল নাই, তবে আমাদের এই পরগণার নাম মহাবিরিষপুর। এই রৈকপন মৌজা মহাবিরিষপুর তহশীলেরই অন্তর্ভুক্ত। আমার 'কোঠিতে' নক্সা আছে, আপনাকে দেখাব।

আমি তাঁকে জানশ্রুতি ও রৈক্কমুণির বিবরণ, রৈক্কপর্ণ হতে রৈকপন ও মহাবৃষদেশ হতে মহাবিরিষপুর তহশীলের কিভাবে উদ্ভব হয়েছে তা সংক্ষেপে জানালাম। এখানে ভূত বা

পিশাচ নাই, বরং সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ এই পূণ্যভূমিতেই লাভ করেছিলেন মহাবৃষদেশ তথা বর্তমানের মহাবিরিষপুর তহশীলের রাজা জানশ্রুতি, রৈক্কমুনির কাছ হতে। মহর্ষি রৈক্ক এইখানেই একটা গাড়ীর তলায় বাস করতেন, তাঁর নামানুসারেই রৈক্কপর্ণ হতে বর্তমানে নাম চালু হয়েছে রৈকপন। যদি ছান্দোগ্য উপনিষদ সংগ্রহ করতে পারেন, আমি তাহলে বই খুলে সব দেখিয়ে দিব।

তিনি বললেন, এখান থেকে দুতিন মাইল দূরে একজন বড় পণ্ডিত থাকেন। তাঁর কাছে বেদ উপনিষদ আছে। আপনি আরও দুচার দিন এখানে থাকুন। আমি বইসহ পণ্ডিত এবং এখানকার লোকজনকে এখানে আনব। আপনি নিজমুখে সকলকে এই কথা বললে এই জংলী দেশের অনেক উপকার হবে। ভূতের ভয়ে মশাই বেলা তিনটায় সন্ধ্যারতি সেরে যাই। লোকও ভয়ে পূজা দিতে আসে না। কেউ শিবের স্থানে ভেট পূজাও চড়ায় না।

আমি সানন্দে রাজী হলাম। তার পরদিনই বেলা তিনটা নাগাদ ছান্দোগ্য উপনিষদসহ সেই পণ্ডিতজী এবং আরও প্রায় শতাধিক লোককে মন্দিরে এনে হাজির করলেন পুরোহিত মশাই। আমি ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে ছান্দোগ্য উপনিষদের জানশ্রুতি ও রৈক্কমুনির উপাখ্যান ব্যাখ্যা করলাম। বললাম যে, মানুষের ভূত বিশ্বাস যত দৃঢ় ভূতনাথের উপর বিশ্বাষ তত দৃঢ় নয়। যদি কোথাও ভূত বা পিশাচ থাকে, ভূতনাথও সেখানে নিশ্চয়ই বিদ্যমান থাকেন কারণ তিনি ত সর্বব্যাপী। ভূতনাথ যদি থাকেন তবে ভূতকে ভয় করার ত কোন হেতু নাই। আমি পণ্ডিতজীকে অনুরোধ করলাম জানশ্রুতি ও রৈক্ক সম্বন্ধে ছান্দোগ্য শ্রুতির বিবরণ সবাইকে পড়ে শোনাতে। কিভাবে মহাবিরিযপুর ও রৈকপন মহল্লার উদ্ভব হয়েছে তাও সবাইকে জানাতে বললাম। আমি যে রাতের পর রাত নিরুপদ্রবে কয়েক রাত্রি একাকী নির্জন মন্দিরে কাটাতে পারলাম, তাতেই প্রমাণিত হয় যে রৈকপনেশ্বরজীর মন্দিরে পিশাচের কোন ভয় নাই। অন্ধ কুসংস্কার হতেই ভূত-প্রেতের ভয় মানুষের মনে বাসা বাঁধে। বনের ভূত এসে মানুষের ঘাড় মটকায় না, তার মনের ভূতই ঘাড় ভাঙ্গে।

সেদিন থেকেই লক্ষ্য করলাম যে ধীরে ধীরে কিছু ভক্ত রৈকপনেশ্বর মন্দিরে আসা যাওয়া করছে , শিবের কাছে ভেট পূজাও দিচ্ছে।

সম্বর্গবিদ্যার পুণ্যপীঠে আজ সপ্তম দিন। মধ্যাহ্ন ভোজনের পর বসে বসে ভাবছি, এখানে প্রথম দুদিন যেসব অলৌকিক কাণ্ড রাত্রে নিজের কানে সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় শুনেছি , সেই দরজার ঠক্ ঠক্ আওয়াজ, গুম্ গুম্ দুড়দাড় শব্দ, জলে পাথর গড়িয়ে পড়ার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ, সে কি ভৌতিক ব্যাপার, সত্যই কোন রুদ্রপিশাচ বা ব্রহ্মদৈত্যের কাণ্ডকারখানা, না — সবটাই স্বপ্ন নু, মায়া নু, মতিভ্রম নু? স্বপ্ন কি করে হবে? আমি ত জেগেই ছিলাম। আর যদি সত্যই সেইরকম কিছু হয়, তবে এই কয়দিন আর কিছু শুনতে পাচ্ছি না কেন? গভীর রাত্রে নর্মদার ঘাটে যে মন্ত্রধ্বনি শুনলাম সেও কি মিথ্যা?

নিজের মনে বিচার করতে লাগলাম। আমার জীবনটা কি? জন্মেছি পল্লীগ্রামে। বাবা বলতেন, গ্রাম মাত্রেই — ভূতের রাজধানী, কারণ সেখানে জ্ঞান-চর্চার অভাব মানুষের মনে নানা কুসংস্কার। যে কোন পল্লীগ্রামে যান, সেখানে শ্মশানকে কেন্দ্র করে মা, ঠাকুরমা, দিদিমাদের ঝুলিতে নানা ধরণের ভূতপ্রেত ব্রহ্মদৈত্যি আর শাঁকচুন্নিদের নানা বীভৎস লীলা খেলার বিবরণ জমা আছে। সেইসব গল্প শিশুকাল হতে শুনে সকলেরই মনে ভূত সম্বন্ধে

ভীতি জেগে থাকে। ভূত হয়ত নিজের চোখে কেউ দেখেন নি, কিন্তু যাঁরা ভূতের গল্প বলেন, তাঁরা এমনভাবে বলেন যেন নিজের চোখে দেখেছেন! শাঁকচুন্নী এসে চক্রবর্তী বাড়ীর বামুন মার কাছে রোজই খাবার চায়, নাপিত বৌ রাত্রে দেখেছে লালপেড়ে কাপড় পরে কেউ যেন ছাদের উপর হেঁটে বেড়াচ্ছে! ভট্টাচার্যি বাড়ীর অশ্বত্থগাছে ব্রহ্মদৈত্য থাকেন, তিনি রোজ রাত্রে অশ্বত্থ গাছ হতে নেমে নদীর ঘাটে স্নান করতে যান, ঠাকুরমা নিজের কানে তার পায়ের খড়মের শব্দ শুনেছেন। দাদামশাই তামাক টানতে টানতে আমাদের কাছে গল্প করেছিলেন, একদিন মামাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাজারচণ্ডী গ্রাম থেকে আসছিলেন, মামার বয়স তখন খুবই কম, সবেমাত্র তাঁর উপনয়ন হয়েছে, সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটা হবে, ফুটফুটে চাঁদের আলোতে চারদিক ঝক্মক্ করছে, হঠাৎ কংসাবতী নদীর বাঁধের উপর জোড়া বটবৃক্ষের তলায় কেউ যেন বলে উঠলেন — ক্ষণং তিষ্ঠ, উপবীতং প্রদীয়তাম্।

দাদামশাই স্পষ্ট দেখলেন, দীর্ঘাকৃতি কোন জটাজুট মহাপুরুষ সত্যসত্যই একটা পৈতা নেবার জন্য তাঁর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। ভয়ে পিতাপুত্র দুইজনেই বাঁধের উপর মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েছিলেন। গ্রামের লোক তাঁদেরকে তদ্‌বস্থায় দেখতে পেয়ে বাড়ীতে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

আমাদের গ্রাম কালিয়াড়া হতে তিনমাইল দূরে ধর্মপুর গ্রামে আমাদের ছোটমাসীর বাড়ী। এই ছোটমাসী আমাকে খুব ভালবাসতেন, কৃত্তিবাসী রামায়ণ এবং কাশীরাম দাসের বাংলা মহাভারত তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ ছিল। ছোটবেলায় আমি প্রায়ই তাঁর কাছে গিয়ে থাকতাম, তাঁর মুখে শুনে শুনেই রামায়ণ-মহাভারতের সমস্ত গল্প আমার জানা হয়ে গেছল। তাঁর কাছে গল্প শুনেছি, তাঁর গ্রামে ভূঞ্যাদের বাড়ীর কাছে যে একটা বিরাট নিমগাছ আছে সেই নিমগাছে এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করেন, তিনি প্রতিদিন গভীর রাত্রে নদীতে স্নান করেন। স্নান করতে করতে তিনি যে মন্ত্রপাঠ করতেন, তা গ্রামের বহুলোক শুনেছেন। সে নিমগাছ আমি দেখেছি, দিনের বেলা ঐ নিমগাছের কাছ দিয়ে যাবার সময় তারা যুক্তকরে ঐ নিমগাছস্থিত ব্রহ্মদৈত্যের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেন, সন্ধ্যাবেলা ঐ রাস্তা দিয়ে জনপ্রাণীও হাঁটত না।

এইরকম পটভূমিকায় গ্রাম্য পরিবেশে আমার বাল্যকাল কেটেছে। কলেজে পড়ার সময় নৈহাটিতে আমার এক বন্ধুর বাড়ীতে গেছলাম। একদিন তার সঙ্গে বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার সময় তাদের গ্রামের শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে যেতে তাকে দেখলাম, একটা গাছ দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল, তারপরেই 'আঁ-আঁ-আঁ' — শব্দ করতে করতে পড়ে গেল। পড়ে গিয়েই সে গোঁ গোঁ করতে থাকল। মুখে চোখে জল ছিটিয়ে অনেক কষ্টে তাকে সুস্থ করা হল। আমার চিৎকারে গ্রামের দু'চারজন লোক দৌড়ে এল, তাদের সাহায্যে তাকে বাড়ীতে নিয়ে গেলাম। পরদিন সে জানালো যে তাদের গ্রামের একটি স্ত্রীলোক শ্মশানের ধারে ঐ গাছের ডালে গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল, সেদিন সন্ধ্যায় আমার বন্ধু স্পষ্ট দেখেছিল যে গাছের ডালে মেয়েটি ঝুলছে, তার গলায় দড়ি — জিভ আর চোখ দুটো যেন ফেটে বেরিয়ে পড়েছে। আমার বন্ধুর মনে ভূত সংস্কার ছিল, কয়েকবছর আগে সে ঐ আত্মহত্যার ঘটনা নিজের চোখে দেখেছিল। সেদিন সন্ধ্যার তার সেই মনের ভূতকেই গাছের ডালে আর একবার প্রত্যক্ষ করল।

আমার বাবা জানতেন যে গ্রামে বুড়োবুড়িদের আড্ডায় ঐ সব ভূতপ্রেতের গল্প হয়। আমার ছোটমাসী বা দাদামশাই-এর ব্রহ্মদৈত্য কাহিনীও তাঁর কর্ণগোচর হয়েছিল। যেখানে যা শুনতাম, আমি নিজেই তাঁর কাছে সব বর্ণনা করতাম। পাছে ভূতের ভয় আমার মনে দানা বাঁধে, তা কাটাবার জন্য বহুবার তিনি আমাকে গভীর রাত্রে গ্রামের 'সতীকুণ্ড' মহাশ্মশানে নিয়ে গিয়ে শেষরাত্রে ফিরে আসতেন।

তাঁর চেষ্টার ফলে আমার মনে ভূতের ভয় ছিল না। কত দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়িয়েছি, কখনও ভূত দেখিনি, ভূতের ভয়ও মনে কখনও দেখা দেয় নি। তবে বাল্য-কৈশোরের সেইসব স্মৃতি মনের অবচেতন স্তরে কিছু প্রভাব ফেলে নি, একথা জোর করে বলা যায় না। বাবার দেহান্তের পর তাঁর শেষ ইচ্ছানুসারে আমি নর্মদা পরিক্রমা করতে এসেছি। কল্লোড়ীনাথের মন্দির হতে বিদায় নেবার কালে চেতন ব্রহ্মচারী সাবধান করে গেলেন — রৈকপন মহল্লামেঁ রাতমেঁ মৎ ঠারো, উধর পিশাচ হ্যায়। রৈকপন মন্দিরে বাধ্য হয়ে যখন রাত্রি কাটাবো স্থির করেছি, তখন চারজন পথচারী আমাকে সেখানে থাকতে বারণ করলেন, কারণ সেখানে পিশাচের ভয় আছে। মন্দিরে ঢুকতে যাচ্ছি পুরোহিত বললেন — এখানে বাস করা আপনার উচিত হবে না, এখানে পিশাচের ভয় আছে, ইতিপূর্বে এখানে থাকতে গিয়ে দুবারে পাঁচজন সাধু মারা গেছেন। পরিক্রামবাসী সাধুরাও এজন্য এস্থান এড়িয়ে চলেন। আপনি বরং আমার বাড়ীতে থাকবেন চলুন ইত্যাদি।

আমি তাঁদের কোন কথাই শুনলাম না, মন্দিরেই থাকলাম বটে কিন্তু বিন্ধ্যপর্বতের কোলে নির্জন নিশুতি রাতে সম্পূর্ণ একা, যখন পথশ্রমে দেহ মন ক্লান্ত, বাবার দেহান্তের পর মনের মধ্যে একটা আর্তিভাবও সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রীকে বিহ্বল ও জর্জরিত করে রেখেছে, চেতন ব্রহ্মচারী, পথচারী এবং পুরোহিতশাই প্রভৃতি সবাই পিশাচভীতি বারবার খুঁচিয়ে দেওয়ার অনুকূল স্থান ও কাল ও পরিবেশ পাওয়ার আমার অবচেতন (subconscious plane) এবং মগ্ন চেতনার স্তরে (subliminal conscious plane) সেইসব বাল্যকৈশোরের ভূতপিশাচ ব্রহ্মদৈত্যদের স্মৃতি সুপ্ত ছিল তা পরিস্ফুট ও স্ফূর্ত হয়ে উঠল, আমি শুনতে লাগলাম — কেউ যেন টোকা দিচ্ছে ঠক্ ঠক্, কেউ যেন অট্টাট্টহাসি হাসছে, গুম্‌গুম্ শব্দ শুনছি, বিরাট পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ছে, আমার ছোট মাসীর গ্রামের নিমগাছস্থিত ব্রহ্মদৈত্য যেমন নদীঘাটে স্নান করে মন্ত্রপাঠ করে থাকেন, সেইরকম কেউ যেন নর্মদার ঘাটে মন্ত্রপাঠ করছেন শুনতে পেলাম! দাদামশাই বলেছিলেন, বটগাছের তলায় ব্রহ্মদৈত্য তাঁকে বলেছিলেন 'ক্ষণং তিষ্ঠ' — অর্থাৎ ব্রহ্মদৈত্য বা রুদ্রপিশাচ যেই হোন, তারা সংস্কৃতেই কথা বলে থাকেন! তাই শুনতে পেলাম — সংস্কৃত মন্ত্রের উদাত্ত ছন্দ! না — আমার সবচেয়ে প্রিয় স্তোত্র শিবতাণ্ডবের ডমড্ ডমড্ ডমড্ ধ্বনি!

মনের অসাধ্য সাধন করার ক্ষমতা আছে। মনঃশক্তির দ্বারা কিনা সম্ভব হয়? মন তার অঘটন ঘটীয়সী ক্ষমতার বলেই যা আছে তাকে নস্যাৎ করতে পারে, যা নাই তাকে সৃষ্টি করে চোখের সামনে নাচাতে পারে। শুক্তিতে রজতভ্রম বা রজতে শুক্তিভ্রম — এই মায়ার খেলা মনের দ্বারাই সম্ভব।

অধিকাংশ সাধকের জীবনেও মন এইভাবে, চাই কি, ঈশ্বরকেও দেখিয়ে দেয়। যাঁরা শিব, কালী, দুর্গা, তারা, চতুর্ভুজ নারায়ণ বা দ্বিভুজমুরলীধারী শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি বা ছবি নিয়ে অহরহ

ধ্যান মনন বা চিন্তা করেন, বিভিন্ন শিল্পীর মনঃকল্পিত সেইসব মূর্তি সাধকের Intense thinking এবং desire এর ফলে রূপ পরিগ্রহ করে দর্শন দেয়, কথা বলে, প্রত্যাদেশ দেয়। আমি যেমন অট্টহাসি বা মন্ত্রধ্বনি শুনেছিলাম সেইরকম ভাবেই দেব-দেবীর দর্শন ঘটে ! ফলে তাঁরা নিজেদেরকে সিদ্ধ ভাবেন, ভক্তরাও তাঁকে অবতার বানিয়ে ছাড়েন। এইসমস্ত অলৌকিক দর্শন যে মিথ্যা দর্শন, সম্পূর্ণ মনঃকল্পিত তা একটু গভীরভাবে বিচার করলেই ধরা পড়ে। যখন দেখা যায় তাঁদের এইরকমের ঈশ্বর দর্শনের পরেও তাঁরা জ্ঞান বা চৈতন্যের দিক দিয়ে পূর্বেও যেমন ছিলেন এখনও তেমনি রয়ে গেছেন, তখন তাঁদের ঐসব দর্শন, স্পর্শন, শ্রবন বা অনুভূতির মধ্যে কোথাও একটা ফাঁক বা ফাঁকি আছে তা বুঝা যায়। কারণ দিব্যানুভূতির গোড়ার কথা এই যে প্রকৃত ব্রহ্মবিদ্যার পথে সাধকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে simultaneously ওতঃপ্রোত ও অঙ্গাঙ্গীভাবে তার ধীশক্তি পরিণত হবে প্রজ্ঞায়, প্রজ্ঞা ঋতম্ভরায়, ঋতম্ভরা পরিণত হবে বোধি সম্বোধী বা সম্বিদশক্তিতে, সম্বিদ্‌চেতনা পরিণতি লাভ করবে বিশোকা বা জ্যোতিষ্মতীতে। জ্যোতিষ্মতী মধুমতী প্রজ্ঞার স্তরে উন্নীত হলেই সাধক উদ্ভাসিত চৈতন্যশিখরে আরূঢ় হবেন।

থাক্ সে প্রসঙ্গ। রৈকপনেশ্বর শিব মন্দিরের ঘটনায় ফিরে যাই। আমি পরপর দুদিন রাত্রে সেই একইরকম ঠক্‌ঠক্ আওয়াজ, খলখল্ হাসি বেদ মন্ত্রপাঠের শব্দ শুনলাম, কিন্তু তৃতীয় দিন হতে সপ্তম দিন পর্যন্ত আর সেইরকম কোন শব্দ শুনতে পাচ্ছি না কেন? এর কারণ বিচার করে দেখলাম, তৃতীয় দিন সকালেই আমার মনে ছান্দোগ্য উপনিষদের জানশ্রুতি ও রৈক্কমুনির কথা স্মৃতিতে ভাসল। মহাবৃষদেশের সঙ্গে মহাবিরিষপুর তহশীল, রাজা জানশ্রুতি প্রদত্ত রৈক্কপর্ণ গ্রামের সঙ্গে রৈকপন মহল্লার সাদৃশ্য ও সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়ে দৃঢ় সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম যে রৈক্কমুনি তাহলে এখানকার জঙ্গলেরই কোন স্থানে গাড়ীর তলায় বসে জানশ্রুতিকে সম্বর্গবিদ্যার উপদেশ দিয়েছিলেন! সম্বর্গবিদ্যা, সে যে পঞ্চাগ্নি বিদ্যা, মধুবিদ্যা, শাণ্ডিল্যবিদ্যার মতই বেদোক্ত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা!

বাল্য-কৈশোরে দাদামশাই ও ছোট মাসী প্রভৃতির কাছে শোনা ব্রহ্মদৈত্য রুদ্রপিশাচাদির গল্পের স্মৃতি যেমন অবচেতন বা মগ্নচেতনার গভীরে লুকিয়ে ছিল, তেমনি বাবার চরণতলে বসে যে দীর্ঘকাল বেদ উপনিষদের পাঠ নিয়েছি, সেই অনুশীলিত বিদ্যার জোরে মন ও বুদ্ধির একটা স্তর পরিমার্জিত এবং আলোক ঝলমল হয়ে আছে। বেদের উপরে অবিচলিত নিষ্ঠার ফলে আমার এই বিশ্বাস দৃঢ় যে, যেখানে সম্বর্গবিদ্যার মত সাক্ষাৎ ব্রহ্মবিদ্যা উপদিষ্ট হয় বা সেই উপদিষ্ট বিদ্যার সাধনা হয় সেই পবিত্র তপস্যাস্থলীতে ভূত-পিশাচের আবির্ভাব ঘটবে কি করে? চৈতন্যময় বিশুদ্ধ পরিমণ্ডলে দেবতাই প্রকট হন। এই ভাবনা দৃঢ় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আর কোন রাত্রেই, মন ভৌতিক বস্তুর ইন্দ্রজাল দেখাতে পারল না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পুরোহিত মশাই এসে গেছেন সন্ধ্যারতি করতে। আমি তাঁকে বললাম, এখানে কয়েকদিন থাকা হয়ে গেল। আগামীকাল সকালেই ভাবছি আপনাদের কাছে বিদায় নিয়ে পরিক্রমার পথে বেরিয়ে পড়ব। তিনি বললেন, আপনি আমাদের পিশাচভীতি ভেঙে দিয়ে রৈকপনেশ্বরের মহিমা নূতনভাবে দেখিয়ে দিয়ে গেলেন, আমরা আপনাকে ভুলব না। আমরা কয়েকজন প্রতিবেশী মিলে ঠিক করেছি, আপনাকে কতকটা রাস্তা এগিয়ে দিয়ে আসব। কাল আমার ছেলে বা ভাইপো মহাদেবের পূজা করবে, আমরা সকাল সাতটা

নাগাদ মন্দিরে এসে যাবো। সন্ধ্যারতি সেরে তিনি বিদায় নিলেন।

পরদিন সকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সেরে এসে দেখি প্রায় শতাধিক লোক এসেছেন বিদায় জানাতে। পুরোহিত মশাই এর বৃদ্ধা মাতাজীও এসেছেন। আমি তাঁদের অতিথিপরায়ণতা এবং ধর্মপ্রাণতার জন্য অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে রৈকপনেশ্বরজীকে প্রণাম করে রওনা হলাম। আমার সঙ্গে চললেন পুরোহিত মশাই এবং আরও পাঁচজন।

পথ কঙ্করময় তবে মানুষ চলে চলে অনেকটা মসৃণ হয়েছে। আমি খালি পায়ে হাঁটলেও হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হচ্ছে না। আমার সঙ্গীদের ত কোন অসুবিধাই নাই, তাদের পায়ে নাগরা জুতা। এখানকার লোকদের ব্যবহৃত নাগরা জুতার চাপে পথে যে দাগ পড়েছে, সাবধানে দাগে দাগে পা ফেলতে পারলে পরিক্রমাবাসীদের কোন কষ্ট হয় না। নর্মদার এই উপত্যকা অঞ্চল খুবই সমৃদ্ধ বলে মনে হল। পাহাড়ের উপর দিকটা বনস্পতি সমাকীর্ণ হলেও উপত্যকার সমতলভাগ গম, বাজরা অড়হর এবং আরও নানারকম শস্যসম্ভারে পরিপূর্ণ দেখছি। রাস্তার দুপাশে শাল, সেগুন, খয়ের, আমলকী, আম ও হরিতকী গাছ। মাঝে মাঝে পল্লী গড়ে উঠেছে। পাকাবাড়ী, কুঁড়েঘর পাথরের ঘর সবই আছে। গোঁড়, রাজপুত, ক্ষত্রিয় এবং ব্রাহ্মণদের বসতি।

প্রায় তিন মাইল হেঁটে যাবার পর সেই পুরোহিতমশাই বললেন — এইখানে জব্বলপুর জেলা শেষ হল। একটা পাথরের মাইলপোষ্টে হিন্দীতে লেখা আছে নরসিংহপুর জেলা। নর্মদার দক্ষিণতটে দিকে আঙুল বাড়িয়ে বললেন — ওপারে সিনোর নামে একটা ছোট নদী এসে নর্মদাতে মিশেছে, ঐখানকার মহল্লাটার নামও সিনোর, ঐখান থেকে নর্মদার দক্ষিণতটে নরসিংহপুর জেলা আরম্ভ। নরসিংহপুরের প্রধান শহর নরসিংহপুর। জব্বলপুর থেকে এই শহরে যাবার কোন রাস্তা নাই। কারণ জব্বলপুর নর্মদার উত্তরতীরে, নরসিংহপুর নর্মদার দক্ষিণে। রেলপথে যাওয়াই সুবিধা। ভিটৌনি আর বিক্রমপুর ষ্টেশনের মাঝখানে রেলওয়ে সেতু আছে — সেই সেতু দিয়ে নর্মদার পারাপার। নরসিংহপুরের মাইল দশ দূরে পরবর্তী ষ্টেশনের নাম করেলি। করেলি থেকে উত্তরমুখী রাস্তায় ন'দশ মাইল হেঁটে গেলেই নর্মদাতীরে পাবেন পুরাণ প্রসিদ্ধ ব্রহ্মাণতীর্থ, পৌষ সংক্রান্তির দিনে এখানে নদীর চড়ায় বিরাট মেলা বসে সারা ভারতের সাধুসন্ত গৃহীরা এসে জমায়েৎ হন। ব্রহ্মাণ ব্রহ্মার তপস্যার ক্ষেত্র। আপনি অবশ্যই যাবেন ওখানে। ওখানে ব্রহ্মাণ তীর্থের সব মন্দির ত দেখবেনই, তাছাড়া বিশেষ করে দেখবেন পিষাণ্‌হারীর মন্দির। আমরা প্রতি বছরই যাই। আমরা বহুবার পরীক্ষা করে দেখেছি, পিষাণ্‌হারীর মন্দিরে যা মানত্ করা হয় তাই সিদ্ধ হয়।

আমি বললাম — আমি পরিক্রমার শপথ নিয়েছি, আমার ত বিশেষ কোন কামনায় মানত্ করা নিষেধ। তাছাড়া আমার রেল, লরি, বাস, গাড়ী প্রভৃতিতে চড়া চলবে না। আপনি যে পথের বর্ণনা দিলেন, তাতে ত দেখছি, নর্মদা লঙ্ঘন না করলে ব্রহ্মাণ বা পিষাণ্‌হরীর মন্দিরে এখান হতে যাবার কোন পথ নাই। কোন পরিক্রমাবাসী কি একমাত্র রেবাসংগম ছাড়া আর কোথাও নর্মদা পারাপার করতে পারে?

— নেহি জী, বিলকুল নেহি। উহ্ মুঝে পাতা হ্যায়। তব্‌ভি লোটনেকা বখৎ যব ভি আপকো মোকা মিলেগা, যাইয়ে গা জরুর। উধার জানেসে আপকো পতা চলেগা — ভক্তকী মহিমা ভগবানকী মহিমাসে জ্যায়দা হৈ।

পথ চলতে চলতেই তাঁদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এর মধ্যে একবার তাঁদেরকে ফিরে যেতে বলেছি কিন্তু পুরোহিতমশাই জানিয়েছেন আরও চার-পাঁচ মাইল তাঁরা আমার সঙ্গে যাবেন। কারণ চার মাইল গেলে তাঁর 'দামাদের' কোঠি পড়বে। তিনি তাঁর মেয়ে এবং 'পোতা'দের (নাতি) খবর নিয়ে যাবেন। কাজেই ফিরে যাবার জন্য দ্বিতীয়বার অনুরোধ করা বৃথা। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — ব্রহ্মা ঐখানে নর্মদাতীরে তপস্যা করেছিলেন বলে স্থানটির নাম হয়েছে — ব্রহ্মাণ এবং নিশ্চয়ই ঐখানে আমাদের হিন্দু ভারতবর্ষের রীতি অনুযায়ী ব্রহ্মার একটি মন্দির আছে, থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু পিষাণ্‌হারী আবার কোন দেবতা?

পুরোহিত মশাই জানালেন — উহ্ বহোৎ মজাদার কিস্‌সা হ্যায়। শুননেসে আপ্ চমৎকৃত হোগা। উহ্ তো হম্ জরুর বাতায়েগা। পহ্‌লে আপ্ মুঝে বাতাইয়ে কোন্ বেদ মেঁ জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাজীকা বারেমেঁ উন্‌কা মহিমাকি ব্যাখ্যান্ হৈ।

আমি বললাম — বেদে বা ব্রাহ্মণ গ্রন্থে ব্রহ্মার নাম কোথাও শোনা যাবে না। বেদে সৃষ্টিকর্তাকে হিরণ্যগর্ভ প্রজাপতি বলা হয়েছে। তবে বিভিন্ন পুরাণে ব্রহ্মার সম্বন্ধে অনেক কাহিনী আছে। পরমব্রহ্মের যখন 'একোহহং বহুস্যাম' অর্থাৎ এক আছি, বহু হব — বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করব, এই ইচ্ছা জাগল তখন কারণার্নবশায়ী সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষ ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করলেন। ব্রহ্মা চোখ মেলে দেখলেন চারিদিকে শুধু জল আর জল, অন্তহীন মহাসমুদ্রের মাঝখানে তিনি ভাসছেন। লক্ষ্য করতে তাঁর চোখে পড়ল তিনি একটি পদ্মের উপর বসে আছেন, সেই পদ্মের মৃণালটি একটি নীল জ্যোতির্ময় পুরুষের নাভিকুণ্ড থেকে উত্থিত হয়েছে। সেই পুরুষের মুখ থেকে দৈববাণী হল — তপঃ, তপঃ অর্থাৎ তপস্যা কর। স অতপাত। ব্রহ্মা তপস্যায় নিমগ্ন হলেন, তাঁর সেই তপস্যা হতেই এই জগতের সৃষ্টি।

অন্য পুরাণের মতে, মহাপ্রলয়ের শেষে এই জগৎ যখন অন্ধাকরময় ছিল, তখন পমরব্রহ্ম সেই অন্ধকার দূর করলেন এবং তাতে সৃষ্টির বীজ নিক্ষেপ করলেন। ঐ বীজ সুবর্ণময় অণ্ডে পরিণত হল। অণ্ড মধ্যে সেই বিরাটপুরুষ নিজে ব্রহ্মা হয়ে অবস্থান করতে থাকেন অর্থাৎ ব্রহ্মে আকার পড়ল, নির্গুণ নিরাকার স্বরাট্ ব্রহ্ম আকারিত বা মূর্ত হতে থাকলেন। অণ্ডটি তৎক্ষণাৎ দুভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ আকাশে এবং অন্যভাগ ভূমণ্ডলে পরিণত হল। এরপর ব্রহ্মা মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, ভৃগু, দক্ষ ও নারদ — এই দশজন প্রজাপতিকে মন হতে উৎপন্ন করেন। এই সকল প্রজাপতি হতে সকল প্রাণীর উদ্ভব হয়। ব্রহ্মা নারদকে সমস্ত সৃষ্টির ভার নিতে বলেন কিন্তু ব্রহ্মসাধনায় বিঘ্ন হবে বলে নারদ সৃষ্টির ভার নিতে রাজী হলেন না। এইজন্য ব্রহ্মার শাপে তাঁকে গন্ধর্ব ও মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়েছিল। সরস্বতী ব্রহ্মার স্ত্রী — দেবসেনা ও দৈত্যসেনা তাঁর দুই কন্যা। ব্রহ্মা চতুর্ভুজ, চতুরানন এবং রক্তবর্ণ। প্রথমে তাঁর পাঁচটি মাথা ছিল কিন্তু একবার তিনি শিবের প্রতি অপমানসূচক বাক্য প্রয়োগ করায় ক্রুদ্ধ শিবের ললাট-নেত্র হতে উদ্ভূত অগ্নিতে তাঁর পঞ্চম মস্তক দগ্ধীভূত হয়। ব্রহ্মার বাহন হংস।

এই ত আমি আপনাদেরকে ব্রহ্মার কাহিনী শোনালাম। এইবার আমাকে পিষাণহারীর গল্প বলুন।

পুরোহিত মশাই বলতে আরম্ভ করলেন — 'পিষাণ্‌হারী' নাম শুনে কোন দেবীর বিগ্রহ বলে মনে করবেন না, ইনি শিবই। তবে এই শিবের উৎপত্তি রহস্য বড় বিচিত্র। কলিযুগেও

যে নর্মদাতটে এক অদ্ভুত দৈবলীলা প্রকট হয়েছিল তারই জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত এই পিষাণ্‌হারী। পিষাণ্‌হারী অতি সাধারণ একজন চাষীর বৌ। তার স্বামীর নাম ছিল রামদীন। সে অত্যন্ত অলস এবং নিষ্কর্মা প্রকৃতির লোক ছিল। সে 'ক্ষেতি-উতির' কাজ করত বটে কিন্তু সেদিকে তার মন ছিল না। 'ক্ষেতির' কাজ ছেড়ে দিয়ে 'ক্ষেতির' ধারে বসেই নাম জপ করত। বাড়ীর কোন কাজ করত না। সারাদিন এমনকি রাত্রেও সে নাম-কীর্তনে মেতে থাকত। অগত্যা এই অকর্মণ্য সংসার-উদাসীন স্বামী এবং নাবালক তিনটি ছেলের ভরণপোষণের দায়িত্ব পিষাণ্‌হারীর উপরই পড়েছিল। সাধ্বী পিষাণ্‌হারী প্রতিবেশীদের গম বাজরা চাকীতে পিষে দিয়ে বিনিময়ে যা পেতেন, তাই দিয়ে স্বামী ও পুত্রদের মুখে অন্ন জোগাতেন। নিজের চাকীটি মাথায় নিয়ে পিষাণ্‌হারী প্রতিবেশীদের বাড়ীতে হাজির হতেন, গম বাজরা পিষতেন আর অহরহ নর্মদামায়ী ও মহাদেবের নাম জপ করতেন। কিন্তু এইটুকু সুখও তাঁর ভাগ্যে সইল না। ভগবানও ভক্তকে পরীক্ষা করেন। হিন্দীমেঁ এক বাত হ্যায় — যব কিয়ো প্রভুকা আশ্‌, তব হোতে সর্বনাশ।

আমি এই শুনে পুরোহিত মশাইকে থামিয়ে মন্তব্য করলাম — আমাদের বাংলাদেশেও এইরকম একটা ছড়া আছে। সেখানে ভগবান বলছেন — যে করে আমার আশ, তার করি সর্বনাশ। তবুও যদি না ছাড়ে পাশ, তখন করি দাসের দাস। ভাঙা হিন্দীতে বাংলা ছড়ার অর্থ বুঝিয়ে দিতেই পুরোহিত মশাই সোৎসাহে বলে উঠলেন — পিষাণ্‌হারী মাতাজীকো ভি এ্যায়সা হুয়া থা। হঠাৎ একদিন ভাবাবস্থায় হাঁটতে হাঁটতে রামদীন পাহাড়ের একটা টিলা থেকে পড়ে গিয়ে মারা যান। চেচক (বসন্তরোগ) হয়ে দুটো ছেলে অকালে প্রাণত্যাগ করল, ছোট ছেলেটিকে একরাত্রে কুটিরের দাওয়া থেকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল। শোকে দুঃখে হতভাগিনী পাগলের মত হয়ে গেলেন। ঘর থেকে আর বাইরে যেতেন না। চাকীটিকে বুকে নিয়েই কখনও আদর করতেন, কখন বা কেঁদে কেঁদে বলতেন — ভগবান! একে একে সবাইকেই ত তুলে নিয়েছ, এতকাল আমি যাদের জন্য পরিশ্রম করে এসেছি, তারা ত এখন আর নাই। আমি ত মন্ত্রতন্ত্র জানিনা, এতকাল চাকী পিষে যাদের পূজা সেবা করতাম, তারা সবাই আমাকে ছেড়ে গেছে। এখন আর কার সেবা করব? হে শিউজী, এখন তোমার আমার মাঝখানে এসে অর কেউ আড়াল করে দাঁড়াবে না। এই বলে চাকীটিকে বুকে জড়িয়ে ধরে শিউজী, শিউজী বলে হাউ হাউ করে কাঁদতেন। চাকীটিই যেন তাঁর শিউজী! এইভাবে অর্ধোন্মাদ অবস্থাতেই একদিন চাকীটিকে বুকে জড়িয়েই পিষাণ্‌হারী শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন।

প্রতিবেশীরা নর্মদার চড়ায় চাকীসহ পিষাণ্‌হারীকে সমাধিস্থ করে এল। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল সেই চাকীটি একটি শিবলিঙ্গে পরিণত হয়ে গেছে এবং নর্মদা পিষাণহারীর সেই সমাধিস্থল এবং শিবলিঙ্গকে মাঝখানে রেখে দুইদিকে দুইটি ধারায় বয়ে চলেছে। হতচকিত এবং বিস্মিত নর্মদার উভয়তটের অধিবাসীরা পিষাণ্‌হারীর সমাধিস্থলের সেই স্থানে ১৮৩২ সালে মহাদেবের একটি মন্দির নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছে — পিষাণ্‌হারী।

প্রায় দেড়শ বছর আগে এই অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। সেই থেকে পিষাণ্‌হারীর মন্দির তীর্থের মর্যাদা পেয়ে আসছে। নর্মদার প্রবল বন্যায় কতবার কতকিছু ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে কিন্তু পিষাণ্‌হারীর মন্দিরের কিছু ক্ষতি হয় নি। পরিক্রমা শেষ করে যখন ফিরবেন, তখন দেখবেন সেখানে শত শত ভক্তের ভীড় লেগেই আছে। পিষাণ্‌হারীর চাকীর বিবর্তিত রূপ

শিবলিঙ্গে বিরাজমান থেকে ভক্তবৎসল মহাদেব ভক্তদের অভীষ্ট পূরণ করে চলেছেন।

আমরা গল্প করতে করতে প্রায় বারো মাইল রাস্তা চলে এসেছি। এবার আমাদের বিদায় নিবার পালা। কারণ এইখান থেকে তাঁরা উত্তরদিকে তিনমাইল রাস্তা গেলে 'দামাদ' (জামাতা) বাড়ীতে পৌঁছাবেন। আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে সবাই বললেন — রৈকপনেশ্বর মহাদেব আপনার পথকে নির্বিঘ্ন করুন। পরিক্রমা শেষে যদি নর্মদাতটে আসন পাততে চান, তাহলে আমরা আমাদের গ্রামে আপনাকে আসন পাততে অনুরোধ জানিয়ে রাখলাম, আপনার কোন তকলিফ্ হবে না, আপনার কথিত বৈদিক সম্বর্গবিদ্যার পীঠস্থানে রৈকপনেশ্বর মন্দিরের পাশেই আমরা আশ্রম বানিয়ে দেব।

তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিলাম। সামনে আমার অন্তঃহীন পথ, সেই রেবাসংগম আর কতদূর? আমি জানি এখন আমি অর্ধপথও পরিক্রমা করতে পারিনি। বেলা প্রায় এগারটা হবে। নর্মদাকে প্রণাম করে তীর ধরে হাঁটতে লাগলাম।

কনকনে ঠাণ্ডা বাতাসে হাড়ে কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। নর্মদার তীর ধরেই যাচ্ছি তবুও স্নান করতে ইচ্ছা করছে না। দূরে মানুষজন আমলকী এবং অন্য ধারে আমরুদ গাছের ঘন জঙ্গল। কোথাও কোথাও পাহাড়ের উপর শিবমন্দির দেখতে পাচ্ছি, নর্মদার উভয়তীরে শুধু শিব আর শিব। তীর থেকে কোথাও একমাইল দূরে, কোথাও দুমাইল দূরে বসতি। কোন পথচারীকে দেখতে পাচ্ছি না। এইভাবে প্রায় আরও তিনঘন্টা একটানা হেঁটে একটা শালগাছের তলায় পাথরের উপর বসে পড়লাম। পাগুলো টেনে ধরেছে, সমস্ত শরীর অবসন্ন, গাঁঠরীর উপর মাথা দিয়ে পাথরের উপরেই শুয়ে পড়লাম। ভীষণ ক্ষুধা পেয়েছে, স্নানটাও এইবেলা সেরে নিতে হবে, স্নান না করলে শীত আরও বেশী করে জেঁকে ধরবে। ধীরে ধীরে নর্মদার ঘাটে নামলাম। ঘাট বলতে কোন বাঁধানো ঘাট নয়, বড় বড় পাথর পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়েছে নর্মদার জলে। সাবধানে নেমে স্নান ও তর্পণ সেরে কয়েক টুকরো মিছরী খেয়ে জল খেলাম। আবার হাঁটতে লাগলাম, একটি ছোট জঙ্গল পেরিয়ে একজন পথিককে চোখে পড়ল। সে রাস্তার বাঁকে মোড় নিতে গিয়েও আমাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। কাছাকাছি কোন থাকার মত মন্দির আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় বলল — তিনমাইল দূরে একটা মন্দির আছে কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসছে মন্দিরের পথ জঙ্গলাকীর্ণ, সেখানে পৌঁছতে পারবেন না। তবে আধমাইলটাক গেলেই শাহগঞ্জে পৌঁছবেন, সেখানে খাটোলা গোঁড়দের বসতি আছে। খুব বড় মহল্লা, সেখানে মন্দিরও আছে, একটি ছোট স্কুলবাড়ীও আছে, সেখানে রাত কাটানোই আপনার পক্ষে ভাল হবে। নমস্কার জানিয়ে সে চলে গেল। আমি শাহগঞ্জে এসে পৌঁছিলাম। সেখানে শিবমন্দির পেলাম বটে মন্দিরটি এত ছোট যে শিবলিঙ্গের পাশে হাত পা মিলে শোবার উপায় নাই। স্থানীয় লোকেরা আমার সমস্যা জানতে পেরে থাকার জন্য স্কুলবাড়ীর একটি কামরা খুলে দিল, পরিক্রমাবাসী জেনে শ্রদ্ধাভরে এক ঘটি দুধও এনে দিল।

দুধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম বটে কিন্তু হাত পা কোমরের অসম্ভব যন্ত্রণায় কিছুতেই রাত্রে ঘুম এল না। মনে হল যেন সর্বাঙ্গে জ্বর জাঁকিয়ে এসেছে। মনে হতে লাগল, বাবার আদেশ প্রতিপালন করতে এসে এই বিদেশ বিরাজ্যে বেঘোরে হয়ত প্রাণটাই যাবে! নর্মদা-পরিক্রমায় এত কষ্ট জানতে হয়ত আবেগের বশে পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়তাম না। বাবাকে হারিয়ে দু'বছর হল ঘর ছেড়েছি, ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান তীর্থ সবই ঘোরা হয়ে গেছে, অনেকবার

পথে নিজের একাকীত্ব ও অসহায়তার কথা ভেবে চঞ্চল হয়েছি ঠিকই , কিন্তু সে সব পর্যটনে পথচলার একটা স্বাধীনতা ছিল, সুযোগ পেলে এবং শরীর অসুস্থ মনে করলে ট্রেন বাস টাট্টু বা লরির মাথায় উঠে কোথাও যাতায়াত করার কোন বাধা ছিল না। কিন্তু রুদ্রকন্যা নর্মদার তটে পরিক্রমা করতে হলে নগ্নপদে যানবাহন পরিত্যাগ করে বনজঙ্গল পাথর কাঁটা যাই থাক্ তার উপর দিয়ে নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হেঁটে যেতে হবে — শাস্ত্রের এইরকম রুদ্রশাসন, সেইসব পরিব্রাজনে মেনে চলার কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। রৈকপনেশ্বরের পুরোহিত মশাই ত বলেই ছিলেন — নর্মদা পেরিয়ে নরসিংহপুর ষ্টেশনে পৌঁছে রেলপথ ধরলে দশমাইল দূরের করেলি, সেখান থেকে উত্তরমুখে মাত্র দশমাইল হেঁটে গেলেই অন্যতম শ্রেষ্ঠ নর্মদাতীর্থ — ব্রহ্মাণে পৌঁছতে পারতাম কিংবা করেলি থেকে ট্রেনে ভায়া পিপারিয়া ইটারসি জংশন অতিক্রম করে হোসেঙ্গাবাদ, যার প্রাচীন নামই নর্মদাপুর, সেখানেই সরাসরি পৌঁছে যেতে পারতাম, কিন্তু পরিক্রমার কঠিন শপথ, উত্তরতটে চলছি যখন, তখন মরি বাঁচি উত্তরতট ধরেই যেতে হবে, কিছুতেই নর্মদা পেরিয়ে দক্ষিণতটে যাওয়া যাবে না। এরই নাম নাকি নর্মদা মার্গের বৈদিক সাধনপথ! কি পাবো আমি এতে ? আদৌ কিছু পাবো কি ? শাস্ত্র বলেছেন — নর্মদা দর্শনেই সর্বপাপের বিলয়। কিন্তু কি পাপ করেছি আমি, মনে ত পড়ে না। অষ্ট বা অষ্টাদশ সিদ্ধি করায়ত্ত হবে? কিন্তু তা কি আমি নর্মদামায়ের কাছে চেয়েছি? কিন্তু একটা আকাঙ্ক্ষা বা পরিকল্পনা বাবার মনে ছিল নিশ্চয়ই, হয়ত নর্মদা-পরিক্রমায় অকল্পনীয় কোন দিব্যবস্তু লাভ হয় এই প্রত্যয় তাঁর মনে ছিল বলেই অন্তিমকালে বলে গেলেন 'তুই যদি নর্মদা পরিক্রমা করতে পারিস আমি খুশী হব, শান্তি পাবো'। আমি যদি বাবার সেই ইচ্ছা পূর্ণ করতে না পারি বা 'দুরন্ত দৈবের বশে' পরিক্রমার অন্তেও আমার মন যদি ফাঁকা থেকে যায়, তাহলে এত পথের কষ্ট অযথা ভোগ করা হচ্ছে।

জ্বরের বিকারে এইসব আবোল-তাবোল চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কিংবা মূর্চ্ছা গিয়েছিলাম কিনা জানিনা, আমি দেখলাম বাবা আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে তাঁর অতি প্রিয় স্বরচিত কবিতাটি বলে চলেছেন —

এ সংসার অন্ধপুরে সর্বত্র ব্যাপিয়া,
পরম আশ্বাস আছে জাগ্রতের তরে;
সত্যের খুঁজছে যারা কাঁদিয়া কাঁদিয়া
কেহ তারা শূন্য হাতে ফিরে নাই ঘরে।

হঠাৎ কারও হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠলাম। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। চোখ মেলে চেয়ে দেখলাম একজন বৃদ্ধ সৌম্যকান্তি ভদ্রলোক আমার নাড়ী দেখছেন। একজন ভদ্রলোক নগ্নগাত্রে ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি আমাকে বললেন — সকালে উঠে আমি উঁকি মেরে আপনার ঘরে দেখলাম, আপনি আলু-থালু হয়ে পড়ে আছেন, মুখে গোঁ-গোঁ করছেন। সেইজন্য আমি এই বৈদ্যজীকে ডেকে এনেছি। এঁর নাম রামশংকরজী। রামশংকরজী বললেন — 'কোঈ ফিকর নেহি, হম্ আভি দাবা দেতা হুঁ।' তিনি তাঁর ঝোলা থেকে একটি বুটি বের করে বললেন — সহদেকা (মধু) সাথ পিলা দিজিয়ে, বুখার ছুট্ জায়েগা। বৈদ্যজীর কথা শুনে সেই ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বাড়ী গিয়ে খল-নুড়ি এনে মধু দিয়ে বড়িটি মেড়ে দিলেন। আমি লোকটির হাত ধরে উঠে বসে ঔষধ খেয়ে শুয়ে পড়লাম। নিজেই তিনি তাঁর পরিচয় দিলেন — হম্ ব্রাহ্মণ হুঁ। হমারা ব্রাহ্মণী আভি গরম পানি লেকর আয়েগা। নর্মদাকী

পানি হৈ। ইহ্ পীনেসে আপকো কোঈ হরজা নেহি।

একটু পরেই গরম জল নিয়ে তাঁর ব্রাহ্মণী এলেন। একেবারে প্রশান্ত মাতৃমূর্তি। স্বামী-স্ত্রী উভয়ে মিলে, আমায় গরম জলে মুখ ধুইয়ে, একগ্লাস গরম সাগু খাইয়ে অতি যত্নে বিছানায় শুইয়ে দিলেন। আমি যেন তাঁদের ছেলে। বাধা দিয়েছিলাম, কিন্তু ছোট ছেলেকে যেমন ধমক দেয় তেমনিভাবে আমাকে ধমকে একজন কপাল টিপতে আর একজন পা দাবাতে বসে গেলেন। স্বামী-স্ত্রী উভয়েই উচ্চৈঃস্বরে বলে চলেছেন — রেবা রেবা রেবা; মনে হল যেন পার্বতী-শংকর এসেছেন আর্ত, অসহায় রোগযন্ত্রণায় কাতর এই ছেলেটাকে দেখতে! ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, ঘুম ভাঙলো যখন তখন মনে হল জ্বর ছেড়ে গেছে, মাথা হাল্কা, শরীরে কোন যন্ত্রণা নাই। একটু পরে সেই রামশংকর বৈদ্যজী আবার আমাকে দেখতে এলেন। নাড়ী দেখে বললেন — বুখার ছুট্ গিয়া। সামকা বখৎ আউর এক বুটি আপকো লেনে হোগা। বেলা চারটা নাগাদ আমার শরীর ঝরঝরে সুস্থ হয়ে গেল। আমি নর্মদা দর্শন করতে চাইলাম, সেই প্রৌঢ় ব্রাহ্মণ আমার হাত ধরে নর্মদার তটে এনে বসিয়ে দিলেন। মানসপূজা সেরে আবার সেই স্কুল-ঘরে ফিরে এলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — এই প্রচণ্ড শীতে আপনি কিভাবে নগ্নগাত্রে থাকতে পারছেন?

—'হম্ ক্যা জানে। নর্মদামায়ী জানে।'

আমি মহাত্মা শোভানন্দজীর কথার প্রতিধ্বনি করে বললাম — ক্যা নর্মদামেঁ এ্যায়সা হোতাই হ্যায়?

এবারেও সংক্ষিপ্ত উত্তর 'জরুর'।

পরদিন ব্রাহ্মণ দম্পতির কাছে বিদায় নিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করলাম। দুর্বল শরীর, ধীরে ধীরে এগিয়ে যেতে লাগলাম নর্মদামাতার কোলে কোলে।

দুধারে পর্বতমালা — বিন্ধ্য আর সাতপুরা। মধ্যে এই নর্মদা উপত্যকা। নর্মদা চলেছেন সাগর-সংগমে, তার উত্তর ও দক্ষিণের পার্বত্যধারাকে বিন্ধ্য ও সাতপুরা এই দুই আলাদা আলাদা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতের ভৌগোলিক পার্বত্য বিন্যাসে এই দুই ধারাই এক বিশাল পার্বত্যজগতের অন্তর্ভুক্ত। নাম তার বিন্ধ্যজগৎ। সে জগৎ ভারতের উত্তর ও দক্ষিণের মাঝখানে এক বিশাল ও দুর্ভেদ্য প্রাচীর। নর্মদার এপার ওপার জুড়ে এই অবিচ্ছেদ্য পার্বত্যজগৎ পশ্চিমে আরব সাগরের কাম্বে উপসাগর থেকে রাজমহল পর্যন্ত বিস্তৃত। বীরভূমের পশ্চিম প্রান্তের পার্বত্য অঞ্চল এই বিন্ধ্যেরই নিশানা। কর্কটক্রান্তি বৃত্ত এই বিশাল বিন্ধ্যজগৎকে ভেদ করে গেছে। উত্তরে গাঙ্গেয় উপত্যকা ও দক্ষিণে দাক্ষিণাত্য মালভূমি। বিন্ধ্যের উত্তরে উত্তরাপথ, দক্ষিণে দক্ষিণাপথ। সমগ্র বিন্ধ্যজগতের দৈর্ঘ্য সাতশ মাইল, পরিধি চল্লিশ হাজার বর্গমাইল।

এই বিন্ধ্যজগৎকে উত্তরে ও দক্ষিণে ভাগ করেছে পশ্চিমপ্রবাহিনী নর্মদা। উত্তরাংশের লৌকিক নাম বিন্ধ্য, দক্ষিণাংশের সাতপুরা। বিহারে রাজমহল, ছোটনাগপুর ও রোটাসের পর্বতাবলী, বাঘেলখণ্ডের কৈমূর পর্বতমালা, নরসিংহপুর অঞ্চলের ভাণ্ডের পর্বতমালা এবং সেখান থেকে সৌরাষ্ট্র পর্যন্ত মালবের বিন্ধ্যপর্বতমালা এই উত্তরাংশের অন্তর্ভুক্ত। পশ্চিম সীমান্তে গীর্ণার বা রৈবতক। মেকল, মহাদেব ও সাতপুরা পর্বতমালা দক্ষিণ বিন্ধ্যাচলের অন্তর্ভুক্ত। বিন্ধ্যের এই উত্তর ও দক্ষিণাংশ, নর্মদা নদীর উৎস মেকলচূড়া অমরকন্টকে যুক্ত হয়েছে।

হাঁটছি আর ভাবছি। দুধারে অরণ্য শ্যাম-গম্ভীর পর্বতমালার মাঝখানে ভারত-ভূগোলের অতি আশ্চর্য সৃষ্টি এই নর্মদা-উপত্যকা। মা নর্মদে, তুমি ঋষিদের চোখে সৃষ্টির পালয়িত্রী, সভ্যতার লালয়িত্রী হয়েও তপস্যা বিধাত্রী বরদা। বরদে একই অঙ্গে তোমার কত রূপ! মাঝে মাঝে কোথাও অরণ্য সঙ্কুল, কোথাও রুক্ষ বন্ধুর — যেন রুদ্র সাজে সেজেছ। আবার তীরে তীরে তোমার কত শ্যামল বনানী, কত শস্যক্ষেত্র, কত গ্রাম, কত জনপদ, কত ঘাট, কত তীর্থমন্দির — এই সকলের মধ্যে তোমার শিবময়ী কল্যাণী রূপটি ফুটে বেরিয়েছে। 'এহো বাহ্য আগে বাঢ়ো আর।' শিবদুলালি, বারেকের তরে, ক্ষণিকের তরে তোমার ঊর্জস্বল বিভূতি অপাবৃত কর মা!

একটা হৈ হৈ শব্দ শুনে চমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একটা বড় পাথরের চাঙড়ে হাত ঠেকাতে মুহূর্তমাত্র দেরী হলে টাল সামলাতে পারতাম না, পথের উপরেই আছড়ে পড়তাম। আমি যেখানে দাঁড়ালাম, সেখান থেকে পঞ্চাশ গজ দুরেই দেখলাম একটা দাঁতালো বন্য বরাহ রাস্তার উপর দিয়ে পাহাড়ের দিকে দৌড়ে যাচ্ছে। প্রায় ত্রিশ-চল্লিশজন লোক বল্লম ছুঁড়তে ছুঁড়তে তাকে তাড়া করে এসেছে। তারা মুখে গর্জন তুলেছে — হর হর ভারেশ্বর মহাদেও। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার হাঁটতে লাগলাম। নর্মদা বাঁক নিয়েছে, রাস্তাও বেঁকেছে। প্রায় পাঁচ-সাত মিনিট যাবার পরেই দেখি একটি ছোট নদী পাহাড়ের উপর থেকে প্রবাহিত হয়ে নর্মদায় পড়েছে। গাছের তলায় দশ বারজন লোক হাতে টাঙি আর বল্লম নিয়ে বসে আছে। এরা আবার কারা? তাদের একসঙ্গে কয়েকজন আমার দিকে তাকিয়ে যুক্তকরে বলে উঠল — গোড় লাগি মহারাজ! আমি জিজ্ঞাসা করলাম — পুষ্কলী তীর্থ কিধার বা?

—শাহগঞ্জকা তরফ্, উহ্ তো আপ্ ছোড়কে আয়া। ইহ্ হ্যায় হিরণ নদীকা সংগম। ঘাটকা নাম ভারেশ্বর তীর্থ। ভারেশ্বরজীকা মন্দর্ দেখাই দেতা হৈ। তাদের অঙ্গুলি-সংকেত লক্ষ্য করে দেখলাম অদূরেই ধূসর রঙের বিরাট শিব মন্দির মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। শাল সেগুন তেঁতুল এবং শীরিষ গাছের মধ্যে ধূসর রঙ আলাদা করে সহসা চোখে পড়ার কথা নয়। মন্দিরে গিয়ে দেখি, দরজা নাই, হয়ত ছিল — কতযুগের মন্দির দরজা ভেঙে গেছে। মন্দিরের ভিতরটা একটা বড় হলের মত, প্রায় পঞ্চাশ জন শুয়ে থাকলেও জায়গার অভাব হবে না। হলের মধ্যস্থলে প্রায় দুইফুট উঁচু উল্টানো ধামার মত দেখতে চকচকে কালো পাথরের একটি স্বয়ম্ভুলিঙ্গ। কাশীতে গৌরীকেদার মন্দিরে ঠিক এই রকমেরই শিবলিঙ্গ দেখেছি। তবে নর্মদাতটের এই শিবলিঙ্গটি অনেক উজ্জ্বল; মনে হচ্ছে যেন এইমাত্র কেউ ঘি মাখিয়ে গেছে। হলের এক কোণে বিছানা পেতে স্নান ও তর্পণাদি সেরে এলাম। কমণ্ডলুর জলে পূজা করলাম। আঙুল দিয়ে ঘষে দেখলাম, আঙুলে ঘি লাগে কিনা। না, ঘি নয়। এই উজ্জ্বল কান্তি শিবলিঙ্গের স্বাভাবিক দ্যুতি। ধূসর পাথর দিয়ে শিবলিঙ্গকে ঘিরে দৈর্ঘ্যে প্রস্থে সমান প্রায় চারফুট যোনিলিঙ্গ গেঁথে তোলা হয়েছে, পাশেই একটি বিরাট ত্রিশূল পোঁতা আছে। শাহগঞ্জের ব্রাহ্মণীমা আসার সময় ঝুলিতে লিট্টি দিয়েছিলেন। তাই খেয়ে মন্দিরের চত্বরে বসে তালপাতার হস্তলিখিত পুঁথি রেবাখণ্ডম্ এর প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শিরোনাম পড়ে পড়ে, ভারেশ্বর তীর্থের বিবরণ খুঁজতে লাগলাম। খুঁজে পেলাম না।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হিমেল বাতাস বইছে, দুদিন আগেই জ্বরে পড়েছিলাম। কাজেই আর বাইরে বসে থাকাটা উচিত মনে করলাম না। পুঁথিটি হাতে নিয়ে মন্দিরের ভিতরে গিয়ে

নিজের আসনে কম্বল মুড়ি দিয়ে বসলাম। অন্ধকারে চারদিক ঢেকে গেল। বসে বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। দুর্বল শরীরে প্রায় বার চৌদ্দ মাইল হেঁটে এসেছি, ঘুম পাচ্ছে, কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম।

রাত্রি তখন কত জানিনা, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। একটা সুরেলা ধ্বনিতে গোটা মন্দির ভরে গেছে, প্রচণ্ড শীতে মুখ থেকে কম্বল সরিয়ে কোন কিছু দেখতে ইচ্ছা হল না। ওমা! এই মিষ্টি সুরতরঙ্গ যে আমার মাথার তলদেশ অর্থাৎ মন্দিরের মেঝে থেকেই উঠছে বলে মনে হচ্ছে! উঠে বসলাম, দেওয়ালের গায়ে কান ঠেকাতেই সেই সুরেলা ধ্বনি যেন আরও স্পষ্টতর হল। মনে হচ্ছে নিরবচ্ছিন্ন এই ধ্বনি বা সুর তালে তালে গমকে গমকে যেন উর্ধ্বের দিকে উঠে যাচ্ছে। একটা অস্বাভাবিক কৌতূহল আমাকে পেয়ে বসল। আমি দাঁড়িয়ে দেওয়াল ধরে ধরে হলঘরের এ প্রান্ত হতে ও প্রান্ত পর্যন্ত দেওয়ালে কান ঠেকিয়ে ঠেকিয়ে নিজের আসনে এসে বসলাম। যেখানেই কান পেতেছি সেইখানেই একই সুরের মূর্ছনা, একই তান। ভাবলাম, জ্বরে ভুগে এবং দীর্ঘপথ অনশনে অর্ধাসনে থেকে থেকে স্নায়ুগুলো দুর্বল হয়ে গেছে, সেইজন্যই হয়ত এই সব শব্দ কানে আসছে, এই শব্দ দেওয়ালে নাই, এ আমারই দুর্বল স্নায়ুতন্ত্রীর ঝঙ্কার মাত্র। কিন্তু এই ধ্বনি এত সুরেলা এত মধুর কেন? স্নায়ুদৌবল্য থেকে যে শব্দ কানে জাগে তাতে ত মাধুর্য থাকে না! গুরু নানকের একটি বাণী মনে পড়ল — হুকমৈ অন্দরি সভকো বাহর হুকুম ন কোই।
নানক হুকম্ জো বুঝৈ ইত্মে কহে ন কৌই।। (জপজী দরবেশ-৬)

সর্বঘটে বিরাজিত অনাহত ধ্বনি, অগম্য তাঁহার তত্ত্ব চিরগুপ্ত খনি।
হুকুম যে বুঝে তার সরে না বচন, আমি আমি ব্যর্থ বাণী কহে না সেজন।।
জ্ঞান বুদ্ধি লুপ্ত তার মহিমার বনে, নানক তাহার তত্ত্ব কেহ নাহি জানে।।

তাহলে কি, তাহলে কি নানক কথিত সেই 'হুকম্', বা হুকম সর্বঘটে বিরাজিত সেই অনাহত নাদধ্বনির বহিরঙ্গ রূপই মন্দিরাভ্যন্তরস্থ প্রতিটি পাথরের মধ্যে অধ্যারোপিত হয়ে আমার কানে এসে বাজছে? কিন্তু আমি ত কোন শব্দসাধনায় এই মুহূর্তে রত নই!

আমি এইভাবে মনে মনে বিচার করে চলেছি। সুরেলা ধ্বনির স্ফূরণ ও অবিরাম ঝঙ্কার এক মুহূর্তও থেমে নাই। ধীরে ধীরে আমাকে মাতাল করে তুলছে , আমি যেন নেশা করেছি, শব্দের নেশা — আমার শরীর টলছে দুলছে, আমি বিছানাতেই লুটিয়ে পড়লাম।

সকালে জেগে উঠলাম। দেখতে পেলাম, রেবাখণ্ডম্ পুঁথিটি দু'ভাগে খোলা হয়ে পড়ে আছে। এ কেমন করে হল, তালপাতার পুঁথি, দুই দিকে শক্ত কাঠের পাটা দিয়ে বাঁধা থাকে, গতকাল পুঁথিটা ত আমি যথারীতি বেঁধেই রেখেছিলাম, খুলে রাখার লোক আমি নই। যাইহোক সেইভাবেই পুঁথি পড়ে থাকল, আমি ঠাকুরকে প্রণাম করে প্রকৃতির বেগে শৌচাদি সারতে চলে গেলাম। ফিরে এসে পুঁথির দুই ভাগে দুই হাতে ধরে বাইরে মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটা পাথরের উপর বসলাম। ভুবন-প্রকাশক উদিত হচ্ছেন, বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশে ; তাঁর রশ্মিচ্ছটা আলোয় আলোয় সব কিছুকেই ফুটিয়ে তুলছে, প্রকাশ করছে। পুঁথির পাতায় নজর দিতে দেখলাম শিরোনাম লেখা পুষ্কলী তীর্থ। প্রথম পংক্তিতে পুষ্কলী সম্বন্ধে দু'চার কথা বলে ঐ একই পরিচ্ছেদে মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন — অতঃপর ক্ষমানাথ তীর্থে যাবে। সাক্ষাৎ মহেশ্বর সেখানে বাস করেন, তিনি জীব উদ্ধারের মহাভার গ্রহন

করেছেন বলে এই তীর্থের অপর নাম ভারভুতি তীর্থ —

তত্র তিষ্ঠতি দেবেশঃ সাক্ষাৎরুদ্রো মহেশ্বরঃ।
ভারেণ মহতা জাতো ভারভূতীরিতি স্মৃতঃ॥

ওহো! এই ভারভূতিই তাহলে লোকমুখে ভারেশ্বর হয়েছেন —'হর হর ভারেশ্বর মহাদেও।'

আমি পুঁথির উপাখ্যান পড়তে লাগলাম। মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে বলছেন — এই ভারভূতি তীর্থে বিষ্ণুশর্মা নামে একজন বেদবেদাঙ্গপারঙ্গম সর্বশাস্ত্রবিৎ ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর কাছে দেশ-দেশান্তর হতে বিদ্যার্থীরা পড়তে আসতেন। এই নর্মদাতটে বিষ্ণুশর্মার একনিষ্ঠ তপস্যা ও বিদ্যাদানের ব্রত পালনে তুষ্ট হয়ে একদিন স্বয়ং মহাদেব ব্রাহ্মণ বালকের বেশ ধরে তাঁর কাছে বিদ্যাভ্যাস করবার জন্য এলেন। বিষ্ণুশর্মা তাঁকে জানালেন — এখানে বিদ্যার্থীরা ভিক্ষা করে এনে নিজেরাই রন্ধনাদি কার্য করে এবং নানাভাবে আমার সেবা করে। তুমি যদি সেইভাবে থাকতে পার তবে তোমাকে ছাত্রশ্রেণীভুক্ত করতে আমার আপত্তি নাই। ব্রাহ্মণ-বালকবেশী মহাদেব সেই কথাতেই সম্মত হয়ে গুরুর আশ্রমে বিদ্যা গ্রহণে ব্রতী হলেন। একদিন পর্যায়ক্রমে রন্ধনের ভার ছদ্মবেশী মহাদেবের উপর পড়ল। তিনি তত্রত্য বনস্পতিগণকে দ্রুত রন্ধনকার্য গোপনে সম্পন্ন করার ভার দিয়ে পাহাড়ের ধারে যেখানে তাঁর সহপাঠীরা খেলা করছিল, সেখানে গিয়ে তাদের সঙ্গে খেলাতে যোগ দিতে চাইলেন। তাঁকে দেখেই সহপাঠীরা ক্রুদ্ধ হয়ে বলতে লাগল — আমরা যখন রান্না করি, তখন তা শেষ করতে বেলা গড়িয়ে যায়। তুমি নিশ্চয়ই রান্না না করেই এখানে এসেছ। আমরা সবাই ক্ষুধার্ত। যদি গিয়ে খেতে না পাই, তাহলে তোমার হাত পা বেঁধে নর্মদার জলে ফেলে দিব। মহাদেবও বললেন — তোমরা তাই করো। তবে আমারও ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনে রাখ, যদি তোমরা গিয়ে যথাযোগ্য ভোজন প্রস্তুত দেখ তাহলে গুরুর সামনেই তোমাদেরকেও আমিও নর্মদাজলে নিক্ষেপ করব। তারা বিদ্যাশ্রমে ফিরে গিয়ে দেখল বিপুল ভক্ষ্যবোঝ্য প্রস্তুত। গুরুকে উভয় পক্ষের প্রতিজ্ঞার কথা নিবেদন করে ছদ্মবেশী মহাদেব তাঁর সহপাঠীদেরকে হস্তপদবদ্ধাবস্থায় নর্মদার জলে নিক্ষেপ করলেন। তাই দেখে গুরু হাহাকার করে বলতে থাকলেন — তুমি এ কি সর্বনাশ করলে। এই বালকদের মাতা-পিতাকে আমি কি উত্তর দিব? তার চেয়ে আমারও নর্মদার জলে ঝাঁপ দিয়ে দেহত্যাগ করা ভাল। এই বলে তিনি ঝাঁপ দিতে উদ্যত হতেই শাপানুগ্রহ-সমর্থ মহেশ্বর বিষ্ণুশর্মাকে নিবৃত্ত করে অবলীলাক্রমে সহপাঠীদেরকে জল থেকে তুলে আনলেন, তাঁদের মধ্যে পাঁচজন মারা গেছলেন। গুরুর কান্নায় বিচলিত হয়ে সেই পাঁচজনের দেহ আচ্ছাদিত করে তিনি মন্ত্রপূত নর্মদার জল সেই মৃতদেহগুলির উপর ছিটিয়ে দিলেন। তার পুনর্জীবিত হয়ে উঠে বসল আর তৎক্ষণাৎ সেখানে এই ভারভূতি নামক স্বয়ম্ভু লিঙ্গ প্রকট হল, ব্রাহ্মণবটুবেশী মহাদেব বিষ্ণুশর্মা ও অন্যান্য অন্তেবাসীদের স্তম্ভিত করে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় সাক্ষ্য দিচ্ছেন,

তদাপ্রভৃতি তত্তীর্থং ভারভূতীতি বিশ্রুতম্॥

প্রচণ্ড কনকনে ঠাণ্ডা, গাছের পাতা হতে যে শিশির পড়ছে, মনে হচ্ছে যেন বরফ জল। কুয়াশায় কিছু দেখা যাচ্ছে না, আসনেই বসে আছি, পুঁথি পড়া শেষ হয়েছে এমন সময় মন্দিরের পিছন দিক দিয়ে আওয়াজ ভেসে এল — হর হর ভারেশ্বর মহাদেও। স্ত্রী, পুরুষ বালক মিলিয়ে কুড়ি বাইশজন লোক মন্দিরের চত্বরে এসে উপস্থিত হলেন। প্রত্যেকের

হাতেই ফল ফুল পূজার অর্ঘ্য। তাঁদের মধ্যে একজনের গলায় রুদ্রাক্ষ মালা। রঙীন সোয়েটারের উপর দিয়ে রুদ্রাক্ষ মালাটি গলা থেকে বুকের উপর ঝুলানো আছে। কপালে ত্রিপুণ্ড্র এবং হাতে কমণ্ডলু দেখে বুঝলাম, ইনিই পুরোহিত।

আড়চোখে একবার আমার দিকে তাকিয়ে মন্দিরে ঢুকে গেলেন সবাই। যে যার লোটায় করে জল এনে ভক্তরা আগে 'হর হর ভারেশ্বর মহাদেও' সমস্বরে উচ্চারণ করে শিবের মাথায় জল ঢাললেন। তারপর পুরোহিত মশাই বসলেন পূজায়। অনেকক্ষণ ধরে তিনি পূজা করলেন, শিবমহিম্নঃ স্তোত্র পাঠ করলেন, শিবের অতবড় স্তোত্র তাঁর সম্পূর্ণ মুখস্থ আছে দেখলাম। বিশুদ্ধ উচ্চারণ। তাঁর পূজার সময় কান পেতে শুনলাম, তিনি বারবার 'নর্মদে শর্মদে নমঃ' এবং 'নমো ভগবতে ভারেশ্বরায় ভূতয়ে নমঃ শিবায়' বলে ফুল চাপালেন। কর্পূর দিয়ে আরতি করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন মহাদেবকে।

ভক্তরা মহাদেবের প্রসাদ নিয়ে এসে চত্বরে বসে খেতে আরম্ভ করলেন। ভক্তদের প্রণামী ট্যাকে গুঁজে পুরোহিতমশাইও প্রসাদ গ্রহণ করলেন। আমি পরিক্রমাবাসী কিনা জেনে নিয়ে আমাকে বললেন — এই মন্দিরের নিয়ম হচ্ছে পরিক্রমাবাসী মন্দিরে উপস্থিত থাকলে তাঁর ভোগের জন্য ফলমূল আগে রেখে দিতে হবে, তারপর ভগবানের পূজা। যদি বেশী সংখ্যায় পরিক্রমাবাসী থাকেন, তাহলে প্রয়োজনে ভক্তদের আনা সব অর্ঘ্যই রেখে দিতে হবে, তখন শুধু নর্মদার জলে পূজা করলে তাতেই ভক্তবৎসল তুষ্ট হবেন। আপনার জন্য ফলমূল, খোয়া ইত্যাদি যা রেখেছি তা দয়া করে গ্রহণ করবেন। আপনি কি সকালে এখানে এসেছেন, না কাল এসেছেন?

— গতকাল বেলা দেড়টা নাগাদ এসেছি আমি। আপনি কি কাল পূজা করতে এসেছিলেন? শিবের মাথায় কোন ফুল বেলপাতা দেখিনি।

— জরুর এসেছিলাম। এই মহল্লার নাম হিরণ্যা। অল্প লোকের বাস কিন্তু পাশের মহল্লার নাম ছিন্দোয়াড়া,★ ঘন বসতি। সেখানে বহু বর্ধিষ্ণু খাটোলা গোঁড়, রাজপুত এবং ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করেন। ছিন্দোয়াড়া থেকে প্রতিদিন অন্ততঃ বিশ পঁচিশজন ভক্ত এখানে পূজা দিতে আসে। পূজা করে চলে যাবার পরেই রহস্যজনকভাবে এখানে ফুল বেলপাতাও উধাও হয়ে যায়। একথা এখানকার সকলেই জানে কিন্তু কেউ এর রহস্য উদ্ধার করতে পারে নি। খোলা দরজা, প্রচণ্ড ঠাণ্ডা পড়েছে, আপনার নিশ্চয়ই রাত্রে খুব কষ্ট হয়েছে।

এই বলেই তিনি দুজন লোককে তাঁর বাড়ী থেকে পর্দা বা একটা বোরার 'ঠাটরা' আনতে হুকুম করলেন। দশ মিনিটের মধ্যেই 'ঠাটরা' পৌঁছে গেল। মন্দিরের মধ্যে দরজার উপরে দুদিকে দুটো হুকে সেটিকে ঝুলিয়ে দিলেন। পুরোহিতসহ ভক্তবৃন্দ মহাদেবের জয়ধ্বনি দিতে দিতে চলে গেলেন। শব্দ রহস্যের কথা বলি বলি করেও বলা হল না।

মন্দিরে গিয়ে পুঁথিটি গুছিয়ে রাখলাম। দেখলাম, আমার আসনের কাছে পেঁপে, পেয়ারা, কলা এবং কতকটা খোয়া তাঁরা রেখে গেছেন। পূজার জন্য কিছু ফুলও আছে। স্নান করতে গেলাম, স্নান করে এসে দেখি, অতো ফুলে শিব ঢাকা পড়ে গেছলেন, তার একটা ফুলও

★ এই নর্মদা-অঞ্চলেই বেতুল জেলার পাশে ছিন্দোয়াড়া বলে আর এক স্বতন্ত্র জেলা আছে। তার প্রধান শহর ছিন্দোয়াড়া। বলা বাহুল্য, এখানে উল্লিখিত ছিন্দোয়াড়া সেই ছিন্দোয়াড়া নয়। ভারেশ্বর মন্দিরে ছিন্দোয়াড়া থেকে যারা পূজা দিতে এসেছে, সে ছিন্দোয়াড়া নর্মদার উত্তর তীরের একটি বির্ধিষ্ণু গ্রাম, নরসিংহপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত।

নাই। কাছেই ঘাট, প্রায় বিশ মিনিট লেগেছে স্নান করে আসতে, এর মধ্যে কে এল যে, সব ফুল নিঃশেষে কুড়িয়ে নিয়ে গেল! মন্দিরে ঢুকতে যে পাথরের সিঁড়ি তা এমনই ভাঙাচোরা যে গরুর পক্ষে ওঠানামা সম্ভব হবে না। রহস্য কিছু বোঝা গেল না।

যাই হোক, আমি পূজা করতে বসলাম। প্রথমেই মহাদেবের গায়ে কান ঠেকালাম। গত রাত্রের সেই সুরেলা শব্দ লিঙ্গের মধ্য থেকে একটানা বেজে চলেছে। একটা অশ্রুতপূর্ব রাগিনীর মধুর ঝঙ্কার, অপূর্ব তান লয়ে ঝঙ্কৃত হতে হতে সহসা মনে হল, আমার মস্তিষ্ককোষের মধ্য হতে উদ্ভূত হচ্ছে — বম্‌বম্-ববম্-বম্। আমি তন্ময় হয়ে গেলাম, আমার দেহকোষের প্রতিটি অনু পরমাণু যে উন্মাদ নৃত্য শুরু করেছে, বম্ বম্ ববম্ — ধ্বনির তালে তালে। অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের ঢল নেমেছে আমার প্রতিটি রোমকূপে, আমি মজে গেলাম, গলে গেলাম।

যখন ধাতস্থ হলাম, তখন সূর্য পাটে বসেছেন। শিবের মাথায় জল, ফুল দিতে গিয়ে দেখলাম হাত অবশ, শরীরও অবশ। কাঁপা কাঁপা অবশ হাত দুটোকে জোড় করতে পারলাম না, অসহ্য আনন্দে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে জড়িত কণ্ঠে আধো আধো ভাষায় বলবার চেষ্টা করলাম —

নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু তুভ্যং
ত্বাং সাধনং তত্ত্বপদস্য জানে।
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং
বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে।। (যোগতারাবলী, শংকরাচার্যকৃত)

হে নাদানুসন্ধান! তোমাকে প্রণাম। আমি তোমাকে পরমতত্ত্বের সাধন বলে জানি তোমার অনুগ্রহে প্রাণবায়ুর সঙ্গে আমার মন ব্রহ্মপদে কবে বিলীন হবে? হে দীনদয়াল, এই পিতৃহারা অনাথকে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলায় দুলিয়ে রহস্যের পর রহস্যের গহন অন্ধকারে নিক্ষেপ করো না প্রভু! দয়া কর হে আশুতোষ, ভক্তি-বিশ্বাসের অচ্যুতভূমিতে যেন আমার উত্তরণ ঘটে!

অদ্ভুত ভঙ্গীতে অদ্ভুত ধরনের পূজা সাঙ্গ হলো। ফলমিষ্টি মহাদেবকে নিবেদন করে বাইরে বসে খেয়ে নিলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। নর্মদার ঘাটে হাত মুখ ধুয়ে এসে ঝাঁপ ফেলে দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে চুপ করে বসে রইলাম। মনের মধ্যে আনন্দের রেশ এখনও মিলিয়ে যায় নি। কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। কালকের মত আজও কানে সেই সুরেলা শব্দ ভেসে আসে কিনা তা শুনবার জন্য কান খাড়া রাখলাম। কিন্তু কিছুই শুনতে পেলাম না। কখন যে ঘুমিয়ে পড়লাম জানিনা, হঠাৎ মেঘের কড়্‌কড়্ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম, এইসময় যদি বৃষ্টি নামে তাহলে শীত আরও জাঁকিয়ে পড়বে। মনে মনে ঠিক করলাম কাল পুরোহিত মশাই যখন পূজা করতে আসবেন, তখন মন্দিরে আগুন জ্বালাবার জন্য কিছু কাঠের ব্যবস্থা করতে হবে। আবার মেঘ ডাকছে গুড়্‌গুড়্ শব্দে। আকাশের অবস্থাটা কিরকম, এখনই বৃষ্টি পড়বে কিনা তা দেখার জন্য দেওয়ালে হাত দিয়ে আস্তে আস্তে দরজার উপর ঝুলানো 'বোরার' পর্দা ঈষৎ ফাঁক করে আকশের দিকে তাকালাম। ওমা! মেঘ কোথায়? নির্মেঘ আকাশ ফিকে জ্যোৎস্নার আলোতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে, নর্মদার জলও ঝিক্‌মিক্ করছে। পর্দা ছেড়ে দিয়ে আসনের দিকে ফিরতেই আবার মেঘের গুড়্‌গুড়্ শব্দ। দেয়ালে কান ঠেকালাম দেওয়াল ভেদ করেও গুড়্‌গুড়্ শব্দ অবিরত হয়ে যাচ্ছে। এই মন্দিরের

অভ্যন্তর ভাগটাই তাহলে মেঘমন্দ্র-ধ্বনিতে মুখরিত! আসনে বসেই সেই শব্দ শুনতে লাগলাম। বাংলাদেশের ছেলে আমি, মেঘের শব্দ কত যে শুনেছি তার ইয়ত্তা নেই, মেঘের ডঙ্কানাদ এবং বজ্রনাদের সঙ্গে আমার মন ও কান বিশেষ ভাবেই পরিচিত, বর্ষাকালে মেঘের সেইসব বিচিত্র ডাক শুনে শিশুকালে ভয় পেয়েছি, কৈশোরে যৌবনেও সহসা মেঘের ডাকে চমকে গেছি, তাতে আনন্দের লহর কখন খুঁজে পাই নি, কিন্তু এখন এই মন্দিরে বসে গতকাল এবং আজ যে আনন্দের স্বাদ পেয়েছি বা পাচ্ছি তার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা হয় না। শুয়ে পড়লে পাছে এই আনন্দের তান ও তাল কেটে যায় এই ভয়ে শুলাম না। বহুক্ষণ পরে মেঘমন্দ্র রূপান্তরিত হল মহাউদগীথ ওঁকার নাদে। ওঁ ওঁ ওঁ— ওঁকারের ধ্বনি করতে করতে তড়িৎ-জড়িত নর্মদার ধারা আমার প্রতিটি শিরা-উপশিরা প্রতিটি কোষকে প্লাবিত করে ছুটে চলে মস্তিষ্কের অভ্যন্তরে ঢেউ তুলছে, শুধুমাত্র এই অলৌকিক শব্দানুভূতি হলেও ত তবে কথা ছিল, এর সঙ্গে যে ওতপ্রোতভাবে (Simultaneously) সব পাগলকরা আনন্দের শিহরণও যে জড়িয়ে আছে! সময় কাল ক্ষণ পরিবেশের কথা — সব ভুলে গেলাম। ডুবে গেলাম। যখন জেগে উঠলাম, তখন বাইরে পাখীর কলরব শুনে বুঝতে পারলাম সকাল হয়ে গেছে। বিচার করতে বসে গেলাম মনে মনে। মহাউদগীথনাদ প্রকট হওয়া কি ছেলেখেলার ব্যাপার নাকি ? আমি সাধনভজনহীন লোক, আক্ষরিক অর্থেই আমি কোনদিন ধ্যান বা যোগাভ্যাস করিনি, নর্মদেশ্বর শিব বা নর্মদামায়ের উপরও আমার ষোল আনা বিশ্বাস নাই, কেবল বাবার কথায়, মানুষ যেমন দেশভ্রমণ বা পর্যটনে যায়, তেমনিভাবে নর্মদা পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়েছি। আবেগ বা উচ্ছ্বাসের বশে এসে বরং ফাঁপরেই পড়েছি। এসবই আমার মনের বিকার! অল্প বয়স থেকে বেদ, বেদান্ত, হঠযোগপ্রদীপিকা, ঘেরণ্ডসংহিতা, যোগীযাজ্ঞবল্ক্যম, শিবসংহিতা, অমনস্ক যোগ, গোরক্ষ-সংহিতা, ভর্ত্তৃহরি প্রণীত বাক্যপদীয় এবং স্ফোটবাদ প্রভৃতি পড়ে পড়ে আমি যে 'এঁচড়ে-পক্ক' দশা প্রাপ্ত হয়েছি, তার ফলেই এই নির্জন নিশীথে শিবমন্দিরে আমার অবচেতন মনে এবং মগ্নচেতনায় অর্জিত এবং আহৃত যে সব কেতাবী বিদ্যা কুণ্ডলী পাকিয়ে আছে, তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে গেল আজ! শীতকালে গর্তে যেমন সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকে, শীত চলে গেলেই গর্তের বাইরে এসে ফণা তুলে এবং যদৃচ্ছা বিচরণ করে, তেমনি অনুকূল কাল ও পরিবেশ পেয়ে আমার পুঁথিগত বিদ্যা তার মনোহারী বেশ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে।

তা হোক, তদবস্থায় আমি ত আনন্দ সম্ভোগ করেছি! যা কিছু ঘটেছে তার মূলে এই ভারভূতি বা ভারেশ্বর মহাদেবেরই মহিমা অথবা নর্মদা মাহাত্ম্য, মুণ্ডমহারণ্যের সেই মহাত্মা শোভানন্দজীর ভাষায় — নর্মদা মেঁ এ্যায়সা হোতাই হৈ!

আমি নতজানু হয়ে শিবসুন্দরকে প্রণাম করতে করতে বলতে থাকলাম —

চারুস্থিতং সোমকলাবতংশং
বীণাধরং ব্যক্তজটাকলাপং।
উপাসতে কেচন যোগিনস্তন্
উপাত্তনাদানুভব প্রমোদম॥ (দক্ষিমামূর্তিস্তোত্রম্)

যিনি মনোহরভাবে অবস্থিত, চন্দ্রকলা যাঁর শিরোভূষণ, যিনি বীণা ধারণ করে উদ্গীথ মহানাদকে মাধুর্যমণ্ডিত সুরে ব্যক্ত করছেন, যাঁর জটা কলাপ বিস্তৃত, নাদানুসন্ধান যোগদ্বারা নিত্য নন্দিত, তাঁকে কোন কোন ভাগ্যবান যোগী উপাসনা করে থাকেন। কিন্তু প্রভু আমি

ত তোমার উপাসনা করি নি, তবুও আজ যে দুর্লভ সৌভাগ্য দান করলে, এতে বিশ্বাস করতে বাধ্য হচ্ছি , তুমি আশুতোষ, তুমি বরদ। হে অহৈতুকী কৃপাসিন্ধো, তোমার শ্রীচরণে কোটি কোটি প্রণাম।

—'আট বাজ গিয়া, আভি তক আপ্ নেহি উঠা? তবিয়ত আচ্ছা হ্যায় ত'?

চমকে পিছন ফিরে দেখি পুরোহিত মশাই 'বোরার' পর্দা গুটিয়ে উপরে তুলছেন। আজ মন্দিরে বহু ভক্তের ভীড়। ব্যতীপাত যোগ — তাই সবাই পূজা দিতে এসেছেন, সবারই হাতে পূজার ডালি। পুরোহিত মশাই আমাকে একজন বুড়ীমাইকে দেখিয়ে বললেন — এ মায়ী ভগত্ লোগ্, আপ্কা লিয়ে চাপাটি বানাকর লে আয়া। আপ্কো ভোগকো লিয়ে চাপাটি ফল বেগারা রাখ দেতা হুঁ।

তিনি পূজার বসার আগেই তাঁকে এক কোণে ডেকে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম — 'ইহ্ মন্দির মেঁ আপ্ কভি আজব শব্দ শুনা'?

—'নেহি জী। তব্ মুঝে ইয়াদ্ আতি, কয় সালকি পহেলে এক সাধু ইধর ঠারতা থা। তিন রোজকা বাদ্ উহ্ পাগল হো গিয়া, মন্দর কা চারো তরফ্ উহ চিল্লাতে থে —

ফুট গয়া আসমান, শবদকী ধমক মেঁ।
লগী গগন মেঁ আগ, সুরতিকী চমক মেঁ।।

(পল্টু সাহেব, সন্তবাণী সংগ্রহ, দ্বিতীয় ভাগ)

অর্থাৎ প্রচণ্ড শব্দের তোড়ে আকাশ ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আত্মজ্যোতি ঝলসে উঠায় মনে হচ্ছে আকাশে আগুন লেগেছে!

ভারেশ্বর মন্দিরে আমার পাঁচদিন থাকা হয়ে গেল। খুব আনন্দেই কাটছে। গত দুদিন ধরে পুরোহিত মশাই আমাকে একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন — আপ্ ইধর কোঈ আজব চীজ দেখা হ্যায়? এহি মন্দর্ কা বারে মেঁ আপ্কা অনুভব ক্যা হৈ? আমি তাঁকে বুঝিয়ে বললাম — সাধারণ দৃষ্টিতে যা আজব বা অলৌকিক বলে প্রতীয়মান হয়, সেইরকম অনেক ঘটনাই প্রাকৃতিক নিয়মানুসারেই ঘটে থাকে। সাধারণতঃ যেসব ঘটনার কার্যকারণ ব্যাখ্যা আমাদের সহজ বুদ্ধিতে ধরা পড়ে না, প্রাত্যহিক জীবন যাত্রায় যে সব অভিজ্ঞতা সচরাচর আমরা লাভ করি না কিংবা আমাদের স্থূল ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা যে সব ব্যাপারের কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা নির্দেশ করতে পারি না তাকেই আমরা আজব বা অলৌকিক আখ্যা দিই। সত্য কথা বলতে কি, সম্যক জ্ঞানানুশীলন ও যোগাভ্যাসের দ্বারা আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাম বিশেযতঃ বুদ্ধিবৃত্তি সূক্ষ্ম ও পরিমার্জিত হলে অনেক অলৌকিক ব্যাপারই লৌকিকের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ে। যাদের স্নায়ুশিরা দুর্বল, রোগভোগ বা আকস্মিক ভয় উদ্বেগ উচ্ছ্বাসের ঘোরে তাদের কাছে অনেক বস্তুই অলৌকিক বলে মনে হয়, আসলে তা তাদের দুর্বল বা অজ্ঞান মস্তিষ্কের পরাকর্য প্রতিক্রিয়ার (function of the hypersensitive brain) ফলে ঘটে থাকে। আপনি আমাকে মাপ করবেন, আমি লৌকিক-অলৌকিক বিষয়ে আর কিছু বলতে পারব না।

পুরোহিত মশাই বললেন — নারাজ মৎ হও জী। ঔর আপ্কো তন্ নেহি করেগা। ভারেশ্বর মন্দর্ কা বারে মেঁ বহুৎ কিস্সা চালু হ্যায়।

আমি চুপ করে গেলাম। তিনিও সন্ধ্যারতি সেরে চলে গেলেন।

ভারেশ্বর মন্দিরে আজ সপ্তম দিন। বেলা আটটা নাগাদ পুরোহিত মশাই পূজা করতে

এসেছেন, সঙ্গে যথারীতি চব্বিশ পঁচিশজন স্ত্রী-পুরুষ, তাঁরাও এসেছেন পূজা দিতে। হঠাৎ তুবড়ী বাজাতে বাজাতে এক দীর্ঘকায় গৈরিক বস্ত্র পরিহিত সাধু, এক গেরুয়া ধারিণীকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। স্ত্রীলোকটির মাথায় জটা। পুরুষটির মাথাতেও জটা তবে তা কুণ্ডলী করে মাথায় চূড়ার আকারে বাঁধা। উভয়েরই গলায় রুদ্রাক্ষ এবং কপালে ত্রিপুণ্ড্র। পুরুষটির ডান হাতে একটি বড় কালো খরিস্ সাপ জড়ানো আছে সাপটি ফণা তুলে ফোঁস ফোঁস করছে। পূজার্থীদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য দেখা গেল। পুরোহিত মশাই তাঁকে দণ্ডবৎ জানালেন সঙ্গে সঙ্গে আর সকলেই তাঁকে প্রণাম করলেন। তবে দূর থেকে। পুরোহিত মশাই আমাকে জানালেন — ইস্ মহাত্মাকা নাম জটিয়াবাবা। এহি দো মূর্তি দশ পনের সাল হোসেঙ্গাবাদ সে নরসিংহপুর তক্ সব জাগাহ মেঁ বিচরণ করতা হৈ। হম্ ইনকো কয় দফে দর্শন কিয়া। সাঁপকো লিয়ে কোঈ ডর নেহি।

উনি ত বলছেন কোন ভয় নাই কিন্তু ভরসা ত কিছু দেখছিনে। বিষধর সাপ যার এক দংশনেই পঞ্চত্বপ্রাপ্তি, তাকে নিয়ে এক ঘরের মধ্যে রাত্রি কাটাতে হবে, এই দুশ্চিন্তা আমাকে সাময়িকভাবে চঞ্চল করে তুলল। পরে এই ভেবে মনকে দৃঢ় করলাম যে এতকাল শ্বাপদ-সঙ্কুল গহন অরণ্যে যে অদৃশ্য শক্তি পদে পদে আমাকে রক্ষা করে চলেছেন, তিনিই রক্ষা করবেন, আমি আর ভেবে কি করব?

পুরোহিত মশাই পূজা সমাপ্ত করে তিনজনের উপযোগী ফলমূলাদি রেখে ভক্তদেরকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। জটিয়াজী এবং তাঁর সঙ্গিনী গাঁজা টানতে বসলেন। আমি লক্ষ্য করলাম, উভয়েরই কানে ফট্ বা ছিদ্র আছে , তাতে পিতলের কুণ্ডল। গলায় ঔর্ণ বা রেশম সূত্রের ডুরি ঝুলছে। আমি এর আগে গোরক্ষপুর গিয়েছি, সেখানে এবং অন্যত্র গোরক্ষপন্থী কানফাট্টা যোগী বহু দেখেছি। তাঁদের গলাতেও ঐ রকম ঔর্ণসূত্রের ডুরি ঝুলানো থাকে, তার সাম্প্রদায়িক নাম — সেলি। তবে তাতে দু'তিন অঙ্গুলি পরিমিত কাঠের বাঁশীর মত একটি যন্ত্রও বাঁধা থাকে তার নাম — নাদ। বিশুদ্ধ গোরক্ষপন্থী বা কানফাট্টারা বিশ্বাস করেন যে, ইন্দ্রিয়বৃত্তি নিরুদ্ধ করে মনকে অন্তর্মুখ করতে পারলে হৃদয়ে অনবরত যে একতান প্রণবনাদ বা অনাহতনাদ ঝঙ্কৃত হচ্ছে তা শুনতে পাওয়া যায়। ভিতরের সেই নাদে মনকে সমাকৃষ্ট করার জন্য হৃদযন্ত্রের উপর অর্থাৎ বক্ষোদেশে নাদটি ঝুলিয়ে রাখার বিধান। জটিয়াজীর বা তাঁর ভৈরবীর গলায় সেলি দেখতে পেলাম বটে তবে নাদ দেখতে পেলাম না। আর একটি তফাৎ চোখে পড়ল — কানফাট্টা বা গোরক্ষপন্থীদের কানের ছিদ্র অনেক বড় থাকে, তাতে পিতল রূপা বা দস্তার কুণ্ডল থাকে না, তাঁদের কুণ্ডল সাধারণতঃ সাদা পাথর, বেলোয়ার বা গণ্ডারের শিং দিয়ে তৈরী হয়। তার নাম 'মুদ্রা' বা 'দর্শন'। এইজন্য কানফাট্টাদের অপর নাম — দর্শনযোগী। দীক্ষার সময় গুরু এই মুদ্রা নাদ বা সেলি শিষ্যকে দিয়ে থাকেন। গোরক্ষপন্থী এবং কানফাট্টারা নিজের গুরু বা যে কোন দেবতা বিশেষতঃ শিবকে প্রণাম করার সময় নাদে ফুঁ দিয়ে প্রণবধ্বনি করেন এবং বলতে থাকেন —'আদেশ', 'আদেশ'। এই সাধু এবং তাঁর ভৈরবী যখন ভারেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করলেন, তখন দেখলাম তাঁরা নেচে নেচে তুবড়ী বাজিয়ে নতশিরে সাপটি শিবলিঙ্গে ছোঁয়ালেন মাত্র, 'আদেশ' উচ্চারণ করলেন না।

ভৈরবী মা তাঁদের উভয়ের ঝোলাঝুলি কম্বলাদি মন্দিরে রেখে এসেই জটিয়াজীকে বললেন — অম্রুত কেলা যাস্তি হ্যায় লেকিন্ চাপাটি পাঁচগো। ইসমে হম লোক্কা ক্যা

হোগা? রোটি পাকাউ? জটিয়াজি সম্মতি দিতেই তিনি নিজেদের ঝোলা থেকে জোয়ার বাজরার আটা বের করে কাঠ জ্বেলে ভোজন বানাতে বসে গেলেন। আমি সাহস করে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম — আপ্ লোগ কানফাট্টা হ্যা।

—'নেহি জী। হমলোগ্ কানিপা যোগী হুঁ। শিউজী ঔর গোরক্ষনাথজীকো হম্লোগ বহোৎ মানতা হুঁ, হম্লোগ গোরক্ষপুর গদীমে যাকর দীক্ষা লেতা হুঁ, লেকিন্ 'নাদ' নেহি লেতে হুঁ। শিউজীকা সবসে বড়া চিহ্নৎ সর্পরাজকো হমলোগ হরবখৎ অঙ্গমেঁ ধারণ করতা হুঁ। কানফাট্টা বেগারা সর্পরাজ দেখনেসে বেঁহোস হো যাবেগা। উনলোগকা এত্না হিম্মৎ নেহি হৈ।'

হিম্মৎই বটে ! এইসব সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামী নিয়ে হিম্মৎওয়ালার সঙ্গে আর কোন উচ্চবাচ্য করতে সাহস হল না। আমি স্নান করতে গেলাম।

স্নান করে এসে পূজায় বসলাম। পূজা করে এসে দেখি তাঁদের 'রোটি পাকানো' হয়ে গেছে। ভোজনের জন্য প্রস্তুত হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। পুরোহিত মশাই-এর রেখে যাওয়া ফলমূল চাপাটি ইত্যাদি এনে ভৈরবী মা আমাদের দুজনকে খেতে দিলেন, নিজেও বসলেন। আমাকে পেটভরে খাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। মায়ের জাত, সর্বাবস্থাতে মা-ই থাকেন। তিনি বৈরাগিনী সন্ন্যাসিনী ভৈরবী যে বেশই ধারণ করুন না কেন, খেতে দিবার সময় মাতৃহৃদয়ের লক্ষণ তাঁদের মধ্যে ধরা পড়ে যায়। তাঁর আদর যত্ন দেখে অনুভব করলাম — স্ত্রী জাতির ব্যহ্যিক বেশ যাই হোক, অন্তরে তাঁরা অনাদিকালের মা।

খাবার পর, বেলা তখন দুটা আড়াইটা হবে, মন্দিরের চত্বরে যেখানে রোদ পড়েছে সেখানে তিনজনেই বসে আছি, ভৈরবী মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — 'কলকাত্তা ক্যাত্না বড়া শহর, জব্বলপুর কা তরহ্, ইয়া, হোসঙ্গবাদ কা তরহ্', আর জটিয়াজী মৌজ করে গাঁজা টানছেন, আমি কৌতূহলবশে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে ফেললাম — আচ্ছা, আপনি যে সাপটাকে হাতে জড়িয়ে রাখছেন, তার কি বিষের থলি নষ্ট করে আগেই বিষ দাঁত উপড়ে ফেলা হয়েছে?

প্রশ্ন করা মাত্রই তড়াক্ করে দাঁড়িয়ে উঠে বললেন — ক্যা আপ মুঝে মদাড়ীবালে (সাপুড়ে) সমঝতে হো? এই বলে দৌড়ে মন্দির থেকে ঝাঁপি নিয়ে এসে সাপটাকে বের করে 'লেও সোহাগিন্ মেরে পেয়ার' এই বলে ভৈরবীমার বাঁ হাতটা টেনে সাপটাকে খোঁচা মারলেন, চোখের নিমেষে কালসর্প তার লক্লকে ফণা বের করে ছোবল দিয়ে বসল। সমস্ত ব্যাপারটা এমন আচমকা ঘটে গেল যে আমি ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গেলাম।

দুমিনিটের মধ্যেই ভৈরবী মা থরথর করে কাঁপতে লাগলেন। আমি তাঁকে ধরে শুইয়ে দিলাম। বিষের জ্বালায় তিনি ছটফট করতে করতে ক্রমে স্থির হয়ে গেলেন। শরীর ক্রমশঃ নীল হয়ে আসছে, চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে পড়ার উপক্রম হল। 'তুম্ খুনী হ্যায়, বদমাস হ্যায়, তুমকো পুলিশকো হাবালা মেঁ দেনা ঠিক হ্যায়' ইত্যাদি যা আমার মনে এলো তাই বলে গালাগালি দিতে লাগলাম। জটিয়াজী সাপটাকে ঝাঁপিতে ভরে হাসতে হাসতে গিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন, তারপর সাশ্রুনয়নে মন্ত্র পড়তে পড়তে বেরিয়ে এসে একটা ছোট্ট কালো পাথর দষ্টস্থানে জেঁকে বসিয়ে দিয়েই বলতে লাগলেন — নমস্তে নর্মদে তুভ্যং ত্রাহি ত্রাহি মাতঃ বিষসর্পতঃ। গুরু গোরখ গুরু গোরখ্। ওঁ রুদ্র হাসন্তি, বিষ্ণু জপন্তি, রেবা রুখন্তি, মূলে রেবা

মধ্যে রেবা, ওঁ হর হর ভারেশ্বর মহাদেও।

প্রায় পনের মিনিট ধরে মন্ত্র পড়ার পর ভৈরবীমার চোখমুখ স্বাভাবিক হয়ে আসল, জটিয়াজী একটা কৌটা হতে এক চিমটি চূর্ণ নিয়ে তাঁর মুখের ভিতর আমাকে ঢেলে দিতে বললেন। দুঘন্টার মধ্যে তাঁকে সুস্থ হয়ে উঠতে দেখলাম। তিনি নিজেই হেঁটে গিয়ে মন্দিরে শুয়ে পড়লেন। জটিয়াজী আমাকে বললেন — ক্যা মন্ত্রকী প্রভাব দেখা? মন্ত্রকী প্রভাব সে হমলোগ্ সর্পরাজকো আপনা বশমেঁ দাবা দেতা হুঁ। গুরু গোরক্ষনাথজীকা দয়া।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। আমিও নিজের আসনে গিয়ে বসলাম। পরে কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। আজকের এই ঘটনা মনকে ভীষণ বিচলিত করেছে। কিছুতেই ঘুম এল না, বিশেষতঃ জটিয়াজী ও ভৈরবীমায়ের নাসিকা গর্জনে কেউ তাঁদেরকে এক ঘরে নিয়ে ঘুমাতে পারবে সাধ্য কি ? মনে মনে স্থির করলাম, রাত্রি প্রভাত হলেই এস্থান ত্যাগ করে আবার পথে বেরিয়ে পড়ব।

সকালে উঠেই প্রচণ্ড শীতের মধ্যেই স্নান করে পূজায় বসে গেলাম, পুরোহিত মশাই এলেই যাতে বিদায় নিতে পারি। সারাদিন আবার অনির্দিষ্ট অজানা পথে পাড়ি দিতে হবে। কানিপা যোগী-যোগিনী তখনও ঘুমাচ্ছেন। গাঁঠরী কম্বল বেঁধে প্রস্তুত হয়ে থাকলাম। যথারীতি সকাল আটটায় পুরোহিত মশাই এলেন, একে একে পূজার্থীরাও আসছেন, তাঁরাও ঘুম থেকে বাইরে এসে বসলেন। আমি প্রাণভরে ভারেশ্বর মহাদেবকে প্রণাম করে সকলকে দণ্ডবৎ জানিয়ে বিদায় নিলাম। পুরোহিত মশাই বললেন —'হিঁয়াসে সিরিফ তিনি মিল চলনেসে আপ্ নরসিংহপুর জেলা অতিক্রম করকে হোসঙ্গাবাদ জেলামেঁ ঘুসেঙ্গে'।

নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে হেঁটে চললাম উত্তরতট ধরে। বিন্ধ্যপর্বতের ঢাল নেমে এসেছে নর্মদার তীর পর্যন্ত। তার ফলে কোথাও কোথাও রাস্তা সংকীর্ণ এবং খারাপ হলেও মোটামুটি উপত্যকা অঞ্চলের রাস্তা ভাল। আধঘন্টার মধ্যেই আমি নরসিংহপুর জেলা অতিক্রম করে হোসেঙ্গাবাদ জেলায় প্রবেশ করলাম। মধ্যাহ্নে একটি শিবমন্দিরে পৌঁছলাম। উঁকি মেরে দেখলাম মন্দিরের মধ্যে জল, নর্মদা এখানে বেশ চওড়া, নর্মদার ঢেউ-এর জলই হয়ত মন্দিরের মধ্যে ঢুকেছে। যাই হোক কিছু মিছরী নর্মদাকে নিবেদন করে তাই প্রসাদ পেলাম। ভাবলাম নর্মদাতীরের মন্দিরে শিবহীন শিবমন্দির থাকতেই পারে না, হয়ত কোন কুণ্ড আছে তার মধ্যেই শিব আছেন। ভারতের বহুস্থানেই এইরকম দেখেছি, যেমন মেদিনীপুর জেলার কর্ণগড়ের মহামায়ার মন্দিরে সিদ্ধিনাথ, দীঘার নিকট চন্দনেশ্বর এবং পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিমে লোকনাথ শিব, তাঁদের লিঙ্গরূপ চোখে দেখা যায় না, জলে ঢাকা আছে। ভাবলাম, চোখে না দেখা গেলেই বা ক্ষতি কি ? অষ্ট প্রকৃতিই যাঁর অবয়ব, সর্বব্যাপ্ত সেই নিরঞ্জন পুরুষ এখানেও বিরাজিত। প্রণাম করেই হাঁটতে লাগলাম, ধারে কাছে কোন লোক দেখতে পেলাম না, যাতে সন্দেহ ভঞ্জন করতে পারি।

একটু পরেই নর্মদার এপারে ওপারে বহু শিবমন্দির চোখে পড়ল। দূরে দূরে বহু বসতি গড়ে উঠেছে, তাদের কাঁচাপাকা বাড়ী, মরাই, গোয়াল সবই দেখা যাচ্ছে। পথের ধারে দলে দলে গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, চরে বেড়াচ্ছে। তাদের 'দেখভাল' করার জন্য আছে লাঠি হাতে রাখাল বালকের দল আর বড় বড় কুকুর। মাঠে ফসল কাটা হচ্ছে। দু'চার জন লোককেও পথে দেখলাম। তাদের কাছে জানলাম আমার এই পরিক্রমার রাস্তা থেকে অর্থাৎ

নর্মদার তট হতে আধমাইলটাক দূরেই সরকারী বাঁধ আছে, দু'মাইল দূরে বাস চলাচলের পাকা রাস্তাও আছে। সেই রাস্তাতেই মানুষজন চলাচল করে। স্থানে স্থানে ফেরিঘাট আছে। সাধারণ লোক ফেরিঘাটে নৌকায় নর্মদা পেরিয়ে এপার-ওপার যাতায়াত করে।

দ্রুততালে হাঁটার ফলে গা গরম হয়ে উঠেছে। বেলা তিনটা নাগাদ নর্মদার দক্ষিণতটের সাতপুরা পর্বতমালার শীর্ষদেশে চোখ পড়তে বিস্ময়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম — আটপৌরে চলতি ভাষায় যাকে বলে 'থ' হয়ে গেলাম। একবার ডানদিকে নীল আকাশের গায়ে বিন্ধ্যপর্বতমালার বাদামী-ধূসর আলিম্পন, আর একবার বামদিকে সাতপুরা পর্বতমালার রূপালী আলিম্পন, সূর্যরশ্মি পড়ে তা ঝলমল করছে। কি মূর্খ আমি! এ দৃশ্য এতক্ষণ আমি চোখ মেলে দেখি নি! এই অপরূপ দৃশ্য দেখতে যদি দু'মিনিট সময় না ব্যয় করি, তবে বিধাতা প্রদত্ত এই চোখ দুটোর সার্থকতা কি?

বেলা অনেকখানি বেড়ে গেছে বলে মনে হচ্ছে , কেননা প্রায় পাঁচটা বাজতে চলল, এখনও সূর্য সম্পূর্ণতঃ অস্ত যায় নি। এখনও পথঘাট, পাহাড়, পাহাড়ের গাছপালা সব স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি। অবশেষে গুলজা গ্রামে এসে পৌঁছে গেলাম। ছোট ছোট ছেলেরা একটা খেলার মাঠে খেলা করছিল ছোট একটা বল নিয়ে। একজন লোক তাদেরকে খেলা ছেড়ে ঘরে ফিরতে তাড়া দিচ্ছে — 'অব বস্ করো জী। খেলা ছোড়কে ঘর মে চলো।' খেলা ছেড়ে ঘরে ফেরাই ত আসল কথা, লাখ কথার এক কথা। একবার একটি ধোপা মেয়ে তার বাবাকে বলছিল — 'বেলা গেল, বাস্‌নায় আগুন দাও' — সেই কথা শুনেই লালাবাবুর মনে তীব্র বৈরাগ্যের উদয় হল, তিনি সঙ্গে সঙ্গে অগাধ ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বৃন্দাবনে গিয়ে ভজনে ডুবে গেলেন। আমি ত আর লালাবাবু নই, কাজেই ছেলেদের প্রতি লোকটির উক্তি যতই গভীর অর্থবহ হোক না কেন, আমার মনে ভাবান্তর ঘটল না। আমার এখন রাত্রির জন্য আশ্রয় প্রয়োজন, বিশ্রাম প্রয়োজন। লোকটির কাছে তারই সন্ধান চাইলাম। তিনি বললেন — আধা ঘন্টা চলনেসে আপ্ গোদারিয়া সংগম গুলজারীঘাটমেঁ পঁহুজ যায়েগা। উধর মন্দির ভি হ্যায়, পরিক্রমাবাসীয়োঁ কে লিয়ে আচ্ছা ইন্তেজাম ভি হ্যায়।

—'ইধর কোঈ মন্দির নেহি হ্যায়? হম্ বহোৎ থক্ গিয়া।'

— হমারা ছোটিসি মহল্লামেঁ মন্দির নেহি হ্যায়, কেঁওকি গুলজারীঘাট বহোৎ নজদিগ্ হ্যায়, উধর শিউজীকা আচ্ছা মন্দির হ্যায়, হম্‌লোগ্ উধরই পূজা করতা হুঁ। তব্ চলিয়ে ঠাড়েশ্বরী মহারাজ কা পাশ, উনকা কোঠিমেঁ জাগাহ্ মিলেগা। মিনিট তিনেক হেঁটে নর্মদার ধারে ঠাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে পৌঁছে গেলাম। দেখলাম, একটি আমলকী গাছের কাছে এক ছয় ফুট দীর্ঘদেহী সন্ন্যাসী দাঁড়িয়ে আছেন। ছোট ছোট চারাগাছকে গরু ছাগলের গ্রাস হতে রক্ষা করার জন্য কাঠ বা বাঁশের যেমন কুণ্ডল দিয়ে ঘিরে রাখা হয় সেইরকম এক কাঠের কুণ্ডলের মাঝখানে ঠাড়েশ্বরী মহারাজ দাঁড়িয়ে আছেন। নগ্ন গাত্র, কোমরে জড়ানা আছে একটুকরো গৈরিক বস্ত্র। অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন নর্মদার দিকে। মৃদু কণ্ঠে জপ করে চলেছেন সেই একই নাম, মহানাম — রেবা, রেবা, রেবা। আমলকী গাছের ডালে আকাশ প্রদীপের মত আট দশটা প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ ঝুলছে। সেই আলোতে দেখলাম — পাশাপাশি দুটি কুটির আছে।

আমার সঙ্গী লোকটি 'গোড় লাগি মহারাজ' বলে সশব্দে যুক্তকরে প্রণাম করতেই সেই

শব্দ শুনে কুটির থেকে একজন গেরুয়াধারী বেরিয়ে এলেন। তিনি লোকটির কাছে আমি আশ্রয়প্রার্থী জেনে আমাকে দ্বিতীয় কুটিরটিতে থাকবার ব্যবস্থা করে দিলেন। কথায় কথায় জেনে নিলাম এই সাধুর নাম বিন্ধ্যেশ্বরী, তিনি ঠাড়েশ্বরী মহারাজের শিষ্য এবং সেবক। ঠাড়েশ্বরী মহারাজকে কেউ কেউ খাড়েশ্বরী মহারাজ বলেও সম্বোধন করে থাকেন। এই গুলজা গ্রামে নর্মদাতীরে তিনি এইরকম দাঁড়ানো অবস্থাতেই কুড়ি বছর ধরে তপস্যা করছেন, কেউ কখনও তাঁকে এই রকম দণ্ডায়মান অবস্থা ছাড়া বসা বা শোয়া অবস্থায় দেখে নি, দিবারাত্র সঙ্গে থেকে তিনিও দেখেন নি। ঐ রকম অবস্থাতেই তিনি শৌচাদি এবং ভোজনকর্মাদি সেবকের সাহায্যে করে থাকেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজীর সঙ্গে নিতান্ত প্রয়োজনে দু'একটা কথা ছাড়া আর কারও সঙ্গে কোন কথাবার্তা বলেন না। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, সর্ব ঋতুতে তিনি নগ্নগাত্রে দাঁড়িয়ে থেকে নিরন্তর রেবা মন্ত্র জপ করে চলেছেন।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্লুত কণ্ঠে সাগ্রহে আমাকে জানালেন — মেরে গুরুজীকে পাশ সবকুছ ঋদ্ধি-সিদ্ধি হ্যায়। দেহাত সে বহোৎ আদমী ইধর আতা হৈ মাথা টেকতা হৈ ঔর চলা যাতা হৈ। ব্যাস্, ইসীসে উনলোগোঁকা দিল্ কা বাসনাকি পূর্তি হো জাতা হৈ। অপ্ ইধর আজ্ আয়েঙ্গে, এবাত্ পহেলেসে উনোনে বাতা দিয়া হৈ। ইসি ওয়াস্তে এ কামরা ভি আপ্‌কো লিয়ে খালি করকে র‍্যাখ্যা হৈ।

এই কথা শুনে আমি খুবই অবাক হলাম। বিন্ধ্যেশ্বরীজীকে জিজ্ঞাসা করে আরও জেনে নিলাম যে এই দুটি কুটির গুণমুগ্ধ গ্রামবাসীরাই তৈরী করে দিয়েছেন। একটিতে তিনি নিজে থাকেন, কুটিরের বারান্দাতে রান্নার কাজ হয়, অপর কুটিরটিতে ক্বচিৎ দু'চারজন আগন্তুক অতিথি (এই যেমন আমি এসেছি) এলে তাঁরা থাকেন। পরিক্রমাবাসী সাধুরা সাধারণতঃ আধমাইল দূরের গোদারিয়া নদীর সংগম গুলজারী ঘাটে গিয়ে থাকতে ভালবাসেন। কারণ সেখানে মন্দির সদাব্রত সবই আছে।

বিন্ধ্যশ্বরীজী এক হাঁড়ী গরমজল দিলেন। ভাল করে মুখ-হাত ধুয়ে বিছানা পেতে শুয়ে পড়লাম। ক্ষুধায় পেট চুঁই চুঁই করছে, ক্ষুধার চোটে বিছানায় উঠে বসলাম, পেট ভরে জল খেয়ে আবার শুলাম। সারাদিন পথ চলার পরিশ্রমে ঘুম আসতে দেরী হল না। কিন্তু শেষরাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। কুটিরের দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসে আমলকীতলায় গিয়ে ঠাড়েশ্বরী মহারাজ কি করছেন, তা দেখবার আগ্রহ বা দুষ্ট বুদ্ধি মাথায় এল। গিয়ে দেখি তিনি একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন, গাছের ডালে প্রদীপগুলো নিভে গেছে। কম্বল মুড়ি দিয়েও কনকনে ঠাণ্ডায় ঠকঠক করে কাঁপছি, আর মহাত্মা নগ্নগাত্রেই তাঁর তপস্যা করে চলেছেন। একেই বলে উগ্র তপস্যা। নর্মদামাতার কৃপা এঁরা পাবেন না, ত কারা পাবেন? চিন্তা করতে করতে কুটিরে এসে আবার ঘুমিয়ে পড়লাম।

ঘুম যখন ভাঙল, তখন অনেক বেলা হয়ে গেছে। দেখলাম, ঠাড়েশ্বরী মহারাজ সেই একইভাবে দণ্ডায়মান। বিন্ধ্যেশ্বরীজীর কাছে জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম যে আজ ২রা ফাল্গুন অর্থাৎ গতকাল ১লা ফাল্গুন হোসেঙ্গেবাদ জেলায় এসে পৌঁছেছি। পরিক্রমা শুরু করা থেকে চারমাস কেটে গেছে। শৌচাদি সেরে স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি সেরে আসার সময় দেখি প্রায় দশজন ভক্ত ভেট নিয়ে ঠাড়েশ্বরীজীকে প্রণাম করে নিজেদের আপন আপন সমস্যার কথা নিবেদন করছেন। মাহত্মা কোন উত্তর দিচ্ছেন না, নির্নিমেষনেত্রে নর্মদার দিকে

তাকিয়ে আছেন। কিন্তু নিজেদের কথা নিবেদন করেই ভক্তদেরকে সন্তুষ্ট দেখছি, দরবারে যখন পেশ করা হয়েছে তখন তাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধি হবেই এই অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসে তাঁদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী ভক্তদের আনা ফলমূল, বাজরা, জোয়ার, দুধ ইত্যাদি তিনজনের উপযোগী রেখে দিয়ে বাকী সব প্রসাদ হিসাবে বিলিয়ে দিলেন। নর্মদাশ্রয়ী সাধুর কোন বস্তু সঞ্চয় করে রাখতে নাই, সেই বিধি কঠোরভাবে এখানে মানা হচ্ছে। আমি গোদারিয়া নদীর সংগম গুলজারী ঘাট দেখতে যাবো, বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমার সঙ্গে যেতে পারবেন কিনা জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, — দুপহরমেঁ ভোজন কে বাদ আপ্‌কা সাথ চলুঙ্গা।

মধ্যাহ্নের পূর্বেই ভোগ প্রস্তুত হয়ে গেল। বিন্ধ্যেশ্বরীজী অত্যন্ত যত্নসহকারে তাঁর গুরুদেবকে রুটি, ফল, দুধ একটু একটু করে মুখে তুলে দিলেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি তা ভোজন করলেন, কুটিরের দ্বারে বসেই আমি সব লক্ষ্য করলাম। ভোজন পর্বের সময়েও দেখলাম, দৃষ্টি তাঁর নর্মদার দিকেই ন্যস্ত। একইভাবে ক্রমাগত দাঁড়িয়ে থাকলে যে কোন লোকেরই দু'পা অসাড় হয়ে যাবার কথা, ফুলে যাবার কথা, কিন্তু সত্তর বৎসর বয়স্ক ঠাড়েশ্বরী মহারাজের শরীর বয়সের তুলনায় অনেক সতেজ, অনেক সুস্থ এবং অনেক বলিষ্ঠ বলে মনে হল।

খাওয়াদাওয়ার পর দুজনেই বেরিয়ে পড়লাম গুলজারীঘটের উদ্দেশ্যে। নর্মদার এ অঞ্চলে বিরাট প্রসার। প্রায় বার চৌদ্দ মিনিট হেঁটে গোদারিয়া নদীর সংগমে এসে পৌঁছে গেলাম। বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশে থেকে প্রবল বেগে একটি ছোট নদী প্রবাহিত হয়ে এসে নর্মদাতে মিশেছে। সংগমস্থলেই এক শিবমন্দির। সেখানে এক মহাত্মা বসে জপ করছেন। মন্দিরে কোন দরজা নাই। শিব এবং সাধুকে প্রণাম করে আমরা গুলজারী ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। এখানেও একটি শিবমন্দির। এই মন্দিরটি বিশাল, তার সুউচ্চ শীর্ষদেশে একটি বড় পিতলের কলস. সোনার মত ঝকঝক করছে, কলস ভেদ করে পিতলেরই এক ধ্বজাও শোভা পাচ্ছে। এখানে কিছু সাধু সন্ন্যাসী ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ বা মন্দির জপ করছেন। একটু দূরেই পরিক্রমাবাসীদের জন্য সদাবর্ত। মন্দিরের দরজা বন্ধ। আমরা শিবের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে মন্দিরে চত্বরেই বসলাম।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী বলতে লাগলেন — এই গুলজারীঘাট বা আমাদের গুলজা গ্রাম হোসেঙ্গেবাদ ও শিহোর — এই দুই জেলার সীমান্ত বা সন্ধিস্থলে অবস্থিত। শিহোর জেলার সীমা শেষ হয়ে হোসেঙ্গাবাদ জেলা শুরু হচ্ছে কিংবা হোসেঙ্গাবাদ জেলা শেষ হয়ে শিহোর জেলা শুরু হচ্ছে — এই রকম সীমান্ত স্থান এটি । নর্মদার বিচিত্র গতিপথের জন্যই এইরকম অবস্থা। নর্মদার ওপারে দক্ষিণতটের দিকে তাকিয়ে দেখুন ঐ যে সুন্দর বাঁধানো ঝকঝকে ঘাট দেখতে পাচ্ছেন, ঐ ঘাটের নাম — শেঠানীঘাট। জানকীবাঈ শেঠানী নামে ধনাঢ্য মহিলা নর্মদামাতার কৃপা লাভ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করে ঐ বিশাল ঘাট বাঁধিয়ে দিয়েছেন। হোসেঙ্গেবাদ শহরের সবচেয়ে সুন্দর ঘাট ঐটি। ঐখানে পাশাপাশি যে অনেকগুলি মন্দিরের চূড়া দেখতে পাচ্ছেন তার একটি নর্মদা মন্দির, একটি শিব মন্দির, একটি বিষ্ণু মন্দির এবং একটি হনুমান মন্দির। এখান থেকে ভাল করে দেখা যাচ্ছেনা, ঐ মন্দিরগুলোর আড়ালে আরও দু-তিনটা মন্দির আছে। ঘাটের পিছনেই মূল শহর। নর্মদা মন্দিরে নর্মদামায়ীর পূর্ণাবয়ব শ্বেতপাথরের মূর্তি দেখতে বড় সুন্দর। হোসেঙ্গেবাদে স্কুল, দোকান, বাজার তিন-চারটা ধর্মশালা এবং দুটো

বড় সদাবর্ত আছে, সেইজন্য দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা করার সময় দলে দলে পরিক্রমাবাসী ঐ হোসেঙ্গাবাদে আশ্রয় নেন, নিজেদের জপতপ করেন। ঐ হোসেঙ্গাবাদ শহর থেকেই বারমাইল দূরে কোকসর গ্রামে নর্মদাবাসী প্রসিদ্ধ মহাত্মা গৌরীশংকর ব্রহ্মচারীজীর সমাধি মন্দির আছে। কমলভারতীজীর পর তিনিই হাজার হাজার সাধুর জমায়েৎ নিয়ে 'নর্মদা' পরিক্রমারূপ তপস্যাকে জনপ্রিয় করে তোলেন। হোসেঙ্গাবাদের পশ্চিমদিকে কোকসর আর পূর্বদিকে আট-দশ মাইল গেলেই পাবেন বাঁদরাভান। সেখানে বৈদিক দেবতা বৈশ্বানর বা অগ্নির তপস্যাক্ষেত্র আছে। বৈশ্বানর নামে এক রাজাও সেখানে তপস্যা করেছিলেন। বাঁদরাভান প্রসিদ্ধ নর্মদা তীর্থ। আপনি উত্তরতট দিয়ে পরিক্রমা করছেন কাজেই এখন ত আপনার নর্মদা লঙ্ঘন করে দক্ষিণতটের ঐসব স্থানে যাবার উপায় নাই। রেবাসংগমে পৌঁছে যখন দক্ষিণতট দিয়ে ফিরবেন, তখন অতি অবশ্যই হোসেঙ্গাবাদের ঐসকল স্থান পর্যটন করবেন, আগে থেকে আপনাকে অনুরোধ করে রাখলাম। আপনাকে বিশেষ করে অনুরোধ করছি এই জন্য যে ঐস্থান এমন একজন নর্মদামায়ীর কৃপাসিদ্ধ মহাত্মার চরণস্পর্শে ধন্য যে, প্রায় তিনশ বৎসর পূর্বে তাঁর আবির্ভাব ঘটলেও তাঁর তপস্যার তেজে এখনও ঐখানকার পরিমণ্ডল তপস্বীকে আধ্যাত্মিক পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করে, একথা আমার পূজনীয় গুরুদেব ঠাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে শুনেছি, অন্যান্য পরিক্রমাবাসীরা আরও বেশী করে ঐখানে নিজেদের গরজেই গিয়ে থাকেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম — কে সেই মহাত্মা যিনি তিনশ বৎসর আগে আর্বির্ভূত হয়েও এতকাল ধরে পরিক্রমাবাসী সাধুদেরকে প্রভাবিত করতে পারছেন? তাঁর নাম কি?

বিন্ধ্যেশ্বরীজী বললেন — তাঁর নাম ছিল রামজী। হোসেঙ্গেবাদ হতে মাইল পাঁচেক দূরে ঘানাবড় গ্রামে এক চাষীর ঘরে তাঁর জন্ম হয়েছিল। লেখাপড়ায় তাঁর মন ছিল না। পূর্বজন্মের সংস্কার ও সুকৃতিবশে তিনি শিশুকাল হতেই ভগবানের নাম ভজন করতে ভালবাসেন। সমবয়সী সাথীদের সঙ্গে খেলাধূলা করতেও তাঁর মন বসত না। খেলতে গেলেই দেখা যেত, যখন অন্য বালকরা খেলার আনন্দে মেতে আছে, এক ফাঁকে রাম একধারে সরে গিয়ে একখণ্ড পাথর বা নুড়িকেই ফুল দিয়ে সাজাচ্ছে, পূজা পূজা খেলছে। হোসেঙ্গাবাদে এখনও যেমন, সেযুগেও তেমন সাধু-মহাত্মাদের ভীড় লেগেই থাকত। তখন অবশ্য হোসেঙ্গাবাদ নাম ছিল না, এর নাম ছিল নর্মদাপুর। সাধু মহাত্মা দেখলেই রাম লুকিয়ে তাঁদের কাছে চলে যেত। পরিক্রমাকারী সাধুরা প্রায় প্রত্যেকেই রেবা রেবা জপ করে থাকেন। তাই দেখে বালক রামও রেবা রেবা জপ করত। একবার রামের বয়স যখন দশ বা এগারো, তখন কতকগুলি বোরার উপর গম ও বাজরা রোদে মিলে দিয়ে, যাতে পাখী বা গরু বাছুর এসে তা খেয়ে না যায়, তা পাহারা দিবার জন্য তাঁর বাবা সেখানে বসে থাকতে বলেন। বাড়ীর সমর্থ স্ত্রী, পুরুষ সকলেই নিজেদের ক্ষেতিতে কাজ করতে চলে যান। দুপুর বেলা তাঁরা ফিরে এসে দেখেন একপাল পাখী মনের সুখে গম বাজরা খাচ্ছে, একটা বাছুরও গোগ্রাসে গিলে যাচ্ছে। রামজী হাসতে হাসতে ছড়া কাটছেন — রেবাকো চিড়িয়া রেবাকো গেহু,
রেবাকো চীজ্ রেবাকো দেহুঁ।

তাঁর বাবা রাগে দৌড়ে এসে রামজীর গালে এক থাপ্পড় মারলেন। রামজী অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। হুঁশ কিছুতেই হয় না। প্রায় সন্ধ্যাকালে জঙ্গল থেকে এক সাধু এসে তাঁর কানে

রেবামন্ত্র শোনালেন। রামজীর জ্ঞান এলো। তিনি তাঁর বাবাকে বলে গেলেন, এই ছেলেকে দিয়ে তোমার সংসারের কোন কাজ হবে না। একটি আলাদা কুটির করে দিয়ে একে ভজনেই মেতে থাকতে দাও। কিন্তু সংসারী লোক প্রাণ থাকতে কি বিষয়ে নির্লিপ্ত থেকে ভগবানকে ডাকার উপদেশ মেনে নিতে পারে? বিশেষ করে পিতৃহৃদয়ের উদ্বেগ শতগুণ। দুদিন পরে তাঁর মৃত্যু হলে কে তাঁর এই পাগল ছেলেটাকে দেখবে? তাই তিনি রামজীকে কিছু ক্ষেতি কাজ শিখাবার জন্য অনেক আদর করে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এক দিন মাঠে লাঙ্গল করাতে নিয়ে গেলেন। কিন্তু একপাক লাঙ্গল ঘুরিয়ে যেই দেখলেন লাঙ্গলের ফালে রক্তের দাগ, সঙ্গে সঙ্গে রামজী লাঙ্গল ফেলে জঙ্গলের দিকে দৌড়াতে লাগলেন। অনেক খুঁজে পেতে তাঁর বাবা-মা খুঁজে পেলেন নর্মদার ধারে। উভয়ে কাঁদাকাটা করে তাঁকে কোনো মতে ফিরিয়ে আনলেন ঘরে। অনেক ভেবেচিন্তে অবশেযে তাঁর বাবা তাঁকে একটি পৃথক কুটির করে দিয়ে একটি তামাকের দোকান করে দিলেন। কুটিরের দাওয়ায় তামাক পাতার বাণ্ডিল আর একটি দাঁড়িপাল্লা এবং বাটখারা পড়ে থাকত। তামাক পাতা বিক্রয়ের দিকে রামজীর মন ছিল না, তিনি কুটিরের মধ্যে বসে ভজনেই মেতে থাকতেন। পাশাপাশি মহল্লার লোকেরা তামাক পাতা কিনতে এসে নিজেরাই ওজন করে যে যার প্রয়োজন মত তামাক নিয়ে দাম সেখানেই রেখে যেত। এই ভজনানন্দী মানুষটাকে কেউ ঠকানোর কথা চিন্তাও করত না। একবার এক খরিদ্দার দুষ্টবুদ্ধিবশে এক সের তামাক নিয়ে আধ সের তামাকের দাম রেখে চলে গেল। বাড়ী গিয়ে দেখল তামাক পাতা অর্ধেক হয়ে গিয়েছে। সে ছুটে এসে রামজী বাবার পায়ে লুটিয়ে পড়ল। সেই থেকে মহল্লাবাসীরা ধীরে ধীরে তাঁর গুণমুগ্ধ ভক্তে পরিণত হতে লাগল। একবার নর্মদায় প্রচণ্ড বান এল। সেই 'বাঢ়মেঁ' সবকিছু ভেসে গেল। বানের প্রচণ্ড তোড়ে ঘানাবড় গ্রাম এবং অনেক মহল্লাই জলে ডুবে গেল। গরু মহিষ যে কত ভেসে গেল তার ইয়ত্তা নাই। মহল্লার লোকজন বাড়ীঘর ফেলে পাহাড়ে উঠে কোন মতে আত্মরক্ষা করল। বানের জল সরে যেতে চারদিক থেকে ভক্তরা রামজীর খোঁজ নিতে এলেন। তাঁরা দেখে অবাক হলেন, চারিদিকে থৈ থৈ করছে শুধু জল আর জল, মাঝখানে রামজীর কুটিরটি শুধু জেগে আছে। তাঁর সেই ভজন কুটিরের চেয়ে আরও উঁচু স্থানের বাড়ী ঘর জলে ডুবে গেছে কিন্তু প্রলয়ঙ্করী বন্যার জল কুটিরের দাওয়া পর্যন্ত এসেছে। আত্মভোলা রামজী দাওয়ায় বসে নর্মদামায়ীর ভজন গেয়ে চলেছেন।

এই ঘটনার পর নর্মদামায়ীর কৃপাসিদ্ধ মহাত্মা হিসাবে তাঁর নাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ল। হাজার ভক্তের ভীড়ে এবং ভজনগানে তাঁর আশ্রম সর্বদা মুখর থাকত। তিনি কাউকে দীক্ষা দিতেন না, বলতেন — আকুল হয়ে ভগবানের শরণ নিলেই ভগবান ভক্তকে দেখা দেন, রক্ষা করেন। রেবাতীরে 'রেবা' নামই মহাসিদ্ধ মন্ত্র। শিব প্রদত্ত মন্ত্র।

তাঁর দেহরক্ষার ঘটনাও অলৌকিক। আগে থেকেই তিনি মৃত্যুর দিনক্ষণ ঘোষণা করে একটি সমাধি-কুটির তৈরী করান। নির্দ্দিষ্ট দিনে সমবেত হাজার হাজার ভক্তকে আশীর্বাদ করে কুটিরের মধ্যে বসে যান যোগাসনে। ভক্তরা রুদ্ধনিঃশ্বাসে সাশ্রুনেত্রে প্রতীক্ষা করতে থাকেন সেই মহাক্ষণটির। যথালগ্নে যথাক্ষণে তাঁর শরীর ঘিরে দাউ দাউ করে স্বতঃই আগুন জ্বলে উঠে। হাজার হাজার ভক্তের চোখের সামনে তাঁর দেহ নিঃশেষে ভস্মীভূত হয়। ঘানাবড়ে সেই সমাধি-মন্দির এখনও আছে। প্রতিদিন শত শত গৃহীভক্ত এবং পরিক্রমাবাসীরা

রামজী বাবার আশীর্বাদ নিতে যান। এছাড়াও ঘানাবড় হতে কয়েক মাইল দূরে খাপড়খেদা গ্রামে এবং হোসেঙ্গাবাদ ষ্টেশনের কাছেও আরও দুটি রামজী বাবার সমাধি-মন্দির বা স্মারক-মন্দির আছে।

আমি বিন্ধ্যেশ্বরীজীকে বললাম — আপনি রামজী বাবার দেহান্তের যে বিবরণ শোনালেন, এ তো আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার কথা। দক্ষ প্রজাপতি যখন শিবহীন যজ্ঞের ব্যবস্থা করেন তখন তাঁর কন্যা সতী অনাহুত হয়েও পিতৃগৃহে গিয়েছিলেন। দক্ষ তাঁর সামনে শিবনিন্দা করতে থাকলে, সতী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেন — আপনি আমার স্বামী এবং ইষ্ট মহাদেবের নিন্দা করায় আমি নিজেকে অশুচি ভাবছি। সুতরাং আপনার অঙ্গোৎপন্ন এই ঘৃণিত দেহ আমি মৃতদেহের ন্যায় এখনই ত্যাগ করব। এই বলে সতীদেবী উত্তরাস্যা হয়ে ভূমিতলে উপবিষ্ট হলেন এবং আচমনপূর্বক পীতবসনে দেহ ঢেকে যোগস্থ হলেন। সমাধিজাত অগ্নিদ্বারা তাঁর দেহ সহসা প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল।★

আগ্নেয়ী যোগ-ধারণার দ্বারা যাঁরা যোগীশ্বর একমাত্র তাঁরাই এইভাবে দেহকে প্রজ্জ্বলিত করে ফেলতে পারে। রামজীবাবা যোগীশ্বর ছিলেন সন্দেহ নাই।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী বললেন — এইজন্য ত বলছি, ফেরার পথে দক্ষিণতট দিয়ে যখন আসবেন তখন অবশ্যই হোসেঙ্গেবাদ পৌঁছে ঘানাবড়ে রামজী বাবার সমাধি-মন্দির দেখবেন। তাঁর কাছে প্রার্থনা করলে সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। হোসেঙ্গাবাদ নর্মদার দক্ষিণতটে একটি বড় তীর্থ।

— দেখার জন্য ফেরার পথে নিশ্চয়ই যাবো। তবে কোন অভীষ্ট সিদ্ধির আকাঙ্ক্ষা নিয়ে নয়। আসার সময় আমাকে রৈকপনেশ্বর মন্দিরের পুরোহিতও দক্ষিণতটের ব্রহ্মাণতীর্থ দেখিয়ে বলেছিলেন, সেখানে যে পিযাণ্হারীর মন্দির আছে, তা অবশ্যই দেখা উচিত কারণ পিযাণ্হারীর মন্দিরে প্রার্থনা করলেও নাকি সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমাকে একাধিক মহাত্মা বলেছেন, নর্মদাতীরে কেবল রেবানাম জপ করলেই সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়, মার্কণ্ডেয় মুনির মতে ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং রেবাসংগমে গেলেও সর্বাভীষ্ট সিদ্ধ হয়। আমার অভীষ্টের পরিমাণ বা সংখ্যা কত যে তা পূরণ করার জন্য এতগুলি দৈবশক্তির সাহায্য নিতে হবে? আমার বাবা কিন্তু আমাকে শিখিয়েছেন — এক সাধে ত সব সাধে, সব সাধে সব যায়।

আমার কথা শুনে বিন্ধ্যেশ্বরীজী থতমত খেয়ে গেলেন। এক মিনিট চুপ থেকে বললেন — অব চলেঙ্গে। গুরুজীকো ছোড়কে জ্যায়দা সময় বাহার মেঁ রহ্না ঠিক নেহি। গুলজারী ঘাটের শিবমন্দিরের দরজা খুলেছে। প্রণাম করে গুলজা গ্রামে ঠাড়েশ্বরী মহারাজের আশ্রমে ফিরে এলাম।

তখনও অনেক বেলা আছে। এসে দেখলাম ঠাড়েশ্বরীজী সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজী তাঁর গুরুদেবকে প্রণাম করে কুটিরে গিয়ে ঢুকলেন, আমি নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম। মনের মধ্যে অনেক চিন্তা ভীড় করে এল। হিন্দুধর্মের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধুদেরকে ইষ্টসিদ্ধির জন্য অনেক রকম শারীরিক নির্যাতন ভোগ করতে দেখেছি। প্রয়াগে কুম্ভমেলায়, কল্পবাস ব্রত পালনের সময় মাঘমেলায় আমি ঊর্ধবাহু, আকাশমুখী, পঞ্চধূনী, জলশয্যী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর সাধু দেখেছি। গুদড়ী সম্প্রদায়ের সাধু সবসময় চলতে থাকেন, হয় পথে নতুবা একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে পদচালনা করতে করতে তাঁদের দুটো পা ফুলে গেছে তবুও হাঁটার ছন্দে তাঁদের পদচালনার বিরাম নাই। কেউ কেউ এক বা উভয় বাহুকে সতত ঊর্ধ্বেই তুলে রাখেন। কেউ বা উপরের দিকে কোন গাছের ডালে পা দুটো বেঁধে রেখে অধোমস্তকে

★ লেখক প্রণীত 'আলোক-তীর্থ' নামক পুস্তক এ বিষয়ে সবিশেষ বর্ণনা আছে।

ঝুলতে থাকেন এবং মাথার নিচে অগ্নিকুণ্ড স্থাপন করেন। এঁদের নাম ঊর্ধ্বমুখ তপস্বী। মেদিনীপুর জেলার ধলহারা গ্রামে 'পাগলী মা' বা গৌরীমা নামে একজন মহাসাধিকা ছিলেন। আমার জীবনে তিনিই প্রথম সাধু। তখন আমার বয়স মাত্র বার। আমাদের গ্রামবাসী পুঁটিরাম পাত্র নামে পাগলীমায়ের এক শিষ্যের সঙ্গে তাঁকে দর্শন করার জন্য বাবা আমাকে পাঠিয়েছিলেন। গিয়ে দেখেছিলাম, বৈশাখ মাসের খররৌদ্রে পাঁচ পাশে পাঁচটা অগ্নিকুণ্ড জ্বেলে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সেই যোগেশ্বরী মা পঞ্চতপা করছিলেন। তাঁর গুরু ভূষণানন্দজী ছিলেন ত্রাটকসিদ্ধ মহাযোগী। তিনি প্রতিদিনই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সূর্যের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতেন। কুম্ভমেলাতে কাউকে দেখেছি কাঁটার উপর শুয়ে আছেন, কেউ বা প্রচণ্ড শীতে গলা পর্যন্ত জলে ডুবিয়ে সাধনা করে চলেছেন। এঁদের নাম জলশয্যী। অযোধ্যার সরযূতীরে এক মহাত্মার জল-তপস্য দেখেছিলাম, একটি মাচার নিচে একটি খাদ, খাদটি জলপূর্ণ, তার মধ্যে তিনি গলা পর্যন্ত ডুবিয়ে বসে আছেন, মাচার উপর একটি ছিদ্রযুক্ত কলস, দুজন সেবক অহরহ সেই কলসে জল ঢালছেন, জল সেই মাথার উপর গিয়ে পড়ছে। তিনি তন্ময় হয়ে ইষ্টনাম জপ করে চলেছেন। পঞ্চধূনী বা পঞ্চতপার চেয়েও এই জল-তপস্যাকে কঠিনতর বলে মনে হয়েছিল। এখানে এই গুলজা গ্রামের ঠাড়েশ্বরী মহারাজকে দেখছি দিবারাত্র দণ্ডায়মান অবস্থাতে নিজের সাধনায় মগ্ন আছেন।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের মনে ধিক্কার জন্মাল। আমার পক্ষে ত কোন উগ্র তপস্যাই সম্ভব নয়। তাহলে আমার কি হবে? নর্মদেশ্বর শিবের উদ্দেশ্যে বললাম — প্রভু! তোমার কৃপালাভ করতে হলে এত যদি উৎকট উগ্র তপস্যার প্রয়োজন হয়, তাহলে তোমার নাম আশুতোষ কেন?

সূর্যাস্ত হচ্ছে, ধীরে ধীরে অন্ধকারের ঢল নামছে বিন্ধ্যপর্বতের সর্বত্র। আশ্রমে ফিরে এলাম, পাঁচছয়জন মহিলা এসে আমলকীর ডালে প্রদীপ জ্বালিয়ে ঝুলিয়ে দিচ্ছেন।

বিন্ধ্যেশ্বরীজী ধূপ দীপ এবং কর্পূর জ্বালিয়ে তাঁর গুরু ঠাড়েশ্বরী মহারাজের আরতি করতে করতে বলছেন — আনন্দমানন্দকরং প্রসন্নং জ্ঞানস্বরূপং নিজবোধযুক্তম্।
যোগীন্দ্রমীড্যং ভবরোগবৈদ্যং শ্রীমদ্‌গুরুং নিত্যমহং ভজামি।।

ঠাড়েশ্বরীজীর দেহে মনে কোন চাঞ্চল্য নাই, বিকার নাই, কোন দিকে দৃকপাত করছেন না, তাঁর অপলক দৃষ্টি একইভাবে নর্মদার দিকে নিবদ্ধ রয়েছে।

আরতি শেষ হতেই মায়েরা চলে গেলেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজী ঠাড়েশ্বরীজীকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। আমিও প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই দেখলাম, তাঁর ডান হাতের তর্জনীটি আহ্বানের ভঙ্গীতে নড়ে উঠল, দৃষ্টি সেই একইভাবে নর্মদার দিকে, আমি তাঁর তর্জনীর ইঙ্গিত বুঝতে পারিনি, বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমার গায়ে টোকা দিয়ে মহাত্মার কাছে এগিয়ে যেতে সংকেত করলেন। আমি তাঁর কুণ্ডলের কাছে এগিয়ে যেতেই তিনি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন — য়হ্ খালা কা ঘর নাঁহি।

এই খণ্ডিত বাক্যাংশের মর্ম কিছু বুঝলাম না। বক্তার দৃষ্টিতে যদি কোন vibration বা expression না থাকে তাহলে এমনিতেই বক্তব্য বিষয়ের রস বা ভাব উপলব্ধি করা যে কোন শ্রোতার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে, বিশেষতঃ এখানে তাঁর উচ্চারিত শব্দগুলি আংশিকভাবে

উচ্চারিত হয়েছে, যার আক্ষরিক শব্দার্থ হল — এটা মাসীর বাড়ী নয়! হঠাৎ কোন কথা নাই বার্তা নাই , বিনা প্রসঙ্গে আচমকা তিনি এমন কথা কেন বললেন বুঝতে পারলাম না, আমি নীরবে দাঁড়িয়েই রইলাম। একমিনিট পরেই তিনি আবার মৃদুকণ্ঠে বলতে লাগলেন — কবীর য়হ ঘর প্রেম কা, খালা কা ঘর নাঁহি।

সীস উতারৈ হাথি করি, সে পৈসে ঘর মাহিঁ।।
কবীর নিজ ঘর প্রেম কা মারগ অগম অগাধ।
সীস উতারি পগ তলি ধরৈ তব নিকটি প্রেম কা স্বাদ।।

অর্থাৎ নিজের হাতে মাথা কেটে হাতে নিয়ে প্রবেশ করতে হবে প্রভুর প্রেম-মন্দিরে। দুর্গম সেই পথ, অসীম তার বিস্তার। এ মাসীর বাড়ী নয় যে আবদার করলে আর চোখের জল ফেললেই যা চাওয়া যায় তাই পাওয়া যাবে!

মহাত্মা আর কিছু বললেন না — আগের মতই নীরব নিথর নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। আমরা কুটিরে ফিরে এলাম। বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব আনন্দ প্রকাশ করতে লাগলেন। কারণ, তাঁর গুরুদেব ক্কচিৎ কদাচিৎ কারও কারও সঙ্গে দু'একটি কথা বলেন বটে কিন্তু গত বিশ বৎসরের মধ্যে আমাকে নিয়ে মোট তিন জনের সঙ্গে কথা বলতে তিনি দেখলেন। কাজেই আমার মহা সৌভাগ্য।

বিছানায় বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। বিকেলে নর্মদার ঘাটে বসে পঞ্চতপা, জলতপা, উর্ধ্বপদ, হেঁটমুণ্ডে থাকা এবং দিনরাত্রি দাঁড়িয়ে থাকা প্রভৃতি তপস্যাকে আমি উৎকট এবং উগ্র ভেবে মনে মনে ভগবানের কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছিলাম যে এত কঠোর তপস্যা ছাড়া তোমাকে পাওয়া যাবে না, এই যদি তোমার বিধান হয় তাহলে তোমার আশুতোষ নাম কি মিথ্যা? বুঝতে পারলাম — ঠাড়েশ্বরী মহারাজ আজ সন্ধ্যায় তারই জবাব দিয়েছেন। বিন্ধ্যেশ্বরীজী আমাকে আগেই কথায় কথায় জানিয়েছেন যে আমি যেদিন সন্ধ্যায় এখানে এসে পৌঁছলাম সেদিনই মধ্যাহ্নে নাকি তাঁর গুরুদেব আমার আসার কথা পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। মহাত্মা কি তাহলে সত্যই অন্তর্যামী?

হোন তিনি অন্তর্যামী, তবুও তাঁর ঐ রকম তপস্যার উগ্রতাকে ভগবৎ প্রাপ্তির উপায় বলে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারছিলাম না। আমার মনে হল, আপাতঃ দৃষ্টিতে ঠাড়েশ্বরী মহারাজের ঐ রকম বিচিত্র তপশ্চরণকে যতই কঠোর মনে হোক, এর মূলেও আছে ভগবানের প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম। প্রীতম্ প্রিয়তমের প্রতি আকুল-করা পাগল-করা সেই সব ভুলানো প্রেমভাব না জন্মালে কি কোন মানুষের পক্ষে নরদেহ ধারণ করে এত কষ্ট সহ্য করা সম্ভব হয়? কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ভক্তিস্নিগ্ধ ভাষায় এইরকম অবস্থার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন, যার হৃদয়ে ভগবৎ প্রেমের আলো এসে পড়েছে — 'তার বক্ষে বেদনা অপার, তার নিত্যজাগরণ।' যে ভগবানের প্রেমে বিভোর হয়, সেই ত জীবনে এবং আচরণে দেখাতে পারে, বলতে পারে — ওরে মন, ওরে আমার প্রিয়বন্ধু , বিবেচনা করে দেখ, প্রণয়ী হলে কি তার শোয়া চলে? সমুঝ দেখ মন মিত পিয়ারা আসিক হো কর্ শোনা ক্যা রে?

ঠাড়েশ্বরী মহারাজকে আমার শুকনো যোগীমাত্র বলে মনে হচ্ছে না, তিনিও আসিক। প্রেমিক বলেই তাঁর শোয়া বসা নাই। অপলক দৃষ্টিতে অহোরাত্র তাঁর প্রেমাস্পদের দিকেই তাকিয়ে আছেন।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। যখন ঘুম ভাঙলো, তখন ভোর হয়ে আসছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম। ফাল্গুন মাস পড়ে গেলেও তখনও খুব শীত। কুয়াশার অন্ধকারে সব ঢেকে আছে। কৌতুহল বশে পা টিপে টিপে মহাত্মা যেখানে দাঁড়িয়ে সেখানে এলাম। তাঁর জটা এবং পরিধেয় গৈরিক বস্ত্রখণ্ড শিশির পড়ে ভিজে গেছে। তাঁর ডান দিকের এক কোণে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, যাতে তিনি আমাকে দেখতে না পান। সহসা তাঁর দক্ষিণ হস্তের তর্জনী কিঞ্চিৎ নড়ে উঠল। সন্ধ্যাবেলার মত এটাকে তর্জনী সংকেত মনে করে সাহসে ভর করে সামনে এসে দাঁড়ালাম। প্রায় দু মিনিট পরে পূর্বের মতই মৃদু কণ্ঠে বলে উঠলেন —

প্রীতম্ হসনাঁ দূরি করি, করি রোবন সৌঁ চিত্ত।
বিন্ রোয়াঁ বস্তুঁ পাই এ প্রেম পিয়ারা মিত্ত।।
হঁসি হঁসি কান্ত ন পাইএ, জিন্ পায়া তিন্ রোই।
জো হাঁসে হী হরিমিলে তব্ নহীঁ দুহাগিন্ কোঈ।।

অর্থাৎ প্রিয়তম এমনিতর দুঃখের পথ দিয়েই আসেন। হাসতে হাসতে তাঁকে পাওয়া যায় না। যে তাঁকে পেয়েছে কাঁদতে কাঁদতেই পেয়েছে; দিনরাত তার চোখে জল ঝরেছে, তবে প্রিয়তমের সঙ্গে তার মিলন ঘটেছে। হাসতে হাসতে যে হরিকে পেল তার মত দুর্ভাগা আর কেউ নাই।

আবার সব চুপচাপ। আমি ধীরে ধীরে তাঁর কাছ হতে সরে এলাম।

গুলজা গ্রামে চারদিন কেটে গেল। আনন্দেই কাটল। প্রতিদিনই বিকালে গুলজারী ঘাটে বসেছি। এইবার পুনরায় পথে বেরিয়ে পড়তে চাই। পঞ্চম দিনে বিন্ধ্যেশ্বরীজীর সন্ধ্যারতি শেষ হলে মহাত্মার কাছে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে নিবেদন করলাম — আগামীকাল সকালেই আমি যাত্রা করব, আশীর্বাদ ভিক্ষা করছি। কী সৌভাগ্য আমার আজও তিনি কথা বললেন। আমাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — এতদিন ত ঘুরলে। নর্মদা পরিক্রমা করতে এসে কি অনুভব করলে? অনেক ভেবে উত্তর দিলাম — অমরকন্টকে পরিক্রমা আরম্ভ করার সময় আমাকে একজন মহাত্মা শুনিয়েছিলেম — পরিক্রমার প্রথম এবং প্রধান নিয়ম হোল এই যে নর্মদাকে চোখে চোখে রেখে ভ্রমণ করতে হবে। পরিক্রমাকালে সেইভাবেই আমি হেঁটেছি। আমি অনুভব করেছি , পরিক্রমাকালে পরিক্রমাবাসী নর্মদাকে সবসময় চোখে চোখে রাখতে পারুন বা না পারুন, নর্মদামাতা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে সব সময় চোখে চোখে রাখেন, এক মিনিটও চোখের আড়াল করেন না।

মনে হল যেন এক লহমার জন্য তাঁর পলকহীন চোখে হাসির লহর ফুটে উঠল।

ষষ্ঠদিন ভোরে উঠেই বিন্ধ্যেশ্বরীজীকে নমস্কার ও আলিঙ্গন করে ঠাড়েশ্বরীজীকে প্রণাম করলাম। বাবা এবং নর্মদামায়ের পবিত্র নাম উচ্চারণ করতে করতে দ্রুত হাঁটতে লাগলাম গুলজারী ঘাটের দিকে। গুলজা গ্রামে যে অভিজ্ঞতা হল তা কোনদিনই ভুলব না। বাবার আশীর্বাদে অনেক সাধু-মহাত্মা দর্শন করার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু সর্বক্ষণ অর্ন্তলক্ষ্য, বর্হিদৃষ্টি সম্পন্ন ঠাড়েশ্বরী মহারাজের মত শাম্ভবী মুদ্রায় নিত্যস্থিত এইরকম উচ্চকোটির যোগী আমি খুবই কম দেখেছি।

গুলজারীঘাট অতিক্রম করে বুধনীঘাটে যখন পৌঁছলাম তখন বড়জোর বেলা দশটা হবে। বুধনীঘাটে বহুলোক সমাগম দেখলাম। স্ত্রী-পুরুষ বালক নির্বিশেষে স্নান করছে, ঘাটের উপরেই শিবমন্দির। ঘাট থেকে মাইলখানিক দূরেই বুধম্ বলে মহল্লা আছে। শুনলাম, খুব

সম্পন্ন গ্রাম, লোকজনের বসতি যথেষ্ট। এত শীঘ্র স্নান করতে ইচ্ছা হল না। মন্দিরের শিবকে প্রণাম করে এগিয়ে চললাম। কতকটা যাবার পরেই গরম বোধ করলাম। কম্বলটা কাঁধে ছিল, সেটাকে গাঁঠরীর মধ্যে বেঁধে হাঁটতে লাগলাম সোজা উত্তরতট ধরে। আকাশ পরিষ্কার, পথও মোটামুটি ভাল। পথিমধ্যে একজন লোককে জিজ্ঞাসা করলাম পথে আর কোথাও ভাল ঘাট বা মন্দির পাবো? তিনি বললেন — করীব দশ মিল যানেসে আপ্‌কো হোলিপুরা মিলেগা, উধর্ পরিক্রমাবাসী ঠারতা হৈ। তিনি প্রণাম করতে উদ্যত হয়েছিলেন, আমি কোনমতে তাকে নিরস্ত করে হাঁটতে লাগলাম। বেলা আড়াইটা বেজে গেল, তবুও হোলিপুরার দেখা মিলল না। পথে অল্পস্বল্প লোক চলাচল আছে . যাকেই জিজ্ঞাসা করি, সেই বলে — নজদিগ হ্যায়। তিনটা বাজালো তবুও 'নজদিগের' নাগাল আর পেলাম না। আমার মনে পড়ল, একবার কটকে নেমে উড়িয়্যার প্রসিদ্ধ মহাত্মা শ্রীমৎ ভাগীরথী পরমহংসের সঙ্গে দেখা করার জন্য যাচ্ছিলাম। তিনি তখন ব্রাহ্মণী নদীর তীরে মধ্যশ্মশান নামক গ্রামে অবস্থান করছিলেন। হাঁটতে হাঁটতে যখনই কোন লোককে জিজ্ঞাসা করেছি মধ্যশ্মশান আর কত দূর, তাদের প্রত্যেকের মুখে একই কথা শুনেছি — বাট দিসুছে, অর্থাৎ ঐতো দেখা যাচ্ছে! কিন্তু সেই 'দিসুছে' পথ হাঁটতে সন্ধ্যা হয়ে গেছল। এখানেও বোধ হয় 'নজদিগের' নাগাল পেতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। বাস্তবিক পক্ষে তাই ঘটল, বেলা চারটা নাগাদ আমি হোলিপুরাতে এসে পৌঁছলাম। মাঝখানে বেলা সাড়ে বারটা বা একটা নাগাদ ঘাটে নেমে স্নান তর্পণ করতে আধঘন্টা হয়ত সময় লেগেছে। সেই আধঘন্টা বাদ দিলে দশমিল রাস্তা হাঁটতে কখনই পাঁচ বা সাড়ে পাঁচ ঘন্টা সময় লাগতে পারে না। বিশেষ করে এতো আর মুণ্ডমহারণ্যের পথ নয়, এতো এবড়ো খেবড়ো উঁচু-নিচু পাহাড়ী পথ হলেও উপত্যকা-অঞ্চল দিয়েই হেঁটে এসেছি। হোলিপুরা মন্দিরে দেখলাম একজন বৃদ্ধ সন্ন্যাসী এবং একজন বৃদ্ধামায়ী বসেছিলেন। আমি মন্দিরে পৌঁছতেই সেই বৃদ্ধ সন্ন্যাসী বলে উঠলেন — লেও মায়ী, আপকো ভাগ পূরা হো গিয়া। আমার দিকে তাকিয়ে যা বললেন তার সারমর্ম এই যে ঐ বুড়ীমার ব্রত — তিনি সন্ধ্যার আগে তিনজন সাধুকে ভোজন করিয়ে তবে অন্নজল গ্রহণ করেন। যদি কোনদিন তা সম্ভব না হয়, তাহলে নির্জলা কাটিয়ে দেন। ঐ বৃদ্ধ সন্ন্যাসী ছাড়া আর একজন সাধুকে তিনি খাইয়েছেন, আমিই তৃতীয়জন। মন্দিরের বারান্দায় গাঁঠরী ফেলে নর্মদা থেকে কমণ্ডলু ভরে জল এনে শিবের মাথায় ঢাললাম, প্রণামাদি সেরে খেতে বসলাম। চাপাটি, কিছু শাক-সব্জীর তরকারী এবং দুধ তৃপ্তি সহকারে খেলাম। খেতে খেতে ভাবতে লাগলাম, এই ভারতের মাটিতে পুণ্যলোভাতুরা ব্রতচারিণী হিন্দুরমণীর উচ্চাদর্শ এবং পবিত্র ধর্মসংস্কারের কথা। চকিতে একবার মনে হল, ঠাড়েশ্বরী মহারাজের কাছে যে বলে এসেছি, নর্মদামাতা তাঁর পরিক্রমাকারী সন্তানকে চোখে চোখে রাখেন, একথা ধ্রুব সত্য। খাঁটি কথা প্রাণের কথাই বলে এসেছি।

আমাকে খাইয়ে বুড়িমা চলে গেলেন। একটু পরেই সূর্যাস্ত হয়ে গেল। টর্চ জ্বেলে দুজনে মন্দিরে ঢুকলাম। আমি সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — এহি মহাদেবকা ক্যা নাম হ্যায়?

— নর্মদেশ্বর হ্যায়, ঔর ক্যা। শিউজীকা নাম শিউজী হ্যায়।

আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, যদি কিছু মনে না করেন, তাহলে আমার জানতে ইচ্ছা হয়, আপনি কোন্ সম্প্রদায়ের লোক ? ভগবানকে লাভ করার জন্য সাধকরা যুগ যুগ ধরে গুরুপরম্পরাগত বহুবিধ সিদ্ধ পথের মধ্যে যে কোন একটা পথ ধরে দুশ্চর তপস্যা করে

থাকেন। যোগের পথ না ভক্তির পথ — কোন পথের পথিক আপনি?

তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন — হম্ দিওয়ানা হ্যায়। বিশেষ কোন সম্প্রদায়ে নাম লেখাই নি আমি। প্রভুর নাম করতে ভালবাসি, নর্মদাতটে ঘুরে ঘুরে সাধ্যমত আমি তাঁর নামগান করি। ভগবৎ-প্রেমের কোন বাঁধাধরা পথ আছে বলে আমি মনে করি না। যে কোন পথ ধরে সে চলতে আরম্ভ করলে, চলতে চলতে সে পায়, পেতে পেতে চলে।

তাঁর কথা শুনে আমি চমকে উঠলাম, এ যে আমাদের রবীন্দ্রনাথের উপলব্ধ সত্যের অবিকল প্রতিধ্বনি! তিনিও যে বলে গেছেন — যাওয়া সে যে তোমার পানে যাওয়া
পথে চলাই সেই তো তোমায় পাওয়া। (গীতালি, ৯৫)

অন্ধকারে কেউ কারো মুখ দেখতে পাচ্ছি না। যে যার শয্যায় বসে আছি। সাধুজী বলে চলেছেন —ভগবানের যিনি যথার্থ প্রেমিক, ভগবান ছাড়া তাঁর আর কোন চাওয়া-পাওয়া নাই। প্রেমের পথে ভক্ত তাঁর প্রিয়তমাকে ক্ষণে পায় ক্ষণে হারায়। যখন পায় তখন আনন্দে আত্মহারা হয়, আর যখন হারায় তখন যাতনায় ছটফট করে। প্রেমিকা প্রিয়তমকে পেয়েও পায় না, বুঝেও বুঝে না তাঁর রহস্য। তাই পেয়েও হারায়, হারিয়ে বিরহে কাতর হয়। কিন্তু একবার যদি রহস্য বুঝে তাহলে প্রিয়ের সন্ধানে আর এখানে ওখানে ছোটাছুটি করে বেড়াতে হয় না! তখন আপন অন্তরের মধ্যেই তাঁকে দেখতে পায়, দেখতে পায় তার প্রিয়তম প্রভু তার হৃদয় আলো করে রয়েছেন।

এই বলে তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে একটি ভজন শুরু করলেন —

চলি মৈঁ খোজমেঁ পিয়কী। মিটি নহি সোচ ইহ জিয়কী।।
রহে নিত পাশ হি মেরে। ন পাউ ইহারকো হেরে।।
বিকল চহুঁ ওরকো ধাউঁ। তবহুঁ নহিঁ কান্তকো পাউঁ।।
ধীরজ ধরুঁ ক্যায়সে ধীরা। গয়ি গির হাথসে হীরা।।
কটি জব্ নৈনকী ঝাঁঈঁ। লখ্যা তব্ হৃদয়মেঁ সাঁঈ।।

গানের সরলার্থ হল — আমি প্রিয়ের খোঁজে চলেছি। তাঁকে কি করে পাব, অন্তরের এই ভাবনা কিছুতেই ঘুচছে না। বন্ধু আমার নিয়তই পাশে রয়েছেন তবু তাঁকে দেখতে পাচ্ছি নে। আকুল হয়ে ছুটে বেড়াই তবুও প্রাণকান্তকে পাচ্ছি না। কি করে আমি ধৈর্য ধরব বল, আমার হাত থেকে যে হীরা পড়ে গেছে। যখন আমার চোখের পর্দা সরে গেল তখন তাকিয়ে দেখি প্রভু আমার হৃদয়েই রয়েছেন!

সাধু অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে অত্যন্ত দরদ দিয়ে প্রত্যেকটি চরণ বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইলেন। কোন বাদ্যযন্ত্র নাই , খালি গলায় তাঁর সুরের লহর আমার শুষ্ক প্রাণকেও সরস করে তুলল। মন্দিরের অভ্যন্তরেও সেই সুরের যাদু যেন একটা সুরভিত মায়াজাল বিছিয়ে দিয়েছে। আমার মনে পড়ল মরমী কবি রবীন্দ্রনাথের গীতিমাল্যেরই আর একটি কবিতা —

আমার হিয়ার মাঝে লুকিয়ে ছিলে
দেখতে আমি পাই নি।
বাহির পানে চোখ মেলেছি
হৃদয় পানেই চাই নি।
তুমি ছিলে আমার কাছে
তোমার কাছে যাই নি।

অন্ধকারেই অনুভব করলাম সাধু শুয়ে পড়েছেন। এই নর্মদাতটেই কয়দিন ধরে দেখে এলাম ঠাড়েশ্বরী মহারাজের উৎকট তপস্যা। শুনে এলাম তাঁর ব্যাঙ্গোক্তি — য়হঁ খালাকা ঘর নাঁহি অর্থাৎ এ মাসীর বাড়ী নয় যে আবদার করলে আর চোখের জল ফেললেই তাঁকে পাওয়া যাবে! এখন এই নর্মদাতটেই শুনছি, প্রেমিক সাধুর আর্তি। তাঁর প্রাণের প্রত্যয়, প্রিয়তমের কাছে আবদার করলে আর যে কোন পথ ধরে চলতে আরম্ভ করলেই চলতে চলতে সে পায়, আর পেতে পেতে চলে।

হোলিপুরার মন্দিরে এক রাত্রি কাটল। সকালে ঘুম ভাঙল 'দিওয়ানা' বৃদ্ধ সাধুর গানে। তিনি গুন্‌গুন্ স্বরে আপন মনে গেয়ে চলেছেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠস্বরের মধুর গানের ভাষা বুঝবার জন্য কান পাতলাম। তিনি গেয়ে চলেছেন —

সকল শিরোমণি নাম হৈ, সব ধরমকে মাহিঁ
অনন্য ভক্ত উহ্ জানিয়ে, সুমিরণ ভুলৈ নাহিঁ।।
মনহি মনমেঁ জপ করুঁ, দরপণ উজ্জ্বল হোয়।।
দরশন হো বৈ রামকা, তিমির যায় সব খোয়।।

অর্থাৎ সকল ধর্মের সারকথা এই যে ভগবানের নামই সর্বশ্রেষ্ঠ বস্তু। তাঁকেই অনন্য ভক্ত বলে জানবে যিনি মুহূর্তের জন্য নামের স্মরণ বা জপ ভুলেন না। মনে মনে অহরহ প্রভুর নাম জপ করবে, তাতে আমার চিত্তরূপ দর্পণ পরিমার্জিত হবে, চিত্তের অন্ধকার দূরীভূত হলেই প্রভু রামচন্দ্রের দর্শন মিলবে।

তিনি গান করতে থাকলেন, আমি প্রাতঃকৃত্য সারতে বাইরে গেলাম। এসে দেখি, তিনি তাঁর একমাত্র সম্বল একটি ছোট সতরঞ্চি এবং কম্বলটি গুটিয়ে বেঁধে ফেলেছেন। আমাকে বললেন দড়ি কম্বল বাঁধ লিয়া, অব চলিয়ে আপকো সাথ বৈষ্ণবতীর্থ তক্ চলুঙ্গা। আমিও সব গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নর্মদার তীরে তীরে হাঁটতে লাগলাম। একই পথ। অনেকক্ষণ নীরবে হেঁটে যাবার পর নিছক কথা বলার জন্যই তাঁকে বললাম, মুখ বুজে একা একা হাঁটলে পথের শ্রম বড় বেশী বলে মনে হয়। আপনি দয়া করে আমার সঙ্গে নর্মদামাতা সম্বন্ধে কিছু কথা শোনাতে শোনাতে চলুন, গল্প করতে করতে দুজনে পথ চললে পথের শ্রম অনেক লাঘব হবে। আপনার মত লোককে সঙ্গী পেয়েছি , এ আমার ভাগ্য। ব্যস্, আমার কথা শেষ হতে না হতেই তিনি গান আরম্ভ করে দিলেন—

না মৈঁ ধর্মী নাহিঁ অধর্মী না মৈঁ যতি না কামী হো।
না মৈঁ কহতা না মৈঁ শুনতা না মৈঁ স্বামী-সেবক হো।
না মৈঁ বন্ধা না মৈঁ মুক্তা না মৈঁ বিরত ন রংগী হো।
না কাঁহুসে ন্যারা হুয়া না কাহুকে সংগী হো।।

অর্থাৎ আমি ধার্মিক নই, অধার্মিকও নই। আমি নির্বানপ্রার্থী যতি নই , কামনাপরায়ণ কামুকও নই। আমি সেবকও নই, স্বামীও নই। আমি বদ্ধও নই, মুক্তও নই। বিরক্তও নই, অনুরক্তও নই। কারুর থেকে আলাদা নই, কারুর সঙ্গীও নই।

'না কাহুকে সংগী হো, না কাহুকে সংগী হো' বলে তিনি গান গাইতে গাইতে ঢলে পড়লেন। আমি না ধরে ফেললে কঙ্করময় পথে পড়ে গিয়ে তাঁর আঘাত লাগত সন্দেহ নাই। আমি ধীরে ধীরে তাঁকে রাস্তার উপরে শুইয়ে দিয়ে চোখে মুখে কমণ্ডলুর জলের ঝাপটা দিলাম। ভাবতে

লাগলাম, এঁকে নিয়ে পথ চলতে ত বেশ বিপত্তি দেখছি। দিওয়ানা সাধু এইভাবে যদি কথায় কথায় গান ধরেন এবং ভাবের ঘোরে পথের মধ্যেই নাচতে থাকেন, তবে পথে এগিয়ে যাওয়া ত বিষম দায় হবে। 'হর নর্মদে হর', 'হর নর্মদে হর' বলে তাঁর গায়ে নাড়া দিতে লাগলাম। মিনিট পাঁচেক পরে তিনি চোখ মিলে তাকালেন। আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালেন। বেলা দশটা নাগাদ আমরা পৌঁছলাম সাততুমড়ী মহল্লায়। সাততুমড়ী অতিক্রম করে বেলা বারটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম একটা আমলকীর জঙ্গলে। প্রায় সিকি মাইল রাস্তা জুড়ে শুধু আমলকী গাছের বাগান — দিওয়ানা সাধু একটি ঘাট ও শিব মন্দির দেখিয়ে বললেন এহি আমলকী ঘাট হৈ। ইধরই হমলোগ আস্নান ও পূজা করঙ্গে। তিনি আমার আগেই স্নান করে মন্দিরে ঢুকলেন। স্নান তর্পণাদি সেরে আমি মন্দিরে ঢুকে দেখি, তিনি শিবলিঙ্গকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে গান জুড়েছেন। দুচোখ দিয়ে অবিরলধারে জল গড়িয়ে পড়ছে , তিনি গাইছেন —

> সব দুনিরা সেয়ানা মৈঁ হুঁ দিওয়ানা। হম্ বিগড়ে ঔর ন বিগড়ে কোঈ জনা।
> মৈঁ নহিঁ বৌরা রাম কিয়ো বৌরা। সতগুরু দয়াসে গয়ে ভ্রম মেরা।
> বিদ্যা ন পঢ়ুঁ বাদ নহিঁ জানুঁ। হরিগুণ কথত্-সুনত মৈঁ হুঁ দিওয়ানা।
> গানা গাবত গাবত পূজুঁ রাম তুমকো গানা হৈ মেরে আরাধনা।।

সাধু গানের মাধ্যমে বলছেন — প্রভু সব দুনিয়া সেয়ানা, আমিই কেবল পাগল। আমি বিগড়েছি কিন্তু আর যেন কেউ না বিগড়ায়। আমি ত পাগল ছিলাম না, রামই আমাকে পাগল করে দিয়েছেন। সদ্গুরুর দয়ায় আমার ভ্রম কেটে গেছে। লেখাপড়া শিখিনি, বিচার বিতর্কও জানি না। হরিগুণ কীর্তন করে করে আর হরিগুণ কীর্তন শুনে শুনে আমি পাগল হয়েছি। গান গেয়ে গেয়ে প্রভু আমি তোমার পূজা করব, আমার গানই তোমার পূজা।

স্নান করে এসে জলভরা কমণ্ডলু হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তাঁর কান্না বা উচ্ছ্বাস কিছুতেই থামছে না, শিবলিঙ্গ হতে তাঁরও হাতও উঠছে না। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করলাম, সদ্য স্নান করে এসে তখন শীতে কাঁপছি , অগত্যা শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢালতে শুরু করলাম। ভক্ত আর ভগবানের একসঙ্গেই তাহলে পূজা হোক। তাঁর হাতে ঠাণ্ডা জল পড়তে, তবে তাঁর চমক ভাঙল। শিবলিঙ্গকে ছেড়ে দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে দাঁড়ালেন। ঝোলা থেকে মিছরী ও কিস্মিস্ দিয়ে শিবের ভোগ দিলাম। উভয়ে সেই প্রসাদ ভাগ করে খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম পথে। নর্মদার তীর থেকে বিন্ধ্যপর্বতের ধার পর্যন্ত এ দিকটা শ্যামল উপত্যকা। রাস্তার ধারে বুনো নিম, তুলো এবং শালগাছ বেশী। মাঠে নানাবিধ ফসলের চাষ হয়েছে। দিওয়ানা সাধু বললেন আমাদের ডানদিকে দিওয়াস জেলা। আমরা শিহোর জেলা পেরিয়ে দিবস (দিওয়াস) জেলার সীমান্ত দিয়ে হাঁটছি। বেলা দুটা আড়াইটা নাগাদ আমরা মর্দানাঘাটে পৌঁছে গেলাম। 'ব্যস করোজী, হমলোগ্ অজ ইধরই ঠারেঙ্গে' — এই বলে সেখানকার শিবমন্দিরের দাওয়াতে দিওয়ানা সাধু বসে পড়লেন। তখনও অনেক বেলা আছে, কাজেই আমার আরও কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সাধু কিছুতেই নড়তে চাইলেন না। তিনি বসে পড়েই গুণ্গুণ্ করে গান ভাঁজতে লাগলেন। সারাদিন হেঁটে এসে শ্রান্ত ক্লান্ত ক্ষুধার্ত অবস্থায় কি করে যে মনে গান জাগে তা আমার মাথায় আসে না। মনে মনে আমি বেজায় বিরক্ত হলাম। সাধু ভাব ঢুলুঢুলু নেত্রে অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে গাইতে লাগলেন —

রাম নাম গাওরে মনুয়া রাম নাম গাও............
সুরগবাসু ন বাঞ্ছিয়ে, ডরো মৎ নরক নিবাসু।
হোনাঁ হৈ সো হবেগা মনমেঁ ন কীজৈ আসু।।
ক্যা জপ ক্যা তপ সংযমো ক্যা বরত্ ক্যা অসনাঁন।
জব লগি জুগতি ন জানিয়ে ভাউ ভগতি ভগবাঁন।।
সম্পৎ দেখি ন হরখিয়ে বিপৎ দেখি না রোই।
জো সম্পৎ সো বিপৎ হৈ করতা করৈ সো হোই।
রাম নাম গাওরে মনুয়া রাম নাম গাও............

ওরে মন, রাম নাম গাও, রাম নাম গাও। স্বর্গবাসের বাঞ্ছা করো না, করো না নরকবাসের ভয়। যা হবার তাই হবে। মনে কোন আশা রেখ না। যতক্ষণ যুক্তি দিয়ে ভাবভক্তি দিয়ে ভগবানকে না জানছ ততক্ষণ জপতপ সংযম পালন ব্রত বা স্নান এসব দিয়ে কি হবে। সম্পত্তি পেয়ে উল্লাস করো না, বিপদ দেখে কেঁদে ভাসাবে না, যা সম্পত্তি তাই বিপত্তি।

সাধুর কণ্ঠস্বরের মাধুর্যে আমিও সাময়িকভাবে ক্ষুধা তৃষ্ণা ভুলে চোখ মুদে তন্ময় হয়ে গান শুনছিলাম। গান থামতে চোখ খুলে দেখি আটদশজন লোক ক্ষেতির কাজ ছেড়ে মাঠ থেকে এসে গান শুনছে। তাদের সঙ্গে আলাপ করে জানলাম, নিকটবর্তী মহল্লা মর্দানপুরের বাসিন্দা তারা। একজন লোক দৌড়ে চলে গেল তার মহল্লায়। প্রায় আধঘন্টা বাদে একটা বড় লোটায় দুধ এবং কতকটা খোয়া এনে দিওয়ানা সাধুর কাছে রেখে তা গ্রহণ করতে মিনতি জানাল। সাধু আমাকে তা শিবকে নিবেদন করতে বললেন। ভোগ নিবেদন হলে তিনি প্রত্যেকের হাতে একটু করে খোয়া-প্রসাদ দিলেন। বাকী খোয়া এবং দুধ আমরা দুজনে প্রসাদ পেলাম। একজন মহাত্মাকে বলল — গানামেঁ আপনে কহা — মনমেঁ ন কীজৈ আসু। আমরা ত আশা নিয়েই বেঁচে আছি। সংসারী লোক আমরা, কামনা-বাসনা কি ত্যাগ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব? আমরা যখন সুখে থাকি তখন ভগবানকে ভুলে যাই। যখন দুঃখে পড়ি তখন তাঁর পায়েই কেঁদে পড়ি, মনের কামনা পূরণের জন্য তাঁর কাছে ছাড়া আর কার কাছে চাইব? সাধু তাকে অত্যন্ত দরদের সঙ্গে উত্তর দিলেন — ভগবান গীতাতে বলেছেন যারা আর্ত ও অর্থার্থী হয়ে ভগবানকে ডাকে তারাও ভক্ত বটে, তবে তারা প্রেমিক নয়। ভগবানকে যে যথার্থ ভালবাসে সে তাঁর কাছে কোন দাবী পেশ করে না। ভালবাসার জন্য যে ভালবাসা, সেই ভালবাসাই যথার্থ ভালবাসা। ভগবান নৃসিংহদেব প্রহ্লাদকে বলেছিলেন, তোমার যা ইচ্ছা তুমি বর চাও। তার উত্তরে ভক্তরাজ প্রহ্লাদ উত্তর দিয়েছিলেন — আমি তোমাকে ভালবাসি। প্রভু তোমার দর্শন পেয়েই আমি কৃতকৃত্য। ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ, কিছুই তোমার কাছে চাই না। যারা কিছু পাওয়ার আশায় তোমাকে ডাকে, তারা বেনিয়াবুদ্ধি সম্পন্ন, তারা তোমার ভক্ত নয় — ন স ভক্তঃ স বৈ বণিক্। যাঁরা যথার্থ ভগবৎ-প্রেমিক তাঁরা সম্পদ বিপদকে গ্রাহ্য করেন না, তাঁদের মনে কোন চাওয়া-পাওয়ার হিল্লোল উঠে না, তাঁরা তাঁর সেবা করে, নাম কীর্ত্তন করে, তাঁকে ডেকেই সুখ পায়।

মহাত্মার কথা শুনে তারা ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে অত্যন্ত তৃপ্ত মনে ফিরে গেল। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। আমরা মন্দিরে ঢুকে যে যার বিছানা পাতলাম। ফাল্গুন মাসের বারদিন হয়ে গেল। শীতের প্রকোপ কমলেও রাত্রিতে কম্বলমুড়ি দিতে হয়। আমি সাধুর সঙ্গে দু'একটা কথা

বলার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু তিনি একেবারে নীরব হয়ে গেলেন। অনেকক্ষণ অন্ধকারে বসে থাকার পর কৌতূহল বশে তিনি কি করছেন তা দেখার জন্য টর্চ জ্বাললাম। দেখলাম তিনি বিছানার উপর দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে আছেন দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তাঁর ভাবাবেগ কাটলে তিনি কোন কথা বলেন কিনা এই আশায় বসে থেকে থেকে শুয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল ভোরে দিওয়ানাজীর গানের শব্দে। তিনি বিভোর হয়ে গাইছেন —

নৈনোঁকী করি কোঠরী পুতরী পলংগ বিছায়।
পলকোঁ কী চিক ডারিকৈ পিয়াকো লিয়া রিঝায়।
প্রীতমকো পাতিয়া লিখুঁ, যো রহেঁ বিদেশ।
তনমেঁ মনমেঁ নৈনমেঁ তাকৌ কহা সন্দেস।।

দরবিগলিত ধারায় কাঁদতে কাঁদতে মহাত্মা বলছেন — চোখকে করলাম কামরা, তাতে পাতলাম আঁখি তারার পালং। তারপর ফেলে দিলাম চোখের নিমেষের চিক। তাতে প্রসন্ন হলেন আমার প্রীতম্ পিয়ারা। প্রিয়তম বিদেশে থাকলে তাঁকে চিঠি লিখতাম কিন্তু তিনি যে শরীরে মনে নয়নে সর্বত্র জুড়ে রয়েছেন, আমাকে জড়িয়ে রয়েছেন, তাঁকে আর কোথায় খবর পাঠাব?

দিওয়ানাজী দিওয়ানাই বটেন। ভগবানের নামে পাগল। অনেক ওস্তাদের গান শুনেছি, তাঁদের দরাজ গলার মুন্সীয়ানা দেখে অনেক সময় চমকে গেছি। অনেক 'কিন্নর-কণ্ঠী', কোকিল কণ্ঠী নামক প্রখ্যাতা গায়িকাদের গান শোনারও সৌভাগ্য আমার হয়েছে। তাঁদের সুরের মাধুরী মনকে দোলা দিয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু এই বৃদ্ধ সাধুর বৃদ্ধ বয়সের কণ্ঠস্বরে এমন একটা স্বতঃস্ফূর্ত আবেগ এবং আর্তি জড়িয়ে আছে যে মনে হচ্ছে এ যেন তাঁর প্রাণের গান। মর্মদেশের কেন্দ্র থেকে উৎসারিত হয়ে তাঁর প্রাণের কান্না অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে তাঁর প্রীতম্ প্রিয়তমের চরণতলে। গান শুনে আমারই প্রাণে কান্না উজিয়ে আসছে। আনন্দ বেদনার একসঙ্গে অনুভূতি আমার জীবনে এই প্রথম। 'প্রীতম্ কো পাতিয়া লিখুঁ' এই শব্দ কয়টি, মহাত্মার উচ্চারণ করার ভঙ্গীতে, তাঁর সুর সৃষ্টির উদ্বেল মূর্চ্ছনায় আমার মনকে উথাল পাথাল করে তুলল।

মহাত্মা নীরব হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ বসে থেকে আমি প্রাতঃকৃত্য করার জন্য বাইরে গেলাম। ঘন্টাখানিক দেরী হয়েছে। নর্মদার ঘাট থেকে ফিরে এসে দেখি মন্দিরের মধ্যে যেন সোরগোল পড়েছে। মন্দিরের পুরোহিত এবং আরও পাঁচছয়জন ভক্ত এসেছেন মন্দিরে পূজা দিতে। আমাকে দেখেই পুরোহিতমশাই বললেন —দিওয়ানা মহারাজকো সমাধি লাগ গিয়া।

আমি বললাম — তব্ আপ্‌লোক ভজন করিয়ে, কীর্তন করিয়ে। ভগবানকী নামকা প্রতাপসে সমাধিসে উনকো ব্যুত্থান ঘটেগা।

কথাটা আমি হালকা ভাবেই বলেছিলাম। কারণ আজকাল গান করতে করতে বা গান শুনতে শুনতে অনেক সাধুবেশী ধূর্তকে হাত পা খিঁচে বা অভয় বাণী দিবার ভঙ্গীতে (যার অন্যনাম বরাভয় মুদ্রা) উপর দিকে হাত তুলে সমাধির ঢং করতে দেখা যায় আর এইরকম তথাকথিত 'দশাপ্রাপ্ত' বা 'ভাবস্থ' সাধুর ভক্তরা তাঁকে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে অবতার বানিয়ে প্রচারের ডঙ্কা বাজাতে থাকেন। পাতঞ্জল-যোগদর্শনে সবীজ, নির্বীজ, সবিতর্ক,

নির্বিতর্ক, সম্প্রজ্ঞাত, অসম্প্রজ্ঞাত, সবিকল্প নির্বিকল্প প্রভৃতি সমাধির সংজ্ঞা, লক্ষণ এবং কোন্ সমাধিতে কি রকম অনুভূতি হয় তার বিশদ আলেচনা আছে। পাতঞ্জল-যোগদর্শন ছাড়া নাথপন্থী যোগী এবং মরমী সাধকদের মধ্যে সহজ সমাধি, আনন্দ সমাধি, চৈতন্য-সমাধি প্রভৃতি আরও কয়েক প্রকারের সমাধির কথা আছে। হঠযোগীরা খেচরীমুদ্রা প্রভৃতি কয়েকটি যৌগিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যে সমাধির অবস্থা লাভ করেন, তার নাম জড়সমাধি। ভক্তিপথের পথিকদের মধ্যে ভাবসমাধি কথাটা বহুল প্রচলিত। বলাবাহুল্য পাতঞ্জলোক্ত যে কোনও সমাধির চেয়ে জড়সমাধি বা ভাবসমাধি অনেক নিম্নস্তরের সমাধি। সমাধি শব্দটির সহজ অর্থ 'সমভাবে অধিষ্ঠান'। স্বরূপস্থিতি হলে কিংবা চৈতন্য জাগরণ ঘটলে সাধক স্থূল সূক্ষ্ম কারণ এবং তূরীয় ভূমিতে একই অবস্থায় থাকেন, তাঁর জ্ঞানদৃষ্টিতে যাবতীয় তত্ত্বের সমাধান হয়। তখন ধ্যেয় ধ্যাতা ধ্যান, জ্ঞেয় জ্ঞাতা জ্ঞান, দ্রষ্টা দৃশ্য দর্শন — এই ত্রিপুটের লয় হয়। আত্মসাক্ষাতকার ঘটে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দিওয়ানাজীকে দেখতে লাগলাম। তাঁর দেহে কোন স্পন্দন নাই, নাসাভ্যন্তরচারিণো বায়ু, নাসিকার বাইরে শ্বাস প্রশ্বাসের কোন ক্রিয়া নাই, হৃদ্‌পিণ্ডও স্তব্ধ, ঊর্ধ্বদৃষ্টি, দেহটি নির্বাত নিষ্কম্প দীপশিখার মত স্থির। তাঁর চোখে মুখে নাকে কপালে হাসির ভাব, আনন্দ ও জ্যোতি যেন উছলে পড়ছে!

ভক্তদেরকে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন থামিয়ে তাঁর আসন থেকে দূরে বসে কেবল 'রেবা রেবা' জপ করতে বললাম। প্রায় বেলা বারটা নাগাদ ধীরে ধীরে তাঁর দেহে স্পন্দন দেখা দিল, শ্বাস প্রশ্বাসও স্বাভাবিক হয়ে এল। আমি আর পুরোহিতমশাই দুজনে তাঁকে ধরাধরি করে শুইয়ে দিলাম। চোখেমুখে নর্মদার জল ছিটিয়ে দিলাম। পূজা করে যাবার সময় পুরোহিত মশাইকে সম্ভব হলে মহাত্মার জন্যে কিছুটা গরম দুধ সংগ্রহ করে আনতে বললাম। ঘন্টাখানিকের মধ্যে তিনি দুধ নিয়ে এবং আমার জন্য রুটি ও ফল নিয়ে উপস্থিত হলেন। দুধ খেয়ে তিনি শুয়েই থাকলেন।

ভেবেছিলাম, আজ সারাদিনে অন্ততঃ বিশ পঁচিশ মাইল রাস্তা হেঁটে ফেলব। তা আর হল না। তা না হোক, একজন সমাধিবান যোগী এবং ভক্তের দুর্লভ সমাধি দর্শন করলাম, এও ত কম লাভ নয়। বেলা চারটার সময় তিনি উঠে বসলেন। দেওয়াল ধরে ধরে তিনি চলবার উপক্রম করতেই আমি তাঁর ইচ্ছানুসারে তাঁকে ধরে ধরে নর্মদার ঘাট পর্যন্ত নিয়ে গেলাম। তিনি স্নান করলেন। স্নান করে স্বাভাবিক মানুযের মত হেঁটে মন্দিরে এলেন। পুরোহিতমশাই এসেছেন সাধুর অবস্থা দেখতে। রাত্রে মন্দিরে প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা করে গেলেন। যে যার শয্যায় বসে আছি। অন্ধকার অনেক আগেই হয়ে গেছে। আমি তাঁকে অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলাম — কাল রাত্রে আপনার কি ধরণের অতীন্দ্রিয় দর্শন ঘটেছিল? আপনার দিব্য অবস্থা দেখে আমি আপনাকে কতকটা চিনবার সুযোগ পেয়েছি। এই কথা বলা মাত্রই তিনি কচি শিশুর মত আধো আধো বুলিতে স্খলিতকণ্ঠে বলে উঠলেন — তনমেঁ মনমেঁ নৈনমেঁ...। আমি তাঁকে আর কোন কথা বলতে দিলাম না। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে তাঁর মনকে নামিয়ে আনার জন্য আবহাওয়ার কথা, বৈষ্ণব-তীর্থ আর কতদূর, কাল সেখানে আমরা পৌঁছতে পারব কিনা ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গ একসঙ্গে এনে ফেললাম। বলতে লাগলাম, রেবাখণ্ডম্ পুঁথি ঘেঁটে আমি বৈষ্ণবতীর্থের কথা পেয়েছি কিন্তু ঐ পুঁথিতে কোন স্থানের নাম

নাই, 'অনন্তর এই তীর্থে যাইবে, অনন্তর ঐ তীর্থে যাইবে', উত্তরতটের তীর্থ এবং দক্ষিণতটের তীর্থ সব এলোমেলো ভাবে লেখা, ক্রমানুসারে তীর্থগুলির বর্ণনা সাজানো নাই, কোন তীর্থেরই সাময়িক স্থানীয় নামের (Local Name) উল্লেখ নাই। দেখে শুনে মনে হয় পুঁথির রচয়িতা নিজেই হয়ত নর্মদা পরিক্রমা করেননি। কারও কাছে নর্মদাতটের বর্ণনা শুনে লিখে গেছেন।

সব শুনে তিনি বললেন — এ্যায়সা মৎ বলিয়ে। মার্কণ্ডেয় মহারাজ ক্ষুদ্ যুধিষ্ঠিরজীকো তীর্থয়োঁ কো নির্দেশ দিয়া থা। মার্কণ্ডেয় মুনিসে কৌন নর্মদা বারেমেঁ জ্যায়দা জানতা হৈ? উন্‌কা বখৎ মে নর্মদাকী অঞ্চল ঔর মহল্লা বাগেরা থোড়ি এ্যায়সা থা। ক্যাত্‌না পরিবর্তন হো চুকা হৈ। ক্রমানুসারে বর্ণনা নেই — উস্‌কা মতলব এহি হ্যায়, যো পরিক্রমা করেঙ্গে, উহ্ ক্ষুদ্ ঢুঁড়েঙ্গে, তালাস্ করেঙ্গে। উহ্ উন্‌কা নর্মদা-তপস্যা কী অঙ্গ হৈ।

আমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে। আমি বললাম — মহারাজ আমার ঘুম পেয়েছে। কাল সকালে কথা হবে। শুয়ে পড়লাম।

সকালে উঠে দেখি তিনি যাত্রা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে বসে আছেন। তাঁর স্নান পর্বও শেষ। আমাকে বললেন — আপভি নাহা লিজিয়ে। আমি তাড়াতাড়ি গাঁঠরী বেঁধে প্রাতঃকৃত্য ও স্নানাদি সেরে এলাম। মন্দিরের শিব এবং নর্মদাকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম পথে।

দিওয়ানাজীকে আজ বেশ দ্রুততালেই হাঁটতে দেখছি। পথ এখানে লাল ধূলায় ভর্তি, পথের দুপাশেও লাল কাঁকর। কিছু কিছু শালগাছ , ঘোড়কে নিম, আমলকী এবং তেঁতুলগাছের জটলা চোখে পড়ছে। নীরবেই দুজনে হাঁটছি। পথঘাট সূর্যরশ্মিতে ঝলমল করছে। বেলা দশটা নাগাধ পৌঁছিলাম বাবরীঘাটে। দিওয়ানাজী বললেন — ইহ্ বাবরীঘাট কা মন্দর কোই পুরানা মন্দির নেহি হ্যায়। মহল্লাবাসীয়োঁ নে নয়া বানায়া। ইসকাবাদ সীলকণ্ঠ। নর্মদার উপত্যকা অঞ্চলে হাঁটতে বিশেষ কষ্ট হয় না। বেলা বারটা নাগাদ সীলকণ্ঠ মহল্লায় পৌঁছে গেলাম। এখানে একটা গাছের তলায় কিছুক্ষণ বিশ্রাম করলাম। তিনি গুণগুণ করে কিছু গাইতে লাগলেন। গান ইনি ছাড়তে পারবেন না। গানেই এঁর বিশ্রাম, গানেই এঁর পূজা। ভজন গানই এঁর সাধনা। গান ভাঁজতে ভাঁজতে পাছে আবার ভাব রসে ভিজে মস্ত হয়ে যান, এইজন্য উঠে পড়বার জন্য তাড়া লাগালাম। হাসতে হাসতে তিনি উঠে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন — রাত্রি নয়টা পর্যন্ত হাঁটলে আজই আমরা ককেড়া সংগম এবং গৌনীসংগমের মধ্যস্থলে এই উত্তরতটে বৈষ্ণবতীর্থে পৌঁছে যেতে পারি কিন্তু দেড়ঘন্টা দুঘন্টা পথ হাঁটলেই আমরা পৌঁছব নীলকণ্ঠ ঘাটে। সেখানে আমার বন্ধু যোগনাথজীর আশ্রম। তিনি নাথপন্থী মহান্ যোগী। নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরের গায়ে তিনি আশ্রম বানিয়ে বাস করছেন। তিনি আজ আমাদেরকে কিছুতেই ছাড়বেন না। নীলকণ্ঠ-স্থানে তোমার একরাত্রি বাস করাও ভাল।

তথাস্তু। এদিকটায় দেখছি ক্রমেই ছোট ছোট জঙ্গলের আধিক্য বেশী। বেলা দেড়টা নাগাদ, অদূরেই একটি শিবমন্দিরের চূড়া দেখিয়ে বললেন — ঐ নীলকণ্ঠ। মহাত্মা যোগনাথজী ঐখানেই বাস করেন। চল, নর্মদার ঘাটে আমরা আর একবার চান করে নেই। হাঁটু পর্যন্ত দুজনেরই লাল ধূলায় ভর্তি।

নর্মদাতে নেমেই সাধু ভজন আরম্ভ করলেন —

বহুৎ দিননকী জোবতী বাট তুম্‌হারী রাম।
জিব তরসৈ তুঝ মিলন কুঁ মনি নাহী বিসরাম॥
বিরহিনী উঠৈ ভী পড়ে দরসন কারনি রাম।
মৌত্ কা পিছে দেহুগে সো দরসন কে হি কাম॥
মৌত্ পিছে জিনি মিলে কহে কবীরা রাম।
পাথর-ঘাটা-লোহে সব পারস কৌণেঁ কাম॥
বাসরি সুখ না রৈণিঁ সুখ না সুখ সুপিনৈ মাহিঁ।
কবীর বিছুট্যা রাম সূঁ নাঁ সুখ ধূপ ন ছাঁহি॥

হে রাম, বহুকাল ধরে তোমার পথ চেয়ে রয়েছি। তোমার সঙ্গে মিলনের জন্য প্রাণ ছটফট করছে , মনে একটুও শান্তি নাই। হে রাম, তোমার দর্শনের জন্য বিরহিনী উঠে দাঁড়াচ্ছে আর পড়ে পড়ে যাচ্ছে। মরবার পর তুমি যে দর্শন দেবে, তা কোন্ কাজে লাগবে। হে রাম, মরবার পর তোমায় পেতে চাই না। সব লোহা যদি পাথরই হয়ে যায় তাহলে স্পর্শমণি কোন্ কাজে আসবে। কবীর বলছেন — রামকে ছেড়ে দিনে সুখে নাই, সুখ নাই রাতে, স্বপ্নে সুখ নাই, রোদে সুখ নাই, ছায়াতেও সুখ নাই।

দিওয়ানা সাধু গান গাইলেই আমার ভাবনা হয়, এই বুঝি ভাবাবেশে ঢলে পড়েন। যাক্, সেরকম কিছু ঘটল না। আমরা দক্ষিণদিকে মুখ করে স্নান করছিলাম, পেছনদিকে মুখ ফেরাতেই দেখি একজন সৌম্যকান্তি সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর গলায় সেলি ও নাদ ঝুলছে, উভয় কর্ণের দুটি বড় ছিদ্রের মধ্যে গণ্ডারের সিং দিয়ে তৈরী সাদা দুটি কুণ্ডল, যার পারিভাষিক নাম — মুদ্রা। দিওয়ানজী মুখ ফেরাতেই ঐ সাধু হাতজোড় করে তাঁকে স্বাগত জানালেন — স্বাগতম্, সুস্বাগতম্। উভয়ে কোলাকুলি করলেন। দিওয়ানাজী তাঁর পরিচয় দিলেন — ইনিই মহান্ যোগী যোগনাথজী। আমাদের দুজনকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে তাঁর আশ্রমে নিয়ে এলেন। আশ্রমটি পাথরের তৈরী একতলা বাড়ী, সারি সারি পাঁচখানা ঘর আছে। নীলকণ্ঠ শিবমন্দিরের সংলগ্ন আশ্রম। যোগনাথজীর অনুমতি নিয়ে আমি মন্দিরে ঢুকলাম নীলকণ্ঠ মহাদেবকে প্রণাম করতে। প্রায় দুই ফুট লম্বা সাদা শিবলিঙ্গ। যোনিপীঠও সাদা পাথর দিয়ে তৈরী। সাদা হলেও ইনি স্ফটিক লিঙ্গ নন। শিবলিঙ্গের মধ্যস্থলে উজ্জ্বল কালো রং-এর বিন্দু ফোঁটার মত জ্বলজ্বল করছে। হেমাদ্রিধৃত লক্ষণকাণ্ডে নীলকণ্ঠ শিবের লক্ষণ দেওয়া আছে —

দীর্ঘকারং শুভ্রবর্ণং কৃষ্ণবিন্দুসমন্বিতম্।
নীলকণ্ঠং সমাখ্যাতং লিঙ্গং পূজ্যং সুরাসুরৈঃ॥

দেবতা এবং অসুরের পূজনীয় নীলকণ্ঠকে ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। শিবের পেছনেই তিনটি তৈলচিত্র, প্রত্যেকটির নীচে পরিচয় লেখা আছে — মহাসিদ্ধ গোরক্ষনাথজী, মহাযোগী গম্ভীরনাথজী এবং সদ্‌গুরু নিবৃত্তিনাথজী। মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর তৈলচিত্রের নিচে একটি শ্লোক লেখা আছে —

সুকেশং সুবেশং সুনেত্রং সুবক্তম্
সুনাশং সুহাসং সুপাণিং সুপাদম্।
সুকর্ণং সুবর্ণং সুবাচং সুশীলম্
প্রপন্নোঽহস্মি নাথং মনোহারিরূপম্॥

আমি ডায়েরীতে শ্লোকটি লিখে নিচ্ছি , এমন সময় চমকে উঠলাম দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বরে — ভুক্ লাগাজী। আভি আইয়ে। যোগনাথজীও এসেছেন। লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি তাঁদের সঙ্গে আশ্রমে এসে খেতে বসলাম। যোগনাথজীর দুজন আশ্রম সেবক পরিবেশন করলেন চাপাটি, অড়হরের ডাল, কড়াই প্রসাদ ইত্যাদি। পরিতৃপ্তিসহ ভোজন পর্ব সমাধা হল।

যোগনাথজীর দুপাশে দুটি ঘর আমাদের দুজনের থাকার জন্য বন্দোবস্ত করে দেওয়া হল। আশ্রমের প্রতি ঘরেই রেড়ির তেল দিয়ে প্রদীপ জ্বালার ব্যবস্থা। সন্ধ্যার পর আশ্রমের প্রশস্ত বারান্দায় বসে তিনজনে গল্প করতে লাগলাম। দিওয়ানাজী আমার পরিচয় দিতে গিয়ে কিভাবে আমি বাবার আদেশে তাঁর দেহান্তের পর নর্মদা পরিক্রমা করতে এসেছি, মহাত্মা শংকরনাথজীর সঙ্গে পরিক্রমায় বেরিয়ে কিভাবে নর্মদামাতার ইচ্ছায় পথ ভুলে কপিলধারা আশ্রমে আমার মাতৃপিতৃবীজ লাভ হয়েছে, আমার শিক্ষাদীক্ষা সব কিছুরই আনুপূর্বিক ইতিহাস গড়গড় করে তিনি বলে গেলেন। বিস্ময়ে আমার বাক্‌রোধ হবার জোগাড়। এতকথা ইনি কি করে জানলেন? মাত্র কয়েকদিন আগে তাঁর সঙ্গে আমার হোলিপুরার শিবমন্দিরে দেখা হয়েছে। আমার ব্যক্তিগত বিবরণ কিছুই তাঁকে জানাই নি। দিবার কোন প্রসঙ্গই ওঠে নি, তিনিও আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন নি। অথচ দেখছি, তিনি আমার সম্বন্ধে সবই জানে। বুঝলাম, সাধু চেনা বড়ই কঠিন, উচ্চকোটির মহাপুরুষকে চেনা অসম্ভব বললেও চলে!

প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য আমি যোগনাথজীকে তাঁর গুরুর কথা বলতে অনুরোধ করলাম। তিনি জানালেন — তাঁর গুরু মহাত্মা নিবৃত্তিনাথজী ছিলেন মহাযোগী গম্ভীরনাথজীর শিষ্য। গোরক্ষপুরের মোহান্ত সদ্‌গুরু গোপালনাথজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে কঠোর সাধনার দ্বারা গম্ভীরনাথজী মহাযোগেশ্বর পদে উন্নীত হন। অষ্টাদশ সিদ্ধি তাঁর করায়ত্ত ছিল। উনোনে মুর্দাকো জিন্দা করনে বালা মহাত্মা থে। উন্‌কো নাম আপ্ নাহি শুনা?

আমি উত্তর দিলাম — হ্যাঁ, তাঁর নাম আমি শুনেছি। বাঙালী মাত্রেই বোধহয় তাঁর নাম জানেন। কারণ, বাংলার সুপ্রসিদ্ধ মহাত্মা ঁবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাত্মা গম্ভীরনাথজীকে খুবই মান্য করতেন, তিনি তাঁর অলৌকিক সিদ্ধির কথা বাঙালীর কাছে তুলে ধরেন। তাছাড়া প্রসিদ্ধ সেবা প্রতিষ্ঠান ভারত সেবাশ্রম সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজীও যে গম্ভীরনাথজীর কাছে দীক্ষা নিয়ে মূলতঃ তারই অনুপ্রেরণায় ভারত-সেবাশ্রম সংঘ স্থাপন করে দুঃস্থ ও আর্তদের সেবা, তীর্থ-পাণ্ডাদের অনাচার এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো, বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের সেবা-যজ্ঞে আত্মনিয়োগরূপ মহাব্রতের প্রবর্তন করে গেছেন, এসব কথা আমি জানি। আমি গোরক্ষপুরে আপনাদের মূল গদী দেখে এসেছি। গয়াতে ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের গায়ে কপিলধারা আশ্রমে গম্ভীরনাথজী প্রতিষ্ঠিত যোগমঠ বা অভিনব সাধনগুহাও দেখে এসেছি। গোরক্ষপুর এবং গয়া উভয়স্থানেই তাঁর অলৌকিক জীবনের অনেক কাহিনীও শোনার সৌভাগ্য আমার হয়েছে।

— কিন্তু তুমি বোধহয় একথা শোননি যে মহাযোগী গম্ভীরনাথ প্রায় চার বৎসরকাল ধরে নর্মদার তটে তটে পরিক্রমা করেছিলেন? শুধু তাই নয়, তিনি গোরক্ষপুরের গদীতে মোহান্তরূপে অভিষিক্ত হবার পর তাঁর প্রধান দুই শিষ্য শান্তিনাথ এবং নিবৃত্তিনাথজীকে নর্মদা পরিক্রমা করতে পাঠিয়েছিলেন। মহাত্মা গম্ভীরনাথজী নর্মদা পরিক্রমাকালে এই নীলকণ্ঠ

মন্দিরে একমাস বাস করেছিলেন, তাই আমার গুরুদেব নিবৃত্তিনাথজী এখানে তাঁর গুরুদেবের স্মারকচিহ্ন হিসাবে এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে যান। তুমি যাঁর সঙ্গে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলে, অমরকন্টকবাসী সেই মহাত্মা শংকরনাথজী আমারই জ্যেষ্ঠ গুরুভ্রাতা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যার পারংগম ব্যক্তি তিনি।

আমি বললাম — মহাযোগী গম্ভীরনাথজীও যে নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন, একথা আমার জানা ছিল না। আপনার কাছেই প্রথম শুনলাম। দেওঘরের বালানন্দ ব্রহ্মচারী যে নর্মদা-পরিক্রমা করেছিলেন সেই কথা আমি শুনে এসেছি।

— তুমি যখন পরিক্রমা করছ তখন মহাযোগী গম্ভীরনাথজী এবং আমার গুরুদেব নিবৃত্তিনাথজী কিভাবে পরিক্রমা করতেন, সে কথা তোমার শুনে রাখা ভাল। পরিক্রমা করার সময় তাঁরা যে কেবল পথে চলতেই থাকতেন তা নয়। সাধনার উপযোগী যেসব স্থানে তাঁরা পৌঁছতেন, সেইসব স্থানে কোথাও একমাস, কোথাও দুইমাস, কোথাও চারমাস বা ছয়মাস পর্যন্ত অবস্থান করে সাধনায় ডুবে যেতেন আবার চলতে আরম্ভ করতেন নর্মদার তট ধরে। অনবরত চলতে থাকা তাঁদের স্বভাব ছিল না। তাঁরা জানতেন যে কেবলমাত্র পদব্রজে নদীটির দুই পাড় ঘুরে আসাই পরিক্রমার উদ্দেশ্য নয়; তাতে তীর্থের মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করাও সম্ভব হয় না। যে আধ্যাত্মিক ভাবপ্রবাহ বিশেষ স্থানে কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তার পবিত্র প্রভাবে সাধনার দ্বারা বর্হির্মুখীন চিত্তবৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে অন্তর্মুখীন্ করাই পরিক্রমার উদ্দেশ্য। চঞ্চল চিত্তে, চঞ্চল ইন্দ্রিয়গ্রাম নিয়ে দৌড়দৌড়ি করে যাঁরা তীর্থ ভ্রমণের কর্তব্যটি 'যেন-তেন-প্রকারেণ' শেষ করেন, তাঁদের পক্ষে তীর্থ ভ্রমণের মাহাত্ম্য উপলব্ধি করা কোনমতেই সম্ভব হয় না। ক্যা দিওয়ানাজী, হমারা বাত্ মেঁ কোঈ গলতি হৈ?

— নেহি জী। আপ্‌কা বাত্ বিলকুল ঠিক। এই কথা বলে দিওয়ানাজী আমার দিকে তাকিয়ে খোড়িবলী হিন্দীতে যা বলতে লাগলেন, তার সারমর্ম এই যে পরিক্রমার উদ্দেশ্য সাততাড়াতাড়ি কেবল নূতন নূতন স্থান দেখে বেড়ানো নয়। শাস্ত্রে কোথাও লেখা নাই, নর্মদামাতাও এমন কোন সময়সীমা বেঁধে দেন নি যে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়ি কি মরি করে অমরকন্টক থেকে রেবা সংগম পর্যন্ত ঘোরা শেষ করতে পারলেই পরিক্রমা কর্ম শেষ। মূল কথা, বৈদিক যুগের বহু ঋষি হতে আরম্ভ করে এ যুগের সাধু মুনিরা যে যে স্থানে বা ঘাটে বসে তপস্যা করেছিলেন, সেই সব স্থানে পর্যাপ্ত সময় দিয়ে ধ্যান ধারণা করলে সেইসব স্থানের চৈতন্য প্রবাহ সাধকের তপস্যার পথ খুলে দিতে সাহায্য করে।

তুমি সৌভাগ্যবান যে তোমার পিতাজী এই যুবা বয়সেই পরিক্রমা করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন। যুবা বয়সে শরীর মন যখন সতেজ এবং বলিষ্ঠ থাকে সেসময় পরিক্রমায় বেরিয়ে বিভিন্ন তপস্থলীতে সমাধিযোগ অভ্যাস করলে সাধনার পথ সুগম হয়। একাকী নিরাশ্রয়ভাবে বিপৎসঙ্কুল পথে চলতে চলতে মন নিরাশ্রয়ের আশ্রয় গুরু বা ভগবানকেই দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে অভ্যস্ত হয়। নিষ্কিঞ্চন অবস্থায় নিতান্ত অপরিচিত স্থানেও যখন ভিক্ষা জুটে যায়, তখন সহজেই উপলব্ধি হয় যে ভগবানই যোগক্ষেম বহন করে চলেছেন। পরিক্রমাকালে নানা সম্প্রদায়ের নানা সাধু ও মহাত্মার সংস্পর্শে আসার সুযোগ ঘটে। ফলে নানাবিধ সাধনার বহু গুহ্য-পদ্ধতি ও কৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়। উচ্চকোটির সিদ্ধ মহাত্মাদের তীব্র বৈরাগ্য, সাধন নিষ্ঠা এবং অলৌকিক উচ্চাবস্থা দেখে নিজেরও মুমুক্ষতা এবং সাধনার

ঐকান্তিকতা অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

কথায় কথায় রাত হয়ে গেছে। আসর ভাঙল। আমরা যে যার ঘরে শোবার জন্য চলে গেলাম। কি জানি কেন, আজ রাত্রে বাবার পুণ্যজীবনের নানা স্মৃতিকথা আমার মনকে উদ্বেল করে তুলল।

ঘুম ভাঙল খুব ভোরে। ফাল্গুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ গত হয়ে গেছে। তবুও বেশ ঠাণ্ডা, কম্বলমুড়ি দিয়ে শৌচে গেলাম। শৌচাদি সেরে মন্দিরের পাশ দিয়ে আসার সময় অতি মধুর বাঁশীর তান শুনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মনে হল মন্দিরের মধ্য থেকেই ঐ শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের পশ্চিমদিকের জানালাটি খোলা ছিল, কৌতূহল বশে উঁকি মেরে আমার মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল ভয়ে বিস্ময়ে এবং উত্তেজনা। দেখলাম, যোগনাথজী যোগাসনে সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে বসে আছেন, তাঁর নাসিকা হতে এক অদ্ভূত সুরেলা আওয়াজের একটানা ঝঙ্কার উঠছে। একটা সোনালী রং এর বিরাট বিষধর সাপ নীলকণ্ঠ শিবকে জড়িয়ে ধরে ফনাবিস্তার করে তালে তালে দুলছে! সেই দৃশ্য দেখে আমি একটু একটু করে পিছিয়ে দৌড়ে আশ্রমে এসে দিওয়ানাজীর ঘরের দরজায় টোকা মারলাম। কোন সাড়া পেলাম না। তখন ব্রহ্মচারীদেরকে কথাটা জানালাম। তাঁরা জানালেন — কোঈ ফিকরকা বাত নেহি। হমারা গুরু মহারাজ যব প্রাণায়াম করতা হে , তব্ যো মিঠিমিঠি সুর নিকালতা হৈ, ওহি সুর মে মোহিত হোকর সর্পরাজ উনকা পাশ হররোজ আতা হৈ। উহ্ কাটেগা নেহি।

মনের উদ্বেগ গেল না, নিজের ঘরে বসে শিবমন্দিরের দিকে তাকিয়ে বসে থাকলাম। প্রায় ঘন্টাখানিক বাদে 'হর নর্মদে হর' বলতে বলতে কমণ্ডলু হাতে যোগনাথজী আশ্রম-বাড়ীতে ফিরে এলেন। অনেকক্ষণ আগেই সূর্য উঠেছেন। রৌদ্রকরোজ্জ্বল পর্বত ও নর্মদা অপূর্ব শোভা ধারণ করেছে। দিওয়ানাজীর ঘর তখনও বন্ধ। বেলা দশটা নাগাদ আমি স্নান করতে গেলাম। মন্দিরে ভয়ে ভয়ে ঢুকলাম পূজা করতে। ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলাম, মন্দিরে কোন সাপও নাই, সাপের গর্তও নাই। নীলকণ্ঠের পূজা যোগনাথজী আগেই করে গেছেন, পুষ্পপাত্রে প্রচুর বেলপাতা এবং বনফুল রাখা আছে। পূজা শেষ করে ঋষি কুৎস দৃষ্ট বেদমন্ত্র পাঠ করছি, দুই ব্রহ্মচারী ভোগের থালা রেখে আমাকেই নিবেদন করতে বলে গেলেন।

পূজা শেষে আশ্রমে ফিরে এলাম। সূর্য তখন মধ্যগগনে। তখনও দিওয়ানাজীর ঘর বন্ধ। যোগনাথজী আমাকে বললেন — দিওয়ানাজী নিশ্চয়ই সমাধিস্থ। সমাধি অবস্থায় তাঁর এইরকম একদিন দুদিন কেটে যায়। তুমি চঞ্চল হয়ো না। আমরা ওঁকে ভালভাবেই জানি। আমরা এস প্রসাদ গ্রহণ করি।

খাবার পর আমি ঘরে বসে ডায়েরী লিখতে বসলাম। কিছু দেহাতি ভক্ত এসেছেন যোগনাথজীর কাছে। তিনি তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত। আমার মন কিন্তু পড়ে আছে দিওয়ানাজীর ঘরের দিকে। কোন সাড়াশব্দ নাই , ভিতর থেকে অর্গলবদ্ধ, ঘরের একটি মাত্র জানালা; তাও বন্ধ। ঘরের মধ্যে তিনি কি অবস্থায় পড়ে আছেন; তা উঁকি মেরে দেখারও উপায় নাই। বেলা তিনটা নাগাদ, বারান্দায় যেখানে রোদ পড়েছে সেখানে যোগনাথজী বসলেন, আমাকেও ডাকলেন। আমি সকালে তাঁর সেই নাসিকা হতে উদ্ভূত মন-মাতাল করা ধ্বনি (enchanting and intoxicating melody) এবং তালে তালে সোনালী সাপের

ফনার দোল্-এর কথা ভুলি নি। তার রহস্য জানার জন্য মন উন্মুখ হয়ে আছে। কিন্তু সরাসরি সেই সাধন-রহস্যের কথা জিজ্ঞাসা করলে যদি তিনি কোন উত্তর না দেন, এই আশঙ্কায় সরলভাবে জিজ্ঞাসা করলাম, গোরক্ষনাথজীর সম্প্রদায়ে কি হঠযোগই মুখ্য সাধন? না, অন্য কোন নিগূঢ় সাধন-পদ্ধতি আছে?

তিনি বললেন — গুরু গোরক্ষনাথজী শ্রেষ্ঠ যোগী গুরু ছিলেন, নাথপন্থে হঠযোগ, রাজযোগ, লয়যোগ, মন্ত্রযোগ প্রভৃতির সাধনা আছে সন্দেহ নাই, তবে সাধারণতঃ গৃহী শিষ্যকে প্রথমে গুরু গোরক্ষ, শিব গোরক্ষ প্রভৃতি যে কোন একটি সিদ্ধমন্ত্র গুরু দান করেন। মন্ত্রযোগে উন্নতি করতে পারলে অনাহত নাদের সাধন শব্দযোগও দেওয়া হয়ে থাকে। তবে যাঁরা সন্ন্যাস গ্রহণ করে পন্থের অন্তর্ভুক্ত হতে চান তাঁদেরকে গুরু আধার ও অধিকার বিচার করে কিছু অন্তরঙ্গ সাধনার পদ্ধতি শেখান। তার সঙ্গে থাকে কিছু সাম্প্রদায়িক আচার। গুরু স্বহস্তে কাঁচি দিয়ে শিষ্যের শিখা বা একগোছা চুল কেটে দেন। এর নাম 'ঝুঁটিকাটা' বা 'চুটিকাটা। এই ঝুঁটিকাটা মুণ্ডনের অনুকল্প। এর তাৎপর্য এই যে, গুরু-শিষ্যর মস্তক মুণ্ডন করে তার পূর্বজীবনের অবসান ও নবজীবনের আরম্ভ করে দিলেন। তখন সাধকের পুনর্জন্ম। তখন তাকে পূর্বাশ্রমের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করে গুরুদত্ত নূতন নাম গ্রহণ করতে হয়। ঝুঁটি-কাটার সঙ্গে নাদ ও সেলি ধারণ করতে হয়।

নাথযোগীদের দ্বিতীয় স্তরের দীক্ষায় গুরু-শিষ্যের দুই কানে দুটি বড় ছিদ্র করে তাতে গণ্ডারের শিং-এর কুণ্ডল পরিয়ে দেন। এর নাম যথাক্রমে শিবকুণ্ডল, মুদ্রা বা দর্শন। যোগে সিদ্ধিলাভ করার জন্য এর বিশেষ কোন মূল্য নাই। যোগীসমাজে অনধিকারী যাতে প্রবেশ করতে না পারে সেইজন্য এই কষ্টকর কর্ণচ্ছেদনের ব্যবস্থা নাথগুরুগণ প্রবর্তন করেছিলেন।

চুটিকাটা এবং কানফাটা ছাড়া উপদেশী দীক্ষা নামে তৃতীয় প্রকারের দীক্ষাবিধি আছে। উপদেশী দীক্ষাকালে মন্ত্রপূত জ্যোৎ-জাগান, হরপার্বতী, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, গণেশ ও গোরক্ষনাথের পূজা, ভাং মদ্য মাংস প্রভৃতির দ্বারা আকাশ-ভৈরবের পূজা করা হয়। কেবল উপদেশীরাই ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারে, অন্যের পক্ষে প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এ ছাড়া চতুর্থ প্রকারের এক দীক্ষা পদ্ধতি আছে। এর নাম অজপা গায়ত্রী দীক্ষা বা হংস-মন্ত্রের সাধনা।

গুরু গোরক্ষনাথ এই গুহ্যসাধন পদ্ধতির সঙ্কেত বলতে গিয়ে বলেছেন —

'হং' কারেণ বর্হির্যাতি 'স' কারেণ' বিশেৎ পুনঃ।
হংস-হংসেতি অমুং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা॥
ষট্‌শতানি দিবারাত্রৌ সহস্রাণ্যেক বিংশতিঃ।
এতৎ সংখ্যান্বিতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্বদা॥
অজপা নাম গায়ত্রী যোগিনাং মোক্ষদায়িনী।
তস্যাঃ স্মরণমাত্রেণ সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সময়ে 'হং' শব্দের সঙ্গে বায়ু বাইরে আসে এবং 'স' শব্দের সঙ্গে পুনরায় প্রবেশ করে। জীব স্বভাবতঃ সর্বদাই হংস মন্ত্র জপ করছে। দিবারাত্রিতে ২১৬০০ বার প্রত্যেকেই এই মন্ত্র জপ করে (প্রতি মিনিটে ১৫ বার শ্বাস-প্রশ্বাস হয় এই হিসাবে ২৪ x ৬০ x ১৫ = ২১৬০০ বার)। প্রত্যেক শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এই যে হংস জপ চলছে,

তা যদি মনোযোগের সঙ্গে শ্বাস প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য করে অনুভব করতে অভ্যাস করা যায়, তবে অজপা নামক গায়ত্রীর সাধন হয়। ঠোঁট, জিহ্বা বা মনের সাহায্যে বিশেষ কোন বীজমন্ত্রকে বারবার উচ্চারণ করে এই জপ করা হচ্ছে না, তাই এর নাম অজপা।

অজপা গায়ত্রী যোগীগণের মোক্ষদায়িনী। হংস মন্ত্রের তাৎপর্য 'অহংসঃ'— সোহহং অর্থাৎ আমি স্বরূপতঃ ব্রহ্ম। শ্বাস-প্রশ্বাস অহরহ আমাদেরকে তা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। শ্বাস গ্রহণ ও ত্যাগের মধ্যবর্তী ক্ষণে স্বভাবতঃ আমরা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হই। বুদ্ধিপূর্বক শ্বাস-প্রশ্বাসের অনুসরণ করে সেই ভাবটি স্মরণ করতে করতে স্থায়ী করবার চেষ্টাই এই সাধনার উদ্দেশ্য। অর্ন্তদর্শী গুরুর নিকট বসে শ্বাস গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যবর্তী ক্ষণটি ধরার কৌশল জেনে নিতে হয়। অজপা গায়ত্রী সিদ্ধ মহাপুরুষ ছাড়া আর কারও পক্ষে এই কৌশল ধরবার এবং সেই পথে চালনা করবার ক্ষমতা নাই।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। যোগনাথজী মন্দিরে গেলেন তাঁর আপন কাজে। আমি দিওয়ানাজীর ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কোন শব্দ পেলাম না। নর্মদার ঘাটে গিয়ে বসলাম সন্ধ্যা করতে।

পরদিন সকালে উঠে যথারীতি কৌতূহল চরিতার্থ করবার জন্য মন্দিরের জানালার কাছে দাঁড়ালাম, উঁকি মেরে দেখলাম যোগনাথজী পূর্বদিনের মত ধ্যানে তন্ময় হয়ে আছেন, তাঁর নাসিকার অভ্যন্তর থেকে পূর্ববৎ শ্রুতিমধুর বংশীধ্বনি ভেসে আসছে। কিন্তু সেই সোনালী সাপটিকে আজ দেখছি না। আজও বেলা দশটা নাগাদ স্নান সেরে নীলকন্ঠের পূজা করলাম। আজ নর্মদার জলে ভাল করে মার্জনা করতে করতে বুঝতে পারলাম লিঙ্গের মধ্যবর্তী উজ্জ্বল ফোঁটাটি কৃষ্ণবর্ণের নয়, গাঢ় নীল। পূজা করে এসে আশ্রমে বসে যোগনাথজীর সঙ্গে বসে গল্প করছি , ব্রহ্মচারী দুজন ভোগ তৈরীর কাজে ব্যস্ত, এমন সময় দিওয়ানাজীর ঘর থেকে একটা গানের কলি ভেসে এল। শশব্যস্তে আমরা দুইজনে তাঁর ঘরের দরজার কাছে এসে কান পাতলাম, দিওয়ানাজী মৃদুকন্ঠে 'গান গাইছেন —সাধো, সো সতগুরু মোঁহি ভাবে।

সৎপ্রেমকা ভর ভর পেয়ালা,
আপ্ পিবৈ মোঁহি পিয়াবে।।

সাধু, সেই সদ্‌গুরুকে আমার ভাল লাগে যিনি সাচ্চা প্রেমের পেয়ালা ভরে ভরে নিজে খান আর আমাকেও খাওয়ান।

আমরা স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, তিনি এই তিনলাইন ভজনগানই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইছেন। দরজা বন্ধই আছে, দরজা খোলার কোন লক্ষণ দেখলাম না। যোগনাথজী তাঁর একজন সেবককে বললেন — দিওয়ানাজী সমাধিসে জাগ গিয়া। একঠো বিল্বপত্র ঔর দো'চামচ ঘিউ গরম করকে রাখনা। আমাকে বললেন, মন্দিরে ভোগ নিবেদন করে আসতে। আমি ভোগ নিবেদন করে ফিরে এলাম, তখনও দেখি দিওয়ানাজীর ঘর বন্ধ। যোগনাথজী দরজার কাছে দাঁড়িয়েই আছেন। মিনিট দশেক পরে আবার তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল, এখনও গলার স্বর স্বাভাবিক নয়। তিনি কাঁপা কাঁপা কণ্ঠে গাইছেন —

আরে, লালী মেরে লালকী জিত দেখোঁ তিত লাল।
লালী দেখন মৈঁ গঈ মৈঁ ভী হো গঈ লাল।

অর্থাৎ তিনি বলছেন, আরে আমার প্রীতম্ প্রিয়তমের লালিমা সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। যেদিকেই তাকাই সেদিকেই সেই লাল। সেই লালিমা দেখার জন্য আমি গেলাম। গিয়ে আমিও লাল হয়ে গেলাম।

আরও পনের মিনিট পরে তাঁর দরজা খোলার শব্দ পাওয়া গেল। দিওয়ানাজী ঘর থেকে টলতে টলতে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন তাঁর সারা শরীরের লালিমা দেখে অবাক হয়ে গেলাম। যোগনাথজী তাঁকে দুহাতে ধরে বারান্দায় কম্বলের উপর বসিয়ে দিলেন। যোগনাথজী তাঁকে বেলপাতা থেঁতো করে দুচামচ ঈষদুষ্ণ গরম ঘি এর সঙ্গে একটু একটু করে খাইয়ে দিলেন। আমার দিকে তাকিয়ে দিওয়ানাজী বললেন বিহানমেঁ সুবাহ্ বৈযেগ্ন তীর্থ জানেকা বাত হৈ ন? যোগনাথজী তাঁকে হাসতে হাসতে বললেন — দো রোজ আপ্, কাল ঔর সময়কে উধার থে! অভি উহ্ বাত্ ছোড় দিজিয়ে। আপ যো বিহানকা বাত বোল রহা হৈ, উঁহ্ দো রোজ পহেলেই বীত গয়া। ঔর দো রোজ বাদ হম্ ছুণ্ডিয়া যায়েঙ্গে। হম্ লোগ্ এক সাথমেঁ চলেঙ্গে।

কিছুক্ষণ পরেই যোগনাথজী দিওয়ানাজীর সঙ্গে গিয়ে তাঁকে নর্মদাতে স্নান করিয়ে নিয়ে এলেন। তাঁরা যখন নর্মদার ঘাটে গেছলেন তখন একজন ব্রহ্মচারী বললেন — আমরা গুরুজীর (যোগনাথজী) কাছে শুনেছি, দিওয়ানাজী সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করার সামর্থ্য রাখেন। পৌঁছে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়। নিজেকে ছিপিয়ে অর্থাৎ প্রচ্ছন্ন করে রাখেন। ওঁর ঐরকম সমাধি আরও দু'একবার আমরা দেখেছি। উনি দিওয়ানা অর্থাৎ পাগল সেজে থাকেন।

একজন প্রকৃত সমাধিবান যোগী এবং প্রেমিক সাধুর দর্শন পেয়ে আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করছি। নর্মদা-পরিক্রমা করতে না এলে এই দুর্লভ সৌভাগ্য আমার জীবনে কি ঘটত ? বাবা কেন যে আমাকে তাঁর অন্তিমকালেও নর্মদা-পরিক্রমা করার কথা বারবার করে বলে গেছলেন, তা এখন মর্মে মর্মে অনুভব করছি। তাঁরা স্নান করে আসার পরেই আমরা খেতে বসলাম।

খাওয়া-দাওয়ার পর বারান্দাতে আমরা সবাই বসে বসে গল্প করতে থাকলাম। একথা-সেকথা বলতে বলতে আমি যোগনাথজীকে প্রশ্ন করে বসলাম — কোন কোন যোগীকে দেখেছি, প্রাণায়াম করতে করতে তাঁদের নাক থেকে এক অদ্ভুত সুরেলা বাঁশীর তান নিরবচ্ছিন্ন ধারায় ভেসে আসতে থাকে। সেই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে যোগীর কাছে সাপ এসে উপস্থিত হয় কিন্তু দংশন করে না। উত্তরকাশীতে এক মহাত্মাকে এক ধরণের প্রাণায়াম করতে দেখেছিলাম, প্রাণায়ামের পর তাঁর বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত হয়ে যেত। সে সময় তাঁর গায়ে ঝাঁকে ঝাঁকে মৌমাছি এসে বসত। দুঘন্টা তিনঘন্টার পর যখন তাঁর প্রাণায়াম ও ধ্যানাবস্থার অবসান ঘটত, তখন মৌমাছিগুলো আপনা হতেই উড়ে যেত, তাঁর গায়ে দংশনের কোন চিহ্ন দেখতে পাই নি। কেন এরকম হয় এবং কিভাবে হয়? যোগের পথে উন্নতি করতে হলে কি প্রাণায়াম অভ্যাস খুবই জরুরী?

প্রায় একই সঙ্গে দুই মহাত্মা দুরকম উত্তর দিলেন।

যোগনাথজী বললেন — 'জরুর' আর দিওয়ানাজী বলে উঠলেন — প্রাণায়াম জরুরী নেহি হ্যায়, প্রেম জরুরী। প্রীতম্ কো পিয়ারা করো। বিনা প্রেম সে না মিলে নন্দলালা।

দু'মিনিট চুপ থেকে যোগনাথজী বলতে থাকলেন — রেচক পূরক কুম্ভকের সাহায্যে

নাড়ী শোধন হয়। নৌলী, ধৌতি কপালভাতি ইত্যাদি ষটকর্মের দ্বারা শরীর রোগশূন্য হয়। হঠযোগপ্রদীপিকা এবং গোরক্ষসংহিতাতে ষটকর্মের বিস্তৃত বর্ণনা আছে। শরীরস্থ বায়ুকে ত্যাগ করার নাম রেচক, বায়ুকে শরীর মধ্যে পূর্ণ করার নাম পূরক আর শরীর মধ্যে বায়ুস্তম্ভন অর্থাৎ নিশ্বাস অবরোধকে কুম্ভক বলা হয়। কুম্ভক নানা প্রকার। যে কুম্ভকের দ্বারা বিজৃম্ভন এবং মুখ ও নাসিকার শীৎকার হয়, তার নাম শীৎকার-কুম্ভক। যে কুম্ভক দ্বারা বায়ু পূরণকালে ভৃঙ্গনাদ এবং রেচককালে ভৃঙ্গীনাদ হয়, তার নাম — ভ্রামরী-কুম্ভক। ভ্রামরী কুম্ভকে সিদ্ধিলাভ করলে যোগীর সাধনাকালে বাঁশীর তান এবং মধুর তানে আকৃষ্ট হয়ে সর্পরাজ বা মৌমাছির আবির্ভাব মোটেই বিচিত্র নয়। যোগে এইরকম বিচিত্র ব্যাপার ঘটে থাকে। ভ্রামরী কুম্ভকের পরাবস্থায় যোগীর গাত্রস্বেদে মধুর মত মিষ্টতা থাকে, উত্তরকাশীর যোগী যোগাসনে থাকাকালে এইজন্যই তাঁর শরীরে মৌমাছির ঝাঁক এসে বসত।

যাই হোক, তাঁর কাছে যে সোনালী রং এর বিষাক্ত সাপকে ফণাবিস্তার করে বসে থাকতে দেখেছি তার রহস্য জানা গেল। আমি আরও কিছু জানার জন্য আবার জিজ্ঞাসার ছলে বললাম — প্রাণায়াম ত প্রাণের অয়মন বা বিস্তার। সেজন্য কি বায়ুত্যাগ, বায়ুপূরণ এবং বায়ুরোধ কি খুবই জরুরী? আমি ত শুনেছি, রেচক পূরক কুম্ভক ত প্রাণায়ামের ক্রিয়ামাত্র, ঐগুলির দ্বারা প্রাণশক্তির বিস্তার ঘটে না, কাজেই প্রকৃত প্রাণায়াম নয়। যার দ্বারা প্রাণারামের সঙ্গে জীবসত্তার মিলন ঘটে তারই পারিভাষিক নাম প্রাণায়াম। প্রাণায়াম কোন মতেই বাহ্যিক ক্রিয়া বিশেষ নয়। কবীর বলেছেন — মানুষের হৃদপিণ্ড কি কামারশালের ভস্ত্রা যে তার সাহায্যে বাতাস নিতে হবে আর ছাড়তে হবে?

দিওয়ানাজী হঠাৎ বলে উঠলেন — প্রাণায়াম, প্রাণায়াম প্রাণারাম — বহুত আচ্ছা বাত আপনে বাতায়া।

আমার কথায় যোগনাথজী যথেষ্ট তেতে উঠেছেন দেখলাম। অত্যন্ত ঝাঁঝের সঙ্গে তিনি বলে উঠলেন —যম নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণ ধ্যান সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ যোগের চতুর্থ অঙ্গ প্রাণায়াম; যার অনিবার্য উপযোগিতার কথা হঠযোগপ্রদীপিকা, গোরক্ষসংহিতা এবং দত্তাত্রেয় সংহিতাতে আছে, তা তুমি মানতে পারছ না এতো বড় আশ্চর্য কথা!

আমি বললাম — উপযোগিতা হয়ত নিশ্চয়ই আছে কিন্তু যোগিসমাজে প্রাণায়াম বলতে রেচক পূরক ও কুম্ভকের যে খেলা দেখি, সেইসব পদ্ধতি মহর্ষি পতঞ্জল কথিত বৈদিক প্রাণায়ামের সঙ্গে মেলে না।

— পাতঞ্জল যোগদর্শনে কি রকম বৈদিক প্রাণায়ামের কথা আছে?

আমি বললাম — আপনি আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন — প্রচ্ছর্দ্দন বিধারণাভ্যাং বা প্রাণস্য (পা, সমাধিপাদ, সূত্র ৩৪)। এই সূত্রের ব্যাখ্যা হচ্ছে যে, অত্যন্ত বেগের সঙ্গে বমন হলে যেমন অন্নজল বের হয়ে যায়, সেইরকম বলপূর্বক প্রাণকে বাইরে নিক্ষেপ করে যথাশক্তি বাইরেই নিরুদ্ধ করতে হয়। ঐসময় মূল ইন্দ্রিয়কে উর্দ্ধ দিকে আকর্ষণ করে রাখতে হয়। যখন অস্থিরতা আসবে, তখন ধীরে ধীরে বায়ুকে ভিতরে এনে পুনরায় সামর্থ্যানুসারে বাইরে যতক্ষণ পারা যায় নিরুদ্ধ করে রাখতে হবে এবং মনে মনে ওঁকার জপ করতে হবে। তাতে মন পবিত্র হয়ে ধীরে ধীরে স্থির হবে। পাতঞ্জলোক্ত প্রাণায়ামের

চারটি ভাগ — (১) বাহ্যবিষয়ক, (২) আভ্যন্তর বিষয়ক, (৩) স্তম্ভবৃত্তি , (৪) বাহ্যাভ্যন্তর ক্ষেপী। 'বাহ্যবিষয়ক' অর্থাৎ প্রাণকে বহুক্ষণ বাইরেই নিরোধ করা। 'আভ্যন্তর' অর্থাৎ প্রাণকে যতক্ষণ বাইরে নিরোধ করা যায় ততক্ষণ নিরোধ করা। 'স্তম্ভবৃত্তি' অর্থাৎ এক সঙ্গেই যে স্থানের প্রাণ সেইস্থানেই যথাশক্তি নিরুদ্ধ রাখা। 'বাহ্যাভ্যন্তরক্ষেপী' অর্থাৎ যখন প্রাণ ভিতর হতে বাইরে আসতে থাকে, তখন তার বিরুদ্ধে তাকে বের হতে না দিয়ে, বাইরের দিক হতে ভিতরে আনতে হবে যখন প্রাণ বাহির হতে ভিতরে আসতে আরম্ভ করবে, তখন তাকে ভিতর হতে বাইরের দিকে ধাক্কা দিয়ে রোধ করতে হবে। এইভাবে একের বিরুদ্ধে অন্যের ক্রিয়া করলে, উভয়ের গতিরুদ্ধ হওয়াতে প্রাণ নিজ বশে আসবে এবং মন ও ইন্দ্রিয়াদি নিজের অধীন হবে।

আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহর্ষি দয়ানন্দ ঐ সূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উপসংহারে বলেছেন যে পাতঞ্জলোক্ত ঐ প্রাণায়ামের যথাযথ অনুষ্ঠান করলে শরীরে বীর্যবৃদ্ধির ফলে স্থৈর্য বল পরাক্রম জিতেন্দ্রিয়তা এবং অল্পায়াসে অল্পসময়ের মধ্যে সকল শাস্ত্র বুঝবার সামর্থ্য জন্মে।

— আপ ইহ্ প্রাণায়াম বিধি জানতা হৈ?

আমি বললাম — বাবার কাছে আমি শিখেছি।

— মুঝে শিখলাইয়ে ত। চলিয়ে আপকা কামরা মেঁ।

যোগনাথজী উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়ালেন। আমাকে রক্ষা করলেন দিওয়ানাজী। তিনি বলে উঠলেন —নেহি, নেহি। ইহ্ লেড়কা পরিক্রমাবাসী, নর্মদামেঁ আতা হৈ শিখনেকা লিয়ে, শিখানেকো লিয়ে নেহি।

দিওয়ানাজীর কথায় যোগনাথজী গম্ভীর মুখে বসে পড়লেন। সন্ধ্যা হয়ে গেছে।

যে যার কামরায় ঢুকে গেলাম। আজ আবার নূতন করে ঝিরঝিরে ঠাণ্ডা বাতাস বইছে।

নীলকণ্ঠ ঘাটে পাঁচদিন থাকা হয়ে গেল। ষষ্ঠদিন সকালে স্নান পূজা সেরে দিওয়ানাজী এবং যোগনাথজী যাত্রার পূর্বে তাঁর দুজন ব্রহ্মচারী সেবককে নীলকণ্ঠের পূজা, কোন অতিথি এলে তাঁর পরিচর্যা এবং আশ্রমের গরুগুলির 'দেখভাল' করার উপদেশ দিতে ভুললেন না। নর্মদা ক্রমেই যেন চওড়া হয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। উপত্যকা অঞ্চল দিয়ে কাঁকুরে পথে হাঁটছি বটে কিন্তু ক্রমে যেন অরণ্যের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। গত পনেরদিন যেমন নর্মদার এই উত্তরতটে মাঝে মাঝেই ঘন বসতি পেয়েছি, এখন লোকের বসতি যেন ক্রমেই বিরল হয়ে আসছে। রাস্তাও ক্রমে খারাপ হচ্ছে, দূরে দূরে দু'একটা পল্লী চোখে পড়ছে। প্রায় প্রতি মাইল দূরে দূরেই ছোট ছোট জঙ্গল পড়ছে পথে। জঙ্গলের পাশেই চাষযোগ্য জমি, মাঠে ফসল কাটা হচ্ছে, কোথাও ভুট্টা বাজরা মহিষের গাড়ীতে করে চাষীরা তাদের ঘরে বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যে যে ছোট ছোট বনগুলি অতিক্রম করছি, সেইসব বনে শাল, তেঁতুল, শীরিষ ও বেলগাছই বেশী। প্রায় চার ঘণ্টা হেঁটে আমরা ছাপানের ঘাট নামক একটি মহল্লায় পৌঁছলাম। একটি পকেট ঘড়ি বের করে যোগনাথজী বললেন — এখন বেলা একটা বেজে কুড়ি মিনিট। নীলকণ্ঠ মহাদেবের প্রসাদ সঙ্গেই আছে। এখানে বসেই আমরা প্রসাদ গ্রহণ করব। আহার বিশ্রাম দুই-ই হবে। বেলা দুটা নাগাদ এখান থেকে পুনরায় যাত্রা করলে সন্ধ্যার পূর্বেই আমরা ককেড়া সংগমে পৌঁছে যাবো। তাঁর প্রস্তাবমত নর্মদার ঘাটে মুখ ধুয়ে এসে আহার ও বিশ্রাম পর্ব শেষ করে পুনরায় হাঁটতে লাগলাম। এ অঞ্চলে দেখছি

দিওয়ানাজীকে সবাই বিপুল শ্রদ্ধা করে। পথের মধ্যে যে লোকই আসা যাওয়া করছে, এমন কি মাঠ থেকে উঠে এসেও লোকে কাঁকর ও ধূলিময় পথের উপরেই তাঁকে প্রায় প্রত্যেকেই সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করছে। দিওয়ানাজী তাদের পরিবারস্থ লোকজনের প্রায় প্রত্যেকেরই নাম ধরে ধরে কুশল বার্তা নিচ্ছেন। পথের মধ্যে আর একটা বন পেলাম। বেশ ঘন বন। ঝোপ ঝাড় কোথাও নাই। খুব উঁচু উঁচু শালগাছ, আমলকী, পেয়ারা এবং খদির গাছ পরিক্রমাবাসীদের পথের দুধারেই ঘন সন্নিবিষ্ট। সেই জঙ্গলের ধার দিয়েই স্বচ্ছসলিলা নর্মদা প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। পথে বড় বড় কাঁকর। আমার সঙ্গী মহাত্মা দুজন ত আর পরিক্রমা করছেন না, তাঁদের পায়ে জুতা আছে। কিন্তু আমি আনুষ্ঠানিকভাবে পরিক্রমাবাসী, পায়ে জুতা নাই, আমারই চলতে কষ্ট হচ্ছে। প্রায় মাইলখানিক সেই বনপথে হাঁটার পরেই হঠাৎ যোগনাথজী চীৎকার করে উঠলেন — ডাঙ্গো, ডাঙ্গো হ্যায় হুঁশিয়ার! ডাঙ্গো অর্থাৎ হায়না। একটা নয় দুটো। আমরা দেখতে পাইনি, কতদূর থেকে যে তারা অনুসরণ করে আসছে জানতে পারিনি। যোগনাথজীর যখন নজরে পড়ল, তখন তারা প্রায় সামনে, বড় জোর বিশ হাত দূরে। একটা বড় পাথরের চাঙড়ের দুদিকে দাঁড়িয়ে। তাদের লোলুপ হিংস্র দৃষ্টি, লকলকে জিহ্বা, চোখগুলো যেন জ্বলছে। যোগনাথজী ছিলেন সামনে, দিওয়ানাজী পিছনে, আমি ছিলাম মাঝখানে। যোগনাথজী চীৎকার করার সঙ্গে সঙ্গে দিওয়ানাজী ত্বড়িৎগতিতে আমাদের দুজনকে পিছনে ঠেলে সামনে দাঁড়িয়ে হাত দুটো কপালে ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। মিনিটখানিক ঐভাবে থেকে তিনি সহসা উচ্চৈঃস্বরে আক্রমনোদ্যত সেই দুই হায়নার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — সাধুলোগোঁকা উপর হামলা করনেবালা হে ডাঙ্গো মহারাজ, আপ দোনো বুড়বক হ্যায়। আপ্ জানতা নেহি রেবাতটমেঁ —

> ভূতানি রেবা ভুবনানি রেবা
> স্ত্রিয়ঃ পশবঃ নরাশ্চাপি রেবা।
> যৎ যৎ দৃশ্যতে খলু সৈব রেবা
> রেবাস্বরূপাদ্ অপরং ন কিঞ্চিৎ।।

মন্ত্রটি বলে তিনি পুনরায় হায়নাদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করা মাত্রই হায়না দুটো দৌড়ে বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেল। যোগনাথজী দরদর করে ঘামছিলেন, তাঁকে থরথর করে কাঁপতে দেখে আমি তাঁকে ধরে রাস্তার উপরেই বসিয়ে দিলাম। দিওয়ানাজী তাঁকে হাত ধরে পুনরায় দাঁড় করিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — দেখ্যা যোগনাথজীকা যোগবল? যোগীলোগ্ যোগকা প্রতাপসে হাজারোঁ শেরকো ভি হঠা দে সকতা হৈ। ম্যয় ত কাঙাল দিওয়ানা হুঁ। সিরিফ্ প্রণাম শিখা হ্যায়, ডাঙ্গোয়োঁ কো প্রণাম কিয়া।

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। কমণ্ডলুর জল খেয়ে যোগনাথজী পুনরায় নীরবে আমাদের দুজনের আগে আগে হাঁটতে লাগলেন। আরও আধঘন্টা হাঁটার পর জঙ্গলটি পেরিয়ে সমতল অঞ্চলে পৌঁছালাম। বেলা পাঁচটা নাগাদ পৌঁছে গেলাম ককেড়া সংগমে। ককেড়া নামক একটি পাহাড়ী নদী এখানে নর্মদাতে এসে মিলিত হয়েছে। সংগমেই একটি পাথরের শিবমন্দির আছে। যোগনাথজীর ইচ্ছা সেই মন্দিরেই আজ রাত্রিবাস করবেন। কিন্তু দিওয়ানাজী বললেন — নেহি জী ঔর দো ঘন্টা চলনেসে হামলোগ বৈষ্ণেতীর্থ কা চক্রেশ্বর মন্দরমেঁ পৌঁছ যাবেগা। আজ পৌর্ণমাসী হ্যায়, চলনেসে কোঈ দ্‌ককৎ নেহি হোগা। ফিন্ আগে বাঢ়ো।

আমরা হাঁটতে লাগলাম নর্মদার তট ধরে। দূরের মহল্লা থেকে কোথাও খোল করতাল, কোথাও ঢোলকের শব্দ ভেসে আসছে। রামা হো রামা হো চীৎকারের সঙ্গে কানাইহা বাঁশুরিয়া হো, হর নর্মদে হর ধ্বনি উত্তাল হয়ে উঠছে। দোল পূর্ণিমা উপলক্ষে ফাগ্ খেলা চলছে।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ চক্রেশ্বর শিবমন্দিরে পৌঁছলাম। বিরাট শিবমন্দির। মন্দিরে যে ফাগের তাণ্ডব কিছুক্ষণ আগেই হয়ে গেছে তা বুঝা গেল, যত্রতত্র লাল আবীরের ছড়াছড়ি দেখে। নাটমন্দিরে নিজেদের গাঁঠরী ফেলে রেখে প্রথমেই নর্মদার ঘাটে গেলাম হাত মুখ ধুতে। নর্মদার বুকে জ্যোৎস্নার ঢেউ জেগেছে। বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতমালার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। পূর্ণচন্দ্রের কিরণে চতুর্দিকে স্নিগ্ধ জ্যোতির প্লাবন! অপরূপ দৃশ্য। নর্মদাকে প্রণাম করে আসার পর আমরা মন্দিরে ঢুকলাম। মন্দিরের মধ্যে ঘি এর প্রদীপ জ্বলছে। প্রকাণ্ড প্রদীপ, প্রায় একসের ঘি লাগে ভর্তি করতে। পুরোহিত মশাই বোধহয় কর্পূর দিয়ে আরতি করে গেছেন। নর্মদেশ্বর শিবলিঙ্গের পাশেই রূপার সিংহাসনে একটি বড় শালগ্রাম শিলা। ইনিই চক্রেশ্বর না শিবলিঙ্গটি চক্রেশ্বর, দিওয়ানাজীকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন — দোনো একই হ্যায়। শিব ঔর নারায়ণ মেঁ কোঈ ভেদ নেহি হ্যায়।

ওঁ নমঃ শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ।।

মূল মন্দিরের সংলগ্ন আরও তিনটি পাথরের ঘর দেখালেন দিওয়ানাজী। দুটি পরিক্রমাবাসী সাধুদের রাত্রিবাসের জন্য, তৃতীয়টি ভোগঘর। তিনি জানালেন, যখন পরিক্রমাবাসীদের জমায়েৎ এখানে আসে তখন মন্দিরের নাটমন্দিরসহ বিশাল প্রাঙ্গণ সব ভরে যায়। দিওয়ানাজী পুনরায় আমার হাত ধরে অমল ধবল জ্যোৎস্নাস্নাত নর্মদার ঘাটে নিয়ে গেলেন। ঘাটে দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন — হিঁয়াসে দো মিল পচ্ছিতরফমেঁ ককেড়া কী তরহ্ ঔর এক ছোটা নদী গৌণী, নর্মদামেঁ আকর সংগত হুয়া। উহ্ স্থানকা নাম গৌণী-সংগম হ্যায়। ককেড়া সংগম ঔর গৌণী সংগমকা বিচ্‌মে ইহ্ হায় বৈষ্ণেতীর্থ। পুরাণ-প্রসিদ্ধ তীর্থ হৈ। রেবাখণ্ডমেঁ ইসকা বারে মেঁ বহুৎ কুছ্ লিখ্যা হ্যায়।

ঘাট থেকে ফিরে এসে অপেক্ষাকৃত বড় ঘরটিতে তাঁরা দু'জন শয্যা পাতলেন, আমি ছোট ঘরটিতে ঢুকলাম। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম — দিওয়ানাজী আজ একটি চমৎকার মন্ত্র শোনালেন — শিবের হৃদয় বিষ্ণু, বিষ্ণুর হৃদয় শিব। একজনেরই দুইরূপ বা দুয়ে মিলে একরূপ। দুই-ই এক। এই সমন্বয় দৃষ্টি বা অভেদ দর্শনই হিন্দুদর্শনের সারকথা। আজই বিকেলে নরখাদক হায়নার রক্তলোলুপ দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়েই মহাত্মা শোনালেন এক অভিনব তত্ত্ব। সমগ্র প্রাণীজগৎ রেবারই রূপ, চর্তুদশ ভুবন জুড়ে রেবার বিভূতি, নরনারী পশুপক্ষী সকলের মধ্যে ব্যাপ্তি চৈতন্যরূপে রেবা প্রকটিত আছেন, যৎ যৎ বস্তু চোখে পড়ছে তৎ তৎ বস্তু রেবারই প্রকাশ বিকাশ। অর্থাৎ তাঁর ঐ কথায় বুঝা যাচ্ছে যে রেবা এবং ব্রহ্ম সমার্থক শব্দ। সেই ব্রহ্মস্বরূপা বা ব্রহ্মময়ী রেবার নদীরূপ পরিক্রমা করতে এসেছি। ঠাকুর আমাকে দয়া কর, আমি যেন বাবার আদেশ পালন করতে পারি। আমি নতজানু হয়ে প্রণাম করলাম নর্মদার উদ্দেশ্যে, কিছুক্ষণ রেবা মন্ত্র জপও করলাম।

ঘুম কিছুতেই আসছে না, দিওয়ানাজী কর্তৃক হায়না বিতাড়নের অভিনব পদ্ধতির কথা বারবার মনে তোলপাড় করছে। মনে পড়ছে, বাংলাদেশের ব্যায়ামাচার্য শ্যামাকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়

যিনি পরবর্তীকালে সোহহং স্বামী রূপে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন, তিনি প্রথম জীবনে অমিত বিক্রমের সঙ্গে নরখাদক বাঘের সঙ্গে খালি হাতে যুদ্ধ করতেন। কুচবিহারের মহারাজা একবার তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য সুন্দরবন থেকে সদ্য ধরে আনা রয়াল বেঙ্গল টাইগারের খাঁচায় ঢুকিয়ে তাঁর শক্তি পরীক্ষা করেছিলেন। বলাবাহুল্য, শ্যামাকান্তই সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। দুই হাতে বাঘের চোয়াল টেনে ধরে মুষ্ঠ্যাঘাতের পর মুষ্ঠ্যাঘাতে তিনি বাঘকে ভূলুণ্ঠিত হতে বাধ্য করেছিলেন। স্বামী রামতীর্থের কথাও মনে পড়ছে। অসাধারণ অঙ্কবিদ্ হিসাবে যখন তিনি গৌরবের সঙ্গে পাঞ্জাবের লায়লাপুর কলেজে অধ্যাপনা করতেন, সেইসময় এক আত্মজ্ঞ মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসে তিনি সন্ন্যাস নেন এবং পূর্বজন্মার্জিত তপস্যার বলে শীঘ্রই আত্মজ্ঞ মহাপুরুষরূপে জগৎ প্রসিদ্ধ হন। শেষ বয়সে আমেরিকায় সানফ্রান্সিসকোতে একটি পাহাড়ে বাস করতেন। সেইখানেই তিনি দেহরক্ষা করেন। তাঁর অলৌকিক যোগবল এবং বেদান্ত ব্যাখ্যায় গুণমুগ্ধ আমেরিকাবাসী সেই পাহাড়টির নাম দেন Ram Tirtha Hill. তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করার পর যখন প্রয়াগে বাস করতেন সেসময় তিনি স্ত্রীপুরুষ বালক-বালিকা গরু মহিষ কুকুর শেয়াল ও সাপ, যাকেই দেখতে পেতেন তাকেই 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলে বুকে নিতেন। তাই দেখে উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন ইংরাজ গভর্নর তাঁকে বিলাতে যাবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। সেখানে দুষ্ট বুদ্ধিবশতঃ, সাধু সত্য সত্যই সর্বত্র আত্মদর্শন করে 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলে, না সেটা তাঁর বুজরুকি তা পরীক্ষা করার জন্য লণ্ডনের পশুশালায় আফ্রিকা হতে সদ্য ধৃত ভয়ঙ্কর এক বিরাট বাঘের খাঁচায় তাঁকে ঢুকিয়ে দেন। শত শত গণ্যমান্য ব্রিটিশ লর্ড ও লেডিরা সেই ভয়ঙ্কর দৃশ উপভোগ করার জন্য উপস্থিত ছিলেন। তাঁরা জানতেন হিংস্র ব্যাঘ্র শীঘ্রই 'ভণ্ড' সাধুর দেহকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে! কিন্তু রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাঁরা হতবাক হয়ে যান যখন দেখলেন, রক্তলোলুপ বাঘটা তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বামী রামতীর্থ বাঘকে জড়িয়ে ধরে 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়, আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলে আদর করছেন এবং কিছুক্ষণ পরেই বাঘটা পোষা বিড়ালের মত মহাপুরুষের পদতলে শান্ত হয়ে বসে আছে।

আমি শুয়ে শুয়ে বিচার করছি , শ্যামাকান্ত বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাকে কাবু করেছিলেন অসাধারণ সাহস ও প্রচণ্ড দৈহিক শক্তিবলে; স্বামী রামতীর্থ আত্মজ্ঞানের তেজে বাঘকে বশীভূত করেছিলেন; সর্বত্র সমদর্শী ব্রহ্মজ্ঞ মহাপুরুষ স্বামী রামতীর্থের পরাবর দৃষ্টিতে বাঘ ছিল না, বাঘের মধ্যে তিনি দেখেছিলেন ব্রহ্মের স্বরূপ। আর গতকাল অপরাহ্নে দিওয়ানাজীকে দেখলাম প্রেমদৃষ্টিতে তিনি হায়নাকে তাঁর প্রীতম্ প্রিয়তমেরই চিদ্‌বিলাসরূপে বুঝে প্রণাম করলেন! হায়না তার হিংসা ভুলে গেল!

মহর্ষি পতঞ্জলিকৃত যোগদর্শনের সাধনপাদের একটি সূত্রের কথা মনে পড়ে গেল। সূত্রটি হচ্ছে — অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎ সন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ ।।২। ৩৫।। অর্থাৎ ঋষি বলছেন মনে প্রাণে যদি কেউ অহিংসাতে প্রতিষ্ঠিত হন, তাহলে তাঁর সান্নিধ্যে এলে, সমীপস্থ হলে হিংস্র প্রাণীও তার হিংসা ভুলে যায়, চরম শত্রুও তার বৈরিতা ত্যাগ করে। আত্মারাম ব্যতীত অন্য কোন বস্তু নাই , এইরূপ দৃঢ় নিশ্চয় হলে অর্থাৎ সর্বভূতে আত্মদর্শী হলে সিদ্ধযোগীর ইষ্টানিষ্ট বোধ থাকে না, রাগদ্বেষও থাকতে পারে না। যাঁর অন্তঃপ্রকৃতি হতে হিংসা দ্বেষ বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়েছে, সেই সর্বভূতান্তদর্শী মহাত্মার সান্নিধ্যে এলে হিংস্র ও ক্রূর

প্রাণীর মধ্যে তাঁর জ্ঞানদৃষ্টি বা প্রেমদৃষ্টির মধ্য দিয়ে বিশুদ্ধসত্ত্বভাব সঞ্চারিত হওয়ার ফলে, তাঁর ভাবে ভাবিত হয়ে সেই হিংস্র ও ক্রূর প্রাণীর মন থেকে হিংসা ও ক্রূরতা দূর হয়ে যায়।

মেসমেরিজম্ বা সম্মোহন বিদ্যা শিক্ষা করে যাঁরা ইচ্ছাশক্তির কিছুটা উৎকর্যসাধন করতে পারেন তাঁরা তাঁদের স্থির দৃষ্টিবলে যে কোন প্রাণীকে সাময়িকভাবে সম্মোহিত করে বশীভূত করতে পারেন কিন্তু তাতে উভয়ে উভয়ের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে হয়। কিন্তু লণ্ডনে নরখাদক বাঘের খাঁচায় মহাত্মা রামতীর্থজীকে যখন ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তখন তাঁর পক্ষে বাঘের দৃষ্টিতে দৃষ্টি স্থাপন করে তাকে সম্মোহিত করার সুযোগ ছিল না। তিনি আক্রমনোদ্যত ভয়ঙ্কর বাঘটিকে দেখামাত্র 'আ! মেরি আত্মা হ্যায়, আ! মেরি আত্মা হ্যায়' বলতে বলতে দৌড়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরেছিলেন। আর গতকাল জঙ্গলের মধ্যে যে দৃশ্য দেখলাম, সেখানে ত দিওয়ানাজী হায়না দুটোকে দেখা মাত্রই চোখ মুদে নতমস্তকে প্রণাম করতে লেগে গেছলেন!

কাজেই মহর্ষি পতঞ্জলির অহিংসা-প্রতিষ্ঠা বিষয়ক সূত্রটি যে কেবল তত্ত্বকথা বা বাণীমাত্র নয়, এ যে প্রত্যক্ষ সত্য তা নর্মদাতটে না এলে নিজের চোখে দেখার সুযোগ ঘটত না।

এইসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। মন্দিরের জাগরণী ঘন্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙল। পুরোহিতমশাই এসে গেছেন মন্দিরে। অনেক বেলা হয়ে গেছে। বাইরে বেরিয়ে এসে বড় ঘরটাতে উঁকি মারলাম, দেওয়ানাজী বা যোগনাথজীর কাউকে দেখতে পেলাম না। শৌচাদি ও স্নানপর্ব সেরে এসে রেবাখণ্ডম্ পুঁথিটি খুলে বৈষ্ণব তীর্থের বিবরণ পড়তে লাগলাম।

মার্কণ্ডেয় মুনি যুধিষ্ঠিরকে বলছেন —

> রেবায়া উত্তরে কূলে বৈষ্ণবং তীর্থমুত্তমম্।
> জলশায়ীতি বৈ নাম বিখ্যাতং বসুধাতলে।।
> দানবানাং বধং কৃত্বা সুপ্তস্তত্র জনার্দনঃ।
> চক্রং প্রক্ষালিতং তত্র দেবদেবেন চক্রিণা।
> সুদর্শনং চ নিষ্পাপং রেবাজল সমাশ্রয়াৎ।।

রেবার উত্তরকূলে জলশায়ী নামক অনুত্তম বৈষ্ণবতীর্থ বিদ্যমান। এই জলশায়ী বসুধাতলে বিখ্যাত। চক্রধর জনার্দন দেবদানবদেরকে বধ করে এই জলশায়ী তীর্থে শয়ন এবং জলশায়ীর জলে চক্র প্রক্ষালিত করেছিলেন। হে রাজন্! এই স্থানের রেবাজল সংস্পর্শে চক্রধারীর সুদর্শন চক্র নিষ্পাপ হয়েছিল।

পুরাকালে তালমেঘ নামক এক দৈত্য ছিল। সে হিমালয়ে বাস করত। তার লক্ষ লক্ষ দুর্ধর্ষ দৈত্যসেনা ছিল। সে সেই সেনাদের সাহায্যে অভিযান চালিয়ে স্বর্গ জয় করে। ইন্দ্র, চন্দ্র, বরুণ, যম, বায়ু প্রভৃতি স্বর্গ হতে বিতাড়িত হয়। পরাজিত ও পর্যুদস্ত দেবতাগণ ব্রহ্মাকে সঙ্গে নিয়ে ভগবান বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। ব্রহ্মা প্রার্থনা করেন — ত্বমেব জহি তং দুষ্টং মৃত্যুং যাস্যতি নান্যথা। হে জনার্দন! পাপমতি তালমেঘ আপনি ছাড়া আর কারও বধ্য নয়। আপনি সেই দুষ্ট দানবকে নিহত করুন, অন্যথা তার মৃত্যু হবে না।

দেবতাদের প্রার্থনায় বিষ্ণুর দয়া হয়। তিনি গরুড় বাহনে হিমালয়ে গিয়ে তালমেঘকে আক্রমণ করেন। বহুদিন যাবৎ ঘোরতর যুদ্ধ করে অবশেষে সুদর্শন চক্রের সাহায্যে তিনি

তালমেঘকে নিহত করতে সমর্থ হন। তালমেঘকে বধ করে স্থানে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি সুদর্শন চক্রটিকে এইখানে রেবার জলে ধৌত করেছিলেন। সেই থেকে এই চক্রতীর্থ একটি শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতীর্থ নামে বিখ্যাত।

পুঁথি পড়া শেষ হয়েছে, এমন সময় মন্দিরের পুরোহিতমশাই পনের কুড়িজন লোক সঙ্গে নিয়ে আমার কাছে এলেন। আমি তাঁকে জানালাম যে আমি পরিক্রমাবাসী, নীলকণ্ঠ ঘাট হতে মহাত্মা দিওয়ানাজী এবং যোগনাথজীর সঙ্গে গত রাত্রিতে এখানে উপস্থিত হয়েছি। দিওয়ানাজীর নাম করার সঙ্গে সঙ্গে সকলের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। বুঝলাম, দিওয়ানাজী এখানে সর্বজনমান্য মহাত্মা। পুরোহিতমশাই বললেন, আপনি যতদিন ইচ্ছা এখানে থাকতে পারেন, পরিক্রমাবাসীদের সেবা করার এখানে ব্যবস্থা আছে। দেওয়ানাজী পাগল সেজে থাকেন, নিজেকে পাগল বলে পরিচয় দেন, উনি কিন্তু সত্য সত্য পাগল নন। অতি উচ্চতমকোটির মহাত্মা। অহর্নিশ ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হয়ে আছেন। বৎসরের অধিকাংশ সময় তিনি এইখান হতে হোলিপুরা পর্যন্ত যাতায়াত করেন, যেখানে যেমন ইচ্ছা যতদিন ইচ্ছা বাস করেন, মন্দির বা গাছের তলা যেখানেই থাকেন, আনন্দে থাকেন, ভজন গানে ডুবে থাকেন। আপনি ভাগ্যবান যে এইরকম একজন মহাপুরুষের সংস্পর্শে এসেছেন। মহাত্মা যোগনাথজীকেও আমি চিনি। এখানে পাশাপাশি কয়েকটি মহল্লায় অনেক নাথপন্থী গৃহীভক্ত বাস করেন। তাঁরা মহাত্মা নিবৃত্তিনাথের ভক্ত। চৈত্র মাসের সংক্রান্তির দিন তাঁর মৃত্যুতিথি বা ভাণ্ডারা। সেই ভাণ্ডারা উপলক্ষে অর্থ সংগ্রহের জন্য প্রতি বৎসরই এই সময় যোগনাথজী এখানে এসে থাকেন, তিনি ঐ একই উদ্দেশ্যে হণ্ডিয়াতেও যান।

পুরোহিতমশাই-এর কথা শেষ হতে না হতেই দিওয়ানাজী যোগনাথজী উভয়ে এসে উপস্থিত হলেন। দিওয়ানাজীকে দেখে সকলের মধ্যে প্রণামের ধূম পড়ে গেল। তিনি বললেন — সবেরে পূজা করকে সিধা চলা যায়েগা। মুঝে তন্ মৎ করনা, তন্ করনেসে হম্ ফিন্ ভাগেঙ্গে। সকলেই সানন্দে সম্মতি জানিয়ে চলে গেলেন।

— চলিয়ে, আপ্‌কা পাশ যো কেতাব হ্যায়, উহ্ লেকর চলিয়ে। নারায়ণজীকা ক্যায়সা চক্র ইধর বিরাজমান হ্যায়, পহ্‌চানিয়ে ত।

দিওয়ানাজীর নির্দেশ মত 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক পুস্তকটি নিয়ে তাঁর সঙ্গে ঠাকুর দর্শন করতে গেলাম। যোগনাথজী নাট মন্দিরে বসে গোরক্ষপন্থী দুজন ভক্তের সঙ্গে বার্তালাপে ব্যস্ত রইলেন। মন্দিরে ঢুকেই দিওয়ানাজী সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করে নারায়ণ শিলা ও নর্মদেশ্বর শিবের দিকে তাকিয়ে নীরবে অশ্রু বর্ষণ করতে লাগলেন। তাঁর শরীরে মুহুর্মুহু রোমাঞ্চ পুলক ও শিহরণ দেখা দিতে লাগল। আমি প্রণাম করে শালগ্রাম শিলাটি হাতে নিয়ে চন্দনাদি মুছে উল্‌টে-পাল্‌টে চিহ্নগুলি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলাম। মন্দিরের মধ্যে যদিও ঘিএর প্রদীপ জ্বলছে, তবুও সেই আলোকে পর্যাপ্ত বলে মনে হল না। আমি গরুড়াসন হতে শিলাটি উঠিয়ে মন্দিরের বাইরে বারন্দায় বেরিয়ে এলাম। দক্ষিণমুখী মন্দির, সামনেই নর্মদা। সূর্যের আলোতে দেখলাম, শিলাটি একটি আপেলের মত বড়। শিলাটির মাথায় শ্বেতাভ একটি ছাতার মত আভাস ফুটে রয়েছে তাতে একটি গহ্বর বা মুখ। সূর্যের দিকে ঘুরিয়ে দেখলাম, মুখের ভিতর বাঁদিকে দুটি এবং ডানদিকে দুটি মোট চারটি চক্র রয়েছে। মুখের বাইরে দুদিকে দুটি রক্তিম কুণ্ডল চিহ্ন। শঙ্খ, মুষল, ধ্বজা, ধনুর্বান এবং গদারও স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলাম।

ইতিমধ্যে দিওয়ানাজীও মন্দিরের গর্ভগৃহ হতে উঠে এসে পাশে দাঁড়িয়েছেন। আমি তাঁকেও ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিহ্নগুলি দেখালাম। মন্দিরের ভিতরে শিলাটিকে নিয়ে গিয়ে তাম্রকুণ্ডে স্থাপন করে নর্মদার জলে স্নান করিয়ে চন্দন মাখিয়ে পুনরায় গরুড়াসনে স্থাপন করলাম। বই ঘেঁটে শিলাস্থিত চিহ্নগুলি মিলিয়ে মিলিয়ে দিওয়ানাজীকে বললাম, লক্ষণ অনুযায়ী এই শিলার নাম — অচ্যুত। বই থেকে পড়ে শুনালাম —

চতুর্ভিশ্চৈব চক্রৈস্তু বামে দক্ষিণপার্শ্বকে।
অধিষ্ঠিতো মুখে রক্তকুণ্ডলদ্বয় শোভিতঃ।
শঙ্খচক্রগদাশার্ঙ্গবাণকৌমদকীধরঃ।
যো মুশলধ্বজশ্বেতচ্ছত্ররক্তাংশুকৈর্যুতঃ।
সোহচ্যুতঃ কথিতো নাম্না দুর্লভস্তু সদা নৃণাম্॥

শ্লোক-বর্ণিত সমস্ত চিহ্নই এই শিলার মধ্যে বর্তমান। বই অনুযায়ী এই শালগ্রাম শিলার নাম অচ্যুত হওয়া উচিত এবং তদনুযায়ী এই তীর্থের নাম চক্রতীর্থ না হয়ে অচ্যুত-তীর্থ হলে আরও যুক্তিযুক্ত হত।

দিওয়ানাজী বললেন — উস্‌মেঁ ক্যা ফারাক হ্যায়। অচ্যুত ভি নারায়ণ, চক্রেশ্বর ভি নারায়ণ। ইস্ স্থানকো বৈষ্ণেতীর্থ কহা যাতা হ্যায়, এহি ঠিক হ্যায়। এ্যায়সা কভি দেখা?

আমি বললাম — আমি সারা ভারতবর্ষ পরিক্রমা করেছি, হাজার হাজার মন্দির দেখেছি, চিত্রকূট, বদরীনারায়ণ, অযোধ্যার হনুমানগড় যেখানে হাজার হাজার শিলা আছে, তাও দেখেছি কিন্তু এইরকম শালগ্রাম আমি কোথাও দেখিনি। নর্মদাতীর্থের কথা ছেড়েই দিলাম, এই মন্দির ছাড়া অমরকন্টক থেকে এই পর্যন্ত কোন মন্দিরে শালগ্রাম শিলাই দেখতে পাই নি। নর্মদাতে শুধু শিবেরই রাজত্ব।

আমার কথা শুনে দিওয়ানাজী হাসতে লাগলেন। এমন সময় যোগনাথজী এসে জানালেন যে পুরোহিতজী আমাদের ভোজনের জন্য ভোগ এনেছেন। চাপাটি ও মালাই। ভোগের থালা রেখে পুরোহিতজী দিওয়ানাজীকে প্রণাম করে চলে গেলেন। খাওয়াদাওয়ার পর নাটমন্দিরে দিওয়ানজী কম্বলমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লেন। আমরা দুজন গল্প করতে লাগলাম।

যোগনাথজী আমাকে বললেন — তুমি গোরক্ষপুরে গেছলে, ওখানে এখন মোহান্ত দিগ্বিজয়নাথজী গদীনসীন মহাত্মা। তাঁর কাছে তোমার দীক্ষা নেওয়া উচিত ছিল। নাথপন্থে না এলে তুমি সাধনরাজ্যের কোন সন্ধান পাবে না। কলিযুগে স্বয়ং শিবই গোরক্ষনাথজী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। গোরক্ষনাথজী নেপালের জাতীয় দেবতা। তাঁর নামানুসারেই নেপালের অধিবাসীদের গোর্খা নাম হয়েছে। নেপালের বর্তমান মহারাজা ত্রিভূবন নারায়ণ সিংহের প্রপিতামহ গোরক্ষনাথজীর আশীর্বাদেই নেপালে স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। তাঁর আশীর্বাদ আছে, যাবচ্চন্দ্রদিবাকরৌ নেপালে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত থাকবে। চিতোরের রাণা বংশের প্রতিষ্ঠাতা বীর হাম্বীরকে গোরক্ষনাথজীই এক দিব্য খড়্গ দান করেন, সেই দিব্য বলে বলীয়ান হয়েই তিনি সমগ্র মেবার জয় করতে পেরেছিলেন। জ্বালামুখী তীর্থ গোরক্ষনাথজীরই তপস্যাস্থল, তোমাদের কলিকাতার কালিঘাটের কালীমূর্তি এবং নকুলেশ্বর ভৈরবের প্রতিষ্ঠা তিনিই করেছিলেন। ঐ কালী এবং শিবের নিত্যপূজার ভার দিয়েছিলেন চৌরঙ্গীনাথকে। আগে কলিকাতা জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জঙ্গলের মধ্যে যেখানে

চৌরঙ্গীনাথজী বসতেন, সেই স্থানের নাম হয়েছে চৌরঙ্গী। আমি কোলকাতায় একবার গিয়েছিলাম। গোরক্ষনাথজী কে জান?

সিদ্ধানাঞ্চ মহাসিদ্ধঃ ঋষিণাঞ্চ ঋষীশ্বরঃ।
যোগীনাম্ চৈব যোগীন্দ্র শ্রীগোরক্ষ নমোহস্তুতে॥
শ্রীগুরুং পরমানন্দং বন্দে সানন্দ বিগ্রহম্।
যস্য সান্নিধ্য মাত্রেন চিদানন্দায়তে তনুম্॥

গোরক্ষনাথজী নিজেও শৈবদেহ প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তাঁর প্রবর্তিত সাধনায় প্রবেশ করলে, তাঁর স্পর্শ পেলে যে কোন সাধকের দেহ চিন্ময় হয়ে যায়।

যোগনাথজীর উচ্ছ্বাস কমলে আমি তাঁকে বললাম — আমার বাবাই আমার ইষ্ট এবং উপাস্য। তাঁর কাছেই আমার দীক্ষা এবং শিক্ষা। স্বয়ং শিব আমার কাছে প্রকট হয়ে দীক্ষা নিতে বললেও আমি তাঁর সেই অযাচিত দিব্য দানকেও প্রত্যাখান করবো। তবে আমি বাবার কাছে শুনেছি যে গোরক্ষনাথজী মহাযোগেশ্বর ছিলেন, তিনি শৈবাবধূত ছিলেন।

—শৈবাবধূত কিসকো বলতে হো?

আমি বললাম — যিনি বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে চলে গেছেন এবং আত্মাতেই স্থিতচিত্ত সেই অতি বর্ণাশ্রমী যোগীকে বলা হয় অবধূত। মহামনীষী বাচস্পতি প্রণীত অভিধানে অবধূতের লক্ষণ সম্বন্ধে বলা আছে — যো বিলঙ্ঘ্য আশ্রমান্ বর্ণান্ আত্মন্যেব স্থিতঃ পুমান্। অতি বর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে।

অবধূতের আবার শ্রেণীবিভাগ আছে — গৃহাবধূত আর কুলাবধূত। গৃহাবধূত গৃহী আর কুলাবধূত গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী হন। তাছাড়াও শৈবাবধূত, ব্রহ্মাবধূত, হংসাবধূত এবং ভক্তাবধূত নামে আরও কয়েকটি শ্রেণীবিভাগ আছে। আর যিনি অপূর্ণ ভক্তাবধূত, তাঁকে বলা হয় পরিব্রাজক।

— এ বাত বিলকুল ঝুট হ্যায়। গোরক্ষনাথজী শৈবাবধূত নেহি থে, উনোনে স্বয়ং শিব থে।

যোগনাথজীর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনুকের ছিলার মত দিওয়ানাজী বিছানা ছেড়ে উঠে বসে বলতে লাগলেন — লেড়কাকা বাত সহি হ্যায়। আপ্‌লোগ্ কট্টর সাম্প্রদায়িক হ্যায়। আরে, তুম্‌লোগ ক্যা সমঝেগা। কবীরজী ভি গোরক্ষনাথজীকো অবধূত কহা। দো মহান্ যোগীকো বার্তালাপ গোরক্ষসংলাপ মেঁ লিখা হ্যায়, উসমে কবীরজী গোরক্ষনাথজীকো বারে মেঁ কহা হ্যায় —

অবধূ জোগী জগসে নেহারা।
মুদ্রা নিরতি সুরতি করি সীংগী নাদখণ্ডে ধারা।
বসে গগনমেঁ দুনী ন দেখৈ চেতনী চৌকি বৈঠা।
চঢ়ি আকাশ আসন নহিঁ ছোড়ে পীবে অমীরস মীঠা।

এই যোগী (অর্থাৎ গোরক্ষনাথজী) অবধূত। ইনি জগৎ থেকে আলাদা। ইনি যোগীর চিহ্ন সুরতি নিরতি আর শিঙা ধারণ করেন, নাদের দ্বারা পন্থের ধারাকে খণ্ডন করেন না। গগনমণ্ডলে এঁর নিয়ত বাস, দুনিয়ার দিকে ইনি তাকান না। চৈতন্যের চৌকির উপর ইনি বসে আছেন। আকাশে ছাড়েন না, সর্বদাই পান করেন মধুমহারস অমৃত। পরগট কন্থা

মাঁহিঁ, জোগী দিলমেঁ দরপন জোবৈ।

সহঁস ঐকীশ ছ সৈ তাগা নিচল নাকৈ পোবৈ।
ব্রহ্ম অগনি মেঁ কায়া জারৈ, ত্রিকূটী সংগম জাগৈ।
কহে কবীর সোঙ্গ যোগেশ্বর, সহজ সুনি ল্যৌ লাগৈ।।

অর্থাৎ কবীর গোরক্ষনাথজীকে দেখিয়ে তাঁর শিষ্যদেরকে বলছেন — যদিও ইনি প্রকটরূপে কাঁথা জড়িয়ে থাকেন তবু নিজের হৃদয় দর্পণে সব কিছু দেখতে পান। নিশ্চল নাকে একুশ হাজার ছয়শত তাগাতে গিঁট দেন। ইনি ব্রহ্মাগ্নিতে সহজ ও পুণ্যের ধ্যানে মগ্ন থাকেন।

— কহিঁয়ে যোগনাথজী ইস্‌সে বড়া মহিমা কোন বর্ণন কর সকতে হৈ? শৈবাবধূতকা গতি এ্যায়সাই হোতে হৈ। ইন্ লেড়কাকী পিতাজীনে গোরক্ষনাথজীকো শৈবাবধূত বাতাকর আচ্ছাই কিয়া।

আগুনে যেন জল পড়ল। দিওয়ানাজীর কথা শুনে যোগনাথজী চুপ্‌সে গেলেন।

বৈষ্ণবতীর্থে আজ তৃতীয় দিন। সন্ধ্যাবেলা যোগনাথজী বললেন যে গুরুদেবের ভাণ্ডারার দিন এগিয়ে আসছে। এখানে তাঁর কাজ সাঙ্গ হয়েছে। তাঁর পক্ষে আর দেরী করা সম্ভব নয়। তিনি বিহানমেঁ (আগামীকাল ভোরেই) এখান থেকে যাত্রা করবেন। আমি এখানে থাকব, না, তাঁরই সঙ্গে যাত্রা করব জানতে চাইলেন। দিওয়ানাজী তাঁকে জানালেন, ইনোনে ভি আপকা সাথ যাত্রা করেঙ্গে, আপ্ জানতে হো, হম বৈষ্ণো তীর্থসে হোলিপুরা তক্ সফর করতা সুঁ। হম্ ইধারই জ্যায়দা নিবাস করতা হুঁ , ইধরই ঠারেঙ্গে।

আমি তাঁর অনুমতি পেয়ে গেলাম। তিনি যোগনাথজীকে আমার কামরায় এবং আমাকে তাঁর কামরায় শোবার ব্যবস্থা করলেন। আমি তাঁর আসন হতে দূরে নিজের আসন পাতলাম। তিনি (দিওয়ানজী) আসনে বসে আমাকে বললেন — যে যার ইষ্ট মন্ত্র সর্বদা জপের বস্তু হলেও নর্মদাতটে রেবা মন্ত্রও প্রতিদিন অন্ততঃ এক হাজার আটবার জপ করবে। এ বিষয়ে কোন 'টেক' (অন্যায় জিদ বা গোঁড়ামি) করবে না। হণ্ডিয়া থেকে ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি আরম্ভ হয়েছে , একথাই সাধারণতঃ সবাই বলে কিন্তু এই পথে জামানের সংগম অতিক্রম করার পরেই ঝাড়ি পথ শুরু হয়ে যাবে। মুণ্ডমহারণ্য যেমন এক ভয়ঙ্কর স্থান, তেমনি ভয়ঙ্কর স্থান বলে জানবে এই ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িকে। হিংস্র শ্বাপদে পরিপূর্ণ এই জঙ্গলকে নর্মদা-তপস্যার এক মহাপরীক্ষার স্থল বলে জানবে। মনের মধ্যে কোন কামনা বাসনা না থাকলে নর্মদামাতা তোমাকে নিজেই রক্ষা করবেন। তাঁর অভয় নাম স্মরণ করে হেলায় সব দুর্বিপাক হতে পার পেয়ে যাবে তুমি।

জো মাঁগে সে কছু ন পাবৈ, বিন্ মাঁগে রেবা দেতা।
কহে দিওয়ানা নিহকাম ভজে জে, তে আপন করি লেতা।।

অর্থাৎ সাংসারিক কামনা বাসনা ত দূরের কথা, ঋদ্ধি সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও সে কিছু পাবে না, কিন্তু নিষ্কামভাবে নর্মদা পরিক্রমা করতে পারলে মাতা রেবা তাঁর পরিক্রমাবাসী সন্তানকে সব কিছুই দিয়ে থাকেন। দিওয়ানা বলছেন যে, নিষ্কাম ভক্তকে মা নর্মদা নিজ জন হিসাবে আত্মসাৎ করেন। রেবা, রেবা, রেবা — এই বলে তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। আমাকে শুতে বলে নিজেও শুয়ে পড়লেন।

শীত অনেক কমে গেছে। তখনও ঘুম ধরেনি। বাবার আশীর্বাদে মহাঘোর মুণ্ডমহারণ্য

যাইহোক করে অতিক্রম করে এসেছি, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে কি ঘটবে জানি না। এইসব কথা ভাবছি, এমন সময় অন্ধকারের মধ্যেই অনুভব করলাম, দিওয়ানাজী উঠে বসেছেন। তাঁর দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে স্পষ্ট দেখতে পেলাম, তাঁর উপবিষ্ট ভঙ্গিমার আকৃতিটি জ্যোতির রেখায় ফুটে উঠেছে। স্তম্ভিত হয়ে আমি উঠে বসলাম। যেন কোন অদৃশ্য শিল্পীর নিপুণ অঙ্গুলি স্পর্শে অন্ধকারের পটভূমিতে জ্যোতির্ময় পেনসিল্ স্কেচ টুকটুক করে আঁকা হয়ে গেল। দেওয়ানাজীর চোখমুখ ভুরু নাক কান চিবুক দাড়ির চুল জটা সবই দেখতে পাচ্ছি! আমার চোখের পাতা সেই দিব্যমূর্তি দেখতে দেখতে ক্রমেই ভারী হয়ে আসছে। মুহুর্তের জন্য চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলাম। এবারে তাকিয়ে দেখি দিওয়ানাজী পদ্মাসনে উপবিষ্ট আর একটি সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহ থেকে বেরিয়ে এমনভাবে সংস্থাপিত হল যে, মূল দেহের ভ্রূদ্বয়ের উপরেই সূক্ষ্মদেহের হাঁটু দুটো পদ্মাসনের আকারে ভাঁজ করা আছে; সূক্ষ্মদেহের চক্ষু নিমীলিত; শুভ্র জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত।

আর তাকিয়ে থাকতে পারলাম না। চোখ বন্ধ করলাম, চোখ বন্ধ করতেই মনে হল পেছন দিকে মাথাকে বাঁকালে ঘাড়ের কাছে যেখানে ভাঁজ খায় ; সেখানে ভিতর দিকে একটা চুলের চেয়েও সূক্ষ্মতর এক জ্যোতির্ময়ী রেখা শির্‌শির্ করে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে উঠে যাচ্ছে , প্রতি রোমকূপে আনন্দের ঢল নেমেছে , সেই আনন্দের স্রোত ক্রমে একটি নদীর আকার নিল, আমি চিনতে পারলাম এই নদী নর্মদা। যে ঘরের মধ্যে বসে আছি , সেই ঘরের কোন ছাদ দেওয়াল কিছু নাই। পরম বিস্ময়ে দেখতে লাগলাম এই পরমাশ্চর্য নদীতে জ্যোতিরই জল; সহসা সমস্ত জ্যোতিজল এক পলকের মধ্যে জমাট হয়ে এক অপূর্ব কুমারী মূর্তি গ্রহণ করল, তাঁর পদতলে যুক্ত করে ধ্যানাবিষ্ট হয়ে বসে আছেন হাজার হাজার ঋষি। দিওয়ানাজী আছেন, এমনকি আমার বাবাও। কোন সুদূর পরম ব্যোমমণ্ডল থেকে ভেসে আসছে ওঁ ওঁ ওঁ বম্-বম্-ববম্ নাদ।

জেগে উঠলাম দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বরে। ভাবাবেগ তিনি গেয়ে চলেছেন —

নৈনা অন্তরি আও তুঁ জ্যু হোঁ নৈন ঝাঁপেউঁ।
না হোঁ দেখোঁ ঔরকু না তুঝ দেখন দেউঁ।।
কবীর রেখ সিন্দূরকী কাজল দিয়া ন জাই।
নৈনূঁ রমইয়া রবি রহ্যা দূজা কহাঁ সমাই।।

অর্থাৎ তুমি এস আমার চোখের মধ্যে, তাহলে আমি চোখ বুজে ফেলব। আমি আর কাউকে দেখব না। তোমাকেও আর কাউকে দেখতে দেব না। কবীর বলছে যেখানে সিঁদুরের রেখা দিতে হয়, সেখানে কাজল দেওয়া যায় না। আমার চোখের মধ্যে যে রাম আনন্দ করেছেন সেখানে অন্যের স্থান হবে কোথায়।

আমি নিজের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আমি বসেই আছি। তবে কি রাত্রে আমি শুই নি? বসে বসেই রাত কাটিয়েছি? তাই বা কেমন করে হবে? তাহলে ত শরীরে ক্লান্তি থাকত, অবসাদ থাকত ? পরিবর্তে, শরীর অনেক হাল্‌কা মনে হচ্ছে। রাত্রে ভাল ঘুম হলে শরীরে যে ঝরঝরে তৃপ্তিবোধ হয়, সেইরকম বা ততোধিক গভীর সুষুপ্তির আনন্দে আমার সকল স্নায়ুতন্ত্রীকে স্নিগ্ধ এবং সতেজ দেখছি।

দরজার বাইরে যোগনাথজীর গলা শোনা যাচ্ছে। 'সাত বাজ গিয়া, আভি যাত্রা করেঙ্গে, হম তৈয়ার হো গয়া'। দিওয়ানাজী উত্তরে বললেন — ইনকো তবিয়ৎ ঠিক নেহি হ্যায়। বড়ি

খুশীসে আপ যা সকতে হো। হম্ ইনকা সাথ নেমাবর তক্ খুদ জায়েঙ্গে। দরজা খুললেন না। আমার ইচ্ছা হচ্ছিল উঠে গিয়ে দরজা খুলতে। কিন্তু এক অনাস্বাদিত পূর্ব তৃপ্তির আবেশে আমার অস্থি সন্ধি শিথিল হয়ে গেছে, উঠে দাঁড়াতে পারলাম না।

দিওয়ানাজী যোগনাথজীকে যেন শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে আমাকে বলতে লাগলেন — মাকড়সা যেমন ধীরে ধীরে তার লালা দিয়ে সূক্ষ্ম তন্তুর জাল বোনে, তেমনি সাধুর মধ্যে যদি লালসা বা প্রতিষ্ঠা বুদ্ধি থাকে তাহলে জনসেবা, দুঃস্থ, আর্তদেরকে সাহায্যদান, গুরুর জন্মতিথি, মৃত্যুতিথি, স্কুল কলেজ বা স্মৃতিসৌধ স্থাপন কিংবা সাড়ম্বরে কোন দেবদেবীর পূজা মহোৎসবের অনুষ্ঠানের অজুহাতে ধীরে ধীরে মায়ার ফাঁদে ফেঁসে যায়, সে শিষ্য ও ভক্তদের কাছ হতে অর্থসংগ্রহে মেতে উঠে। এইসব কাজকে সে গালভরা কথা জীবসেবা, লোককল্যাণ প্রভৃতি আখ্যা দেয়। এইভাবে সে ধীরে ধীরে ইষ্টসাধনার পথ থেকে হয় বিচ্যুত।

এই যোগনাথজীর কথাই ধর। ইনি যোগের পথে যথেষ্ট উন্নতি করেছেন সন্দেহ নাই কিন্তু বর্তমানে ধীরে ধীরে ইনি অর্থসংগ্রহের বিড়ম্বনায় ফেঁসে গিয়ে সাধন-পথ হতে অনেক দূরে সরে গেছেন। বৈষ্ণব তীর্থে এসে এই তিনদিনের একবারও তাঁকে ঠাকুর ঘরে বসে ধ্যান বা উপাসনা করতে দেখা যায় নি। কেবলই মহল্লার পর মহল্লা চযে বেড়িয়েছেন ভাণ্ডারার জন্য অর্থ-ভিক্ষার কাজে অথচ মহাযোগেশ্বর গোরক্ষনাথজীর একটি প্রধান শিক্ষাই হল —

দৃষ্টি অগ্রে দৃষ্টি লুকাইবা সুরতি লুকাইবা কানং।
নাসিকা অগ্রে পবন লুকাইবা তব্ রহিগয়া পদ নিরবানং।।

অর্থাৎ গোরক্ষনাথজী তাঁর উপলব্ধ সত্য পরমপদ, নির্বাণ বা কৈবল্য লাভ কিভাবে হবে তা বলতে গিয়ে বলেছেন, বর্হির্মুখ ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে বিষয় প্রপঞ্চ হতে প্রত্যাবৃত্ত করে অন্তর্মুখ করতে হবে। যেমন চোখের অভ্যাস এই প্রপঞ্চ জগতের ভৌতিক রূপ রসে আসক্ত থাকা, তার স্বভাবই হচ্ছে বাহ্যরূপ দর্শন। যোগীর কর্তব্য এই দৃষ্টিকে বহির্জগৎ হতে প্রত্যাহার করে, অন্তর্জগতের দিব্যরূপ দর্শনে রত রাখা। কানের কাজ বাহ্যিক বার্তালাপ বা ব্যর্থ প্রলাপে মেতে থাকা এবং বাহ্যশব্দ শ্রবণ। যে যথার্থ যোগী হবে সে কানের এই বৃত্তিকে উলটিয়ে অন্তঃকর্ণে অনাহত নাদ শ্রবণে মেতে থাকবে। নাসিকা পথে যে শ্বাস-প্রশ্বাসের গতায়াত চলছে , সেই গতাগতিকে উলটিয়ে শ্বাস-বায়ুকে নাসাভ্যন্তরচারিণো করে আরোহের পথে প্রাণ-চৈতন্যের কূলে পৌঁছতে হবে। এইভাবে নিরন্তর লেগে থাকলে তবেই অলখ্ নিরঞ্জনকে প্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভ হয়।

দরজা খুলে আমরা দুজনে যখন বাইরে বেরিয়ে এলাম তখন মনে হল আটটা বেজে গেছে। যোগনাথজীকে কোথাও দেখতে পেলাম না। তিনি চলে গেছেন। চক্রেশ্বর বা অচ্যুতনারায়ণের মন্দিরে পূজা চলছে। বহু ভক্তের ভীড়। আমরা নর্মদাতে স্নান-তর্পণাদি সেরে যখন ফিরলাম তখন পূজা সমাপ্ত। মন্দিরে কেউ নাই। মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। সারাদিন একা দিওয়ানাজীর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে থাকতে পেয়ে তাঁর কাছে অনেক গুহ্য তত্ত্ব শুনতে এবং শিখতে পারলাম।

পরদিন ভোরে উঠে দুজনে যাত্রা করলাম নর্মদার তট ধরে। গৌণী সংগম পেরিয়ে বেলা দুটা নাগাদ পৌঁছলাম জামানের সংগমে। গৌণী সংগম হতেই পাহাড়ী পথ উপত্যকা অঞ্চলের সমতল পথ শেষ হয়েছে, কোথাও কৃষিক্ষেত্র চোখে পড়ছে না, জঙ্গল ক্রমেই বাড়ছে , উঁচু নিচু রুক্ষ কঠিন পার্বত্য পথে হাঁটছি। জামানের সঙ্গমে একটি শিবমন্দিরেই রাত্রিবাসের

সংকল্প করলেন দিওয়ানাজী। নর্মদাতে স্নান করে আমার ঝোলাতে জব্বলপুরের ভিড়াঘাটে মহাত্মা সুমেরদাসজীর দেওয়া যে মিছরী এবং কিস্‌মিস্ ছিল তাই নর্মদার উদ্দেশ্যে নিবেদন করে আমরা প্রসাদ পেলাম। দেওয়ানাজী বললেন — কভি মালাই , কভি চানা, কভি কড়াই , মিছরী দানা, এই ত সাধুর জীবন। তোমার ঝোলার সঞ্চয় শেষ হল, এই বার আকাশবৃত্তি , নিঃস্ব ও নিষ্কাম হয়ে রেবা-তটে পরিক্রমা কর, দেখ রেবা মাতা কিভাবে তাঁর অগাধ ও অফুরন্ত মাতৃস্নেহে তোমকে প্রতিপালন করেন।

মন্দিরে ঢুকে দেখলাম এক বিরাট শিবলিঙ্গ, লিঙ্গের গাত্রে অসংখ্য ছিদ্র, কোনদিন পূজা হয় বলে মনে হল না। দিওয়ানাজী 'ভৈরব, ভৈরব, ভৈরবায় নমঃ' বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করলেন। প্রণাম করে উঠে আমাকে বললেন — ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িপথে রাস্তার নমুনা দেখেছ ত ? এইবার যত এগোবে, ততই এই মহাবনের ভীষণতা অনুভব করবে। যে পথে এসেছে, এই পথই যথার্থ পরিক্রমার পথ। পরিক্রমাবাসীরা যতদূর সম্ভব এই পথকে এড়িয়ে চলবার জন্য হয় রেবা-সংগম হতে দক্ষিণতট ধরে, নতুবা হণ্ডিয়া হতে দক্ষিণতট ধরে পরিক্রমা সুরু করেন। তাতে ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িপথ যে বাদ দেওয়া যায় তা নয়, তবে চুয়াল্লিশ মাইল ব্যাপী এই কঠিনতম কষ্টকর পথের বিকল্প অপেক্ষাকৃত সহজতর পথে হেঁটে পরিক্রমা করা সম্ভব হয়। যাঁরা পরিক্রমা করেন না অথচ ওঁকারেশ্বরের জ্যোতির্লিঙ্গ দর্শনে ইচ্ছুক সেইসব সখের অভিযাত্রী বা ভ্রমণকারীদের জন্য হোসেঙ্গাবাদ হতে খাণ্ডোয়া পর্যন্ত একশ পঁচিশ মাইল পথ রেলপথে আসার ব্যবস্থা আছে। হোসেঙ্গাবাদ হতে ভায়া ইটরাসি হরদা হরসুদ হয়ে খাণ্ডোয়া জংশনে পৌঁছানো যায়। খাণ্ডোয়া থেকে সনাবদ হয়ে মোরটক্কাতে নেমে সাতমাইল রাস্তা রুক্ষ কাঁকরময় পথে অল্পসল্প জঙ্গল পথ হাঁটলে কিংবা হোসেঙ্গাবাদ হতে মোটরে চেপে এসে মোরটক্কাতে নেমেও ওঁকাশ্বরের মহাতীর্থে পৌঁছানো যায়। কিন্তু নর্মদা-তপস্যার পথ সেটা নয়। কঠোর কৃচ্ছ্র সাধন করে নগ্নপদে পরিক্রমা করতে পারলে তবেই তাকে তপস্যা বলা যাবে। তোমার বাবার কাছে ত শুনেইছ — তপস্যা মানে তাপ সহা! এই বলে হাসতে লাগলেন।

বাবা কবে বাংলাদেশের এক গ্রামে বসে তপস্যা অর্থে তাপ-সহা এই ব্যাখ্যা করেছিলেন, এই মহাপুরুষ দেখছি, তাও জানেন। আমার জীবনের কোন ঘটনাই দেখছি এঁর অবিদিত নয়। সন্ধ্যা হয়ে আসছে, হঠাৎ আমাকে বললেন এসো মন্দিরটার চারপাশ প্রদক্ষিণ করি। মহাত্মা সুমেরদাসজী ত তোমাকে হিংস্র পশুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে মন্ত্রে গণ্ডী দিতে শিখিয়েছিলেন, এসো সেই মন্ত্রেই মন্দিরের চারপাশে গণ্ডী কাটি ; বলেই মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। আমি তাঁকে অনুসরণ করলাম। বললেন, ওঁকারের ঝাড়ির উপান্তভাগ সুরু হয়েছে , কাজেই এদিকেও জঙ্গল থেকে শের, ডাঙ্গো, সাপ, হুড়াল বা গণ্ডারাদি ছিট্‌কে ছাট্‌কে চলে আসতে পারে; তাই গণ্ডী কাটলাম। আমি নিজে জন্তু জানোয়ারকে ডরাই না। কিন্তু আমি নিজে এটি আচরণ করে তোমাকে জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছি , ওঁকারের ঝাড়িতে মন্দির বা গাছতলা যেখানেই রাত্রিবাস করবে, একাই থাক আর জমায়েতের সঙ্গেই থাক, অতি অবশ্যই এই মন্ত্রে গণ্ডী কেটে বাস করবে, আমাকে কথা দাও। এই বলে চিবুকে হাত দিলেন। আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁকে বললাম আপনার হুকুম আমি অবশ্যই পালন করব।

মন্দিরে ঢুকে আমরা আসন পাতলাম। মন্দিরের দরজা নাই। তবে ফাল্গুন মাসের আজ শেষ দিন, শীত খুব সামান্যই আছে। তিনি একদম মৌন হয়ে গেলেন। শুয়ে পড়লেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম সুমেরদাসজী আমাকে গণ্ডী কাটার যে মন্ত্র শিখিয়েছিলেন তাও এঁর অজানা নাই। ভাগ্যবশে যখন এইরকম একজন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষের সঙ্গলাভ করছি , তখন এঁর সঙ্গে থেকে গেলেই বা মন্দ কি ! কিন্তু না, বাবার হুকুম নর্মদা পরিক্রমা করতে হবে। জীবন থাকতে বাবার অন্তিম আদেশ অমান্য করতে পারব না। বাবার কথা চিন্তা করতে করতে শেষ পর্যন্ত শুয়েই পড়লাম।

ভোরেই ঘুম ভেঙেছে। তিনি বললেন — চল নর্মদাতে স্নান সেরে সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ি। স্নান সেরে এসে উভয়ে ভৈরবের মাথায় জল ঢাললাম। প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম পথে। পথ বলতে বালি আর কাঁকর, লাল আর কালো পাথরের ঢিবির পর ঢিবি। ঢিবির গায়ে গায়ে ফণিমনযা আর কাঁটা বাবলা। মাঝে মাঝেই সেগুন গাছের জটলা। কোথাও বা পথের দুধারে সারিবদ্ধভাবে সেগুন বুনো নিম এবং শিরীষ গাছ। নর্মদা যেন ধীরে ধীরে পাহাড়ের মধ্যে কতকটা পথ ঢুকে গিয়ে আবার বক্রগতিতে আপন পথে বয়ে চলেছে। দিওয়ানাজী বললেন — এসো গল্প করতে করতে যাই, তাতে হাঁটার পরিশ্রম লাঘব হবে। তুমি যথেষ্ট হুঁশিয়ার আছ, তবুও তোমাকে বলছি পরিক্রমার পথে অনেক সাধু-সন্ন্যাসী দেখতে পাবে যাদের বেশভূষা, পোযাক পরিচ্ছদ, মালা-তিলকের ঘটা কিংবা বচন-পরিপাট্য দেখে মনে হবে যেন কত বড় সিদ্ধযোগী! কিন্তু তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেই বুঝতে পারবে, তাদের অধিকাংশই বৈরাগ্যহীন বৈরাগী, কপট এবং ক্রূর প্রকৃতির মানুষ। সাধু সেজে থাকে, যোগী সেজে থাকে। সাধন ভজন না করে কেবল ছত্রে বা সদাবর্তে অন্ন ধ্বংস করাই তাদের কাজ। বৃথা বাগবিতণ্ডায় তারা সময় কাটায়। ভারতের বিভিন্ন মঠে এবং সম্প্রদায়ে এ ধরণের লোক এখন ভীড় করে আছে। নর্মদা পরিক্রমা করতে করতেও অনেক ভণ্ড সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পাবে। এদের সঙ্গে কোন মতেই বিবাদ বা সংঘাত সৃষ্টি করবে না। এড়িয়ে চলবে। প্রয়োজন বোধে মৌনব্রত অবলম্বন করবে। সাম্প্রদায়িক সাধুরা ভীষণ গোঁড়া হয়। শাস্ত্রীয় সত্য প্রকাশের অনুরোধে কারও আচার বিচারকে ভুল বলে মনে হলেও চুপ থাকবে। সাধুসমাজে এই রকম ভণ্ডের ভীড় পূর্ব যুগেও ছিল নতুবা যোগীগুরু দত্তাত্রেয় একথা বলতেন না যে,

ক্রিয়ৈব কারণং সিদ্ধেঃ সত্যমেতৎ তু সাঙ্কৃতে।
শিশ্নোদরার্থং যোগস্য কথং বা বেশধারিণঃ॥
অন্নপানবিহীনাস্তু বঞ্চয়ন্তি জনান্ কিল।
উচ্চাবচৈ বিপ্রলম্ভে যথস্তে অশনালবঃ॥

হে সাঙ্কৃতে ! ক্রিয়াই সিদ্ধির কারণ, এই কথাকে সত্য বলে জানবে। শিশ্নোদর তৃপ্তির মানসে যারা যোগীর বেশ ধারণ করে, তাদের সিদ্ধি কেমন করে সম্ভব? তারা অন্নপানাসক্ত উদরসর্বস্ব হয়েও লোকের কাছে পান ভোজন ত্যাগের অভিনয় করে এবং লম্বা চওড়া কপট বাক্য উচ্চারণ করে লোকসমাজকে প্রবঞ্চিত করে থাকে।

দিওয়ানাজী কথা বলতে বলতে বোধহয় অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন, বড় একটা কাঁকরে হোঁচট খেলেন। আমি ধরে ফেললাম। ডান পায়ের বুড়ো আঙুলে হাত দিয়ে দেখি, সামান্য একটু ছড়ে গেছে। আমি জল ঢেলে তাঁর পা ধুয়ে দিলাম। নর্মদাতে গেলাম কমণ্ডলু ভরে

নিতে। ফিরে আসতেই বললেন — মহাত্মা সুমেরদাসজী তোমাকে গণ্ডী কাটার যে রেবামন্ত্র শিখিয়েছিলেন, যে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে আমি গতকাল জামানের সঙ্গমের ভৈরব মন্দির প্রদক্ষিণ করেছিলাম, সেই মন্ত্র দিয়ে তাড়াতাড়ি একটা গণ্ডী কাটত। দূরে একটা হিংস্র গেঁওড়া আসছে দেখতে পাচ্ছি। মন্ত্রটি ঠিকমত প্রয়োগ করতে পার কিনা, আমি তা নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হতে চাই। তুমিও রেবামন্ত্রের মাহাত্ম্য পরীক্ষা করে মন্ত্রের কার্যকারিতায় ধ্রুব বিশ্বাস স্থাপন করতে পারবে।

তাঁর কথা শুনে আমি পথের দিকে এবং পথের দুপাশের জঙ্গল এবং পাহাড়ের দিকে ঘুরে ফিরে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম, বনের পাখী এবং দূরের গাছের ডালে দু'চারটা ময়ূর ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না। পুনরায় তিনি তাড়া দিতে মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে দুজনের দাঁড়ানোর মত স্থানকে কেন্দ্র করে চক্রাকারে গণ্ডী টানলাম। গণ্ডীর মধ্যে দাঁড়িয়ে আছি, প্রায় দশ মিনিট পরেই দেখি জঙ্গল ভেদ করে গাছপালাকে আলোড়িত করে একটা বিরাট গণ্ডার ক্রুদ্ধভাবে গর্জন করতে করতে গণ্ডী থেকে প্রায় পাঁচ হাত দূরে দাঁড়িয়ে পড়ল। ছাত্রাবস্থায় কলিকাতার পশুশালায় গণ্ডার দেখেছিলাম কিন্তু পাহাড় ও জঙ্গলের পটভূমিতে তেজে বীর্যে টগ্‌বগ্ করছে এই রকম একটি বিকট জীব, দুটো বড় ধারালো দাঁত নিয়ে যখন সামনে এসে হাজির হল, বুঝলাম এর সঙ্গে পশুশালার গণ্ডারের কোন তুলনাই হয় না। আমি চাপা কণ্ঠে মহাত্মাকে বললাম, আপনি নর্মদার দিকে ঘুরে দাঁড়ান, আপনি চেয়ে থাকলে বা চোখ বুজে থাকলে আমার মনে হবে, সেদিনকার সেই হায়না তাড়ানোর মত আপনি কিছু করলেন। আমি মন্ত্রের শক্তি পরীক্ষা করতে চাই। মৃদু হেসে দিওয়ানাজী নর্মদার দিকে ঘুরে দাঁড়ালেন।

গণ্ডার কিন্তু আর এগিয়ে এল না। যে রকম তেড়ে ফুড়ে সে এগিয়ে এসেছিল, তার সেই উদ্দাম গতি স্তব্ধ হয়ে গেছে। মিনিট খানিক থমকে দাঁড়িয়ে থেকে গণ্ডারটা ডান দিকে জঙ্গলের মধ্যে দৌড়ে ঢুকে গেল।

দিওয়ানাজী বললেন — রেবামায়ীকি মন্ত্রকী প্রভাব দেখ্যা? ভুলো মৎ। জঙ্গলমেঁ জাঁহা রাত বীতায়েগা এহি মন্ত্রসে গণ্ডী জরুর দেনা। এখন গণ্ডীর রেখাটা মুছে ফেল। এটা থাকলে কোন পশুরই ক্ষমতা নাই এই গণ্ডী অতিক্রম করে। প্রকৃতির কোলে প্রকৃতির সন্তানদের যাত্রাপথ অবাধ এবং অবারিত থাকাই ভাল।

গণ্ডী মুছে আবার হাঁটতে লাগলাম। সারাদিন হেঁটে বেলা প্রায় চারটার সময় নেমাবরে এসে পৌঁছলাম। দূর থেকে একটা মন্দিরের চূড়া মাঝে মাঝে দেখতে পাচ্ছিলাম। বড় বড় সেগুন গাছের জটলার জন্য সম্পূর্ণ মন্দিরটা চোখে পড়ছিল না। জঙ্গল পেরিয়ে আসতেই বিরাট মন্দির। এই মন্দিরে সিদ্ধনাথ বিরাজিত। কিছুদূরে আরও দু'চারটা পাথরের পুরানো বাড়ী দেখতে পেলাম। দিওয়ানাজী বললেন — এই নেমাবর হচ্ছে নর্মদামাতার নাভিস্থল। পরিক্রমাবাসীর হাঁটা পথে অমরকণ্টক হতে চারশ ছাব্বিশ মাইল পথ তুমি হেঁটে এসেছ। এখনও প্রায় অর্থেক পথ বাকী, তবে রেবাসংগমে পৌঁছতে পারবে। এই স্থান প্রাচীনকালে হতেই তপস্যার অনুকূল। এখানকার বাতাবরণ বড়ই পবিত্র। সদাবর্ত আছে। চল যাই সর্বাগ্রে সিদ্ধনাথকে প্রণাম করি।

মন্দিরে গিয়ে দেখলাম বহু ভক্তের ভীড়। গৃহী সন্ন্যাসী দুই আছে। এই মন্দিরের পুরোহিত তিনি একজন সন্ন্যাসী, তাঁর একটি চোখ কানা। তিনি এক জটাধারী। তিনি দিওয়ানাজীকে

চেনেন, তিনি ভীড় ঠেলে বেরিয়ে এসে দিওয়ানাজীকে প্রণাম করে বললেন — বৈষেণতীর্থ ছোড়কে আপ ইধর পধারেঙ্গে এহি ত বড়ি তাজ্জব বাত। আপকা সাথমেঁ কয় মূর্তি হ্যায়? দিওয়ানাজী আমাকে দেখিয়ে দিলেন।

—'তব ত হম্ নেহি ছড়ুঙ্গা। হমারা আশ্রমমেঁ ঠাহরনেই পড়েগা। আজ চৈত্র মাসকি পহেলা হ্যায়। ইহ্ পুণীত দিবসমেঁ আপকো দর্শন মিলা, ইহ হমারা ভাগ হ্যায়'।

তাঁর কথায় বুঝলাম আজ ছয় মাস ধরে আমি পরিক্রমা করছি। সন্ধ্যা হয়নি। আরতির দেরী আছে। আমরা সিদ্ধনাথকে প্রণাম করে নর্মদার ঘাটে এসে স্নান করলাম। স্নান সেরে উঠতেই দিওয়ানাজী নর্মদার দক্ষিণতটের একটি সুউচ্চ মন্দির দেখিয়ে বললেন — 'উহ্ হ্যায় হণ্ডিয়াকী ঋদ্ধনাথজীকো মন্দর'। মন্দিরের চূড়ায় দ্বাদশ কলস, বোধহয় পিতলের, ঝকঝক করছে। দিওয়ানাজী বললেন — নর্মদার এপারে এই উত্তরতটে নেমাবর এবং ওপারে ঐ দক্ষিণতটে হণ্ডিয়া, দুই স্থানকে নর্মদার নাভিস্থল এইজন্য বলা হয় যে এই দুই স্থানই অমরকণ্টক হতে রেবাসংগম পর্যন্ত দূরত্বের মাঝামাঝি স্থানে অর্থাৎ কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত। ঋদ্ধনাথ ও সিদ্ধনাথ এই দুই স্থানই কুবেরের শিবতপস্যার সিদ্ধক্ষেত্র। মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা পরিক্রমার দূরত্বকে আটশ মাইল বলে বর্ণনা করেছেন বটে কিন্তু পরিক্রমাকারীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হতে বুঝা যায় মুণ্ডমহারণ্য, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি এবং শূলপাণির ঝাড়ি এই তিনিটি ঘোর জঙ্গলসহ পাহাড়ী উপত্যকা অঞ্চলকে ধরলে সমগ্র পথ সাড়ে আটশ মাইলের কম হবে না। যে যুগে মহামুনি মার্কণ্ডেয় নর্মদা পরিক্রমা করেছিলেন সেই সময় হয়ত পথের দূরত্ব আটশ মাইলই ছিল কিন্তু কালক্রমে নর্মদার গতিপথের সামান্য অদল্‌বদল হওয়ায় এখন দূরত্ব যৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ প্রায় পঞ্চাশ মাইল বেড়ে গেছে। কুবেরজী সম্বন্ধে তোমার কি জানা আছে আগে বল দেখি।

— পুরাণে এবং রামায়ণে যা আছে তাতে জানা যায় যে কুবের যক্ষদের রাজা, তিনি ধনাধিপতি। পুলস্ত্য ঋষির পুত্র বিশ্রবামুনি তাঁর পিতা। কুবেরের মায়ের নাম দেববর্ণিনী। বিশ্রবার পুত্র বলে এঁর আর এক নাম বৈশ্রবণ। উগ্র তপস্যার বলে কুবের ব্রহ্মার বরে অমরত্ব, উত্তর দিগন্তের দিকপালত্ব এবং ধনাধ্যক্ষতা লাভ করেন। ব্রহ্মা তাঁকে পুষ্পক রথ দান করেছিলেন। এই দিব্য রথের বৈশিষ্ট্য এই যে স্মরণ মাত্রই এই রথ তাঁর কাছে উপস্থিত হত এবং যথাসংকল্পিত স্থানে পৌঁছে দিত। বিশ্রবামুনি তাঁর এই পুত্রের জন্য লঙ্কাপুরী বাসস্থান হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্রবার অপর পুত্র কুবেরের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিশ্বত্রাস রাক্ষসরাজ রাবণ কুবেরের কাছ হতে স্বর্ণলঙ্কা এবং পুষ্পক রথ অধিকার করে নেন। তখন বিশ্রবামুনি অলকাপুরীকে কুবেরের বাসস্থান নির্দিষ্ট করে দেন। মহাকবি কালিদাসের অমর গীতিকাব্য 'মেঘদূতম্'এ বর্ণিত এই অলকাপুরী লোকমানসে চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

কুবের হিমালয়ে একবার দেবী রুদ্রানীকে দৈবাৎ দেখতে পান, ফলে তাঁর দক্ষিণ চক্ষু দগ্ধ এবং বাম চক্ষু বিগলিত হয়ে পিঙ্গল বর্ণ ধারণ করে। সেইজন্য এঁর তিনটি পা এবং আটটি দাঁত ছিল। এঁর দেহের গঠন এইরকম কুৎসিৎ বলেই এর নাম হয় কুবের। এর দুই পুত্রের নাম যথাক্রমে নল-কুবের ও মনিগ্রীব, কন্যার নাম মীনাক্ষী। এই পৌরাণিক কাহিনী বাদ দিলে বৈদিক মতে কুবের শব্দের অর্থ পরমেশ্বর। কুবি আচ্ছাদনে এই ধাতু হতে কুবের শব্দ নিষ্পন্ন হয়। যঃ সর্বং কুবতি স্বব্যাপ্ত্যাচ্ছদয়তি স কুবরো জগদীশ্বরঃ। যিনি স্বীয় ব্যাপ্তির দ্বারা

সকলকে আচ্ছাদন করেন সেই পরমেশ্বরের নাম কুবের।

সব শুনে দিওয়ানাজী বললেন, তা ঠিক ; তবে তুমি এইমাত্র বললে যে কুবের উগ্র তপস্যা করেছিলেন। তাঁর সেই উগ্র তপস্যা স্থান এই নেমাবর এবং হণ্ডিয়া। রাবণ কুবেরের কাছ হতে স্বর্ণলঙ্কা এবং পুষ্পক রথ কেড়ে নিলে মনের দুঃখে কুবের নর্মদায় উত্তরতটস্থ এই নেমাবরে সিদ্ধনাথের স্থানে এসে যড়ক্ষরী শিববীজ জপ করতে থাকেন। মহাদেব প্রসন্ন হয়ে কুবেরকে নবনিধি অর্থাৎ দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ, মহাপদ্ম, মকর কচ্ছপ, নীল, কুন্দ, মুকুন্দ, খর্ব প্রভৃতি মহামূল্য মণিমাণিক্যের সঙ্গে পুষ্পক রথ এবং অলকাপুরী দান করেন। রাবণ পুনরায় তা কেড়ে নিলে মহাদেবের প্রত্যাদেশে কুবের নর্মদার দক্ষিণতটে ঐপারে হণ্ডিয়াতে ঋদ্ধনাথের স্থানে বসে তপস্যা করেন এবং পুনরায় সেই নবনিধি এবং অলকাপুরী ফিরে পান।

মন্দিরে আরতির বাজনা বাজছে। আমরা সিদ্ধনাথের মন্দিরে এসে আরতি দেখতে লাগলাম। দিওয়ানাজী সমাধিস্থ হয়ে গেলেন। ভক্তদের ভীড় ঠেলে আমি তাঁকে বসিয়ে দিলাম। আরতি শেষ হবার পর একজটা বাবা জোর করে ভক্তদেরকে মন্দির ছেড়ে যেতে বাধ্য করলেন। তিনি দিওয়ানাজীর এই দুর্লভ অবস্থার সঙ্গে পূর্ব হতেই পরিচিত। দিওয়ানাজীর শরীরে কোন স্পন্দন নাই , নাকে হাত দিয়ে দেখলাম নিঃশ্বাস পড়ছে না। শরীর ধীরে ধীরে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে। মন্দিরের মধ্যে জ্বলছে ঘিএর প্রদীপ, দরজার দুই কোণে জ্বলছিল দুটি মোমবাতি। ক্রমে দুটি মোমবাতিও নিভে গেল। মন্দিরের দাওয়াতে পূর্বদিকে আমি আসন পেতেছি। একজটা বাবাও অন্যদিকে একটি কম্বল এনে তাঁর শয্যা পাতলেন। আকাশে চাঁদের প্লাবন, জ্যোৎস্নায় নর্মদার জল পাহাড় ও বনস্থলী যে হাসছে। সমাধিস্থ দিওয়ানাজীর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। তাঁর মুখমণ্ডলকে ঘিরে এক জ্যোতির বলয় সৃষ্টি হয়েছে , তাঁর দাড়ির চুলগুলোও চিকচিক করছে। একজটা বাবা স্থির দৃষ্টিতে তাঁর দিকে তাকিয়ে জপ করে চলেছেন। হঠাৎ সারা মন্দির কস্তুরীর গন্ধে ভরে গেল।

শেষ রাত্রে তাঁর শরীরে কম্পন দেখা দিল। কয়েকবার কেঁপে কেঁপে উঠে তিনি মৃদুকণ্ঠে বলে উঠলেন হরি হরয়ে নমঃ, হর নর্মদে হর। একজটা বাবার ইঙ্গিতে রেবামন্ত্র উচ্চারণ করে কমণ্ডলু হতে কয়েক বিন্দু নর্মদার জল তাঁর শরীরে ছিটিয়ে দিলাম। একজটা বাবা দ্রুত তাঁর আশ্রমে গিয়ে একটা খাটিয়া আনলেন। দুজন শিবস্তোত্র পাঠ করতে করতে তাঁকে খাটিয়ায় শুইয়ে আশ্রমে বয়ে আনলাম। তিনি তদবস্থায় শুয়ে থাকলেন, আমি তাঁর কাছেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লাম। ভোর হয়ে আসছে। বেলা নটার সময় আমি যখন জেগে উঠলাম তখন তিনি বসে বসে গুণগুণ করে গান গাইছেন। আমাকে বললেন — নর্মদাতে গিয়ে স্নান করে বাবা সিদ্ধনাথজীকে প্রণাম ও পূজা করে এস। কাল থেকে তুমি অভুক্ত। একজটাজী ভোজনের ব্যবস্থ করেছেন। ভক্তদের 'হর নর্মদে হর' ধ্বনি ভেসে আসছে। স্নান করে মন্দিরে পৌঁছতেই একজটাজী পূজার সুযোগ করে দিলেন। মন্দিরের প্রাত্যহিক নিত্যপূজা শেষ হয়ে গেছে। ভীড় আর নাই বললেও চলে।

পূজা করতে বসে 'ত্র্যম্বকং যজামহে' ইত্যাদি বেদমন্ত্রে শিবলিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে ভাল করে মার্জনা করতে করতেই শিবলিঙ্গের স্বাভাবিক রূপ দেখতে পেলাম। দেখলাম প্রায় দুই ফুট উচ্চ শিবলিঙ্গের সামনের দিকটা কালো এবং যোনিপীঠের দিকটা সাদা। জ্যামিতিক মাপে সাদা ও কালো অংশ প্রায় সমান সমান। শিবলিঙ্গের যোনিপীঠ যেদিকে, সেদিকে গিয়ে খুব খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে শিবলিঙ্গের গাত্রে দক্ষিণাবর্ত শঙ্খ চিহ্ন, দক্ষিণাবর্ত গতিতে

পরিস্ফুট চক্র চিহ্ন এবং কৌমদকী অর্থাৎ গদার চিহ্ন দেখে আমি অবাক হলাম। সামনে ঘুরে এসে ঘন কৃষ্ণ অংশ একটুকরো রেশমী বস্ত্রে (মন্দিরেরই) ভাল করে ঘষতে ঘষতে যখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একটা অস্পষ্ট চিহ্নকে বুঝবার চেষ্টা করছি , তখন পিছন থেকে একজটা বাবা বলে উঠলেন — আরে ভেইয়া, শিউজিকো এতনা রগড়াতে হো কেঁও? ম্যয়নে দেখা, উহ পদ্মচিহ্ন হ্যায়। মহাদেওকী বিভূতি এক দো নেহি , উন্‌কা অনন্ত বিভূতিয়াঁ হো। আমি তাঁকে বললাম, আপনার আশ্রমে যাচ্ছি একটা বই আনতে। তাতে সব চিহ্নের পরিচয় আছে। এসে পূজা করব।

— য্যায়সা আপকী মৌজ।

আশ্রমের দিকে যাচ্ছি , দেখলাম দুজন বৃদ্ধ দণ্ডী সন্ন্যাসী কমণ্ডলু হাতে মন্দিরে যাচ্ছেন সিদ্ধনাথের পূজা করতে। আশ্রমে এসে দেখি দিওয়ানাজী ঘুমিয়ে আছেন। ঝোলা হতে 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বইটি বের করে আবার মন্দিরে ফিরে এলাম। সেই দণ্ডী সন্ন্যাসীদ্বয় তাঁদের দণ্ড স্পর্শ করে শিবস্তোত্র পাঠ করছেন। স্তোত্র পাঠ হতেই তাঁরা চলে গেলেন। অমরকন্টক হতে এ পর্যন্ত আমি এর আগে কোন দণ্ডী সন্ন্যাসী দেখিনি, একজটা বাবাকে জিজ্ঞাসা করতে জানলাম যে স্বামী ভাবানন্দ আশ্রম নামে এক মহাত্মা আজ তিন চার বৎসর হল নেমাবরে এসে আশ্রম করে রয়েছেন। এই দুইজন মহাত্মা তাঁরই শিষ্য। স্বামী ভাবানন্দ শংকরপন্থী অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসী অনর্গল সংস্কৃত ছাড়া অন্য ভাষায় কথা বলেন না। তাঁর গুরুপীঠ হল কাশীস্থিত মছলি-বন্দর মঠ। আমার ডেরা থেকে একটু দূরেই তিনি সম্প্রতি তাঁর আশ্রমেই অবস্থান করছেন। এখন তুমি পূজা সেরে চল, কোন এক সময় তাঁর কাছে নিয়ে যাবো। তবে সংস্কৃতে কথা বলতে হবে। এই দুঃখে ঐ সন্ন্যাসীর কাছে কেউ যান না।

যাইহোক আমি 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বইটি ঘেঁটে পূর্বদৃষ্ট লক্ষণ মিলিয়ে মিলিয়ে সিদ্ধনাথের পরিচয় পেলাম যে ইনি বৈষ্ণবলিঙ্গ, কারণ বৈষ্ণবলিঙ্গের পরিচয় হচ্ছে যে,

> বৈষ্ণবং শঙ্খচক্রাঙ্কগদাজ্জাদিবিভূষিতম্।
> শ্রীবৎসকৌস্তুভাঙ্কঞ্চ সর্বসিংহাসনাঙ্কিতম্।।
> বৈনতেয়সমাঙ্কং বা তথা বিষ্ণুপদাঙ্কিতম্।
> বৈষ্ণবং নাম তৎপ্রোক্তং সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদম।।

সিদ্ধানাথের লিঙ্গে শ্রীবৎস, কৌস্তভ, গরুড় ও বিষ্ণু পদচিহ্ন না থাকলেও শঙ্খ, চক্র গদা, পদ্ম প্রভৃতি বিষ্ণু চিহ্ন থাকায় ইনি যে বৈষ্ণবলিঙ্গ এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হলাম। এই লিঙ্গ সর্বৈশ্বর্য প্রদান করেন। তাই রাজ্যভ্রষ্ট হৃতসর্বস্ব কুবের এর তপস্যা এবং অর্চনা করে পুনরায় অলকাপুরী লাভ করতে এবং ধনাধিপতি হতে পেরেছিলেন।

শিবের মাথায় বেলপাতা চাপিয়ে প্রণাম করে মন আনন্দে ভরে গেল। মন্দির থেকে বেরিয়েই আমি একজটা বাবাকে কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নর্মদার ঘাটে গিয়ে নামলাম। ইতিমধ্যেই আমার মনে জেগেছে যে, ঁহরকুমার ঠাকুর এই দুর্লভ বই 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' সংকলন করেছিলেন এবং মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর যেটি প্রকাশ করে সমগ্র হিন্দুজনতার অশেষ ধন্যবাদের পাত্র হয়েছেন, যে বইটির সাহায্যে শিবভূমি নর্মদাতে এসে আমি শিবলিঙ্গের পরিচয় জানতে পারছি , আমার সর্বাগ্রেই উচিত ছিল তাঁদের উদ্দেশ্যে নর্মদার পবিত্র জলে অর্ঘ্য দান করা। আমি নর্মদার জলে তাঁদের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে অর্ঘ্য নিবেদন করে এসে একজটা বাবাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর ডেরায় ফিরলাম।

দিওয়ানাজীকে দেখলাম দুটি বড় ভাঁড়ে মাঠা ঢেকে রেখে বসে আছেন। একজটা বাবার দুজন সেবক তাঁকে মাঠা দিয়েছিলেন, আমাকে নিয়ে একসঙ্গে তা পান করবেন বলে বসে আছেন। মাঠা শেষ করে জিজ্ঞাসা করলেন — ক্যা সিদ্ধনাথজীকো পরিচয় উদ্‌ঘাটন কিয়া? আমি তাঁকে সব তথ্য জানালাম। বেলা প্রায় একটার সময় ভোজনপর্ব সমাধা করে একজটা বাবাকে অনুরোধ করলাম দণ্ডী সন্ন্যাসী ভাবানন্দজীর আশ্রমটা দেখিয়ে দিতে। দিওয়ানাজী মন্তব্য করলেন — বেকার বার্তালাপ সে ক্যা ফয়দা? বিশ্রাম করো, সিদ্ধনাথজীকো স্মরণ মনন করো। আমি তাঁকে কোনমতে বুঝিয়ে আশ্রমের সেবককে সঙ্গে নিয়ে ভাবানন্দজীর আশ্রমে এলাম। বনের মধ্যে নর্মদার তটেই তিনটি কুটির, একটিতে তিনি স্বয়ং থাকেন, অন্য দুটিতে আর চারজন সন্ন্যাসী থাকেন। আমি আশ্রমে ঢুকতেই ভাবানন্দজীর গর্জন শুনতে পেলাম।

— কুতো আগতবান ভবান্? গৌড়দেশাৎ?

— বাঢ়ম্ (হ্যাঁ)।

— অহমেব তত্রদেশাৎ আগতোহস্মি যত্র দেশাৎ ভগবৎ পূজ্যপাদ শংকরাচার্য আবির্ভুবয়ন্ বৌদ্ধধর্মাদিন অপধর্মান্‌নিগড়ীকৃত্য সনাতন ধর্মতত্ত্বম্ সমুজ্জ্বল কৃতবান্।

— যো ধর্মতত্ত্বাৎ ভগবৎপাদ বুদ্ধঃ মহাবীরশ্চ অহিংসা মৈত্রী করুণা মুদিতাদিন প্রচার্থ সর্বেযাম্ শং মঙ্গলম্ করোৎ তান ধর্মান্ অপধর্মান্ উচ্চার্য ত্বমহপি অপভাযিতবান্। ইদং গর্হিতম, ইদং গর্হিতম্।

সংস্কৃত ভাষায় এই কথোপকথন বাংলায় বললে এই দাঁড়ায় যে, তিনি এমন মহান দেশ থেকে এসেছেন যে দেশে ভগবান শংকরাচার্য আবির্ভূত হয়ে বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম প্রভৃতি অপধর্মকে নিগড়বদ্ধ এবং স্তব্ধীভূত করে সনাতন হিন্দুধর্মকে সমুজ্জ্বল করে গেছেন।

তার উত্তরে আমি জানালাম যে — ভগবান বুদ্ধদেব ও মহাবীর অহিংসা সত্য মৈত্রী মুদিতা ও করুণার বাণী প্রচার করে সমগ্র জীবজগতের কল্যাণ করেছিলেন, তাঁদের সেই মহান্ কল্যাণ ধর্মকে অপধর্ম বলে আপনি গর্হিত কাজ করেছেন।

আমার কথায় সাধু ক্ষেপে উঠলেন যেন। তিনি সংস্কৃতে বলতে লাগলেন — গৌড়দেশ বেদবর্জিত। বেদ-বেদান্তের নিগূঢ় তত্ত্ব গৌড়ীয়দের মাথায় ঢুকবে না, তায় তোমার বয়সও অল্প।

আমি সংস্কৃতেই জবাব দিলাম — যে দেশ মহর্ষি কপিলের তপস্যাভূমি, যেখানে জন্মগ্রহণ করে সন্ন্যাসীকুলের পূজনীয়, ভারতের দ্বিতীয় শংকরাচার্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' লিখে শংকরাচার্য প্রচারিত অদ্বৈতবাদের কঠিন্ ইক্ষুদণ্ড হতে সুমিষ্ট নির্যাস নিষ্কাসন করে আপনাদের মত পণ্ডিতম্মন্যদের বোধগম্য করে তুলেছেন, কিংবা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যেখানে আবির্ভূত হয়ে ভক্তিপ্রেমের মন্দাকিনীর রুদ্ধ স্রোতকে উৎসারিত করে দিয়েছেন, সে দেশকে বেদবর্জিত বলতে আপনার মত প্রবীণ সন্ন্যাসীর জিহ্বা কম্পিত হল না দেখে আশ্চর্য বোধ করছি।

ভাবানন্দ — অদ্বৈতসিদ্ধি প্রণেতা মধুসূদন সরস্বতীর গুরুস্থানীয় আচার্য শংকরের জন্মভূমি এবং চৈতন্যদেবের গুরুস্থানীয় পূর্বাচার্য রামানুজ বা মধ্বাচার্যের দ্বারা ব্যাখ্যাত ভক্তিবাদের উৎপত্তিস্থল হিসাবে কেরল তথা মদ্রদেশের গুরুত্ব যে গৌড়দেশের চেয়ে বেশী একথা তুমি

কিছুতেই অস্বীকার করতে পার না। মহা মহা মনীষী বেদজ্ঞ এবং বৈদান্তিক জন্মেছেন দাক্ষিণাত্যে।

আমি — বড়ই আশ্চর্য যে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেও ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতার সংকীর্ণ সংস্কার হতে এখনও মুক্ত হতে পারেন নি। কেরল, মাদ্রাজ বা বাংলাদেশ ঋষি-সেবিত ভারতবর্ষেরই এক একটি অঙ্গদেশ মাত্র। ভারতের যে অংশে যে মনীষী বা তত্ত্ববিদ জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাই দিয়ে কোন দেশ ছোট বা বড় তার বিচার করা একান্ত হীনবুদ্ধি বলেই মনে করি। তপোভূমি নর্মদার তটে কোন সন্ন্যাসীর কাছে এই রকম কথা শুনতে পাব আশা করি নি। আপনি দণ্ড গ্রহণ করেছেন যেখান থেকে আপনার সেই গুরুস্থান অর্থাৎ কাশীর মছলি-বন্দর মঠও আর্যাবর্তেরই একটি ক্ষুদ্র স্থান। কোন তত্ত্বসাক্ষাৎকার বা মনীষার দিব্যপ্রকাশ ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়; যেখানেই, যার মধ্যেই জ্যোতিষ্মতী প্রজ্ঞার উদয় ঘটুক না কেন; তা সমস্ত পৃথিবীর মানুষকেই উপকৃত করে। দেশকালের গণ্ডী অতিক্রম করে তা সর্বকালের সর্বজাতির মানুষেরই গর্ব ও গৌরবের বস্তু হয়। গৌড় তথা বাংলাদেশের উপর আপনার বিরাগ এবং উন্নাসিক মনোবৃত্তি দেখে আপনাকে গৌড়ীয় মহামনীষী অতীশ দীপঙ্করের পুণ্যনাম সবিনয়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। শুধু কেরল বা মদ্রদেশে কেন সারা পৃথিবীর কোণে কোণে মাথা খুঁড়ে মরলেও আপনি তাঁর সমকক্ষ মৌলিক প্রতিভার অধিকারী আর একজন তত্ত্বাচার্যের নাম করতে পারবেন না।

দেখলাম, ভাবানন্দজীর মুখ ক্রোধে রক্তিম আকার ধারণ করেছে ; কপাল ও গলার শিরাগুলোও ফুলে উঠেছে। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে সংস্কৃতে বলে উঠলেন — 'তুমি বালক, তোমার প্রগলভতা আমি ক্ষমা করলাম। বলত বাচাল ছেলে, শংকরাচার্যের মত মাত্র আট বৎসর বয়সে আর কে সর্বশাস্ত্রবিশারদ হতে পেরেছেন?' শংকরো শংকরঃ সাক্ষাৎ স দেব ন তু মানুষঃ। মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়েছিল। পৃথিবীর ধর্মেতিহাসে আর কোন ধর্মাচার্যের কথা কি তুমি পড়েছ যিনি এত অল্প বয়সে সারাভারতের তৎকালীন বিভিন্ন ধর্মের শ্রেষ্ঠ ধর্মাচার্যদেরকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করে বেদ-বেদান্তসিদ্ধ অদ্বৈতবাদের বিজয়-কেতন উড্ডীন করতে পেরেছেন? কী অমানুষিক সংগঠনী প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি! একবার ভেবে দেখ, পদব্রজে পরিক্রমান্তে ভারতের চার প্রান্তে চারটি প্রধান মঠ যথা দ্বারকায় সারদামঠ, মহীশূরে শৃঙ্গেরীমঠ, পুরীতে গোবর্ধনমঠ এবং বদরিকাশ্রমে জ্যোতির্মঠ স্থাপন করে তিনি সনাতন হিন্দুধর্মের একটা সুসংহত রূপ দিয়েছিলেন। দৈবী প্রতিভা ছাড়া কি আর কারও দ্বারা এই রকম বিরাট কাজ করা সম্ভব?

আমি — আপনি দয়া করে আমাকে ভুল বুঝবেন না। আচার্য শংকরকে আমি যুগন্ধর পুরুষ বলে স্বীকার করি এবং শ্রদ্ধা করি। আমি কেবল কৌতূহল নিবৃত্তির জন্য আপনাকে আর একটি প্রশ্ন করব। আচার্য বারটি প্রধান উপনিষদ এবং ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য রচনা করেছেন একথা আমরা সবাই জানি এবং মানি। তাঁর প্রতিটি ভাষ্য রচনার প্রতি পংক্তিতেই মনীষার স্বাক্ষর রয়েছে, একথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য। কিন্তু স্তবকবচমালার শতশত স্তোত্রও কি তিনি রচনা করেছিলেন?

ভাবানন্দ — নিশ্চয়ই করেছিলেন। দেবদেবীর উদ্দেশে রচিত তাঁর প্রতিটি স্তোত্রের তলায় লেখাই ত আছে —ইতি শ্রীমৎ-পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য-বিরচিতং

শিবাপরাধক্ষমাপন-স্তোত্রং অথবা শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপন-স্তোত্রং-সমাপ্তম ইত্যাদি।' কাজেই এ বিষয়ে তোমার কোন সন্দেহ থাকলে তা অমূলক।

আমি — ভগবন্! আপনার মত এইরকম বিদ্বান স্বামীজীর দর্শন লাভ আর কোনদিন জীবনে ঘটবে কিনা জানি না, তাই আপনার কাছে আর একটি শঙ্কার সমাধান করে নিচ্ছি। আপনি কোন অপরাধ নেবেন না।

স্তব, স্তুতিতে দেবতা সন্তুষ্ট হন, স্বামীজী ত মনুষ্য দেহধারী! তিনি আমার বিনম্র বচনে অর্থাৎ তোষামুদিতে তুষ্ট হয়ে হাসতে হাসতে বললেন — ব্রুহি ব্রুহি কিম্ শঙ্কামিতি অর্থাৎ বল বল তোমার শঙ্কাটি কি ?

আমি — শংকরাচার্য বিরচিত স্তবস্তোত্র প্রসঙ্গে আপনার শ্রীমুখ হতে যখন দৃষ্টান্তস্বরূপ শিবাপরাধক্ষমাপণ এবং শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রের নাম উচ্চারিত হল, তখন ঐ দুটি স্তোত্র সম্বন্ধেই আমার কিঞ্চিৎ আশঙ্কার কথা নিবেদন করছি। শিবাপরাধক্ষমাপণ নামক দীর্ঘ স্তোত্রে শিবের কাছে কাতর প্রার্থনা করা হচ্ছে — হে মহাদেব, পূর্ব জন্মার্জিত কর্ম-বিপাকে আমি যখন ভ্রূণাবস্থায় মাতৃগর্ভের মধ্যে বিষ্ঠা মুত্রের সঙ্গে লিপ্ত ছিলাম তখন তোমাকে স্মরণ করিনি, শৈশবে স্তন্যপানে সদাই আসক্ত থাকায় রোগে তাপে জর্জরিত হয়ে তোমাকে ডাকার কথা ভুলে গেছি। যৌবনকালে এবং প্রৌঢ়াবস্থায় কামভোগে মত্ত থেকেছি। স্ত্রী-পুত্র, বিষয়-লালসা, মানগর্ব, এইসব নিয়ে ভোগের মোহে ডুবেছিলাম। তোমাকে যথোচিতভাবে স্মরণ মনন করিনি। এখন বার্ধক্যে ইন্দ্রিয় সব জীর্ণ এবং বিকল হয়ে গেছে। রোগ শোক তাপে শক্তিহীন হয়ে পড়েছি বলে তোমার ধ্যান করতে পারছি না। হে প্রভু, তুমি আমাকে ক্ষমা কর — ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো।

এই স্তোত্র যদি শংকরাচার্য প্রণীত হয়, তাহলে তাঁর বার্ধক্য অবস্থার কথা আসে কি করে? আপনি ত বলছেনই, তাছাড়া তাবৎ হিন্দুজনতা এবং শংকরপন্থী সন্ন্যাসী মত্রেই বিশ্বাস করেন যে মাত্র বত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁর দেহান্ত হয়েছিল, বত্রিশ বৎসর বয়সকে ত যৌবনকালই বলা যায়। এর একটা মাত্র জবাব এই হতে পারে যে, তিনি এই স্তোত্রে 'মম' 'মে' প্রভৃতি প্রথম পুরুষের শব্দ ব্যবহার করলেও সর্বসাধারণের শৈশব-বাল্য-যৌবন-প্রৌঢ়-বার্ধক্য অবস্থার কথা বিবেচনা করে সর্বসাধারণের পক্ষে মহাদেবের চরণে প্রাণের আকুতি নিবেদনের জন্য এই স্তোত্র রচনা করেছিলেন। কিন্তু শ্রীদুর্গাপরাধক্ষমাপণ স্তোত্রের এমন একটা শ্লোক আছে যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে আচার্য শংকর পঁচাশী বৎসর বয়স এমন কি তদধিক কাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

তদ্‌যথা —

> পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া
> ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি।
> অপীদানীং মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা
> নিরালম্বো লম্বোদর-জননি কং যামি শরণং।।

এই স্তোত্রে দেখা যাচ্ছে , শিবস্তোত্রের ঢংএ শংকরাচার্য বলছেন — জগৎজননী মাগো, আমি যন্ত্র-মন্ত্র জানি না। কিভাবে স্তুতি বা কিভাবে কাতরতা প্রকাশ করতে হয়, তাও আমার জানা নাই; নির্ধনতা ও আলস্য নিবন্ধন শাস্ত্রানুসারে যে সকল কর্তব্য-কর্মের অনুষ্ঠান করতে

হয় তাও আমি শিখিনি। আচার-বিচারের আড়ম্বর ও নিয়মনিষ্ঠার বেড়াজালে বিভ্রান্ত হয়ে যথোচিত ভক্তিসহকারে কোন দেবতার সেবা পূজাও করিনি। ইদানীং পঁচাশী বৎসরের অধিককাল আমার বয়স হয়ে গেছে এখন শেষ আশ্রয় তুমি। ঐয়ি লম্বোদর-জননি, অবলম্বনহীন নিরাশ্রয় সন্তানকে এখনু তুমি যদি কৃপা না কর, তাহলে আমি কার শরণ নেব? 'পঞ্চাশীতেরধিকমপনীতে তু বয়সি' অর্থাৎ — পঁচাশী বৎসরেরও অধিককাল বয়স — এইরকম একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই প্রতিপন্ন হয় যে, হয় এইসকল স্তব স্তুতি শংকরাচার্য রচনা করেন নি, নতুবা তিনি বত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত বেঁচে থেকে নানা অসাধ্য সাধন করেছিলেন, এই গল্প মিথ্যা। এখন মহারাজের যা অভিরুচি !

ভাবানন্দ কোন উত্তর দিলেন না। থমথমে মুখ নিয়ে বসে থাকলেন। তাঁকে চুপ করে থাকতে দেখে আমি বলতে লাগলাম — আরও একটি ক্ষুদ্র শঙ্কা মনে জাগছে। আমি দাক্ষিণাত্য পরিভ্রমণের সময় মাধ্বমতাবলম্বী পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য এবং তৎপুত্র পণ্ডিত নারায়ণাচার্য প্রণীত 'মণিমঞ্জরী' নামক একটি ক্ষুদ্র পুস্তক পড়েছিলাম। পুস্তকটির প্রণয়নকাল অজ্ঞাত। ১৮৩৪ সালে মাদ্রাজের মাধ্ববিলাস বুক ডিপো হতে বইখানি প্রকাশিত। ঐ পুস্তকে আচার্য শংকরকে 'জারজ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে। শংকরের বর্ণসঙ্করত্বের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যই বুঝি বা উক্ত গ্রন্থের সর্বত্র 'শংকর' শব্দের বর্ণবিন্যাস করা হয়েছে — 'সংকর'। শংকরাচার্য যখন মণ্ডনমিশ্রকে শাস্ত্র বিচারে পরাজিত করেন তাতে মধ্যস্থ ছিলেন মণ্ডন পত্নী সরস্বতী দেবী। সেই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে 'মণিমঞ্জরী' প্রণেতারা যা লিখেছেন তার কয়েকটি শ্লোক স্মৃতিপথে উদিত হচ্ছে। আপনার অবগতির জন্য এবং সেই বই পড়ার পর থেকে যে চিত্ত-বেদনায় কষ্ট পাচ্ছি, তা অপনোদন করে নিবার উদ্দেশ্যে কয়েকটি শ্লোক বর্ণনা করছি, আপনি দয়া করে শুনুন —

ততঃ স মণ্ডনমিশ্রস্য গৃহং ব্রবাজ সংকরঃ।
কিমপ্যবোধ্যতাপাঙ্গবীক্ষয়া তৎপ্রিয়ামুনা।।
নিলীনোহধ্বায়ভিক্ষুর্নিশীথে প্রাঙ্গনাদ্বহিঃ।
তয়া কিঞ্চিৎ পরিগতে, নিদ্রয়া নিঝর্ভর্ত্তরি।।

... ...

ইত্যুক্তা তেন সোহজল্পৎ, সা পতিম্ জিতমব্রবীৎ।
ততঃ পর্য্যব্রজদ্বিপ্রস্তয়া রেমে স সংকরঃ।।

আচার্য শংকরের মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে শাস্ত্রার্থ বিচার প্রসঙ্গে ত্রিবিক্রমাচার্য যা লিখেছেন; শ্লীলতা রক্ষার জন্য তার সারসংক্ষেপ ও তাৎপর্যানুবাদ করলে এই দাঁড়ায় —'শংকর মণ্ডনমিশ্রের সঙ্গে বিচারে উপস্থিত হওয়ার পূর্বদিন মণ্ডনমিশ্রের বাড়ীতে গিয়ে অপাঙ্গবীক্ষণ দ্বারা তাঁর পত্নীর চিত্তহরণ করেন এবং রাত্রে সংকেত ধ্বনির দ্বারা মণ্ডনমিশ্রের পত্নীকে গৃহের বাইরে এনে তাঁকে রমন করে বশীভূত করেন। পরের দিন মণ্ডনমিশ্রের কাছে উপস্থিত হয়ে তাঁর পত্নীকে মধ্যস্থ রেখে শাস্ত্রার্থ বিচারে প্রবৃত্ত হন। মণ্ডনমিশ্রের পত্নী পূর্ব হতেই শংকরের বশীভূতা ছিলেন বলে তিনি শংকরের জয় এবং মণ্ডনের পরাজয় ঘোষণা করেন। বিচারের পূর্বে প্রতিশ্রুতি অনুসারে মণ্ডনমিশ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তখন শংকর কিছুদিন মণ্ডন পত্নীর সঙ্গে বাস করে তাঁর **রতিবাসনা** পূর্ণ করেন।.......'

এইসব কথা বলে আমি মন্তব্য করলাম — মহারাজ, শিবকল্প মহাযোগী শংকরাচার্যের দেবচরিত্রের এই কদর্য অপবাদের এক বর্ণও আমি বিশ্বাস করি না। আপনার দৃষ্টিতে যাঁরা বেদবর্জিত সেইরকম কোন গৌড়দেশীয় পণ্ডিতের কলম থেকে এইরকম কোন কদর্য কথা প্রকাশিত হয়নি। এই জঘন্য অপবাদ প্রচার করেছেন আপনারই স্বদেশবাসী তথাকথিত 'বেদজ্ঞ' মদ্রদেশীয় পণ্ডিত ত্রিবিক্রমাচার্য এবং তাঁর গুণধর পুত্র পণ্ডিত নারায়ণাচার্য।

ভাবানন্দ ক্রোধে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন — দূরমপসর! দূরমপসর! অর্থাৎ তুই দূর হয়ে যা! 'নমো নারায়ণায় নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করে আমি একজটা বাবার আশ্রমে দ্রুতপদে ফিরে এলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে আসছে।

আমাকে দেখেই দিওয়ানাজী বললেন — ঝুটমুট বিতণ্ডাসে ক্যা ফায়দা হোতা হৈ? জো আদমী ঘেমণ্ডী হোতা হৈ, সাল ভর সমঝানেসে ভি উনকা ঘেমণ্ড বিমারী হঠেগা নেই। আভি চলিয়ে সিদ্ধনাথজীকি আরত্ দর্শন করুঁ। দুজনে সিদ্ধনাথজীর মন্দিরে গিয়ে আরতি দর্শন করতে থাকলাম।

আগামীকাল সকালেই যাতে ওঙ্কার-মান্ধাতার দিকে যাত্রা করতে পারি, দিওয়ানাজী এবং একজটা বাবার অনুমতি চেয়ে রাখলাম। দিওয়ানাজী বললেন — সতত রেবা মন্ত্র জপ করতে করতে ঝাড়ি পথে হাঁটবে। ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি প্রায় ৮০ মাইল লম্বা এবং ১০ মাইল চওড়া। ঘনঘোর জঙ্গল তবে মুণ্ডমহারণ্যে যেমন পাখীও ডানা মেলতে পারে না, এত ঘন এ জঙ্গল নয়। সেগুন গাছের এতবড় জঙ্গল সারা ভারতের আর কোন জঙ্গলে নাই। তাছাড়া বুনো নিম্, সাজা, বিল্ব কোথাও কোথাও বট অশ্বত্থেরও ক্বচিৎ দর্শন মিলবে। মুণ্ডমহারণ্যের চেয়ে এ জঙ্গলে গেণ্ডা (গণ্ডার), বাঘ, ডাংগো (হায়না), হুড়াল (নেকড়ে বাঘ) এবং সাপের উপদ্রব বেশী। শীত শেষ হয়ে গেছে বলে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর বিষধর সাপরা এবার তাদের গর্ত থেকে বোরোবে, মা নর্মদা তোমাকে রক্ষা করুন।

এই বলে তিনি আমার চিবুকে হাত দিয়ে আদর করে বললেন — বেটা, রেবা নাম হরবখৎ জপতে রহো তব রেবা মাতাজীকা কৃপা মালুম হোগা।

আমি তাঁকে বললাম — আচ্ছা আপনি ছাড়াও এই রেবাতটে যত মহাত্মার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে, সবাই একবাক্যে বলেছেন রেবা নাম জপ কর, রেবা নাম জপ কর। এর কারণ কি ? যে যার গুরুদত্ত ইষ্টমন্ত্র আছে। সে তা জপ করলে কেন তা ফলদায়ী হবে না? রেবাতট যদি তপোভূমি হয়, তাহলে যে যার ইষ্টমন্ত্র নিষ্ঠা সহকারে জপ করলে এবং যথোচিত নিয়মে ইষ্টদেবতার স্মরণ-মনন করলে সেই মন্ত্রই ত জাগ্রত ও চিন্ময় হয়ে ওঠার কথা। আর তবেই ত নর্মদাতটকে তপোভূমি এবং নর্মদামায়ীকে সিদ্ধিপ্রদায়িনী মহাকন্যকা শক্তি বলা সার্থক হয়? আমার পিতৃদত্ত মহাবীজ ত্যাগ করে শ্বাসে শ্বাসে রেবা রেবা করলে তাতে কি অনবস্থা দোষ জন্মাবে না?

— য্যায়সা তুম্‌হারা ইচ্ছা। ক্যা কহুঁ , নর্মদামায়ী তুম্‌হারা আচ্ছাই করে গা। এই বলে তিনি শুয়ে পড়লেন। আমিও শুলাম। দিওয়ানাজীর হস্তস্পর্শে ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলাম প্রায় সকাল হয়ে গেছে , তাই তিনি আমাকে জাগিয়ে দিলেন। কিন্তু না, তিনি নিজেই বললেন — আভিতক্ সুবা নাহি হুয়া। দো আড়াই ঘন্টে আভিতক্ বাকী হ্যায়।

তবে ঘুম ভাঙালেন কেন?

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন — শিবমহিম্নঃ স্তোত্রম্ আমার মুখস্ত আছে কি না?

— না আমার মুখস্ত নাই তবে বহুবার আমি পাঠ করেছি।

— নর্মদা পরিক্রমা করতে পাঠিয়েছেন তোমার বাবা, অথচ তোমাকে তিনি শিবমহিম্নঃস্তোত্রম্ মুখস্ত করান নি, ইয়ে বড়ি তাজ্জব বাৎ!

তাঁর কথা শুনে মনে উষ্মা দেখা দিয়েছে। বাবার বিষয়ে কেউ এই ধরণের কথা বললে; তিনি যত বড় তপস্বী, এমনকি স্বয়ং শিবই হোন না কেন, আমার মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি বললাম — কেন শিবমহিম্নঃ স্তোত্র না মুখস্ত থাকলে কি এমন ক্ষতি হয়। পুষ্পদন্ত নামক কোন গর্ন্ধব প্রণীত স্তোত্রের চেয়ে আরও অনেক বড় মহিমা-মণ্ডিত মহাসিদ্ধ শিবস্তোত্র বাবা আমাকে শিখিয়ে গেছেন। ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্রে একাদশ রুদ্রের স্তব আছে, আরও অনেক শিবমন্ত্র বেদে আছে। বাবার দয়ায় সেসব আমি শিখেছি। বেদমন্ত্রের চেয়ে আর কোন স্তব বড় হতে পারে না।

— দেখ বাবা, ত্যাগ ও তপস্যার মূর্ত বিগ্রহ অনাদিকারণ-তত্ত্ব শিবসুন্দরের পীঠিকা হল এই পৃথ্বী, আকাশ তাঁর শীর্ষ। সহস্রার মণ্ডল রূপ হিমালয়ে তাঁর দিব্যপ্রকাশ, তুষার-ধবল তাঁর অঙ্গজ্যোতিঃ, নগ্ন নিঃসঙ্গ শ্মশানচারী মহাভৈরব তিনি। উত্তরা সুষুম্নার পথ বেয়ে দিব্য নর্মদার ধারা ব্রহ্মনাড়ী পথে বয়ে চলেছেন। চক্রে চক্রে ঘাটে ঘাটে তাঁর দিব্য অবতরণ এবং আরোহ পথে সমুদ্রসংগমে অর্থাৎ শিবাত্মায় লীন হওয়া — এই মহাযজ্ঞ এবং তপস্যার ধারাকে বাহ্যতঃ সূচিত করে এই নর্মদা পরিক্রমার পথ। নর্মদা তপস্যায় মুণ্ডমহারণ্য আছে, ওঁকারেশ্বরের ঝাড়ি আছে, আছে মহাভয়প্রদ শূলপাণির ঝাড়ি। অন্তর্জগতে এসবই আছে। সপ্তাক্ষর অঘোর মন্ত্রের সাধনায় এই তত্ত্ব দ্রুত উপলব্ধিতে ফুটে উঠে।

পুষ্পদন্ত বলেছেন —

মহেশান্নাপরো দেবো মহিম্নো নাপরা স্তুতিঃ।
অঘোরান্নাপরো মন্ত্রো নাস্তি তত্ত্বং গুরোঃ পরম্।।

অর্থাৎ শিবের চেয়েও শ্রেষ্ঠ দেবতা মহিম্নঃ হতে শ্রেষ্ঠ স্তব, অঘোর মন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র এবং গুরু হতে শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নাই।

— মহিম্নঃ স্তোত্রের ঐ সাঁইত্রিশ নম্বর শ্লোকটি আমার জানা। শিব এবং শিবস্বরূপ গুরু সম্বন্ধে ঐ শ্লোকে যা বলা হয়েছে, তা আমি নতমস্তকে মানি। তবে অঘোর মন্ত্রের চেয়ে শ্রেষ্ঠ মন্ত্র আর নাই, একথা আমি স্বীকার করি না। কেননা, পূর্বাপর সকল ঋষিই স্বীকার করে গেছেন যে গায়ত্রীই শ্রেষ্ঠ মন্ত্র। গায়ত্রীকে বলা হয় মন্ত্ররাজ। আর সামান্য গর্ন্ধবকৃত স্তোত্রকে আমি যে শ্রেষ্ঠ বলে মানি না, তাতো আপনাকে একটু আগেই বলেছি। নিজে স্তোত্র রচনা করে পুষ্পদন্ত নিজেই নিজের ঢাক পিটিয়েছেন — মহিম্নো ন পরা স্তুতিঃ।

আমার কথা শুনে দিওয়ানাজী কিছুক্ষণ চুপ করে বসে রইলেন। ভোর হয়ে আসছে। জঙ্গলের মধ্য হতে বন্যমোরগ ডেকে উঠল।

আমি তাঁকে বললাম — এই অঘোর মন্ত্র কি অঘোরী কাপালিকদের যে কথা শুনি, তাদের মন্ত্র নাকি? তারা ত ঘোর তান্ত্রিক, কোন আচার বিচার নাই, নরমাংস ভক্ষণ করে; শবদেহের উপর বসে শ্মশানে সাধনা করে। দাহ্যমান শবের মাথার খুলি ফেটে গেলে তার ঘিলু নর-কপালে ধরে ভক্ষণ করে আর সর্বদাই সুরাপানে মত্ত থাকে।

দিওয়ানজী হাসতে হাসতে বললেন — না, না, সেইসব অনাচারী বীভৎস প্রকৃতির সাম্প্রদায়িক সাধনার মন্ত্র এটি নয়। পঞ্চাননের পাঁচটি রূপ — ঈশান, সদ্যোজাত, তৎপুরুষ, বামদেব এবং অঘোর। অঘোর শিবেরই নাম। তাঁরই সর্বসিদ্ধি মন্ত্র এই অঘোর বীজ। যোনিপীঠ মুদ্রায় বসে কোন সংযমী সাধক যদি বিশেষ প্রক্রিয়ায় এই সপ্তাক্ষর মহাবীজ জপ করেন তবে এগার দিনের মধ্যে তাঁর দেবদুর্লভ নির্বিকল্প সমাধি ঘটবে। এই মন্ত্রের যিনি সিদ্ধসাধক, যিনি যোনিপীঠ মুদ্রা নামে বিশেষ প্রক্রিয়াটি জানেন তাঁর কাছেই এই মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়। তাতেই সিদ্ধি। এই নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটলে কিংবা কোন অনাচারী বা ব্যভিচারী যদি বই পড়ে এই মন্ত্র শিখে নিয়ে সাধনা করতে বসে যান তাহলে তিনদিনের মধ্যে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। আমি সারাজীবন ধরে এই মন্ত্রের সাধনা করে আসছি। আমাকে যে এতদিন ধরে দেখছ, আমাকে কি অনাচারী বা উন্মাদ বলে মনে কর?

আমি পরিহাস করে বললাম — অনাচারী নন, সমস্ত আচরের ঊর্ধ্বে আপনিও ত একধরণের উন্মাদ —ঊর্ধ্বের বস্তু নিয়ে মেতে আছেন, অঘোরমন্ত্র আপনাকে দিওয়ানা করে ছেড়েছে।

— তা তুমি যাই বল, এই অঘোর মন্ত্রের সাধনায় কি হয়, তা গুছিয়ে সাজিয়ে বলতে হলে শংকরাচার্যের শতশ্লোকীয় একটি একটি শ্লোক তোমাকে শোনাতে হয়। শতশ্লোকীয়তে আছে —

নো দেহো নেন্দ্রিয়ানি ক্ষরমতি চপলং নে মনো নৈব বুদ্ধিঃ।
প্রাণো নৈবাহংঅস্মীতি অখিল জড়মিদং বস্তুজাতং কথং স্যাম্।
নাহঙ্কারো ন দ্বারা স্বজন গৃহসুত ক্ষেত্র বিত্তাদি দূরং
সাক্ষী চিৎ প্রত্যগাত্মা নিখিল জগদধিষ্ঠান ভুক্তঃ শিবোহহং॥

অর্থাৎ অঘোর মন্ত্রের সাধনায় অচিরাৎ এই বোধ জন্মে যে, আমি দেহ বা ইন্দ্রিয় নিচয় নই। বিনশ্বর ও অতি চঞ্চল মন বা বুদ্ধিও আমি নই, এমনকি প্রাণও নই; সুতরাং এই অখিল জড়বস্তুর সমষ্টিই বা কেমন করে হব? আমি অহংকার নই, স্ত্রী পুত্র বন্ধু ক্ষেত্র ধন প্রভৃতি আমার থেকে অনেক দূরে। আমি কর্তাও নই, ভোক্তাও নই, প্রপঞ্চের দর্শক, সাক্ষী মাত্র আমি; চৈতন্য আমার স্বরূপ, জীবের অন্তর্যামী আত্মাই আমি, সমস্ত বিশ্বের আধার আমার এই জ্ঞান, আমার সত্তা শিবস্বরূপ। জীবাত্মা আমি নই , আমি শিবাত্মা, শিবাত্মাই জীবের প্রকৃত স্বরূপ। অঘোর মন্ত্রের সাধনা করলে এই প্রকৃত স্বরূপ হতে আগন্তুক যত উপাধি, যত আবরণ, যত বন্ধন তা দ্রুত সরে যায়, খসে পড়ে ছিন্ন হয়। যোনিপীঠের উপর যেমন শিব থাকেন, তেমনি এই দেখ যোনিপীঠ মুদ্রা (বলতে বলতেই তিনি যোনিপীঠ মুদ্রার অঙ্গ-ভঙ্গিমা বা আসন দেখিয়ে দিলেন)। এই মুদ্রায় বসে সপ্তাক্ষর অঘোরমন্ত্র — হৌং অঘোরায় নমঃ — নিবিষ্ট চিত্তে জপ করতে থাকলে জীবচেতনা শিবচেতনায় রূপান্তরিত হয়। এই মন্ত্রের সাধনা করেছিলেন অগস্ত্য, করেছিলেন দুর্বাসা এবং দত্তাত্রেয়। শিবের প্রধান অনুচর পুরাণ প্রসিদ্ধ ভৈরব নন্দী মহারাজও এ মন্ত্র জপ করেছিলেন ....

— থামুন, থামুন ; আপনার কাছে কোন মন্ত্র সাধনা শেখার প্রয়োজন আমার নাই , চিৎকার করে উঠলাম আমি। 'আমার গুরু পিতাঠাকুরের কাছে যে মন্ত্র পেয়েছি, সেই আমার পরম সম্বল।' এই বলে আমি কমণ্ডলু হাতে নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম। স্নান তর্পণাদি

সেরে সিদ্ধনাথজীকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে এসে দেখি, তিনি পরিপাটি করে আমার গাঁঠরী এবং কম্বল বেঁধে রেখেছেন। একজটা বাবা বললেন — সারাদিন জঙ্গল পথে হাঁটতে হবে, এই পথে সহসা কোন লোকালয় পাবেন না, সারাদিন কিছু জুটবে কিনা ঠিক নাই। ব্রহ্মচারী আশ্রমের গাভীটিকে দুয়ে এই দুধ আপনার জন্য দিয়েছে। খেয়ে নিন। তাঁর হাতে থেকে দুধের ভাঁড় নিয়ে চুমুক দিয়ে খেয়ে ফেললাম। একজটা বাবাকে প্রণাম করে দিওয়ানাজীকে প্রণাম করে যুক্তকরে বললাম — আপনি বৈষ্ণবতীর্থ হতে হোলিপুরা, হোলিপুরা হতে বৈষ্ণবতীর্থ পর্যন্ত ঘোরাফেরা করেন। এর বাইরে কোথাও যাতায়াত করেন না, একথা আমি শুনে এসেছি, সেই আপনি যে স্নেহবশে এতদূর পর্যন্ত আমার সঙ্গে এসেছেন আপনার এই স্নেহ এবং করুণার কথা আমার চিরকাল মনে থাকবে। আমি আপনার মন্ত্রদান কালে যে উত্তেজনা দেখিয়েছি, সেজন্য আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। দিওয়ানাজী আমাকে জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন!

আমি বললাম — ছিঃ! অঘোর মন্ত্রের সাধককে কাঁদতে নাই। আপনিই ত একটু আগে বলেছেন, যিনি অঘোর মন্ত্রের সিদ্ধসাধক তাঁর চোখে এ জগৎ প্রপঞ্চ মাত্র, তাঁর স্নেহ মমতা থাকতে নাই, তিনি ত সাক্ষী চৈতন্য!

নিজের কণ্ঠস্বর নিজের কানেই বড় বিসদৃশ এবং কটু শোনালো। নিজের মনে ধিক্কার জন্মাল, এতবড় সিদ্ধ মহাত্মাকে একথা না বললেই ভাল হত, শোভন হত, কিন্তু আমার স্বভাব যা তাইতো করব! আমি পুনরায় প্রণাম করে জঙ্গল পথে নর্মদার তীর ঘেঁসে হাঁটতে লাগলাম। সূর্য উদিত হচ্ছেন, বিন্ধ্যপর্বত ও সাতপুরা পর্বতমালার শীর্ষদেশ উদীয়মান সূর্যের লাল আভায় রঙীন হয়ে উঠছে। হন্ হন্ করে হাঁটছি, হঠাৎ চমকে উঠলাম দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বর শুনে। পিছন দিকে তাকিয়ে দেখি, তিনি ধীরে ধীরে গান গাইতে গাইতে আসছেন — তেরা হীরা হিরাইল বা কিচড়মেঁ।

কোঈ ঢুঁড়ে পূরব কোঈ ঢুঁড়ে পছিম কোঈ ঢুঁড়ে পানি পত্থল মেঁ।
দিওয়ানা জো হীরাকো পরখেঁ বাঁধ লিয়া জীয়রাকে আঁচলমেঁ।।

অর্থাৎ কাদার মধ্যে হারিয়ে গেছে তোর হীরা। কেউ খুঁজছে পূবে, কেউ পশ্চিমে, কেউ জলে, কেউ পাথরের মধ্যে। দিওয়ানা এই হীরা পরীক্ষা করে হৃদয়ের আঁচলে বেঁধে নিয়েছে।

আমি কোন ভ্রূক্ষেপ করলাম না, তাঁর রসমধুর গানের মাধুরী আজ আমাকে আকর্ষণ করতে পারছে না, সামনে আমার দীর্ঘপথ, ভয়ঙ্কর ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে আমি, পথ কঙ্করময়। একটু অসাবধান হলে হোঁচট খেতে হবে। সেগুনের বিরাট অরণ্য সারা আকাশকে যেন ছেয়ে রেখেছে। মনে নানা কথার উদয় হচ্ছে। এতদিনের যাত্রাপথে কত বন্ধু, কত সাথী পেয়েছিলাম। মুণ্ডমহারণ্যে হাঁটার পথে সাথী পেয়েছিলাম দুজন দরদী সাধুকে— শোভানন্দ ও সূর্যনারায়ণজী মুণ্ডহারণ্যের অরণ্যযাত্রাকে আমার পক্ষে আরামপ্রদ করে তুলেছিলেন। কি খাবো, কোথায় থাকব, কোন তীর্থঘাটের পরে কোন তীর্থঘাট, কোথায় কোন নামের কি কি শিব মন্দির বিরাজিত, সে বিষয়ে আমাকে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাতে হয়নি। খাদ্যসংগ্রহ, খাদ্যপ্রস্তুত, কনকনে শীত থেকে বাঁচার জন্য কাঠসংগ্রহ করে আগুন জ্বালার ব্যবস্থা সবই তাঁরা করেছিলেন। তারপরে মান্দালায় এসে যখন প্রেমিক সাধু সুমেরদাসজীর সাক্ষাৎ পেলাম, তখন মনে হয়েছিল একান্ত আপনজনের সঙ্গে হাঁটছি। দুঃখ পাইনি, কষ্ট হয়নি, কোনদিন মন

খারাপ হয়নি মুহূর্তের জন্যও। কিন্তু আজ? আজ আমি সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ, সাথীহীন, নির্বান্ধব অবস্থায় চলেছি। দূর থেকে সামনের দিকে তাকালে ছায়ায় ঢাকা জঙ্গলের চওড়া বড় বড় পাতাওয়ালা লম্বা লম্বা সেগুন গাছগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে, সেগুলো দাঁড়িয়ে আছে বীভৎস প্রেতের মত।

হঠাৎ দূরাগত এক কণ্ঠধ্বনি ভেসে এল। সামনের দিকে তাকিয়ে কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। কান খাড়া করে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেই কানে ভেসে এল —

তেরা হীরা হিরাইল বা কিচড়মেঁ।

এ ত দিওয়ানাজীর কণ্ঠস্বর। তাঁর গানের সুর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ের কোণে কোণে। পাশের জঙ্গলে দৃষ্টি দিয়ে অনুসন্ধান করা বৃথা। কারণ ঘন সেগুন গাছের তলায় তলায় ছোট ছোট নানা জাতীয় গাছের ঝোপে দৃষ্টি আচ্ছন্ন। আবার একলাইন গান কানে এসে বাজল। গাঁঠরী ফেলে রেখে সামনের একটা বড় পাথরের উপর উঠে দাঁড়ালাম। পিছন দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম কেউ যেন আমারই মত একটা বড় পাথরের উপর উঠে বসে আছেন। একি ! সুমেরদাসজী! তিনি এখানে কিভাবে আসবেন? এ নিশ্চয় আমার দৃষ্টি বিভ্রম! একটু আগেই সুমেরদাসজীর কথা ভাবছিলাম, আমার সেই মনের ভাবনা গাছ ও পাথরের উপর পতিত সূর্যরশ্মির তির্যক কোণের সৃষ্টি করায় তারই পরাকর্ষ প্রতিক্রিয়ায় refracted reaction সুমেরদাসজীর মূর্তি গড়ে আমাকে প্রতারিত করছে! আমি চোখ দুটো ভাল করে রগড়ে নিলাম। এবার যখন সেইদিকে তাকালাম, তখন দেখি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। এ যে আমার প্রতিক্ষণের ধ্যেয় মূর্তি ! আমার জাগ্রত চেতনায় এই দিব্যমূর্তি এতই জীবন্ত যে মনের সাধ্য নাই যে এই রূপদর্শনে কোন দৃষ্টি বিভ্রম ঘটতে পারে। বিস্ময় বিস্ফারিত দৃষ্টিতে আমি চোখ বড় করে সেই জ্যোতির্ময় রূপ দর্শন করতে লাগলাম। আমি যখন গ্রামের বাড়ী হতে কলকাতা যেতাম, তখন তিনি কিছুটা পথ সঙ্গে এসে মাঠের মধ্যে এক অশ্বত্থ গাছের তলায় দাঁড়িয়ে থাকতেন, আমি কালিয়াড়া গ্রামের মাঠ পেরিয়ে গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোডে না ওঠা পর্যন্ত ঘন ঘন পিছন ফিরে তাকাতাম, দেখতাম তিনি দাঁড়িয়ে আছেন! যতক্ষণ না আমি দৃষ্টির আড়াল হচ্ছি, ততক্ষণই তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেই স্নেহ-বিহ্বল করুণা-ঢলঢল একই সজীব মূর্ত্তি! নর্মদাতটে এই ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আমার শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, আমি পড়ে গেলাম। উঠে দাঁড়িয়েই দৌড়তে লাগলাম। গাঁঠরী কমণ্ডলু সেখানেই পড়ে থাকল। প্রায় ছশ গজ দৌড়ে এসে দেখি, চোখ বন্ধ করে দিওয়ানাজী গেয়ে চলেছেন —

দিওয়ানা জো হীরাকো পরখেঁ বাঁধ লিয়া জীয়ারাকে আঁচলমেঁ।

আমি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে তাঁর হাত ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললাম — আপ্‌কা বিভূতিকা বিড়ম্বনা বন্ধ করো জী। আমি হাঁপাচ্ছি। যেন কিছুই হয় নি; এই ভঙ্গীতে মৃদু হাস্যে আমাকে বলতে লাগলেন — আমি তোমাকে দুটো কথা বলতে ভুলে গেছি, এইখান থেকে আর মাইল তিনেক গেলেই বাগদী সংগমে পৌঁছে যাবে। সেখান থেকে আর দশ মাইল দূরে তীথি ঘাট। সেখানে রাত্রির আশ্রয় জুটবে, সাথীও পাবে।

— আপনার অপার করুণা! কোন সাথীর আশা করে নর্মদা পরিক্রমা করতে আসিনি,

অথচ বাবার দয়ায় যখনই প্রয়োজন হয়েছে সাথী জুটে গেছে। আপনারা বলবেন নর্মদেশ্বর মহাদেবের দয়া কিংবা মাতা নর্মদার দয়া। আপনাকে মোটামুটিভাবে চিনতে পেরেছি বলে মনে হয়। সারাজীবন আপনার কাছে থাকতে পারলে আমার আধ্যাত্মিক মঙ্গল হত সন্দেহ নাই। কিন্তু বাবার আদেশ প্রতিপালন করার জন্য সর্বাগ্রে নর্মদা পরিক্রমা শেষ করাই আমার প্রধান কর্তব্য। আপনি আশীর্বাদ করুন যাতে আমার ব্রত সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারি। তিনি জড়িয়ে ধরে আমার মাথায় চুমু খেলেন। প্রণাম করে আমি এগিয়ে চললাম। আর পিছনের দিকে তাকালাম না।

যেখানে গাঁঠরী ফেলে গেছলাম সেখানে এসে গাঁঠরী পুনরায় কাঁধে তুলে নিলাম, কমণ্ডলুতে জল ভরবার জন্য নর্মদার ঘাটে নেমে চোখে মুখে জল নিয়ে কমণ্ডুল ভরে উঠে দাঁড়িয়েছি, দেখলাম একটা নীলগাই এর পিছনে একপাল নেকড়ে দৌড়ে চলে গেল। আমার গায়ের গন্ধ কি ওরা পায় নি! শুনেছি মানুষের গায়ের গন্ধ অনেক দূর থেকেই ওদের নাকে ঢোকে। আমার গায়ের গন্ধ পেলে কিংবা আমাকে দেখতে পেলে আমি যদি সারাদিন এবং সারারাত নর্মদার জলে নেমে দাঁড়িয়ে থাকতাম, তাহলে ওরা তীরে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করত, কিছুতেই ছেড়ে যেত না। যাইহোক আমি তটে উঠে হাঁটতে লাগলাম। বেলা বোধহয় দশটা নাগাদ আমি পৌঁছে গেলাম বাগদী সংগমে। পাহাড়ের উপর থেকে সেগুন বনের মধ্য দিয়ে একটা ছোট নদী বয়ে আসছে দেখতে পেলাম। বুঝলাম, এটাই বাগদী-সংগম। কোন মন্দিরও চোখে পড়ল না। এতদূর এলাম কোন মানুষজনও চোখে পড়ল না। জঙ্গল ক্রমেই ঘন হচ্ছে, মনে আতঙ্ক জাগানো সেগুন বনের বীভৎসতার মধ্যে সজ্ঞানে প্রবেশ করছি। এ এমন এক জঙ্গল যার কোন শ্রী নাই, ছাঁদ নাই। মড়্ মড়্ মড়াৎ! মড়্ মড়্ মড়াৎ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। কিছু দূরেই সেগুন বনের ছোট ছোট গাছ নড়ে দুলে উঠছে। বাঘ না কি ? মনে হওয়া মাত্রই সুমেরদাসজীর শেখানো মন্ত্রে গণ্ডী টেনে দাঁড়াবো কি না ভাবছি , এমন সময় দেখতে পেলাম একটা বুনো হাতির বাচ্চা হেলে দুলে ছোট সেগুনের গাছ চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে এল। কালো মেঘের মত গায়ের রং, যেমন একখণ্ড জমাট মেঘ সেগুন বনের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছে। আমি কয়েকটা বড় সেগুনের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম। হাতীটা চলে যেতেই আবার হাঁটতে লাগলাম। চৈত্রমাস সূর্যের তেজ বেশ বেড়ে গেছে, গায়ের ঘামে আলখাল্লাটা ভিজে জবজবে হয়ে গেছে। শুকনো সেগুন পাতার উপর পা দিলেই গাছের পাতা যে পায়ে ফুটে এই প্রথম অনুভব করলাম। একটা বেলগাছের তলায় দেখলাম বড় বড় বেল পড়ে আছে। পাকা দেখে একটা বেল কুড়িয়ে ঝোলায় পুরলাম। ছায়া পথ ধরে হাঁটতে লাগলাম। এসে পড়লাম এমন একটা স্থানে যেখানে গাছের জটলা অপেক্ষাকৃত কম। আকাশের দিকে তাকিয়ে সূর্যকে লম্বভাবে কিরণ দিতে দেখে অনুমান করলাম বেলা বারটা বেজে গেছে। ঘাটের দিকে নেমে গেলাম আর একবার স্নান করতে। ঘাটের গায়ে একটা বড় পাথরের চাঙড়ের উপর গাঁঠরীটা সবেমাত্র রেখেছি হঠাৎ সেই পাথরের তলা থেকে ফণা বিস্তার করে বেরিয়ে পড়ল বিরাট লম্বা সাপ। পিঙ্গল বর্ণের এইরকম সাপ জীবনে কখন দেখিনি। আমি দ্রুত সুমেরদাসজীর মন্ত্রে গণ্ডী টেনে দাঁড়িয়ে রইলাম। সাপের ক্রুদ্ধ গর্জন এবং পুনঃ পুনঃ লকলকে জিহ্বা বের করতে দেখে ভয়ের পরিবর্তে আমাদের

কুলগুরু মহেশ গোস্বামীর কথা মনে পড়ে গেল। মায়ের মুখে গল্প শুনেছি , এই গৃহীযোগীর সাড়ে ছয়ফুট দীর্ঘ গৌরকান্তি দেহ এবং তিলক লাঞ্ছিত প্রশস্ত ললাট দেখে যে কেউ বুঝত যে ইনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি। কিন্তু তিনি অসাধারণ হয়েও সাধারণের সঙ্গে মিশতে পারতেন। সাধারণ চাষীভূষি ভক্তদের সঙ্গে দাবা খেলতে বসে যেতেন। একবার তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে বেড়াতে এসে দাবা খেলায় তন্ময় ছিলেন, এমন সময় গ্রামেরই এক গরীব ভক্ত এসে কেঁদে পড়ল। 'বাবাগো আমার সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার বৌকে খরিস্ সাপ কামড়েছে। দংশনের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। এখন ওঝা এবং একজন ডাক্তার এসে বলছে বৌটা মরেই গেছে। বাবাগো, আমার সংসারটা ভেসেই গেল। দুটো ছোট ছোট বাচ্চাকে কি করে বাঁচাবো'? সে যতই ডুকরে ডুকরে কাঁদে এবং মাথা কুড়ে ততই গুরুদেব তাঁর সঙ্গী খেলোয়াড়কে বলেন — এই তোমার ঘোড়াকে খেলাম। এই নৌকার কিস্তি দিলাম। তাঁর এইরকম উদাসীন এবং নিষ্করুণ ভাব দেখে বাবা অধৈর্য হয়ে বলে ওঠেন — গুরুদেব! দয়া করে গরীবটার দিকে দৃষ্টি দেন। শুনেই তিনি তাঁর নৌকা রাজা আর বোড়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই বলতে থাকেন — কি বললে সাপ? সে থাকে কোথায়? তার জাত কি? গোত্র কি? নাম কি ? যা যা বিরক্ত করিস্ না, দেখবি যা রোগী উঠে বসেছে, তাকে টক পান্তা খেতে দিবি।

পরে দেখা গেল সত্য সত্যই সেই সর্পদষ্ট রোগিনী সেরে উঠেছিল। আমি কুলগুরুর সেই ঘটনা স্মরণ করে সর্পরাজের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলাম —'ওহে , তোমার নাম কি ? গোত্র কি ? কি জাত তোমার?' সাপটা সহসা জঙ্গলের মধ্যে চলে গেল। আমি নিজেই নিজের আচরণে আশ্চর্য হলাম। সেই কুলগুরুর পুণ্যনাম ও গোত্র উল্লেখ করে নর্মদার জলে তর্পণ করতে ইচ্ছা হোল। স্নান তর্পণ সেরে বেলটা পাথরে ঠুকে ভেঙে নর্মদামাতাকে নিবেদন করে প্রসাদ পেলাম।

ইষ্ট স্মরণ করতে করতে এগিয়ে চললাম। পরিক্রমাবাসীদের পথ এইটা! সামান্য চলার দাগ মাত্র! দুদিকেই পাথর আর কাঁকর, পথের উপরেও ছোটবড় পাথর, তাও আবার ঝোপ গুল্মে ঢাকা। খালি পায়ে হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে। তবুও উপায় নাই, লাফিয়ে ডিঙিয়ে হাতের লাঠি দিয়ে লতাপাতা সরিয়ে সরিয়ে চলতে লাগলাম। এইভাবে প্রায় আধমাইল হাঁটার পর এমন একটা স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে প্রায় দেড়ফুট চওড়া পরিষ্কার পথের দাগ। সেগুন ত আছেই , তার সঙ্গে শিমূল, বেল, জামীর, কাঁঠাল, চম্পক এবং অগস্তি গাছও দেখা যাচ্ছে। পথটা মোটামুটি অনুকূল হওয়ায় চলার গতি বাড়িয়ে দিলাম। নর্মদা তাঁর আপন বেগে বয়ে চলেছেন। নর্মদা এতদূর যেভাবে এঁকে বেঁকে আসছিলেন; এখানে দেখছি , তাঁর জলারাশি যেন ক্রমেই উঁচু হতে নিচের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে অর্থাৎ জলের তলায় পাহাড়ের অংশটা ক্রমে ঢালুর দিকে বাঁক নিয়েছে। এইভাবে প্রায় পাঁচ-ছয় মাইল হাঁটার পর এমন ঘোরতর সেগুন বনে ঢুকে গেলাম, যেখানে সবই ছায়াছায়া অন্ধকারে ঢাকা। বেলা অনুমান করলাম বড়জোর দুটো হবে। বনের প্রকৃতিটাই যেন বদলে গেল। দুনিয়ার তাবৎ কবিকুলের উপরেই আমার রাগ জন্মাল। যাঁরা রাজধানীর সুরম্য অট্টালিকায় বাস করে কিংবা সখের ভ্রমণে বেরিয়ে বাংলো বা হোটেলের জানালা দিয়ে পাহাড় দেখে সবুজ বনানীর লাবণ্যে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনা করেছেন, আমার ইচ্ছা হল তাঁদেরকে ধরে এনে এখানে

বসিয়ে তাঁদের বল্গাহীন কল্পনার দৌড়টা একবার দেখি! বড় অদ্ভুত এই বন! প্রত্যেক গাছের গুঁড়ি ও শাখা প্রশাখা পুরু শেওলায় আবৃত, প্রত্যেক গাছের ডাল থেকে শেওলা ঝুলছে — সে শেওলা কোথাও কোথাও এমন লম্বা যে, গাছ থেকে ঝুলে প্রায় মাটিতে এসে ঠেকবার মত হয়েছে, বাতাসে সেগুলো আবার দোল খাচ্ছে, কোথাও সূর্যের রশ্মি এসে পড়তে পারছে না, সবসময়েই যেন গোধূলি। চারদিক ঘিরে বিরাজ করছে এক অপার্থিব ধরণের নিস্তব্ধতা — বাতাস বইছে, তারও কোনও শব্দ নাই, ময়ূরের কেকাধ্বনি বা অন্য কোন পাখীর ডাকও শুনতে পাচ্ছি না; মানুষের গলার সুর ত নাই-ই নাই, বনের কোন জানোয়ারেরও ডাক নাই। মনে হচ্ছে, যেন কোন অন্ধকার প্রেতরাজ্যে এসে পৌঁছেছি।

আমার ত আর থমকে দাঁড়ালে চলবে না! আমি সাবধানে পা ফেলে ফেলে হাঁটতে লাগলাম। হঠাৎ খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ শব্দে চমকে উঠে তাকাতেই দেখতে পেলাম পাঁচ ছটা বুনো বেড়াল দৌড়ে আসছে, তাদের হলুদবর্ণের ঘোলাটে চোখ আর হিংস্র দৃষ্টি দেখে প্রথমে মনে করলাম এগুলো বাঘের বাচ্চা, কিন্তু তাদের পিছনে ক্রুদ্ধ আক্রোশে কয়েকটা বুনো কুকুর দৌড়ে আসতেই দেখলাম তারা প্রাণপণে দৌড়ে বনের মধ্যে ঢুকে গেল। পাঁচ ছটা হৃষ্টপুষ্ট বাঘের বাচ্চা হলে অত সহজে পালাত না। আমি একটা গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে ছিলাম, পথ পরিষ্কার দেখে আবার হাঁটতে লাগলাম। মাইল খানিক ব্যাপী গোধূলির অন্ধকারে ঢাকা এই প্রেতরাজ্য অতিক্রম করে পরিষ্কার বনভূমিতে পা দিলাম। চারিদিক রৌদ্রকরোজ্জ্বল। নর্মদা ও পাহাড়ের সব গাছপালা স্পষ্টভাবে চোখে পড়ছে। পথ একই, সেই সেগুন বেল অগস্তি গাছের জঙ্গল, তবে সবকিছু চোখে দেখতে পাওয়ায় মনে স্বস্তি পাচ্ছি। নর্মদার জলের ধারা যেখানে, সেখান থেকে প্রায় পাঁচ ছশো ফুট উঁচুতে পাহাড়ের উপর দিয়ে হাঁটছি। পথের দাগকে কিছুতেই অনুসরণ করতে ছাড়ি নি। সেই পথের দাগই যেন আমাকে আরও উঁচুতে এনে ফেলল চড়াইর পথে। এইভাবে প্রায় আরও তিন মাইল হাঁটলাম। একবার নিচে নর্মদার দিকে তাকাতে দেখলাম একপাল বন্য শূকর চরে বেড়াচ্ছে। বাংলাদেশের বা উত্তরপ্রদেশের সমতলভূমিতে শূকর দেখেছি তারা ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে মুখ দিয়ে মাটি খুঁড়ে কেঁচো ও পোকা খায়। এখানের শূকরগুলো কি পাবে? পাথরের রাজ্য, মুখ দিয়ে পাথর খুঁড়ে কি পাবে? মরুকগে, এ চিন্তায় আমার কাজ নাই , সন্ধ্যার অগেই কোন নিরাপদ আস্তানায় পৌঁছতে পারলে আমি এখন বাঁচি। থাকে থাকে পাহাড় ও জঙ্গল উঠে গেছে, আমি বোধহয় হাজার ফুট উঁচু দিয়ে হাঁটছি, নিচে নর্মদার জল চিক্‌চিক্ করছে। এইভাবে আরও মাইল তিনেক হাঁটলাম। সামনে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। মুখে সূর্য কিরণ এসে পড়ায়, গাছের ছায়া দেখে দেখে দ্রুত হাঁটছি। হঠাৎ বহুদূর হতে বাঘের প্রলয়ঙ্কর হুঙ্কার ভেসে এল। এ ডাক আমি চিনি! থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। অনুমান করার চেষ্টা করলাম ব্যাঘ্রমহারাজ দূরে না নিকটে? আমার সামনে তিনি নাই ত? কতকগুলো নীলগাই হুড়মুড় করে দৌঁড়ে গেল আমার কাছ হতে অন্ততঃ চারশ ফুট নিচ দিয়ে, তাদের পিছনেই একপাল বন্যবরাহ। রোদের আলো পড়ে তাদের দাঁতগুলো চক্‌চক্ করছে। ক্রমে উৎরাই এর পথে নামতে লাগলাম। নর্মদার স্রোতও নিম্নাভিমুখী হচ্ছে। অনেকক্ষণ হাঁটার পর নর্মদার কাছাকাছি এসে পৌঁছলাম। একই পরিচিত পথের চিহ্ন আমাকে ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে চড়াই উৎরাই করিয়ে ছাড়ল। বড় ক্লান্ত লাগছে, ঘামে ভিজে গেছি। নর্মদার জলে মুখ হাত ধুয়ে পেট ভরে জল খেলাম। কানে ভেসে

আসছে শিঙা ও ভেরীর আওয়াজ। মন আনন্দে দুলে উঠল। ভাবলাম কিছুদূরে নিশ্চয়ই পরিক্রমাবাসীদের জমায়েৎ ছাউনি ফেলেছে। তাঁদের কাছে পৌঁছতে পারলেই রাত্রির আশ্রয় পেয়ে যাবো। ভেরীর আওয়াজ লক্ষ্য করে দ্রুততালে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় আধমাইল হাঁটার পর তিনজন লোককে দেখতে পেলাম, তাদের দুজন কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে হাঁটছে। আর একজনের হাতে তিনটে কুড়ুল দেখতে টাঙির মত। আমি তাদেরকে জিজ্ঞাসা করলাম — তীথিঘাট কিধার বা? উহ্ ভেরীকা আওয়াজ কাঁহাসে শুনাই দেতে হৈ?

তারা উত্তর দিল — তীথিঘাটমেঁ আপ আগয়া। এক জমায়েৎ সে উহ্ আওয়াজ আতী হৈ। উহ্ লোগনেঁ পরিক্রমা করকে লোটতা হৈ। আভি গরমী কালমেঁ উন্‌কা পরিক্রমা বন্ধ রহে গা।

— এখানে কোন মন্দির আছে, যেখানে রাত্রে থাকতে পারি?

— আমাদের সঙ্গে আসুন। আমরা একটা শিবমন্দিরেই আছি। আমাদের গুরুদেবও সঙ্গে আছেন। আপনার থাকতে কোন অসুবিধা হবে না। আমরা ওঁকারমান্ধাতার দিকেই যাচ্ছি, সেখানে গুরুদেব কিছু লোককে দীক্ষা দেবেন। আমরা শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ের লোক।

শিবনারায়ণ সম্প্রদায়ের নাম কখনও শুনিনি। লোকগুলির বেশভূষাও সাধারণ লোকের মত। তিলক ত্রিপুণ্ড্রাদি মালা ঝোলা কোন কিছু সাম্প্রদায়িক চিহ্ন তাঁদের অঙ্গে দেখতে পাচ্ছি না। জমায়েতে শত শত লোকের সঙ্গে থাকার চেয়ে এই চারজন লোকের সঙ্গে থাকাই সুবিধাজনক হবে, এই ভেবে তাঁদের সঙ্গেই হাঁটতে লাগলাম। পথ চলতে চলতে তাঁদের মধ্যেই আমাকে একজন জানালেন যে এই তীথিঘাট ফতেগড় ষ্টেটের অন্তর্গত। তাঁদের সন্তগুরু স্বয়ং অলখ-নিরঞ্জনের অংশ। তাঁর নাম পাতিরাম। আমরা একেশ্বরবাদী, একমাত্র নিরাকার নির্বিকার নির্গুণ পরমেশ্বরের সৎনাম নিরঞ্জন কর্তাপুরুষেরই আমরা উপাসনা করে থাকি। আমরা জাতপাত মানি না, আমাদের সম্প্রদায়ই একমাত্র সংস্কারমুক্ত সম্প্রদায়। হিন্দুমুসলমান সব সম্প্রদায়ের লোককেই নির্বিচারে আমরা গোষ্ঠীভুক্ত করে থাকি। আমরা মূর্তিপূজা মানি না। শিব, দুর্গা, কালী, নারায়ণ, কৃষ্ণ, রাম, প্রভৃতি দেবতাকেও আমরা মানি না, তীর্থভ্রমণে আমাদের আস্থা নাই, হিন্দু শাস্ত্রোক্ত যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপও করিনা। আমাদের সমাজে বিধবা বিবাহের প্রচলন আছে।

— এককথায় বলুন না, হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ে যে সমস্ত শ্রদ্ধেয় পূজনীয় বস্তু বা আচার বিচার আছে আপনারা তার ঘোরতর বিরোধী। আপনাদের এই অভিনব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক কে? কতদিন আগে ভারতবর্ষে এই সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটেছে?

— উত্তরপ্রদেশের গাজিপুর জেলায় চন্দোরার গ্রামে শিবনারায়ণ নামে এক ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অলখ্ নিরঞ্জন কর্তাপুরুষের এক দিব্যরশ্মি অন্তঃপ্রবিষ্ট হয়, তিনিই সন্তধর্ম প্রচার করেন। তাঁর নামানুসারে এই সন্তমতের লোকেরা বর্তমানে শিবনারায়ণী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এই মধ্যপ্রদেশে গাজীপুর এবং আগ্রা অঞ্চলে আমাদের সম্প্রদায়ের বহুলোক বাস করেন। বর্তমানে আগ্রা প্রভৃতি স্থানে সন্তমত নামে যে এক নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে তা আমাদের কর্তাগুরু শিবনারায়ণজীর ভাবধারায় প্রভাবিত। মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে কর্তাগুরুর আবির্ভাব ঘটে। তিনি সারা ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন ; ১৭৯১ সংবতে তাঁর রচিত সন্তবিলাস, সন্তসুন্দর, সন্ত-আখেরি, সন্ত-উপদেশ শব্দাবলী এবং সন্ত-মহিমা

প্রকাশিত হয়। আপনাদের কলিকাতাতেও আমাদের সম্প্রদায়ের বহুলোক বাস করেন। সন্ত বলদিরামের শিষ্য তাঁরা, সেই বলদিরামের শিষ্য সন্ত পাতিরামকে এখনই মন্দিরে গিয়ে দর্শন করবেন।

কথা বলতে বলতেই মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের গোপুরমে দেখলাম একজন নধরকান্তি পুরুষ বসে আছেন। বয়স বড়জোর পঞ্চাশ হবে, দেখতে সুপুরুষই বটে! গলায় একটা সরু সোনার চেন। কাঠের বোঝা ফেলে দিয়েই তাঁরা তিনজন সমস্বরে বলে উঠলেন — বন্দেগী কর্তাগুরু আপনো অলখ পুরুষ। সবাই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। যে লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে আসছিলাম, তিনি গুরুদেবকে আমার পরিচয় দিলেন। তিনি আমার দিকে তাকিয়ে 'আও মেরে রাম' বলে সাদরে আবাহন করলেন। আমি তাড়াতাড়ি গাঁঠরী ফেলে দিয়ে নর্মদায় স্নান করতে নামলাম। পর্বতের আড়ালে সূর্য পড়ে গেলেও তখনও চারিদিকে আলো আছে, তখনও সূর্যাস্ত হয়নি। আমি মন্দিরে ঢুকে শিবের মাথায় জল ঢালতে গিয়ে দেখি শিবলিঙ্গের উপর গুরু মহারাজের কোর্তা ও মের্জাই রাখা রয়েছে। গুরু মহারাজের ইঙ্গিতে তাঁর একজন অনুচর সে দুখানা সরিয়ে রাখলেন, আমি শিবের মাথায় জল ঢাললাম। আমি জল ঢালতে ঢালতেই শুনতে পেলাম; গুরু মহারাজ দোঁহা আওড়াচ্ছেন —

ইনসান হোকে না পূজো দেও পত্থর।
ইহ্‌লোক দুঃখ পাবে পড়ে নরক ঘোর॥

অর্থাৎ মনুষ্যজন্ম গ্রহণ করে যে লোক দেবতা ভেবে পাথর পূজা করে তারা ইহলোকে দুঃখভোগ করে, অন্তে ঘোর নরকভোগ করে।

জৈঁও নেহি সতী দুজা পতি ভাবে।
ত্যায়সে সন্তজন পরদেব না সেবে॥

অর্থাৎ সতী নারী যেমন পরপুরুষের সেবা করে না, তেমনি সন্তজন নিজ্ গুরু ছাড়া অন্য দেবতার পূজা করে না।

শিবকে প্রণাম করে উঠে ভাবতে লাগলাম, দিওয়ানাজীর কথামত তীর্থঘাটে ভাল সাথীই পেলাম বটে। এঁদের সঙ্গে ওঁকারমান্ধাতা পর্যন্ত যাওয়া খুব সুখকর হবে বলে মনে হয় না। মন্দিরের বাইরে এসে দেখলাম, তখনও দিনের আলো আছে। সন্তমহারাজ সাদরে ডেকে আমাকে পাশে বসালেন এবং একজন লোককে বললেন — ডাণ্ডারা লে আও। লোকটি দ্রুত মন্দিরে ঢুকে একথালা লাড্ডু আমাকে এনে দিলেন। বুঝলাম এরা মিষ্টান্ন ভোজনকে ডাণ্ডারা বলেন, যাক্ বাঁচা গেল ডাণ্ডারা তাহলে ডাণ্ডা প্রহার নয়। সন্তমহারাজ অত্যন্ত মিষ্টভাষী, আমাকে আদর করে বললেন — মেরে রাম, খানা সুরু করিয়ে আভি তব সাম নেহি হুয়া। হন্‌কো পতা হ্যায়, পরিক্রমাবাসী সাঁঝ হো জানেসে কুছ নাহি লেতে হৈ।

একটা বেল ছাড়া সারাদিন আজ কিছুই পেটে পড়েনি। ক্ষুধার চোটে সেই একথালা লাড্ডু সবই খেয়ে ফেললাম। খেয়ে থালা ধুতে যাবো, তিনি হাঁক পাড়লেন 'শোভারাম', সঙ্গে সঙ্গে একজন লোক এসে আমার হাত হতে থালাটা নিয়ে নর্মদাতে ধুতে গেলেন, আমাকে কিছুতেই ধুতে দিলেন না। অন্ধকার হয়ে আসতেই আমাকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে ঢুকলেন। তাঁর অনুচররা ইতিমধ্যেই মন্দিরের মধ্যে তিনটা পিতলের প্রদীপ জ্বেলে ধূপ জ্বালিয়েছেন, একটা প্রদীপ ভোগের ঘরে জ্বলছে, সন্তপুরুষের সান্ধ্যভোগ প্রস্তুত হচ্ছে। এইসব প্রদীপ মন্দিরের নয়,

তাঁদের নিজস্ব সম্পত্তি। মন্দিরের দরজা ভিতর থেকে বন্ধ করে দেওয়া হল। পুরু কার্পেটের উপর পরিচ্ছন্ন রঙীন বিছানার চাদর পেতে সন্তমহারাজের পরিপাটি শয্যা রচনা করা হয়েছে। মন্দিরের এক কোণায় আমার আসন পাতলাম। তাঁরা চারজন গুরুমহারাজকে ঘিরে উপাসনায় বসলেন। শোভারামজী ভজন আরম্ভ করলেন —

ওহি দেশ বসন্ত গাইয়ে যাঁহা রহিমি দিবস ন হোই।
যাঁহা ধরিতি আকাশ না পাতালা যাঁহা চাঁদ সূরয না তারা
বিনা দীপক উজিয়ারা হো, উজিয়ারা হো।
যাঁহা বিনুদক কমল ফুলানা, মধুবন পিয়া মরু কানা,
তাঁহা শিবনারায়ণ মন মনা, তাঁহা সন্তন কিয়া পিয়ানা॥

অর্থাৎ যে দেশে নিত্য বসন্ত বিরাজিত, যেখানে দিন নাই, রাত্রি নাই, ধরিত্রী, আকাশ পাতালও নাই , চাঁদ সূর্য তারাও নাই, বিনা দীপকেই যে দেশ আলোয় আলো হয়ে আছে, বিনা জল বা সরোবর ছাড়াই যেখানে অজস্র পদ্ম ও নানাবিধ ফুল ফুটে রয়েছে, যেখানের মধুবনে মধু নিয়ত ঝরছে, শিবনারায়ণ তা পান করছেন, সন্তরা বা সন্তমতিয়ারাই কেবল তা পান করতে পারে।

বন্দনাগান শেষ হতেই সকলেই এক একটা পাতলা কাপড়ে মুখ ঢেকে দুই কানে হাত চাপা দিয়ে বসে রইলেন। বুঝলাম, শব্দ-সাধনা হচ্ছে। এক ঘন্টার মধ্যেই উপাসনাপর্ব শেষ হল, সন্তমহারাজ শোভারামকে বললেন — মেরে লিয়ে দুদুররাম লে আও। আমাকে বললেন — আমরা সত্য পথের পথিক। মন যা চায় তাই করি, ক্ষমা সত্য এবং মিতাচার এই তিন ধর্মকে আমরা প্রধান বলে মানি। মূর্তিপূজা, দেবদেবীর পূজা ভেয এবং ভেক ধারণাকে আমরা ঘৃণা করি। অলখ্‌পুরুয পরমেশ্বরের কোন গুণবাচক নাম জপে কোন ফল হয় বলে আমরা মনে করি না। কর্তাপুরুয অলখ্ নিরঞ্জন সকল জীবের মধ্যে শব্দস্বরূপে বিরাজমান। সেই পথেই আমরা তাঁকে ধরতে চেষ্টা করি। তুমি যদি দীক্ষা পাও তখন আমাদের গুহ্য সাধনার সঙ্কেত জানতে পারবে।

এই সময় শোভারাম একটা রূপার গ্লাসে কিছু তরল পদার্থ এনে দিলেন। বুঝলাম, এইটাই সন্তমহারাজের দুদুররাম অর্থাৎ মদ। তিনি চুমুক দিতে লাগলেন, আর, নিজের মনে ভাবতে লাগলাম — সন্তবাবাজী, ছোট জিনিযকে আটপৌরে ভাযায় 'পাতি' বলা হয়, তুমি ত পাতিলেবু, পাতিহাঁস বা পাতিকাকের মতই একটা পাতিরাম অর্থাৎ ছোটোখাটো রাম মাত্র! বড়রাম এলেও আমাকে তাঁর সম্পত্তি করতে পারবে না। শালুক চিনেছ গোপাল ঠাকুর!

আমি শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করলাম। আজ সারাদিন খুব পরিশ্রম হয়েছে , পথের ক্লান্তি ছাড়াও যে সব আতঙ্ককর জিনিয চোখে পড়েছে, তাতে মনের উপরেও খুব চোট পড়েছে। অমি সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম। গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। পাঁচটা ইন্দ্রিয়ের বাইরে আর কোন যষ্ঠ ইন্দ্রিয় সহসা সচেতন হয়ে যেন আমাকে জানিয়ে দিল যে, সাবধান! সাক্ষাৎ মৃত্যু শিয়রে এসে দাঁড়িয়ে আছে। ঘুম ভাঙতেই ক্ষীণ প্রদীপের আলোতে যা দেখলাম তাতে আমার সমস্ত শরীর শিউরে উঠল। ঘরের মধ্যে মেঝেতে ঘস্‌টে ঘস্‌টে একটা বড় গোখরো এগিয়ে যাচ্ছে সন্তমহারাজের দিকে। 'দুদুররামের' নেশায় তিনি ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে কাঠ হয়ে বিছানার উপর উঠে বসলাম।

মন্দিরের দরজার চৌকাঠ ঘেঁসে এগিয়ে আসছে জীবন্ত মৃত্যু, পাকা তেঁতুলের মত রং। পাহাড়ী গোখরো। 'সাপ সাপ' বলে চিৎকার করে উঠতেই সেই মৃত্যুদূত ঝটাৎসে আমার দিকে ঘুরে ফোঁস করে বিরাট ফণা তুলেছে। সাপটা মেঝে থেকে প্রায় দুই ফুট উঁচু হয়ে উঠেছে, তার চোখ দুটো জ্বলছে , যেন দুটো আলোর দানার মত। কি ভীষণ শক্তি ও রাগ প্রকাশ পাচ্ছে চাবুকের মত খাড়া উদ্যত তার দেহেটাতে ! আমার মনে হল এর হাত থেকে বাঁচা মানে আমাদেরই সকলেরই পুনর্জন্ম। সন্তমহারাজের কোন অনুচরও জেগে উঠে সবাইকে খোঁচা দিয়ে জাগিয়েছে, জেগে উঠেই তারা হুড়মুড় করে পাশের ভোগের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল। কপাট লাগানোর শব্দ কানে শুনতে পেলাম। দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখার উপায় নাই। আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম তার জ্বলন্ত চোখ দুটোর দিকে।

আমি বেশ বুঝতে পারছি , আমার আয়ু নির্ভর করছে দৃঢ় ও অকম্পিত ভাবে সাপের চোখের দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকার উপর। যতক্ষণ এইভাবে ত্রাটক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে পারব, সাপের চোখে টর্চের ফোকাস করতে পারব নিজের দৃষ্টি, ততক্ষণই আমি নিরাপদ। কিন্তু যদি দৃষ্টি কেঁপে উঠে? আমার দেহ মনে সমস্ত শক্তিকে সংহৃত করে তাকিয়ে রইলাম তার চোখের দিকে। ক্রমেই দেয়াল, মেঝে, সাপের দেহ সবই আমার চোখ ও মন থেকে উবে গেল। আমি দেখছি দুটো আলোর দানা। অন্ধকার এবং একটা ভয়াবহ শূন্যতা নেমে এসেছে। মনে হচ্ছে ঐ দুটো আলোর দানা হয়ত সাপের চোখ নয় — জোনাকি পোকা, কিংবা নক্ষত্র, কিংবা ....

এখন রাত না দিন? ভোর না সন্ধ্যা? চেতনা যখন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে, কাতর কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম বেদমন্ত্র — বিদ্ম হি ত্বা বৃষন্তমম্ বাজেষু হবনশ্রুতম্।

বৃষন্তমস্য হূবহে উতিং সহস্রসাতমাম॥ (ঋগ্বেদে, ১/১০/১০)

জানি তোমায় জানি ইন্দ্র অমোঘ তুমি দাতা
বিপদ্‌কালে রণস্থলে তুমিই মোদের ত্রাতা।
বৃষ্টিধারার মত তোমার পড়ছে ঝরে স্নেহ ,
ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু, রক্ষ মোদের দেহ॥

আ তু ন ইন্দ্র কৌশিক মন্দস্রানঃ সুতং পিব।
নব্যমায়ুঃ প্রসূতির কৃধি সহস্রামৃষিং॥ (ঐ, ১/১০/১১)

হে কৌশিক শতক্রতু ! ক্ষিপ্র তুমি হেথায় আসি
অভিষুত সোমধারায় পান কর হে হাসি হাসি।
বৃদ্ধি কর পরমায়ু কর্মে কর বরণীয়
ত্যাগ-তপস্যায় হই যেন গো অমর ঋষি স্মরণীয়॥

মন্ত্র পাঠ করেই অভ্যাস বসে হাত জোড় করার চেষ্টা করতেই দৃষ্টি চঞ্চল হল । চোখ গেল কেঁপে। আবার দৃষ্টি দিতে গিয়ে দেখি — সামনের আলোর দানাদুটো গেছে নিভে। সাপ কই? তাড়া করে আসছে না কেন? পিছন থেকে সন্ত শিরোমণি কর্তাপুরুষ বলে উঠলেন — শালে সাপ ভাগ গিয়া। থপ্ থপ্ করে এসে আমার হাত দুটো ধরে বলতে লাগলেন — আপনে বহুৎ আচ্ছা কিয়া। ইহ্ সাপ ভাগানেওয়ালা মন্ত্র আপসে শিখ্ লেঙ্গে। লেকিন ইন্দ্রকা নাম হম্ নেহি লেঙ্গে। আমি বললাম — এ সাপ তাড়ানোর মন্ত্র নয়, বিশ্বামিত্র-পুত্র ঋষি

মধুছন্দা দৃষ্ট বেদমন্ত্র। ইন্দ্র মানে স্বর্গের রাজা শচীপতি ইন্দ্র নন, বেদে পরমেশ্বরকেই ইন্দ্র বলা হয়। ইন্দ্রের অর্থ পরমাত্মা। ইতিমধ্যে প্রদীপগুলো জ্বালা হয়েছে। শোভারাম একটা বড় টর্চ হাতে নিয়ে মন্দিরের চারদিক তন্ন তন্ন করে দেখছে। সন্তমহারাজ একজনকে বললেন, আমার হাতটা ভাল করে দলাই মালাই করতে। ভোর হয়ে গেছে। একজন প্রস্রাব করতে যাবে বলে উস্‌খুস্‌ করছিল, তাকে সন্তমহারাজ দাবড়ানি দিলেন। বললেন — দরজার সামনে নিশ্চয়ই ওৎ পেতে আছে , দরজা খুললেই ছোবল মারবে। আমাকে বললেন — আপ পহেলে যাইয়ে। কেওঁকি আপ্‌ মন্ত্র জানতা হৈ। অগত্যা আমিই দরজা খুলে বাইরে বেরোলাম। শৌচাদি সেরে এসে দেখি তাঁরা তাঁদের বিছানাপত্র বাঁধছেন। সন্তমহারাজ বললেন — এ স্থান অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত। সাপ পুনরায় ফিরে আসতে পারে। আমি স্নানটা করে নিতে চাইলাম, তিনি বললেন — মাইল দশেক গেলেই ধর্মপুরী পৌঁছে যাব, সেখানেই আমরা স্নান করব।

অগত্যা গাঁঠরী বেঁধে মহাদেবকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। সেই একই পার্বত্য পথ। দামী জুতো পায়ে দিয়েও সন্তমহারাজ একটুকুতেই আহা উহু করে উঠছেন, আর সঙ্গে সঙ্গে চার শিষ্য এসে তাঁর পায়ে হাত বুলোচ্ছে। ভাবলাম, এভাবে যদি হাঁটা যায় তাহলে ধর্মপুরী পৌঁছাতেই রাত হয়ে যাবে। আমি বললাম, আপনি আমার সঙ্গে হাঁটুন, কোথাও হোঁচট খেলে আমি ধরে ফেলব, পথের মধ্যে পাথর-কাঁকর থাকলেও তা সাবধানে সরিয়ে ফেলব। গত রাত্রির ঘটনার পর থেকে তাঁর কাছে আমার আদর বেড়ে গেছে। আমার কথায় রাজী হয়ে হাঁটতে লাগলেন। শোভারামকে বললেন — তোমরা সবাই শুনে রাখ, এ যদি আমার কাছে দীক্ষা নেয়, তাহলে একেই আমি মোহান্ত বানাব। তোমাদের কোন আপত্তি আছে?

— নেহী জী। বহুৎ আচ্ছাই হোগা।

আমি দীক্ষা নিতে রাজী আছি কিনা জিজ্ঞাসা করলেন। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনাদের দীক্ষার পদ্ধতি কি?

— পরমেশ্বরের কোন নির্দিষ্ট নাম আছে বলে আমরা স্বীকার করি না। তাঁর গুণানুসারে সত্য, নাথ, নিরঞ্জন, অলখপুরুষ বলে নির্দেশ করি মাত্র। দীক্ষাকালে থালার উপর ধুনুচি রেখে তাতে ধূপধূনা লোবান জটামাংসী কর্পূর জ্বালাতে হয়। শিবনারায়ণজী রচিত যে কোন একখানা বইএর উপর সেই থালা রেখে তাতে কয়েকজন শিবনারায়ণী তা পর্যায়ক্রমে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দীক্ষার্থীর কপালে ঠেকিয়ে চারটি শপথবাক্য পাঠ করায়। সেই শপথবাক্য হল — (১) সত্যপথে থাকব, পরস্ত্রীর উপর কুদৃষ্টি দিব না। (২) মূর্তিপূজা বা হিন্দু মুসলমানদের কোন আচার অনুষ্ঠান করব না। কোন দেবদেবীকে মানব না। (৩) দেখি দেখি ঘর যাও, অর্থাৎ বিচার করে চলব এবং যো মন চাহে সো খাও — যা খেতে রুচি হবে তাই খাবে। (৪) অলখ্‌পুরুষের অবতার কর্তা গুরুর নামই জপ করব। এই শপথবাক্য পাঠের পরেই শব্দ সাধনার সঙ্কেত জানানো হয়। পিতৃদত্ত নামের সঙ্গে 'রাম' শব্দযুক্ত করে নূতন নামকরণও করা হয়। যেমন ধর, শিবনারায়ণজীর চার শিষ্য ছিলেন, তাঁদের নাম—রামনাথরাম, যুবরাজরাম, রঘুনন্দনরাম এবং লক্ষ্মণরাম। লক্ষ্মণরামের শিষ্য ছিলেন সদাশিবরাম আর সদাশিবরামের শিষ্য ছিলেন বলদিরাম, তিনিই আমার গুরু। আমাদের সম্প্রদায়ে কতকগুলি সাঙ্কেতিক নাম আছে , যেমন —

ভাত — ফুলরাম,	লবণ — রামরস,	মুরগী — হুঁকা
ডাল — রুক্মিণী,	হাঁস মাংস — বটের,	শূকর মাংস — চন্দনখোরি
রুটি — মুদ্রা,	মাছ — জলাযেম,	গাঁজা — আনন্দরাম
ছাগ মাংস — কাঁঠাল,	তরকারী — সুধি,	আফিং — ভোলারাম
মদ — দুদুররাম।		

— ক্যা শোভারাম, ইনকো ত এক কিসিমকা দীক্ছা হো চুকা। ওঁকারমান্ধাতামেঁ পৌঁছকর যব্ দুসরা দুসরা আদমী কো শিবনারায়ণী বানায়েগা উস্ বখৎ ইনকো শব্দসাধন শিখলা দেঙ্গা।

শোভারাম সংক্ষিপ্ত জবাব দিলেন — জী হ্যাঁ।

আমাকে এবার জিজ্ঞাসা করলেন — এখন তুমি কিসের সাধনা কর?

— আমি কোন অলখ্পুরুয বা অদৃশ্য দেবতার উপাসনা করি না। কোন অদৃশ্য বা অদৃষ্টপূর্ব দেবতাকে ধ্যেয়ে বেড়ানো আমার স্বভাব নয়। আমার যিনি ইষ্টদেবতা, সেই জন্মদাতা জ্ঞানদাতা বাবারই উপাসনা করি। বাবা নর্মদা পরিক্রমা করতে বলেছিলেন, তাই এখানে এসেছি।

— এখন করছ কর, উসসে কোই হরজা নেহি। তবে আমি দীক্ষা দেওয়ার পর তোমাকে আর পরিক্রমা করতে দিব না, হয় আমার সঙ্গেই ফিরে আসবে নতুবা মাকে দেখবার জন্য একবার দেশে যেতেও আমি হুকুম করতে পারি।

পাতিরামের এই প্রলাপোক্তি বা পাতিবাক্যের কোন জবাব দিলাম না।

কথা বলতে বলতে এমন স্থানে এসে পৌঁছলাম যেখানে নর্মদার দিকে তাকিয়ে দেখি নর্মদা জলপ্রপাতের আকারে পর্বত ভেদ করে যেন নিচে নামছে। চারধারে বড় বড় গাছের মেলা আর সব গাছেরই গুঁড়ি ও ডালপালা বেয়ে এক রকমের বড় বড় লতা উঠে তাদের ছোট ছোট পাতা দিয়ে এমন নিবিড় ভাবে গাছগুলোকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়েছে যে গুঁড়ির আসল রঙ দেখা যাচ্ছে না। শোভারাম বলল — এইসব লতায় বর্ষাকালে একরকম ফুল ফোটে যার রঙ সোনালী, তার গন্ধে ঘুম পায়। এখানে বাঘ ভালুকও থাকতে পারে, মাইলখানিক পথ একটু তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন। আমরা চলার ছন্দ বাড়িয়ে দিলাম। রাস্তাটা ঢালুর দিকে যাচ্ছে। উঁচু থেকে নিচে নামলে এমনিতে পায়ে গতি বেড়ে যায়, মনে হয় পিছন দিকে কেউ যেন ক্রমাগত ঠেলা দিচ্ছে। সেই ঠেলা বা বেগের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে হয় নতুবা মুখ থুবড়ে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। কিন্তু পথ ত পিচঢালা বা সিমেন্ট বাঁধানো নয়, পাথরে ভর্তি কাজেই আমাদের টাল সামলানো কঠিন হল। একে অন্যের উপর আমরা আছড়ে পড়লাম। পরস্পর পরস্পরকে ধরাধরি করে উঠে দাঁড়ালাম। ভক্তরা ত্রস্তব্যস্তে তাদের আরাধ্য দেবতার শ্রীঅঙ্গের লালধুলা ঝেড়ে মুছে দিল। গাঁঠরী এবং পোঁটলা পুটলি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল, সব একে একে কুড়ানো হল। আবার হাঁটতে সুরু করলাম। বড় বড় গাছের জঙ্গল পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা স্থানে যেখানে গাছপালা পাতলা, ঝোপঝাড়ও কম, সেখানে পৌঁছেই সন্তমহারাজ একটা বড় পাথরের উপর ধপ করে বসে পড়লেন।

— লেও শোভারাম মুঝে মুদ্রা দেও, থোড়াসা দুদুররামভি দেও। আপলোগভি মুদ্রা খা লেও, আনন্দরামভি পি সক্তে হো। হম্ বহুত থক্ গয়ে।

শিষ্যদের একজন তাঁর পা থেকে জুতা খুলে নিয়ে পা দুটো দাবাতে লাগলেন। শোভারাম রুপার গ্লাসে 'দুদুররাম' দিয়ে গোটা আষ্টেক রুটি ও লাড্ডু একটা রুপার থালাতে পরিবেশন করল। তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। বাকী চারজন রুটি খাওয়া শেষ করে আনন্দরাম অর্থাৎ গাঁজা টানতে লাগল। আমাকে শোভারাম খাবার খেতে অনুরোধ করেছিল, আমি সবিনয়ে অসম্মতি জানালাম। তাঁদের পান ভোজনে ঘন্টাখানিক সময় কাটল। বেলা বোধহয় নটা সাড়ে নটা হবে। একদল কৃষ্ণসার মৃগ দৌড়ে চলে গেল। আমি বললাম, হরিণ থাকলেই বাঘের ভয়। এবার এস্থান ছেড়ে যাওয়াই ভাল। 'হাঁ হাঁ চলিয়ে, আপনে ঠিক বোলা'। একজন শিষ্য সযত্নে তাঁকে জুতা পরিয়ে দিল। 'দুদুররামের'গুণে তাঁর চলার গতি বেড়ে গেছে। আমাকে বললেন — জোস্ আ গিয়া! জোর কদমসে চলিয়ে।

আমাদেরকে চলতে হচ্ছে নর্মদার কিনারে কিনারেই। এই কিনারা বরাবর রয়েছে একটি পথরেখা। সে পথের একপাশে পাথরের রাজ্য, অন্য পাশে জলের। ডান দিকে থাকে থাকে উঠে গেছে পাহাড়, মাঝারি পাহাড়, বড় পাহাড়। সেই আকাশচুম্বি বড় পাহাড়টা অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বতের মেরুদণ্ডটা কোথায় কোন্ ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা, বড় বড় বনস্পতির ভীড়ে তা ঠাউরে ওঠা অসাধ্য। বাম দিকে উথাল-পাতাল তরঙ্গ বাহু তুলে বয়ে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা নর্মদা বাঙালি কবি করুণনিধানের ভাষায় , 'বারুণী রুপসী বেণী- রচনাতে; কঙ্কতিকার সঘন আঘাতে। ভাঙে অর্বুদ জল বুদ্বুদ' যেন! সূর্যকরস্নাত নর্মদাতটে আমার হাঁটতে ভালই লাগছে। এক জায়গায় কতকগুলো ময়ূরকে দেখলাম ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এ ময়ূর চিড়িয়াখানার ময়ূর নয়, মুণ্ডমহারণ্যেও বড় বড় ময়ূর দেখেছি। এই ময়ূর গুলির মত বৃহদাকার ময়ূর এর আগে দেখিনি। অবশেষে আমরা ধর্মপুরীতে পৌঁছে গেলাম। নর্মদার তটে একটি বড় শিবমন্দির। পাহাড়ের গায়ে দেখলাম প্রায় একশ ফুট উঁচুতে তিন চারটি গুহা, গাছের ডালে গৈরিক বস্ত্র এবং কৌপিন ঝুলছে। বুঝলাম এইসব গুহায় কোন সাধু মহাত্মা তপস্যার জন্য বাস করেন। সন্তমহারাজ তাঁর পকেট থেকে একটা রূপার পকেট ঘড়ি বের করে বললেন — মোটে বেলা সাড়ে দশটা। শোভারাম তুমি তাড়াতাড়ি লিট্টি তৈরীর ব্যবস্থা কর, শৈলেন্দ্ররামের জন্য ''ফুলরাম'' বানাও। আচ্ছা ঘিউ ত হ্যায়ই হ্যায়। আমরা এখানে স্নান করব। শৈলেন্দ্ররামকে এখানেই খাইয়ে দাও। আমরা মাঝপথে কোথাও খেয়ে নেব। আমরা পামাখেড়ি পৌঁছে রাত্রিবাস করব।

তাঁর মুখে আমার নূতন নাম শুনে বুঝলামে যে ইতিমধ্যেই তিনি আমাকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছেন! শিবমন্দিরে সব জিনিষ রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হলাম। সন্তশিরোমণির শ্রীমুখের আদেশ শুনে তিনজন 'ভোজন' বানাবার আয়োজন করতে লাগল। মন্দিরের চাতালে বসে শোভারাম তাঁর শ্রীঅঙ্গে তৈলমর্দন করতে আরম্ভ করল, আমাকে বললেন — সাপ তাড়ানোর মত বাঘ তাড়ানোর কোন মন্ত্র জান কি ?

— জানি বৈ কি ! আমি স্নান করে সেই মন্ত্র পাঠ করব। আপনি শুনতে পাবেন।

নর্মদার ঘাটে নেমে মনে পড়ল শোভানন্দজী নর্মদার গল্প করতে করতে একবার শুনিয়েছিলেন যে এই ধর্মপুরীতে স্বয়ং ধর্মরাজ তপস্যা করেছিলেন। যমের অপর নাম ধর্মরাজ। পুরাণের মতে, ইনি ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। জীবদের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। এঁর বাহন মহিষ এবং অস্ত্র হল যমদণ্ড। বেদের মতে যম হচ্ছে বায়ু

অর্থাৎ প্রাণবায়ু। 'যমেন বায়ুনা'। জীবের মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু উর্ধপথে আকৃষ্ট হয়ে নবদ্বারের যে কোন একটি দ্বার দিয়ে উৎক্রান্ত হয়। এইজন্য সেই অন্তিমকালের উর্ধগামী প্রাণবায়ুকে যম বা মৃত্যুর দূত বলে পুরাণকাররা কল্পনা করেছেন।

যাইহোক স্নান করে সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করার পর সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমি মধুছন্দার পুত্র জেতাঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্র স্তব করতে লাগলেন —

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবাদন্ ।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বনোবিদুষ্টে তস্য কারবঃ॥ (ঋ ১/১১/৬)
আবার এনু তোমার পাশে সাধন-বিত্ত চাহি,
অশেষ তোমার কীর্তিগাথা বারে বারে গাহি।
পূর্বকালে ঋষি তোমায় ভজেছিল যাগে,
তাদের দেছ দুহাত ঢালি (তাইত)প্রভু ডাকি অনুরাগে॥
মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং ★ শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেযাং শ্রবাংসি উৎতির॥ (ঐ, ১/১১/৭)
মায়াবি যে শুষ্ণ অসুর করলে হনন তারে,
করলে তারে পরাজিত মায়ার অভিসারে।
মেধাবী সব যাজ্ঞিকেরা কীর্তি তোমার জানে
সিদ্ধ কর তাঁদের তুমি সত্য শ্রেয় দানে॥
ইন্দ্রং ঈশানং ওজসা অভিস্তোমাঃ অনূযত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ॥ (ঐ, ১/১১/৮)
ঈশান তুমি হে মঘবা, তোমার ওজঃ বলে
স্তোতৃগণের কীর্তনে যে তোমার খ্যাতি চলে।
তোমার উদার বদান্যতা সহস্রধারে নিত্য
উজাড় করি আরও ঢালুক যতেক সাধন বিত্ত॥

স্নান করে মন্দিরে আসতেই তিনি বললেন — আপকা কন্ঠসর বহুত সুরেলা হ্যায়। লেকিন্ বাঘ ভাগানেবালা ইস্ মন্ত্রমেঁ ভি ইন্দ্রকো জিকর আয়া।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। শিবলিঙ্গের উপর চন্দন, বিল্বপত্র ও প্রচুর বনফুল দেখে বুঝলাম, আমরা এখানে পৌঁছানোর পূর্বেই কেউ পুজা করে গেছেন, হয়ত বা গুহাবাসী সন্ন্যাসীরাই পূজা করে গেছেন। ঘনকৃষ্ণ শিবলিঙ্গকে খুব দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। আমি নর্মদার জল ঢেলে পূজা করলাম। জপ ও প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। শোভারামজী সন্তজীকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেছেন। মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখলাম রান্না হচ্ছে। তিনখণ্ড পাথরের উপর একটা ছোট হাঁড়ি চাপিয়ে আমার জন্য ভাত রান্না হচ্ছে। কাঠের আগুনে গোল গোল কমলালেবুর সাইজে লিট্টি সেঁকা হচ্ছে। প্রায় চব্বিশ পঁচিশটা লিট্টি তৈরী হয়ে গেছে। স্নান করে এসেই আমাকে জোর করে খেতে বসালেন সন্তজী। ঘি ও গলা ভাত তৃপ্তি করে খেলাম। তাঁরাও কিন্তু খেয়ে নিলেন। সব জিনিষ গুছিয়ে

★ শুষ্ণং - হৃদয়স্থ কাম-কামনাদি অসৎবৃত্তি নিচয়কে শুষ্ণ বলা হয়। কারণ তা জীবের সৎবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত শোষণ ও শুষ্ক করে দিচ্ছে।

শিষ্যদের একজন তাঁর পা থেকে জুতা খুলে নিয়ে পা দুটো দাবাতে লাগলেন। শোভারাম রূপার গ্লাসে 'দুদুররাম' দিয়ে গোটা আষ্টেক রুটি ও লাড্ডু একটা রূপার থালাতে পরিবেশন করল। তিনি তার সদ্ব্যবহার করতে লাগলেন। বাকী চারজন রুটি খাওয়া শেষ করে আনন্দরাম অর্থাৎ গাঁজা টানতে লাগল। আমাকে শোভারাম খাবার খেতে অনুরোধ করেছিল, আমি সবিনয়ে অসম্মতি জানালাম। তাঁদের পান ভোজনে ঘন্টাখানিক সময় কাটল। বেলা বোধহয় নটা সাড়ে নটা হবে। একদল কৃষ্ণসার মৃগ দৌড়ে চলে গেল। আমি বললাম, হরিণ থাকলেই বাঘের ভয়। এবার এস্থান ছেড়ে যাওয়াই ভাল। 'হাঁ হাঁ চলিয়ে, আপনে ঠিক বোলা'। একজন শিষ্য সযত্নে তাঁকে জুতা পরিয়ে দিল। 'দুদুররামের'গুণে তাঁর চলার গতি বেড়ে গেছে। আমাকে বললেন — জোস্ আ গিয়া! জোর কদমসে চলিয়ে।

আমাদেরকে চলতে হচ্ছে নর্মদার কিনারে কিনারেই। এই কিনারা বরাবর রয়েছে একটি পথরেখা। সে পথের একপাশে পাথরের রাজ্য, অন্য পাশে জলের। ডান দিকে থাকে থাকে উঠে গেছে পাহাড়, মাঝারি পাহাড়, বড় পাহাড়। সেই আকাশচুম্বি বড় পাহাড়টা অর্থাৎ বিন্ধ্যপর্বতের মেরুদণ্ডটা কোথায় কোন্ ঘনঘোর জঙ্গলে ঢাকা, বড় বড় বনস্পতির ভীড়ে তা ঠাউরে ওঠা অসাধ্য। বাম দিকে উথাল-পাতাল তরঙ্গ বাহু তুলে বয়ে চলেছেন স্বচ্ছসলিলা নর্মদা বাঙালি কবি করুণনিধানের ভাষায় , 'বারুণী রূপসী বেণী- রচনাতে; কঙ্কতিকার সঘন আঘাতে। ভাঙে অর্বুদ জল বুদ্বুদ' যেন! সূর্যকরস্নাত নর্মদাতটে আমার হাঁটতে ভালই লাগছে। এক জায়গায় কতকগুলো ময়ূরকে দেখলাম ঘুড়ে বেড়াচ্ছে। এ ময়ূর চিড়িয়াখানার ময়ূর নয়, মুণ্ডমহারণ্যেও বড় বড় ময়ূর দেখেছি। এই ময়ূর গুলির মত বৃহদাকার ময়ূর এর আগে দেখিনি। অবশেযে আমরা ধর্মপুরীতে পৌঁছে গেলাম। নর্মদার তটে একটি বড় শিবমন্দির। পাহাড়ের গায়ে দেখলাম প্রায় একশ ফুট উঁচুতে তিন চারটি গুহা, গাছের ডালে গৈরিক বস্ত্র এবং কৌপিন ঝুলছে। বুঝলাম এইসব গুহায় কোন সাধু মহাত্মা তপস্যার জন্য বাস করেন। সন্তমহারাজ তাঁর পকেট থেকে একটা রূপার পকেট ঘড়ি বের করে বললেন — মোটে বেলা সাড়ে দশটা। শোভারাম তুমি তাড়াতাড়ি লিট্টি তৈরীর ব্যবস্থা কর, শৈলেন্দ্ররামের জন্য "ফুলরাম" বানাও। আচ্ছা ঘিউ ত হ্যায়ই হ্যায়। আমরা এখানে স্নান করব। শৈলেন্দ্ররামকে এখানেই খাইয়ে দাও। আমরা মাঝপথে কোথাও খেয়ে নেব। আমরা পামাখেড়ি পৌঁছে রাত্রিবাস করব।

তাঁর মুখে আমার নূতন নাম শুনে বুঝলামে যে ইতিমধ্যেই তিনি আমাকে তাঁর শিষ্যশ্রেণীভুক্ত করে ফেলেছেন! শিবমন্দিরে সব জিনিষ রেখে স্নানের জন্য প্রস্তুত হলাম। সন্তশিরোমণির শ্রীমুখের আদেশ শুনে তিনজন 'ভোজন' বানাবার আয়োজন করতে লাগল। মন্দিরের চাতালে বসে শোভারাম তাঁর শ্রীঅঙ্গে তৈলমর্দন করতে আরম্ভ করল, আমাকে বললেন — সাপ তাড়ানোর মত বাঘ তাড়ানোর কোন মন্ত্র জান কি ?

— জানি বৈ কি ! আমি স্নান করে সেই মন্ত্র পাঠ করব। আপনি শুনতে পাবেন।

নর্মদার ঘাটে নেমে মনে পড়ল শোভানন্দজী নর্মদার গল্প করতে করতে একবার শুনিয়েছিলেন যে এই ধর্মপুরীতে স্বয়ং ধর্মরাজ তপস্যা করেছিলেন। যমের অপর নাম ধর্মরাজ। পুরাণের মতে, ইনি ধর্মাধর্মের বিচারকর্তা বলে ধর্মরাজ নামে বিখ্যাত। জীবদের পাপপুণ্যের বিচারকর্তা। এঁর বাহন মহিয এবং অস্ত্র হল যমদণ্ড। বেদের মতে যম হচ্ছে বায়ু

অর্থাৎ প্রাণবায়ু। 'যমেন বায়ুনা'। জীবের মৃত্যুকালে প্রাণবায়ু উর্ধপথে আকৃষ্ট হয়ে নবদ্বারের যে কোন একটি দ্বার দিয়ে উৎক্রান্ত হয়। এইজন্য সেই অন্তিমকালের উর্ধগামী প্রাণবায়ুকে যম বা মৃত্যুর দূত বলে পুরাণকাররা কল্পনা করেছেন।

যাইহোক স্নান করে সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করার পর সূর্যের দিকে তাকিয়ে আমি মধুছন্দার পুত্র জেতাঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্র স্তব করতে লাগলেন —

তবাহং শূর রাতিভিঃ প্রত্যায়ং সিন্ধুমাবাদন্ ।
উপাতিষ্ঠন্ত গির্বনোবিদুষ্টে তস্য কারবঃ।। (ঋ ১/১১/৬)
আবার এনু তোমার পাশে সাধন-বিত্ত চাহি,
অশেষ তোমার কীর্তিগাথা বারে বারে গাহি।
পূর্বকালে ঋষি তোমায় ভজেছিল যাগে,
তাদের দেছ দুহাত ঢালি (তাইত)প্রভু ডাকি অনুরাগে।।
মায়াভিরিন্দ্র মায়িনং ত্বং ★ শুষ্ণমবাতিরঃ।
বিদুষ্টে তস্য মেধিরাস্তেযাং শ্রবাংসি উৎতির।। (ঐ, ১/১১/৭)
মায়াবি যে শুষ্ণ অসুর করলে হনন তারে,
করলে তারে পরাজিত মায়ার অভিসারে।
মেধাবী সব যাজ্ঞিকেরা কীর্তি তোমার জানে
সিদ্ধ কর তাঁদের তুমি সত্য শ্রেয় দানে।।
ইন্দ্রং ঈশানং ওজসা অভিস্তোমাঃ অনূযত।
সহস্রং যস্য রাতয় উত বা সন্তি ভূয়সীঃ।। (ঐ, ১/১১/৮)
ঈশান তুমি হে মঘবা, তোমার ওজঃ বলে
স্তোতৃগণের কীর্তনে যে তোমার খ্যাতি চলে।
তোমার উদার বদান্যতা সহস্রধারে নিত্য
উজাড় করি আরও ঢালুক যতেক সাধন বিত্ত।।

স্নান করে মন্দিরে আসতেই তিনি বললেন — আপকা কণ্ঠসর বহুত সুরেলা হ্যায়। লেকিন্ বাঘ ভাগানেবালা ইস্ মন্ত্রমেঁ ভি ইন্দ্রকো জিকর আয়া।

আমি কোন উত্তর দিলাম না। মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশ করলাম। শিবলিঙ্গের উপর চন্দন, বিল্বপত্র ও প্রচুর বনফুল দেখে বুঝলাম, আমরা এখানে পৌঁছানোর পূর্বেই কেউ পুজা করে গেছেন, হয়ত বা গুহাবাসী সন্ন্যাসীরাই পূজা করে গেছেন। ঘনকৃষ্ণ শিবলিঙ্গকে খুব দীপ্তিময় মনে হচ্ছে। আমি নর্মদার জল ঢেলে পূজা করলাম। জপ ও প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম। শোভারামজী সন্তজীকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে গেছেন। মন্দিরের পিছনে গিয়ে দেখলাম রান্না হচ্ছে। তিনখণ্ড পাথরের উপর একটা ছোট হাঁড়ি চাপিয়ে আমার জন্য ভাত রান্না হচ্ছে। কাঠের আগুনে গোল গোল কমলালেবুর সাইজে লিট্টি সেঁকা হচ্ছে। প্রায় চব্বিশ পঁচিশটা লিট্টি তৈরী হয়ে গেছে। স্নান করে এসেই আমাকে জোর করে খেতে বসালেন সন্তজী। ঘি ও গলা ভাত তৃপ্তি করে খেলাম। তাঁরাও কিন্তু খেয়ে নিলেন। সব জিনিষ গুছিয়ে

★ শুষ্ণং - হৃদয়স্থ কাম-কামনাদি অসৎবৃত্তি নিচয়কে শুষ্ণ বলা হয়। কারণ তা জীবের সৎবৃত্তিকে প্রতিনিয়ত শোষণ ও শুষ্ক করে দিচ্ছে।

নেবার পর আবার যাত্রা শুরু হল। সন্তজীর ঘোষণায় জানলাম বেলা দেড়টা বেজেছে।

নর্মদার কিনারা ঘেঁসে যে পথচিহ্ন গিয়েছে সেই এবড়ো খেবড়ো পার্বত্য পথে কখন দ্রুততালে কখনও বা ধীরগতিতে হেঁটে বেলা পাঁচটা নাগাদ আমরা পামাখেড়ির শিবমন্দিরে এসে পৌঁছলাম। মন্দিরের চত্বরে জিনিষপত্র ফেলে সন্তমহারাজের নির্দেশে দুজন মন্দিরের ভিতরটা পরিষ্কার করার কাজে লেগে গেল; একজন সারা মন্দিরটা ধুয়ে সাফ করল। ঘাটে নেমে স্নান করে এসে দেখি চারটা পিতলের প্রদীপ জ্বেলে ফেলা হয়েছে। তখনও কিন্তু সূর্য অস্ত যায়নি। মন্দিরের চত্বরে দাঁড়িয়ে দেখছি বিশাল বিন্ধ্যপর্বত যেন ধাপে ধাপে উঠে আকাশে গিয়ে ঠেকেছে। পর্বতের উচ্চতম শিখররাজি অস্তমান সূর্যের রঙীন আলোয় দেবলোকের কনক দেউলের মত বহুদূর নীলশূন্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। কিন্তু সেই অপরূপ শোভা বেশীক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম না।

সন্তমহারাজ চেঁচামেচি করে আমাকে মন্দিরের ভিতর ঢুকতে বাধ্য করলেন। দরজা নিজ হাতে বন্ধ করে আমায় বললেন — আচ্ছিতরেসে সাপ ভাগানেবালা মন্ত্র জপ করোজী। আমি শিবলিঙ্গ হতে ফুট চারেক দূরে নিজের বিছানা পাতলাম। ভোগ ঘরে কিছু কাঠ পড়েছিল। তিনি শোভারামকে হুকুম করলেন — হমারা ওয়াস্তে ফুলরাম বানাও। তুমলোগকো লিয়ে 'মুদ্রা'। সব্‌সে পহেলে চা বানাও। বহুৎ থক গয়ে। আমি চমকে উঠলাম, তাঁর কথা শুনে। এই পাহাড় জঙ্গলে তিনি চা সংগ্রহ করলেন কিভাবে? নিজেই তার উত্তর দিলেন — হমারা কর্তাগুরু সন্তরাজ বলদিরাম নে কলকত্তাকা শিবনারায়ণী সম্প্রদায়কা মোহান্ত থে। হম্ ভি উনকা সাথ দো তিন দফে কলকাত্তা গয়া। উহ্ লোগ্ হমারা পাশ চা ভেজতে হেঁ। ওঁকারমান্ধাতাকা নজদিগ্ মোরটক্কামে হমারা গদী হ্যায়। রেল পার্শেল মেঁ হমারা পাশ চা আতী হৈ।

চা বানানোর কথা বলতেই তাঁর অনুচরদের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। চা হবার পর তিনি নিজ হাতে আমাকে একটা গ্লাস দিয়ে বললেন — পিয়ো জী। ইহ্ ত সিরিফি গরম পানি হৈ। আরাম মিলেগা। সারাদিন হাঁটার পরিশ্রমে পা আমার কন্‌কন্ করছে। আমি খুশী মনেই চা খেলাম। তাঁর অনুমতি নিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। তাঁদের বন্দেগী অর্থাৎ উপাসনাদি 'দুদুররাম' 'আনন্দরাম' ওবং ভোজনপর্ব কত রাত্রে যে শেষ হল তা আমি জানতে পারিনি। অকাতরে ঘুমিয়েছি।

যখন ঘুম ভাঙল তখন সকাল হয়ে গেছে। প্রাতঃকৃত্য সেরে এসে দেখি, সন্তমহারাজ জেগেছেন, একজন তাঁর পদসেবা করছে আর তিনজন পোঁটলাপুটলী বাঁধাছাঁদায় ব্যস্ত। আমাকে দেখেই বললেন — আভি হমলোগ্ যাত্রা করেঙ্গে। ইধরসে দশমিল জানেসে হমলোগ্ কালাদেও পৌঁছ জায়েগী। উধর বহুৎ শিবনারায়ণী লোগ্‌কা নিবাস হ্যায়। উহ্‌লোগ মেরে দর্শনকে লিয়ে তড়পাতে হৈ। কালাদেওমেঁ আজ ঠারেঙ্গে।

— আমি তাহলে স্নান করে এই মন্দিরের মহাদেবকে পূজা করে নিই।

এই বলে তাড়াতাড়ি ঘাটে নেমে স্নান করে এসে পামাখেড়ীর শিবকে পূজা করতে বসলাম। প্রায় দেড়ফুট উঁচু শিবলিঙ্গ। এইরকম অদ্ভুত ধরণের শিবলিঙ্গ ইতিপূর্বে কোথাও দেখিনি। যোনিপীঠের উপর গিট্টি দিয়ে তৈরী যেন একটা খড়্গা বসানো আছে। খড়্গার মতই কণ্ঠকূপে ভাঁজ। মনে হচ্ছে যেন লালচে বড় বড় বালির দানা সিমেন্ট দিয়ে জমানো আছে।

কিন্তু হাত দিয়ে দেখলাম, খুবই মসৃণ। এক কণা সিমেন্ট নাই। ছোট গিট্টি বা বালির বড় দানাকে সিমেন্ট দিয়ে খড়্গের আকারে জমালে হাতে যে কর্কশ ভাঁজ লাগার কথা তা হাতে লাগল না। নর্মদার জলে স্বতঃই উদ্ভূত এই লিঙ্গ। আমি বুঝতে পারলাম, অনুচরবর্গসহ সন্তমহারাজ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন, আমি তা গ্রাহ্য করলাম না, 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' বের করে এই শিবলিঙ্গের পরিচয় খুঁজে পাই কিনা দেখতে লাগলাম। বইয়ের লক্ষণ মিলিয়ে জানতে পারলাম যে এই লিঙ্গের নাম রাক্ষস লিঙ্গ বা নৈর্ঋত লিঙ্গ। তার লক্ষণ হল —

রাক্ষসং খড়্গাসদৃশং জ্ঞানযোগ ফলপ্রদম্।
কর্করাদি প্রলিপ্তস্তু কুণ্ঠকুক্ষিযুতং তথা।
রাক্ষসং নিষ্কৃতে লিঙ্গং গার্হস্থে ন সুখপ্রদম্॥

এই লিঙ্গ গৃহীদের পূজনীয় নয়। কারণ গৃহীর কাম্য সুখ ও সাধের সংসার। কিন্তু এই লিঙ্গ সংসার-জ্বালার নিবৃত্তি ঘটায়, নির্বান দান করে তাই হয়ত নির্বাণাকাঙ্ক্ষী সাধুরা উপরের ঐ গুহায় থেকে এই নির্বাণপ্রদ শিবের তপস্যা করছেন। মহাদেবকে প্রণাম করে গাঁঠরীটি কাঁধে তুলে নিয়ে সন্তমহারাজের সঙ্গে যাত্রা করলাম কালাদেওয়ের দিকে। সাজা ও সেগুনের জঙ্গল আরও যেন ঘন হয়ে উঠে গেছে পর্বতের উপর দিকে।

যেদিন অমরকন্টক হতে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলাম সেদিন ছিল ১৯৫৩ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার, বাংলা ১৩৫৯ সাল ১লা আশ্বিন, তাল নবমী। প্রায় ছ'মাস ধরে নর্মদাতটে হাঁটছি; ১৯৫৩ সাল গত হয়ে ১৯৫৪ সাল পড়েছে, আর পনের দিন পরে বাংলা ১৩৫৯ সাল শেষ হয়ে ১৩৬০ সাল সুরু হবে। সন্তমহারাজ হঠাৎ জাপটে ধরতেই চিন্তাস্রোত ছিন্ন হল। প্রায় গোটা চারেক বাইসন তীরবেগে দৌড়ে আসছে। ঠিক গরুর মত দেখতে তবে দুটো করে শিং প্রায় দু'ফুট করে লম্বা। আমাদের চলার পথ ধরেই আসছে। আমরা তাড়াতাড়ি প্রায় দশ ফুট উপরে উঠে সাজা ও সেগুন গাছের আড়ালে গিয়ে দাঁড়ালাম, সন্তমহারাজ থরথর করে কাঁপছেন আর হাঁপাচ্ছেন। বাইসনগুলো চলে যেতেই নেমে এলাম।

তিনি শোভারামকে চোখ রাঙিয়ে বলতে লাগলেন, এইভাবে আমাকে আর সফর করিয়ো না। এবার থেকে যারা দীক্ষাপ্রার্থী হবে তাদেরকে আমার গদীতে আসতে হবে। যেখানে ট্রেনে বা বাসে যাওয়া যাবে, সেখানে কেবল যেতে পারি। তিনি রাগে ফুঁসছেন, সবই যেন শোভারামেরই দোষ। সাপ, বাইসন সবাই যেন শোভারামের ষড়যন্ত্রে চক্রান্ত করে গুরুমহারাজকে নাজেহাল করছে! আমি শোভারামকে তাঁর ভর্ৎসনা থেকে বাঁচাবার জন্য বললাম — দেখিয়ে পেড়্কা ডালমেঁ ক্যাতনা সুন্দর খুপসুরৎ বান্দর হ্যায়; তিনি বাঁদর দেখায় ব্যস্ত হলেন। শোভারামকে বললেন, পাথর ছুঁড়ে তাড়িয়ে দিতে। আমি বললাম — পাথর ছোঁড়ার দরকার কি? পাথর ছুঁড়লেই ওরা দলবদ্ধ হয়ে আক্রমণ করবে। সাবধানে বাঁদর এড়িয়ে এবড়ো খেবড়ো পথে হাঁটতে লাগলাম। এইভাবে মাইল তিনেক হাঁটার পর আবার নর্মদাকে একটু দক্ষিণদিকে বেঁকে বইতে দেখলাম। এই অঞ্চলে শিমূলগাছ এবং কুল গাছের ঝোপ বড় বেশী করে চোখে পড়তে লাগল। মাঝে মাঝে সাজা, সেগুন গাছ ত আছেই তবে ছায়বিরল বিশাল বিশাল শিমূল গাছই বেশী। তাদের সারা গায়ে যেন বড় বড় আঁচিল বা আব বেরিয়েছে। আমি শোভারামকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ অঞ্চলে কি মানুষজনের বসতি নাই?

—- কি করে থাকবে? বাঘ, নেকড়ে, হায়না, গেউড়া আর চিতাবাঘের থাবার নিচে কে মাথা দিতে যাবে? তবে ঐ দিকে নর্মদার দক্ষিণতটে মানুষজনের বসতি আছে। শিমূলফুলের জঙ্গল অতিক্রম করার পর আবার ঘন জঙ্গলে পা দিলাম। সেখানে পাহাড়ের উপর থেকে ঝরঝর করে ঝরণা বয়ে আসছে, পথ পিচ্ছিল। একদল ময়ূর এবং হরিণ দৌড়াদৌড়ি করে খেলা করছে। এক-একটা ময়ূরকে তাড়া করে দু'তিনটা হরিণ আসছে, ময়ূরটা কেকারব করতে করতে গাছের ডালে উড়ে গিয়ে বসছে। কোন কোন ময়ূর পেখম মেলে ঝরণার জলে মুখ দিবার চেষ্টা করলেই হরিণ তাড়া করে আসছে, হরিণ জলে মুখ দিতে গেলেই ময়ূর তার গা ঘেঁষে ঠোকরাচ্ছে। চারদিকে অদ্ভুত নিস্তব্ধতা, আমরা নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে সেই অপরূপ দৃশ্য প্রায় দশ মিনিটকাল উপভোগ করলাম। সহসা সন্তমহারাজের 'হ্যাঁচ্চো' শব্দে চোখের পলকে হরিণগুলো ত্বরিৎগতিতে অদৃশ্য হয়ে গেল। সবাই আমরা পা টিপে টিপে ঝরণার জলে ভেজা অংশটা পেরিয়ে এলাম। চোখে পড়ল একটা বড় নৌকায় চেপে নৌকাভর্তি লোক মাদল আর ভেরী বাজাতে বাজতে নর্মদার দক্ষিণতট হতে উত্তরতটে এসে নৌকা ভিড়াল। শোভারাম সন্তমহারাজকে বললেন — আপ ইধর পধারেঙ্গে ইহ্ বার্তা শিবনারায়নী লোগনে অবগত হুয়া। ইস্‌লিয়ে উহ্‌লোগ কালাদেও মন্দিরমেঁ আপকো লিয়ে প্রতীক্ষা কর রহা হ্যায়। শুনে তিনি খুবই পুলকিত হলেন। বললেন — ঘন্টিরাম বহোৎ কাবিল আদমী হৈ। উনোনে সবকো সংবাদ দে দিয়া। দেও মুঝে মুদ্রা দেও, থোড়াসা দুদুররাম ভি দেও। তিনি বিশ্রাম করার জন্য বসে পড়লেন। তাঁদের মুদ্রা-পর্ব, লাড্ডু-পর্ব, দুদুররাম এবং আনন্দরাম-পর্ব শেষ হল। কর্তাপুরুষ, পূরণধনী সন্তমহারাজ আমাকেও সেই বাসিরুটি খাবার জন্য অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু আমি জানালাম যে কিছুক্ষণ পরেই যখন কালাদেও মন্দিরে পৌঁছে যাচ্ছি, তখন সেই মহাদেবকে পূজা করে একেবারে আপনাদের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজন করব।

— য্যায়সা আপকা মর্জি! গম্ভীর মুখে সন্তমহারাজ বললেন। সকালে পামাখেড়ীর মন্দিরে সেই নৈর্ঋত বা রাক্ষসলিঙ্গকে পূজা করার সময় থেকেই তিনি আমার উপর চটে আছেন!

আধঘন্টা ধরে সেই জঙ্গলপথে হাঁটার পরেই কালাদেও মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। বিশ পঁচিশজন নারী পুরুষ ভীড় করে দাঁড়িয়ে আছে। সন্তমহারাজকে দর্শন মাত্রেই তারা মাদল এবং ভেরী বাজিয়ে সম্বর্ধনা জানাল। বন্দেগী কর্তাপুরুষ পূরণধনী সন্তমহারাজ বলে সমস্বরে আওয়াজ তুলল। একজন মধ্যবয়স্ক লোক ভীড়ের মধ্য থেকে এগিয়ে এসে সন্তমহারাজের হাত ধরে মন্দিরের চত্বরে বসালেন। সেখানে তাঁর বসার জন্য জাজিম পূর্ব হতেই পাতা ছিল। মন্দিরও ধুয়ে মুছে সাফ করা আছে। তিনি বসতেই তাঁর হাত মুখ পা ধুইয়ে দেওয়া হল। দলের মধ্যে পাঁচজন মহিলা ছিলেন, তাঁরা তাঁদের মাথায় চুল নিয়ে গুরুদেবের পা মুছিয়ে দিলেন। তারপরেই প্রণাম পর্ব, প্রত্যেকেই পায়ের কাছে ভেট দিয়ে প্রণাম করলেন। রেশমী বস্ত্র, লাড্ডু খোয়া, দুধ ঘি, নানাজাতীয় ফল মেওয়া স্তূপীকৃত হল। যা প্রণামী পড়ল, শোভারাম গুনে সন্তমহারাজেকে জনালেন —'ঢ়াই হাজার রূপেয়া'।

— রাখ দো রাখ্ দো। ইনলোগোকে পরসাদ দেও। একজন লোককে সহাস্যে প্রশ্ন করলেন — ক্যা হুঁকা নেহি লে আয়া? বটের ভি নেহি। লোকটি জিভ্ কাটল। অত্যন্ত অপরাধীর মত কাঁচুমাচু হয়ে জানালো — ভুল হো গয়া, মুঝে মাফি কিয়া যায়।

— আপ্ জানতা হৈ ঘন্টিরাম, এতনা বড় সফরমেঁ ক্যাতনা তকলিফ হোতা হৈ, বিচ বিচ্‌মে হুঁকা বটের ঔর কাঁঠাল না খানেসে তবিয়ৎ কমজোরী হো জাতা হৈ। ঘন্টিরাম নতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইল। মন্দিরের এককোণে গাঁঠরীটা রেখেছিলাম, আমি শোভারামকে বলে নর্মদা স্পর্শ করতে নামলাম। ঘাটে যেতে যেতেই আমি শুনতে পেলাম, সন্তমহারাজ উপদেশ দিচ্ছেন — দেখো, হরবখৎ সত্যপুরুষকা ভজন করনা চাহিয়ে, সত্য পথমেঁ সত্যকা সন্ধ্যান মিলতা হৈ, যো দুখ পড়ে ত সত্য ব্যবহারা। সত্য কি জানো পুরুখ্ অপারা। অর্থাৎ দুঃখ-কষ্টে পড়লেও সত্য ব্যবহার করবে। যদি কোন মিথ্যা আচরণ করলে বুঝ তোমার সাময়িকভাবে দুঃখ কষ্টের অবসান ঘটবে, তবুও স্বার্থবশে সত্যকে ত্যাগ করো না। কায়মনোবাক্যে সত্যভাষণ, সত্যরক্ষা এবং সত্যপালনকেই সত্যপুরুষ অলখ্ নিরঞ্জন বলে জানবে।

ফিন্ বলো, জোরসে বলো — তুঁহ দুঃখহরণ সকল সংসারা।
শিবনারায়ণ দাস তুমহারা॥

সকলেই তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে দোঁহাটি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করলেন। আমাকে দেখিয়ে তিনি সবাইকে বললেন — ইনকা নাম শৈলেন্দ্ররাম, বাঙাল মুলুকসে আয়া, আভিতক কাল করমকা ফান্দোমেঁ ফাঁস রহা হ্যায়। পরিক্রমা কর রহা হ্যায়, শিবলিঙ্গকা পূজা কর রাহা হ্যায়, লেকিন ওঁকারমান্ধাতামেঁ পোঁছকর হম্ ইনকো দীখ্ছা দেগা, করম ভরমসে ছুটকারা হো জাবেগা। সাপ ঔর শের্‌কো ভাগানেবালা মন্ত্র ইনোনো আচ্ছিতরেসে ইস্তেমাল কর্ চুকা। একদফা হমারা চেলাচেলিয়োঁকো শুনা দিজিয়ে ত?

আমি বললাম — আপনাকে যে মন্ত্র শুনিয়েছি; তা সাপুড়ে ভুতুড়ে মন্ত্র নয়, দুর্লভ বেদমন্ত্র, মহর্ষিদের সাধনার বস্তু। যখন তখন ঐ মন্ত্র শুনতে বা বলতে নাই। এই বলে কমণ্ডলু হাতে করে ঘাটের দিকে স্নান করতে নেমে গেলাম।

আমি শুনতে পেলাম তিনি বলছেন — বাচ্চা বহোৎ তেজী হ্যায়। আখেরমেঁ সিধা হো জাবেগা। হম্ ইনকো মোহান্ত বনায়েগা। জনৈক বশংবদ ভক্ত মন্তব্য করলেন শুনতে পেলাম — সত্যপুরুষ অলখ্ নিরঞ্জনকা জব্ নজরমেঁ আ গিয়া, তব উহ্ জাবেগা কাঁহা, উন্‌সে বহোৎ ট্যারা আদমীকো আপনে সিধা কিয়া।

নর্মদাতে স্নান করে ইচ্ছা করেই দেরী করে যাবার জন্য জলে দাঁড়িয়ে জপ করতে লাগলাম। যখন ফিরে এলাম তখন দেখি কর্তাপুরুষকে প্রণাম ও বন্দনার হুড়োহুড়ি পড়ে গেছে। একজন তাঁর শ্রীদেহে তৈলমর্দন করছে। আমি একপাশ দিয়ে মন্দিরে ঢুকে শিবলিঙ্গের কাছে বসে প্রণাম ও পূজা সারলাম। পূজা করে বিশেষ তৃপ্তি হল না। কারণ বিশাল শিবলিঙ্গটি দেখতে বড় কর্কশ ও রুক্ষ, আমার গ্রামের ভট্টাচার্য বাড়ীর শালগ্রাম শিলার কথা মনে পড়ে গেল। তাঁদের বাড়ীতে যে শালগ্রামটির পূজা হত, সেটি এমনই অদ্ভুত প্রকৃতির ছিল যে যতই পঞ্চগব্য ও ঘি মাখিয়ে স্নান পূজা বা চন্দন চর্চিত করা হোক না কেন, দু'তিন মিনিট পরেই দেখা যেত শালগ্রামের চন্দন শুকিয়ে ফেটে ফেটে পড়ছে আর কর্কশতা এবং রুক্ষতা বিষমভাবে ফুটে উঠছে। সকলেই বলত — বংশ নেশে ঠাকুর। সত্যি সেই সম্পন্ন ও সমৃদ্ধ ভট্টাচার্যি পরিবার, সেই শালগ্রামটি ঘরে আসার পর থেকে দশ বারো বৎসরের মধ্যে আমাদের চোখের সামনে নির্বংশ হয়ে গেল। কালাদেও-এর শিব-লিঙ্গটিকে নিন্দনীয় দুষ্ট

লিঙ্গের অন্তর্ভুক্ত বলে মনে হল। শাস্ত্রে আছে — কর্কশে বাণ লিঙ্গেতু পুত্রদারক্ষয়ো ভবেৎ। যাই হোক, নর্মদাতটের প্রাচীন বাণলিঙ্গকে শাস্ত্রকাররা 'নিন্দনীয় বা দুষ্ট' যাই আখ্যা দিন আমার চোখে তিনি শিব, মঙ্গলময় দেবতা। পূজা করে বাইরে বেরিয়ে দেখি সন্তমহারাজ স্নান করে এসেছেন, ভক্তরা তাঁকে রেশমী বস্ত্র পরিয়ে কর্পূর জ্বেলে আরতি করছে। শোভারামদের সন্ধান নিতে গিয়ে দেখি তারা চারজনেই মন্দিরের ভোগঘরে রান্নার কাজে ব্যস্ত। নবাগত চেলাদের মধ্যে চার পাঁচজন একসঙ্গে গিয়ে জঙ্গল হতে বহু শুকনো কাঠ নিয়ে এসে জমা করে রেখেছে। তাঁরা এখানে কেউ খেলেন না, হাতে হাতে প্রসাদ নিয়ে কর্তাপুরুষের জয়ধ্বনি দিতে দিতে নৌকাতে গিয়ে উঠলেন। সন্তজী পকেট ঘড়ি দেখে শোভারামকে হুকুম করলেন — এক বাজ গিয়া, ভোজনকা ইন্তেজাম করো। এতক্ষণে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকে খেতে বসলেন। আমাকেও পাশে বসালেন। পুরী, ডাল, সব্জী এবং পায়েস আমরা সবাই তৃপ্তি করে খেলাম। সন্তমহারাজ রুক্মিনী (ডাল) এবং সুধিতে (তরকারী) কিঞ্চিৎ রামরস (নুন) বেশী পড়েছে বলে উষ্মা প্রকাশ করলেন।

খাওয়া দাওয়ার পর সবাই একটু গড়িয়ে নিলাম, গরমকাল যে পড়ে গেছে তা ভালভাবেই অনুভব করছি। কয়েকটা সেগুন পাতা একত্র করে শোভারাম গুরুদেবকে সারা দুপুর হাওয়া করল। বেলা চারটা নাগাদ সবাই বাইরে বসে নানারকম গল্প করতে লাগলাম। সূর্যাস্ত হতেই আমি নর্মদা স্পর্শ করে এলাম। মন্দিরের দু'দিকে দুটো জানালা বন্ধ করলে গরমে হাঁফাতে হবে, কিন্তু সাপের ভয়ে তিনি জানালা খোলা রাখতে দেবেন না। অগত্যা আমি বললাম, দুটো জানালা স্পর্শ করে আমি মন্ত্র পড়ছি, আর তাহলে সাপ আসবে না, আমার প্রস্তাবে তিনি সম্মত হতেই আমি ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট রুদ্রস্তবের একটি মন্ত্র জানালা স্পর্শ করে উদাত্ত কণ্ঠে পাঠ করতে লাগলাম —

ওঁ অবোচাম নমো অস্মা অবস্যব শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্র বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ॥
(ঋ ১ম, সূ ১১৪, মন্ত্র ১১)

স্মরণ করি রুদ্র তোমায় স্তবে গভীর নমস্কারে
মরুৎ সহ ডাকি তোমা আহ্বান করি বারে বারে।
পালন করুন মিত্রবরুণ, পালন করুন মা অদিতি।
পালন করুন সিন্দু-সাগর পালন করুন দ্যুলোক ক্ষিতি॥

সন্তমহারাজ নিজেই গিয়ে মন্দিরের দরজা বন্ধ করে এলেন। এইবার তাঁর 'দুদুররাম' চাই। শোভারাম রূপার গ্লাসে এনে দিতেই চুমুক দিলেন। তুমলোগ 'আজ্জেরি' লে আও, 'বন্দেগি' সুরু করো। অর্থাৎ এইবার সেই রূপার ধূনুচিতে ধূপধুনা কর্পূর লোবান ও জটামাংসী জ্বেলে বন্দনা পাঠ হবে। কিন্তু শোভারাম ভোগঘর হতে আসতে দেরী করছে। তিনি আবার 'শোভারাম, শোভারাম' বলে হাঁক পাড়লেন। শোভারাম ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে হাতজোড় করে নিবেদন করল — প্রভু কর্তাপুরুষ, দুখীরাম ভুল করে ধূনুচিটা পামাখেড়ীর মন্দিরে ফেলে এসেছে। 'আজ্জেরি' ক্যায়সে হোগা? এই বলে সে কর্তাপুরুষের পা দুটো জড়িয়ে ধরল। তিনি শোভারামকে পা দিয়ে ঠেলে হুঙ্কার ছাড়লেন — দুখীরাম! দুখীরামের তখন আত্মারাম খাঁচাছাড়া। সে কাঁপতে কাঁপতে এসে পায়ে পড়ে কোনমতে জড়িয়ে জড়িয়ে

বলল—মাফি, মাফি.........। রোষ কষায়িত লোচনে তিনি আবার হুঙ্কার ছাড়লেন — ধূনুচি কিধার বা? ভয়ে থতমত খেয়ে বেচারা বলে উঠল — বাজারসে লে আঁউ? বেকুফ ইধর জঙ্গলমেঁ বাজার কাঁহা? ক্যা তুমহারা বাপ ইধার দোকান রাখ্যা? নার্ভাস হয়ে দুখীরাম জবাব দিল — জী হাঁ।

আমি হাত জোড় করে তাঁকে শান্ত হতে বললাম। গর্জাতে গর্জাতে তিনি গ্লাসের বাকী দুদুররাম চুমুক দিতে লাগলেন। আমি শোভারাম ও দুখীরামের হাত ধরে পাশের ভোগঘরে পাঠিয়ে দিলাম। তাঁর ক্রোধ শান্ত করার জন্য বললাম — আপনি স্বয়ং পূরণধনী কর্তাপুরুষ, আপনার আর আজ্ঞেরি বা উপাসনার বিশেষ প্রয়োজন নাই আর আপনি নিজে যখন ওদের সামনে উপস্থিত আছেন, তখন ওদেরও একদিন আধদিন উপাসনা না করলে এমন কি ক্ষতি হবে। আপনি দয়া করে ভাই দুখীরামকে ক্ষমা করুন।

আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি শুনুন। আমি তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়ি। আমাদের একজন সহপাঠী ছিল, তার নাম গৌরহরি পাল। সে একটু তোৎলা ছিল, লেখাপড়াতেও ভাল ছিল না। পঞ্চম শ্রেণীতেই সে দু'বছর ধরে পড়ছিল, বার্ষিক পরীক্ষায় পাশ করতে পারেনি। শ্রীযুক্ত মহেশ্বর কর নামে আমাদের যিনি সহকারী হেডমাষ্টার মশাই ছিলেন তিনি আমাদের অঙ্ক এবং বাংলা শিখাতেন, খুব যত্ন করে পড়াতেন কিন্তু খুব কড়া ধাতের লোক। স্কুলের সমস্ত ছেলেই তাঁকে খুব ভয় করত। তিনি বেত হাতে ক্লাশে ঢুকতেন, পড়া না পারলেই বেত খেতে হত। একদিন তিনি ক্লাশে এসে, পড়া বলতে না পারায় চারজন ছাত্রকে বেঞ্চের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলেন। গৌরহরিও পড়া পারেনি, সেও বেঞ্চের উপর নিজের কান ধরে দাঁড়িয়েছিল। মাষ্টারমশাই একে একে কৈফিয়ৎ নিচ্ছিলেন। একজন বলল — দিদির বিয়ে ছিল, আর একজন বলল — তার কাকার বিয়ে ছিল, তাই পড়া করতে পারেনি। তিনি যখন বেত নাচিয়ে গৌরহরিকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন সে বলে উঠল — কা-কাল আমার বা-বাবার বি-বি-বিয়ে ছিল।

গৌরহরির মত নার্ভাস হয়ে দুখীরাম তাই আপনার কাছে আবোল তাবোল উত্তর দিয়েছে।

আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। ভোগের ঘরে যারা ভয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তারাও বেরিয়ে এসে হাঁসতে লাগল।

পান ভোজন সেরে তাঁদের শুতে দেরী আছে দেখে আমি তাঁর অনুমতি নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

গভীর রাতে আমার ঘুম ভাঙল। জঙ্গলের দিক থেকে কত বন্য জন্তুর ডাক ভেসে আসছে। বনের মধ্যে একটানা সোঁ সোঁ শব্দ ছাড়া আরও সব বিচিত্র শব্দ থেকে থেকে ভেসে আসছে কানে। রহস্যময়ী বন্যপ্রকৃতি যেন জেগে উঠেছে। আমি বিছানার উপর উঠে বসলাম। জানালা দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম তারায় ভরা আকাশের দিকে। একটা প্রদীপ নিভে গেলেও তিনটি প্রদীপ এখনও জ্বলছে। সন্তমহারাজকে দেখলাম, 'দুদুররামের' ঘোরে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। প্রস্রাবের বেগে বাইরে যেতে ইচ্ছা হল, উঠে দরজার দিকে এগোচ্ছি, দেখলাম দুখীরামও জেগেছে। পা টিপে টিপে কাছে এসে সেও ইঙ্গিতে জানাল যে সেও বাইরে যাবে। সন্তর্পণে দরজা খুলে বাইরে এলাম। আকাশে জ্বলজ্বলে সপ্তর্ষিমণ্ডলকে দেখে আমার মনে

পড়ে গেল অনেকদূরে আমার কালিয়াড়া গ্রামটিকে, সেখানেও হয়ত আজ অমনি সপ্তর্ষিমণ্ডল উঠেছে, ঐরকম একফালি কৃষ্ণপক্ষের গভীর রাত্রির চাঁদও। সেই পরিচিত আকাশ, নিজের প্রিয় পরিবেশ ও পরিমণ্ডল ছেড়ে কতদূরে আজ এসে পড়েছি, আরও কতদূর যে যেতে হবে, শেষ পরিণতি যে কি হবে তা জানা নাই। বাবা আমাকে নর্মদাতটে আসতে বলেছিলেন, ভেবে চিন্তেই বলেছিলেন, কাজেই পরিণামে যাই ঘটুক তা আমার বিচার্য নয়। মা নর্মদে, বাবা এখন কোথায় আছেন তা আমার জানাই নাই। তুমি দয়া করে তাঁকে জানাও যে আমি তাঁর কথা অমান্য করিনি। চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমাকে কাঁদতে দেখে দুখীরাম এসে আমার হাত ধরল, নর্মদাকে প্রণাম করে ফিরে এলাম মন্দিরে।

ঘুম ভাঙল সকালে। অন্যেরা সবাই উঠে পড়েছেন। শোভারাম বলল — আজ বড়া লম্বে সফর হ্যায়। করীব সতের মিল জানেসে লাখড়াকোটকা মন্দর মিলেগা। লাখড়াকোটকা জঙ্গল খতরনাকী মহাজঙ্গল। আস্নান করকে রেডি হো জাইয়ে। সন্তজীর এখনও ঘুম ভাঙেনি। তাঁকে জাগাবে এত সাহস কার? আমি গাঁঠরী বেঁধে স্নান করতে চলে গেলাম। ফিরে এসে দেখি সন্তজী বিছানার উপর উঠে বসেছেন। সকলকে প্রস্তুত দেখে তিনিও জামা জুতা পরে রেডি হয়ে গেলেন। শোভারাম পথ দেখিয়ে আগে আগে চলতে লাগল। কিছুটা যাবার পরেই ক্রমশঃ চড়াই সুরু হল। সাজা ও সেগুন গাছের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ক্রমশঃ প্রায় ছশ ফুট উপরে উঠে এলাম। পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে হাঁটতে হচ্ছে। সূর্যরশ্মির দেখা নাই। সন্তজীর ঘড়ি বলছে সাতটা বেজে গেছে, তবুও সূর্যরশ্মির দেখা নাই। মাইল দুই এইভাবে হাঁটার পর মালভূমিতে পড়লাম। দুপাশে এমন জঙ্গল যে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করছে না। এক জায়গায় দেখলাম পাথর ভেদ করে বড় বড় ঘাসের জঙ্গল, ঘাসবনের ভিতর দিয়ে ঝরণা বয়ে আসছে। বুনো জাম কেঁদ সাজা ও বেলগাছ ছাড়া সেগুনগাছ একটাও দেখতে পেলাম না। আর একরকম গাছ দেখলাম যার প্রতিটি শাখায় কাশ্মীরের পিচফলের মত একরকম ফল অজস্র ফলে আছে। শোভারামকে জিজ্ঞাসা করতে বলল — তন্দুফল, মারাত্মক বিষ। ভীল আর কোরকারা তাদের তীরে এর রস আর আঁঠা মাখিয়ে রাখে। তার এক তীরেই একটা বাঘ খতম হয়ে যেতে পারে। তীরবিদ্ধ হবার পাঁচ দশ মিনিটের মধ্যে ভয়ঙ্কর জানোয়ারগুলো মাটিতে লুটিয়ে ছটফট করতে থাকে। তন্দুগাছের বনে কোন জন্তুই বাস করে না। কাজেই পরিক্রমারত পথিকের পক্ষে এই বন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ। এই বনে বসে কোন খাবার খাওয়া এমন কি জল খাওয়াও নিরাপদ নয়। তন্দুবন পেরিয়ে আবার কিছুটা নিচে নামতে লাগলাম। বড় গাছের ফাঁক দিয়ে উপর দিকে তাকালে সূর্যরশ্মি চোখে পড়ছে। নিচের দিকে তাকিয়ে অনেকখানি দূরে নর্মদাকে দেখতে পেলাম, চকচকে উজ্জ্বল রেখা যেন। চকচকে সেই রেখা ক্রমশঃ যেন বুক উঁচু হচ্ছে অর্থাৎ নর্মদাও চড়াই পথে বয়ে চলেছেন। রেল লাইনে দাঁড়িয়ে সোজা তাকালে ইস্পাতের রেলপথ যেমন সরলরেখায় গিয়ে আবার বাঁক নেয়, বহুদূর হতে চোখে পড়ে তার ঝক্‌ঝকে দাগ, নর্মদাকেও তেমন দেখাচ্ছে। আমাদের পথে ভালভাবে সূর্যরশ্মি বন ভেদ করে প্রবেশ করতে পারছে না বটে কিন্তু নর্মদার জল রৌদ্রে ঝলমল করছে। উভয় তটের দিকে তাকিয়ে কখন নীলাভ কখনও সবুজ গাছপালার সমারোহ এবং তার বর্ণাঢ্য শোভা দেখে আমি স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলে উঠলাম — কী সুন্দর! শোভারাম কথাটা বুঝতে পেরে বলল — সুন্দর নয় বলুন ভয়ঙ্কর। লাখড়াকোটের জঙ্গলে

জানবেন, যেখানে সেখানে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা আছে — পরমুহূর্তে কী ঘটবে তা কেউ বলতে পারে না। এতক্ষণ সন্তজী কোন কথা বলেননি। এবারে তিনি গর্জে উঠলেন — ঘাবড়া দেতা হেঁ কেঁও। হরবখৎ তুম ডর দেখাতা হো। শোভারাম চুপ করে গেল।

আমি মনে মনে ভাবছি মুণ্ডমহারণ্য দেখে এসেছি, এখানেও দেখছি বনজঙ্গলের অদ্ভুত দৃশ্য। নর্মদাতে না এলে এ দৃশ্য দর্শন জীবনে ঘটত না। আমরা আবার চড়াইএর পথে উঠছি, ক্ষীণ পথরেখা লক্ষ্য করে। আমার বলা ভুল হল, আমরা কেউ লক্ষ্য করছি না, করছে শোভারাম, আজ সেই আমাদের অগ্রপথিক নেতা, আমরা কেবল দেখছি, দুধারে নিবিড় বনানী, অজস্র রকমের মোটা লতা আর বনের ফুল। বন-প্রকৃতি এখানে লীলাময়ী, আপন সৌন্দর্যে আত্মহারা। আমরা একটা উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়লাম। আমাদের চলার পথে উভয় দিকে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত জায়গা বেশ ফাঁকা মনে হল। পঞ্চাশ ষাট হাত দূরেই কিন্তু ঘন বন, বনের গাছ পালা হঠাৎ যেন প্ল্যান করে যুক্তি করে এই একটা জায়গা ফাঁকা রেখে সারি সারি থমকে দাঁড়িয়েছে। সামনে দৃষ্টি দিয়ে পরিমাপ করলাম প্রায় আধামাইল ত বটেই ; ফাঁকা মাঠের মত দেখা যাচ্ছে। বুক-পকেট থেকে ঘড়িটা বের করেই সন্তজী বললেন ন'টা। দেও মুদ্রা ঔর দুদুররাম দেও। তুমলোগভি মুদ্রা লেও, আনন্দরামভি পিলেও। শৈলেন্দ্ররামকো ফল বেগারা দেও। দুখীরাম তাড়াতাড়ি জাজিম পেতে দিল। তিনি বসলেন, আমাদের একটু বিশ্রামেরও প্রয়োজন ছিল। তাঁদের সঙ্গে বসে আমিও কলা লাড্ডু এবং মেওয়া খেলাম। শোভারামকে দেখলাম, তাড়াতাড়ি খেয়ে টাঙি দিয়ে সেগুন গাছের দু'হাত লম্বা লম্বা পাঁচটা লাঠি বানিয়ে তাতে নেকড়া জড়িয়ে তা তেলে ডুবিয়ে নিল। আমাকে বলল — একটু পরেই আমরা এমন ঘনঘোর জঙ্গলের মধ্যে ঢুকব, যেখানে দিনের আলো আদৌ দেখা যাবে না। পথ ছায়ায় ঢাকা অন্ধকার, হায়না নেকড়ে সব ওত পেতে আছে। মশাল জ্বেলে চলতে হবে, কথা বলতে বলতেই দেখতে পেলাম আমাদের কাছ হতে প্রায় শত-খানিক হাত দূরে একটি চিতল হরিণ বন থেকে বেরিয়ে এসে দৌড়াচ্ছে, আর তাকে তাড়া করে ছুটে চলেছে একপাল নেকড়ে। সন্তমহারাজ উঠে দাঁড়িয়ে বদ্ধমুষ্ঠির আস্ফালন করতে করতে বললেন — দেখ্ শোভারাম, তুই আর ঘন্টিরাম যদি এর পরে আর কখন জঙ্গলপথে হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে দীক্ষা দিবার জন্য হেথা সেথা নিয়ে যাস্ তাহলে তোদের জান নিয়ে নেব। শিবনারায়ণী সম্প্রদায়ের শিষ্য সংখ্যা বাড়ল কি কমল তাতে আমার থোড়াই বয়ে গেল।

শোভারাম চুপ করেই রইল। আমরা আবার হাঁটতে শুরু করলাম। সেই ফাঁকা প্রান্তরটা শেষ হয়ে একটা পাকদণ্ডীর মুখে শোভারাম দিয়াশালাই জ্বেলে সন্তজী বাদে আমাদের সকলের হাতে এক একটা মশাল দিল। সন্তজী টর্চ হাতে নিয়ে আমাদের মাঝখানে থাকলেন। পাক্‌দণ্ডী বেয়ে হাঁটতে লাগলাম। যতই এগোচ্ছি জঙ্গল ততই ঘন হয়ে আসছে, বড় বড় গাছ বেয়ে বড় বড় লতার ঝোপ এমনভাবে আচ্ছাদন সৃষ্টি করেছে যে সূর্যরশ্মির সাধ্য কি এই জঙ্গলে প্রবেশ করে। মনে হচ্ছে যেন অন্ধকারময় প্রেতপুরীতে হঠাৎ এসে ঢুকে গেছি। কোথাও কোন আলোর নিশানা নাই। হঠাৎ বনের মধ্যে শব্দ হল — খিক্-খিক্-খিক্। মনে হচ্ছে প্রেতরা তাদের রাজ্যে অনধিকার প্রবেশের জন্য আমাদের ঘাড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়েছে। শোভারাম বললেন —একসঙ্গে অনেকগুলো হায়না আমাদেরকে অনুসরণ করছে। এইজন্য মশাল জ্বেলে এই জঙ্গলে হাঁটতে হয়। শুধু অন্ধকারের জন্য নয়। বন্যজন্তুর

হাত থেকে বাঁচবার জন্যও বটে। সন্তজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, পাঁচ সেলের ব্যাটারীওয়ালা টর্চ জঙ্গলের এদিকে ওদিকে ফেলছেন। টর্চের আলোয় আমরা দেখতে পেলাম আমাদের ডান দিকে পাঁচ ছটা হায়না আমাদের কাছ হতে হাত দশেক দূরে দূরে গাছের আড়ালে আড়ালে চলেছে। আলোতে তাদের লকলকে জিহ্বা আর জ্বলন্ত চোখ দেখে বুকের মধ্যে শির্ শির্ করে উঠল। আমার গলা শুকিয়ে গেছে। শোভারামকে অকুতোভয় তেজস্বী পুরুষ বলে স্বীকার করতেই হবে। সে বলল, বাঁদিকে তিনজন আর ডানদিকে তিনজন মশাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আর টর্চের আলো ফেলতে হবে। এই বলে কিভাবে মশাল ঘুরাতে হবে তা দেখিয়ে দিল। সন্তজী ডানদিকে হায়না দেখেছেন, তাই তিনি সেই দিকেই আলো ফেলতে লাগলেন। শোভারাম এবং আমিও ডান হাতে ধরা মশাল ঘুরাতে ও দুলাতে লাগলাম। তাই দেখে দুখীরামসহ বাকী দুজন বাঁহাতে মশাল ধরে ঘুরাতে লাগল। টর্চের আলো যখনই পড়ে তখনই দেখি তাদের বীভৎস কাংস্যকণ্ঠ থেমে যায় আর দূরের দিকে পালিয়ে যায়। সন্তজীর ফোঁপানি বন্ধ হয়েছে। তিনি বেশ মজা পেয়েছেন বলে মনে হল। তিনি চিৎকার করে বলতে লাগলেন — আরে জানোয়ার সন্তপুরুষকা সাধ দিল্লাগি ছোড়্। দিওয়ানাজীকে দেখেছিলাম, নমস্কার করেই হায়নাদেরকে হঠিয়ে দিয়েছিলেন। সে মহাপুরুষকে এখানে কোথায় পাবো? তাঁর কথা মনে পড়তেই 'রেবা', 'রেবা' জপ করতে লাগলাম উচ্চৈঃস্বরে। শোভারাম তার গুরুভক্তি দেখাবার জন্য বলল — চুপ রহোজী। খুদ্ কর্তাপুরুখ্ কা পাশমেঁ রহকর্ ক্যা 'রেবা রেবা' চিল্লাতে হো। আমি তার কথায় কর্ণপাত করলাম না। সন্তমহারাজ আমাকে বেশ আবদারের সুরেই বললেন — আপ্ত জী শের্ ভাগানেবালা মন্ত্র জানতা হ্যায়, এক দফে কহিয়ে ত। আমি বললাম সেই মন্ত্রই আমি জপ করছি, ভয় নাই চলুন। নর্মদাতীরে পরিক্রমা করতে করতে আমি কি মিথ্যা বললাম?

যতই এগোচ্ছি, ততই জঙ্গলকে আরও ভয়ঙ্করভাবে ঘন মনে হচ্ছে। বড় বড় গাছের ডালপালা লতাপাতা যেন পাকদণ্ডীর পথকে ঢেকে ফেলার উপক্রম করছে, পাকদণ্ডী যেন শেষ হতেই চায় না। মুণ্ডমহারণ্যের কথা মনে পড়ল। সেখানেও এইরকম নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে হেঁটেছি, সেখানে হয়ত জঙ্গল আরও ঘন, আরও গভীর কারণ সেখানে পাখী ডানা মেলে উড়তে পারে না। ওঁকারেশ্বর ঝাড়িতে এই লাখড়াকোটের জঙ্গলেই দেখছি কিছু অংশ মুণ্ডমহারণ্যের মত। মুণ্ডমহারণ্য যখন অতিক্রম করতে পেরেছি, তখন এ জঙ্গলও পারব। তবে সেখানে সাথী ও পথ-প্রদর্শক ছিলেন সিদ্ধ মহাত্মা শোভানন্দ আর এখানে রয়েছে শোভারাম, পাতিরামের একজন তল্পীবাহক মাত্র।

হায়নাদেরকে আর দেখা যাচ্ছে না। মশাল ধরাই আছে। প্রায় দেড় ঘন্টা এইভাবে চলার পর পাকদণ্ডী শেষ হল, উৎরাই-এর পথে নেমে এলাম ফাঁকা মাঠে। নর্মদাকে দেখতে পেয়ে ধড়ে প্রাণ এল, মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের খর উত্তাপ গায়ে লাগছে। অন্ধকার হতে এসে পৌঁচেছি আলোতে। মনে অনেক স্বস্তি। এক কমণ্ডলু জল ঢক্ ঢক্ করে খেয়ে ফেললাম। চারপাশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম। নানা লতা গুল্মে পাথরের চাঙড়গুলো ঢাকা, কিছু লতাগাছ শুকিয়ে গেছে। কোথাও কোথাও সেগুন গাছের জটলা। দূরে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। সন্তজীর কাছে জানতে পারলাম বেলা বারটা বেজেছে। শোভারাম জানাল আর এক মাইল হেঁটে গেলে ভাল স্নানের ঘাট পাওয়া যাবে, সেখানে খাওয়া দাওয়া করে ধীরে সুস্থে হাঁটলেও সন্ধ্যার আগেই লাখড়াকোটের মন্দিরে পৌঁছে যাবো। রূপার গ্লাসে একগ্লাস জল খেয়ে তিনি

পুনরায় হাঁটবার অনুমতি দিলেন। মশালগুলো ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হল। এখানে গাছপালার সংখ্যা কম হলে কি হবে পথ খারাপ বলে সেই একমাইল রাস্তা হাঁটতেই একঘন্টা লেগে গেল। শোভারামের নির্বাচিত স্থানে এসে দেখলাম, নর্মদাতে স্নানের ঘাট সত্যিই পরিষ্কার। বড় বড় গাছ দিয়ে ঘেরা স্থানটা একটা ফুটবল খেলার মাঠের মত। এখানে যে অল্প কিছুকাল আগে পরিক্রমাবাসীরা ছাউনি ফেলেছিল তার চিহ্ন পড়ে আছে। ভাল কাঠের টুকরো এবং অনেক পোড়া কাঠের অংশ পড়ে আছে, ধুনি বা রান্না করার জন্য চুল্লির কাঠ।

সন্তজীর জন্য এক শিষ্য একটা বড় জাজিম পেতে দিল। শোভারাম রান্না করার জন্য কাঠ কুড়িয়ে আনল, দুখীরাম সন্তজীকে তেল মাখিয়ে দলাই মালাই করতে লাগলেন। সন্তজীর হুকুম মত শোভারাম স্নান করে এসে কড়াই অর্থাৎ আটা, ঘি, খোয়া এবং মেওয়া দিয়ে একরকমের মোহন ভোগ পাকাতে বসল। আমি ঘাম জুড়িয়ে যেতেই নর্মদায় স্নান করতে নামলাম । স্নান জপ সেরে ঘাট থেকে উপরে উঠে আসছি, হঠাৎ দেখে চমকে উঠলাম! কিছু দূরেই ঝোপে ঢাকা একটা বড় পাথরের চাঙড়ের আড়ালে একটা বড় বাঘ গুটি গুটি করে এগিয়ে আসছে তার চোখগুলো জ্বলছে। আমি 'শের শের' বলে চেঁচিয়ে উঠলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল একটা হলুদ বর্ণের বিদ্যুৎ যেন ঝিলিক দিয়ে উঠল । মুহূর্তের জন্য আতঙ্কে চোখ বন্ধ করলাম। চোখ খুলে আর সন্তমহারাজকে দেখতে পেলাম না, বাঘের থাবার ঘায়ে দুখীরাম রক্তাক্ত দেহে পাথরের উপর গড়াচ্ছে। পলকের জন্য দেখতে পেলাম গর্জন করতে করতে কালান্তক বাঘটা সন্তমহারাজকে পিঠে ফেলে জঙ্গলের দিকে পালাচ্ছে। থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আমি পাথরের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। তাড়াতাড়ি উঠে শোভারামের কাছে গিয়ে দেখি তারা অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছে। দুখীরামকে দেখে মনে হল সে আর বেঁচে নাই। বুক ও গলার মাঝখানে এক খাব্‌লা মাংস খুবলে নিয়ে গেছে বাঘটা, ঘাড়টা ভেঙে গেছে। গল্‌ গল্‌ করে রক্ত বেরোচ্ছে, জাজিম রক্তে ভিজে গেছে। শোভারামসহ আর দু'জনের চোখে মুখে আমি জলের ঝাপটা দিতে লাগলাম। হাত কাঁপছে, মাথা ঘুরছে, টাল সামলে নিজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না, যাইহোক কোন রকমে জলের ঝাপটা দিতে দিতে তারা চোখ খুলে তাকাল। আর্তনাদ কান্না ও বিলাপধ্বনিতে কিছুক্ষণ কাটল। আমিও কাঁদছি। দুখীরামের রক্তাপ্লুত মৃতদেহের দিকে তাকানো যায় না। বেচারা কায়মনোবাক্যে 'কর্তাপুরুষের' সেবায় নিজেকে সমর্পণ করেছিল। তার প্রিয় পরিজন কিছুই জানতে পারল না, নর্মদাতটের এই জঙ্গলপ্রান্তে তার দেহটা পড়ে রইল। সন্তমহারাজের জন্যও মনটা বড় কাতর হল। তাঁর সরল ও সদয় ব্যবহার যতই মনে হতে লাগল; ততই কান্না উজিয়ে এল। আমাকে দীক্ষা দিয়ে মোহান্ত বানাবার সাধ তাঁর মিটল না! শোভারামরা তখনও কাঁদছে। আমি নর্মদাতে গিয়ে সন্তমহারাজ ও দুখীরামের বিদেহী আত্মার উদ্দেশ্যে তর্পণ করে এলাম। আকাশে একপাল শকুনি চক্রাকারে ঘুরছে। এই বীভৎস জীবগুলো কি করে যে তাদের খাদ্যের সন্ধান পায়! শোভারাম নিজেকে সামলে নিয়েছে। দূরে বাঘের হুঙ্কার শুনলাম। শুনেছি, শিকার প্রাপ্তির পর বাঘ এইভাবে আনন্দে হুঙ্কার দেয়। হয়ত বা সন্তমহারাজের দেহটা কোন ঝোপের আড়ালে মুখের কাছে ফেলে রেখে সে এই হুঙ্কার দিচ্ছে।

শোভারাম তার দুই গুরুভ্রাতাকে বলল — ঘন্টিরামকে আমি কিছুতেই গদীতে বসতে দেব না। আমাকে এখনই লরি বা বাস ধরে মোরটক্কাতে পৌঁছতে হবে, গদী সামলাতে হবে। তুম্‌লোগ মুঝে মদৎ দেগা ত?

—'আলবৎ জী'।

— তব মেরা সাথমেঁ চলিয়ে।

আমাকে বলল — পথের চিহ্ন ধরে দু'মাইল হাঁটলেই আপনি লাখড়াকোটের মন্দির পাবেন। আমরা এখান থেকে মাইল তিনেক গেলেই কোরকাদের মহল্লায় পৌঁছব। সেখান থেকে লরী ধরব। আচ্ছা চলি।

নিজেদের সামান্য কিছু কাপড়, কম্বলের মধ্যে টাকার থলি এবং রূপার বাসন ভাল করে বেঁধে তারা তিনজন চলে গেল। শোভারামের স্বরূপ দেখে আমি আর একবার শিউরে উঠলাম। মনুষ্য চরিত্রের এই গহণ ও বীভৎস দিকটির সঙ্গে এর আগে আমার পরিচয় ঘটেনি। লোকটা কিভাবে এতকাল গুরুভক্ত সেজে কপট অভিনয় করে এসেছে! হয়ত ভারতের গুরুবর্গের শিষ্যসমাজে কোন কোন অভিসন্ধিপরায়ণ ধূর্তব্যক্তি এইরকমই বা শুধু গদীর লোভে গুরুর কাছে পড়ে থাকে !

শিবনারায়ণী সম্প্রদায়ের 'কর্তাপুরুষের' এই রকম শোচনীয় পরিণতি মনকে নাড়া দিয়েছে। দুখীরামের বিকৃত মৃতদেহের দিকে তাকানো যাচ্ছে না, চারদিকে তাদের ছড়ানো ছিটানো বোচকা বুচকি রান্না খাওয়ার বাসনপত্র লণ্ডভণ্ড হয়ে পড়ে রইল, উপরে শকুনির দল চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একে একে পাথরের উপর বসছে। জঙ্গলঘেরা এই পার্বত্য প্রান্তরে শ্মশানের দৃশ্য।

আমি আর দাঁড়ালাম না, পথের দাগ ধরে পশ্চিমমুখে হাঁটতে লাগলাম। অনুমান করলাম বেলা চারটা সাড়ে চারটা হবে। আমি হাঁটতে লাগলাম। আজ আবার একা হলাম। সন্ধ্যার আগেই লাখড়াকোটের মন্দিরে যাতে পৌঁছতে পারি, সেজন্য দ্রুততালে হাঁটতে চাইলাম কিন্তু সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শিথিল ও অবশ বলে মনে হচ্ছে। বুঝলাম, নিজের চোখের সামনে যে করুণ ও লোমহর্ষক কাণ্ড ঘটে গেল, তাতে আমার স্নায়ুর উপর চোট পড়েছে। দু'তিন ঘন্টার মধ্যেই সুস্থ ও তাজা মানুষটা দুর্বল হয়ে পড়েছি। কোন মতে পা দুটো টেনে টেনে হাঁটছি। খুব শীঘ্রই পুনরায় জঙ্গলের মধ্যে পা দিলাম, সন্ধ্যা না হলেও বনের মধ্যস্থলে যেন আবছা গোধূলি! ঝোলা থেকে আমার ছোট টর্চটা বার করে হাতে রাখলাম। গোধূলির সময় যেমন পথঘাট আবছা আবছা দেখা যায় সেইরকম পথ-ঘাট এখনও বনের মধ্যে দেখা যাচ্ছে। অনেকক্ষণ ধরে হাঁটলাম, শোভারাম বলেছিল সেই শ্মশান-প্রান্তর থেকে দু'মাইল হাঁটলেই লাখড়াকোটের মন্দির পাওয়া যাবে। প্রায় দু'ঘন্টা হাঁটা হয়ে গেল, এখনও কি দু'মাইল হাঁটা হয়নি? না — পথ ভুল করেছি? মনে ভয়ের সঞ্চার হল। বনের নানা প্রান্ত থেকে নানা বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। টর্চ টিপে টিপে পথ দেখে দেখে, বড় বড় পাথরের চাঙড় ও ঝোপ এড়িয়ে সাধ্যমত জোরে হাঁটতে লাগলাম। এক একটা সেগুন গাছকে মনে হচ্ছে তারা যেন অশরীরী প্রেতাত্মা অন্ধকারময় আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। টর্চের ব্যাটারী শেষ হল। আমি আর অন্ধকারে এগোতে সাহস করলাম না। একটা সেগুন গাছের গোড়ায় পাথরের উপর গাঁঠরীটা ফেলে দিয়ে বসে পড়লাম। গাছে পিঠ হেলিয়ে ইষ্টমন্ত্র স্মরণ করতে লাগলাম। মনের মধ্যে ভেসে উঠছে, দুখীরামের রক্তাক্ত দেহ , সেই হলুদ জ্যোতির ঝিলিক, 'সন্তজীকে পিঠে ফেলে নরখাদক হিংস্র বাঘের তড়িৎগতিতে পলায়ন ও হুঙ্কার। বীভৎস! বীভৎস! হতাশভাবে ভাবতে লাগলাম --- আমার নিজের পরিণতিও আজ রাত্রে কি দুখীরামের

মত হবে? না-না, তা হবে কেন? আমি সুমেরদাসজী প্রদত্ত মন্ত্রে লাঠি দিয়ে নিজের চারদিকে গণ্ডী টানলাম। মনে এল আমি গায়ত্রী জপ করি। যার মধ্যে গায়ত্রী জাগ্রত, তার কি কখন অপঘাতে মৃত্যু হয়? এইরকম পরিণতি অদৃষ্টে থাকলে আমাকে বাবা কি নর্মদা পরিক্রমা করতে বলতেন? রাত্রি বাড়ছে, গভীর রাত্রে অরণ্যের ভাষা মুখর হয়ে উঠে। মাঝে মাঝেই নানা শব্দ কানে ভেসে আসতে থাকল। রাত্রিচর কোন পাখীর ডাক শুনতে পেলাম। মিঠি সুর! দূর থেকে একটা কুলু-কুলু ধ্বনি কানে ভেসে আসছে — এ কি কোন ঝরণা? না — নর্মদার স্রোতধ্বনি? উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলাম, মনে হচ্ছে যেন বাঁ দিক থেকে ভেসে আসছে। আশ্চর্য সারাদিন দেহে মনে এত পরিশ্রম হয়েছে কিন্তু ঘুম আসছে না কেন? চোখ খোলা রেখেই আমি ধ্যানে ডুববার চেষ্টা করছি। এই অবস্থাতেই হয়ত আমি ক্ষণিকের জন্য তন্ময় বা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম, আমার অজ্ঞাতসারেই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল — হঠাৎ চোখে আলোর আভাস জাগল; কেউ যেন বলছে — বাচ্চা রোতে হ্যায় কেঁও? দেখো বেটি, এ লেড়কা পরিক্রমাবাসী হো। তাঁদের কণ্ঠস্বরে ধড়্‌ফড়িয়ে জেগে উঠলাম। দেখলাম — প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সের প্রৌঢ় এক হাতে মশাল, কাঁধে বিশাল ধনুক, আর এক হাতে বল্লম নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছেন; দ্রঢ়িষ্ট, বলিষ্ট পেশী-বহুল কালো মজবুত শরীর, পরিধানে কৌপীন, পাশেই তাঁর অষ্টাদশী কন্যা, রুক্ষ ধূসর আলুলায়িত চুল, বুকে হ্রস্ব ব্যাঘ্রচর্মের চোলি; নাভির নিচে খয়েরী রঙের খাটো ঘাগরা, হাতের শক্ত কব্জিতে মোটা কঙ্কণ, পায়ে আরো মোটা জুড়িমল; তার পিঠে বাঁধা তূণে কুড়ি পঁচিশটা লম্বা লম্বা তীর, বাম হাতে বল্লম আর ডান হাতে প্রজ্বলিত মশাল।

পিতাপুত্রীর মধ্যে যে ভাষায় কথা হল তা আমার হৃদয়ঙ্গম হল না। প্রৌঢ় মানুষটি আমার হাত ধরে উঠিয়ে তাঁদেরকে অনুসরণ করার ইঙ্গিত করলেন। মিনিট দশেক হাঁটার পরেই জঙ্গলের মধ্যে একটা বাঁক ঘুরতেই দূরে অনেকগুলি মশাল জ্বলছে দেখতে পেলাম। আশা ও আনন্দে আমার মন ভরে উঠল। পিতাপুত্রী সেই আলোর দিকে অঙ্গুলি সঙ্কেত করে এগিয়ে যেতে ইঙ্গিত করলেন। তাঁরা অন্য একটা দিকে বাঁক নিলেন। আমি দু'তিন মিনিট তাঁদের যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারা দ্রুত হাঁটছেন ঢালু পথে, তাঁদের হাতের মশাল দপ্‌দপ্ করে উঠা নামা করছে। আমি মনে মনে বলছি ভগবান নর্মদেশ্বর, তোমার 'বিপদ বারণ' নাম সার্থক। মশালের আলো অদৃশ্য হল কিন্তু সেই পথ থেকে ভেসে এল উদাত্ত ধ্বনি — হর নর্মদে হর। এই ত পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর। তাঁরা বোধহয় বিদায় জানিয়ে দূর থেকে সাহস দিচ্ছেন।

আমি মশালের আলো লক্ষ্য করে এগিয়ে যেতে লাগলাম, কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই জঙ্গলের মধ্যেই নর্মদার তীর ঘেঁসে একটা ফাঁকা জায়গায় দেখলাম বহু সাধুর ছাউনি। বিবস্ত্র নাগা সাধু এবং কৌপীন বা অল্পমাত্র বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করে কিছু ভীল জাতীয় লোক শুয়ে আছে। চারটা তাঁবু খাটানো হয়েছে। তাঁবুর বাইরে শুয়ে আছেন অন্ততঃ একশ জন মানুষ। ছাউনির চারদিকে ঘিরে বড় বড় মশাল জ্বলছে। ধুনি জ্বেলে কয়েকজন নাগা বসে আছেন ; হাতে তীর ধনুক নিয়ে প্রায় জনাদশেক ভীল চারদিক ঘুরে ঘুরে পাহারা দিচ্ছে। তাদের সঙ্গে লম্বা লম্বা ত্রিশূল হাতে কয়েকজন দীর্ঘদেহী নাগাও আছে। আমাকে দেখেই একজন ভীল এবং একজন ত্রিশূলধারী আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন। আমাকে

পরিক্রমাবাসী জেনে বললেন — রাত বারা বাজ গিয়া, আভি লেট জাইয়ে, সবেরে গুরুমহারাজ কা দর্শন মিলেগা। জান্ পহচান ভি আচ্ছি তরে হোঙ্গে। আমি লাখড়াকোটের মন্দিরটি কোথায় জানতে চাইতে হেসে বলতে লাগলেন — লাখড়াকোট্কী মন্দর বহুৎ দূরমেঁ আপ্ ছোড়কে আয়া। ইহ্ হ্যায় ভেটাখেড়াকী জঙ্গল, সবেরে ইধরকা শিউজীকো দর্শন করেগা। আপ রাস্তা ভুল কিয়া হোঙ্গে। এখানে কাছাকাছি কোন ভীল বা কোরকাদের মহল্লা আছে কিনা জানতে চাইতে বললেন — হম্ দো দফে পরিক্রমা করচুকা, হম্ আচ্ছিতরেসে জানতা হুঁ সাত আট মিলকা অন্দর কোই মহল্লা নেহি হ্যায়। চারো তরফ জঙ্গল হৈ। তিনি জলের ড্রাম দেখিয়ে দিলেন। প্রায় চারটা বড় বড় ড্রামে জল ভর্তি আছে। আমি হাত পা ধুয়ে সারি সারি নিদ্রিত নাগাদের শয্যার একপাশে শুয়ে পড়লাম, গাঁঠরী মাথায় দিয়ে। সমস্ত মাঠটায় বড় সতরঞ্চি পাতাই আছে। ঘুম আসতে দেরী হল না। ঘুমের মধ্যেই শুনতে পেলাম ঠিক যেন সেই পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর — হর নর্মদে হর। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। পাশের এক নাগা বললেন — ক্যা হুয়া, লেট যাও, আভি সুবা হোনেমে দের হ্যায়। আবার শুয়ে পড়লাম। আবার ঘুমের মধ্যে শুনতে পেলাম, সেই অপার্থিব ধ্বনি, পিতাপুত্রীর কণ্ঠস্বর — হর নর্মদে হর।

জেগে উঠে দেখি জমায়েতের সাধুরাও জেগে উঠেছেন। ভোর হয়ে গেছে। তাঁদের অধিকাংশই স্নান করে এসে গায়ে ভস্ম মাখছেন। মাথায় লম্বা বেণীর জটা খুলে তা শুকোবার জন্য ঝাড়ছেন ও মুছছেন। তাঁবু থেকে দূরে দেখলাম ইতিমধ্যেই কয়েকটি চুল্লী জ্বেলে প্রায় দশবারোজন নাগা 'রোটি' বানাচ্ছেন। একজন নাগাকে নর্মদার ঘাটটা কোনদিকে জিজ্ঞেসা করতেই তিনি একজন ভীলকে সঙ্গে দিলেন। একটু দূরেই নর্মদা, ঘাটের পাশেই মন্দির। আমি স্নান শৌচাদি সেরে মন্দিরে ঢুকে একটি কালো পাথরের উপর প্রায় তিনফুট লম্বা সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ দেখতে পেলাম। এ মন্দিরেও কোন দরজা নাই। আমি শিবের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করে এলাম ।

একজন নাগা এসে আমাকে বললেন — মোহান্ত মহারাজ আপ্‌কো তলব কিয়া। আমাকে সঙ্গে করে তিনি একটি তাঁবুর মধ্যে নিয়ে গেলেন। তাঁবুর মধ্যে জাজিম পাতা। একটা বড় রূপার ত্রিশূল দাঁড় করানো আছে। ত্রিশূল জড়ানো হয়েছে একটা লম্বা জটা দিয়ে. জটার মুখটা একটা সাপের ফণার মত। তার পাশেই আছে একটা রূপার থালায় ভস্ম বা বিভূতির সঙ্গে গিরিমাটি মাখিয়ে একটা বড় গোলা, দেখতে একটা এক নম্বর ফুটবলের মত। তা আবার চন্দন লিপ্ত। থালাতে চার পাঁচটা সোনার গিনিসহ দশবারটা রৌপ্যমুদ্রা। ধূপ জ্বলছে। পাশেই ভগবান দত্তাত্রেয় অবধূতের এক বিশাল তৈলচিত্র। তাঁর বিবস্ত্র বেশ।

আমার সঙ্গী নাগা তাঁবুতে ঢুকে সেই বিভূতির গোলকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। জোরে আওয়াজ দিলেন — গুরুজী, উহ্ বঙ্গালকা সাধুকো লে আয়া। তাঁবুর মধ্যেই একটা প্রকোষ্ঠ থেকে পক্ক জটার কুণ্ডলী মাথায়, এক দীর্ঘদেহী প্রায় সাড়ে ছফুট লম্বা গৌরবর্ণ ভস্মলিপ্ত সম্পূর্ণ উলঙ্গ সাধু হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালেন, তাঁর কোমরে মোটা লোহার শিকল, শিকলে লোহার আংটা ঝুলিয়ে লিঙ্গকে বিদ্ধ করা আছে। প্রথম দর্শনেই 'রঘুবংশে' মহাকবি কালিদাস, মহারাজ দিলীপের যে অঙ্গ সৌষ্ঠবের বর্ণনা করেছেন সেই শ্লোকটি মনে পড়ে গেল!

ব্যুঢ়োরস্কো বৃষস্কন্ধঃ শালপ্রাংশুর্মহাভুজঃ।
আত্মকর্মক্ষমং দেহং ক্ষাত্রোধর্ম ইবাশ্রিতঃ॥

দীর্ঘ সুঠাম বপু, প্রশস্থ ললাট, শালগাছের মত উন্নত মহাবাহু, বক্ষঃস্থল বিশাল, বৃযস্কন্ধের তুল্য স্কন্ধ বিশিষ্ট এই সাধুর ভীমকান্ত দেহ দেখে মনে হল, মূর্তিমান ক্ষাত্রধর্ম যেন আত্মকর্মক্ষম দেহ নিয়ে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আমি উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে অভিবাদন করলাম।

— বৈঠিয়ে বৈঠিয়ে সুমেরদাসজী আপকা বারেমেঁ বহুত কুছ বাতায়া হৈ। উনোনে হমারা দোস্ত হৈ। অমরকন্টকসে লোটনে কা বখৎ হমলোগ জলেরীঘাটমে ছাউনি ফেলা থা। উনোনে আপকা দেখভাল করনেকে লিয়ে বহুত বিনতি কিয়ে থে। লেকিন আপকো দর্শন নহী মিলা। পরমাত্মা অন্তঃমে আপকো মিলা দিয়া। এহি জমাত কো আপ আপনা সামঝো । হাম্‌সে যো কুছ হো, সেবা করনেমেঁ তৈয়ার হুঁ। সুমেরদাসজী আপকো বহুৎ পেয়ার করতা হ্যায়, মালুম হুয়া। হমারা সংগত কো আপ্ বেদ শোনায়েগা। বেফিকর আপ রহো। চব্বিশ অবতার মেঁ হমারা আস্তানা হৈ। উধর যা কর্ হাম্‌লোগ পরিক্রমা সমাপ্ত করেঙ্গে।

তিনি আসন পরিগ্রহ করলেন। তাঁর এক শিষ্য এসে রূপার গ্লাসে এক গ্লাস সরবৎ দিয়ে গেলেন। আমাকে বললেন — ভাঙ হ্যায়। বিভূতি-নারায়ণকি পরসাদী।

বিভূতি-নারায়ণ বলতে তিনি শিব না নারায়ণকে বুঝাচ্ছেন তা আমি বুঝতে পারলাম না। আমাকে প্রশ্ন করতে হল না, তিনি নিজেই বলতে লাগলেন — আমরা দত্তাত্রেয় ভগবান প্রবর্তিত নাগা। অবধূতজীর গায়ের ভস্ম আমাদের সম্প্রদায়ে গুরুপরম্পরা ক্রমে রক্ষিত হয়ে আসছে। সেই ভস্ম দিয়েই ঐ গোলাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। যুগযুগ ধরে ঐ বিভূতি গোলাই উপাস্য দেবতা হিসাবে পূজিত হয়ে আসছে। ওঁকেই আমরা বলি বিভূতি নারায়ণ। আমাদের নাগারা যখন বিভিন্ন স্থানে ভিক্ষা করতে যায় তখন এই রকম বিভূতি-নারায়ণ সঙ্গে থাকে। শহর ও গ্রামের ভক্তরা সেই বিভূতির গোলায় ভিক্ষা সমর্পণ করে। সাধারণত স্বর্ণমুদ্রা বা রজতমুদ্রা ছাড়া গোলার থালায় সরাসরি কাউকে ভিক্ষা দিতে দেওয়া হয় না। অন্যান্য ভিক্ষাসামগ্রী নাগারা ঝোলায় গ্রহণ করে। যারা বিভূতি-নারায়ণের থালায় ভিক্ষা দেবার সুযোগ পায়, ভগবান দত্তাত্রেয়ের আশীর্বাদে তাদের সর্বকামনা সিদ্ধ হয়।

এইসময় দেখলাম, একে একে এসে নাগারা এসে বিভূতি-নারায়ণের উপর নানারকম বনফুল দিয়ে পুজা করে মোহান্ত মহারাজকে প্রণাম করে যেতে থাকল।

আমি এক ফাঁকে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — আমি কাশীতে মহানির্বাণী মঠ এবং নিরঞ্জনী আখড়া দেখেছি। জুনা আখড়া ও নির্মলী আখড়ার নাগাদেরকেও দেখেছি। প্রত্যেক আখড়ার মধ্যে গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীও যেমন আছেন তেমনি বিবস্ত্র নাগাও আছেন। মুসলমানরা যখন হিন্দু যাত্রীদের উপর নানারকম অত্যাচার চালাত, তা রুখবার জন্য আচার্য মধুসূদন সরস্বতী ত্রিশূল ও তরবারিধারী একদল যুদ্ধবিশারদ নাগাদল (Hindu Military force) সৃষ্টি করেছিলেন। আপনারা কি সেই নাগা সম্প্রদায়, না — নির্বানী বা নিরঞ্জনী আখড়ার শাখা?

— আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি আমরা দত্তাত্রেয় অবধূতের শাখা। নির্বানী ও নিরঞ্জনী আখড়ার নাগারাও দত্তাত্রেয় ভগবানকে মানেন এবং আমাদের মতই বিভূতি-নারায়ণের পূজা করেন বটে ; তবে ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখতে পেতে পরস্পরের পূজিত বিভূতি নারায়ণের Shape এবং size-এ তফাৎ আছে। নিরঞ্জনী সম্প্রদায়ের নাগাদের গোলা

আমাদের মতই গোলাকার, তবে আমাদের চেয়ে ছোট আর নির্বানী আখড়ার বিভূতি নারায়ণের আকার চতুষ্কোণ। আমাদের সম্প্রদায়ের নাম 'নাগা পহ্‌রে নাগফণী'। সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। নির্বানী ও নিরঞ্জনী আখড়ার নাগারা উগ্রস্বভাব, কলহপ্রিয়। তারা জবরদস্তি ভিক্ষা আদায় করে। কিন্তু আমাদের সম্প্রদায়ের নাগারা শৃঙ্খলাপরায়ণ। তাছাড়া আমাদের সঙ্গে তাঁদের জটারও তফাৎ আছে। জটা সাধারণতঃ তিনপ্রকার — নাগজটা, শম্ভুজটা এবং বারবান্। আমরা নাগফণী সম্প্রদায়ের নাগা। আমার জটার দিকে লক্ষ্য করে দেখ, দড়ির মত পাকান সর্পাকৃতির জটা আমরা ধারণ করি। যে জটা এইরকমভাবে পাকান নয় তার নাম — শম্ভুজটা। শম্ভুজটা ছোট হলে তাকে বারবান্ বলা হয়। নির্বানী, নিরঞ্জনী, নির্মলী এবং জুনা আখড়ার নাগারা শম্ভুজটা বা বারবান্‌জটা ধারণ করে। আমাদেরকে আগে সন্ন্যাস গ্রহণ করতে হয়, তারপর সেইসব সন্ন্যাসীদের মধ্যে যাঁরা কষ্টসহিষ্ণু ও তপস্বী স্বভাবের হন, তাঁরাই দীক্ষাগুরু ত্যাগ করে নাগাগুরুর কাছে দীক্ষা নিয়ে নাগা হন। এই ব্যাপারটাকে আমরা গুরুপক্ষ ত্যাগ করে দেবপক্ষ গ্রহণ বলে থাকি। দেবপক্ষ গ্রহণ করার পর আমাদেরকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র হতে হয়। সেসময় উগ্র ঠাণ্ডা বা উগ্র গরমের মধ্যে একমাসকাল সম্পূর্ণ ফাঁকা মাঠে বাস করতে হয়। ঐ সময় কোনমতেই কোন মঠ, বাড়ী বা গুহাতে বাস করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

এই সময় একজন নাগা এসে মোহান্তজীকে পূজা করার সময় হয়েছে নিবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি উঠে পড়ে সেই জটা-বেষ্টিত রূপার বিশাল ত্রিশূলটি কাঁধে নিয়ে নর্মদাঘাটের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করলেন। একসঙ্গে অনেকগুলো তুরী, ভেরী, শিঙা বেজে উঠল। প্রায় পনেরজন নাগা তাঁর অনুগমন করলেন। আমিও কৌতূহল বশে তাঁদের সঙ্গে চলতে লাগলাম। মোহান্তজী মন্দিরে ঢুকে তাঁর ত্রিশূলটি শিবলিঙ্গে স্পর্শ করে স্তব করতে শুরু করলেন। অপর নাগারাও তাঁর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে সেই স্তব উদাত্তকণ্ঠে একই ছন্দে এবং সুরে গাইতে লাগলেন —

ওঁ কপর্দিন! সর্বভূতেশ ! ভগনেত্রনিপাতন!
দেবদেব ! মহাদেব ! নীলগ্রীব ! জটাধর !
কারণানামপি পরং জানে ত্বাং এ্যম্বকং বিভূন্।
দেবানাঞ্চ গতিং দেব! তৎপ্রসূতমিদৎ জগৎ।।
অজেয়স্ত্বং ত্রিভির্লোকৈঃ সদেবাসুরমানুষৈঃ।
শিবায় বিষ্ণুরূপায় বিষ্ণবে শিবরূপিণে।
দক্ষযজ্ঞবিনাশায় হরিভদ্রায় বৈ নমঃ।।
ললাটাক্ষায় শর্বায় মীঢুষে শূলপাণয়ে।
পিণাকগোত্রে সূর্যায় মঙ্গল্যায় চ বেধসে।।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্! সর্বভূতমহেশ্বর !
গণেশং জগতঃ শম্ভুং লোককারণ কারণং।।
প্রধান পুরুষাতীতং পরং সূক্ষ্মতরং হরম্।
ব্যতিক্রমং মে ভগবন্ ! ক্ষন্তুমর্হসি শঙ্কর!
ভগবদ্দর্শনাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্তোহহস্মীমং মহাগিরিম্
দয়িতং তব দেবেশ! তাপসালয়মুত্তমম্।।

প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবন্ ! সর্বলোক নমস্কৃতম্।
ন মে স্যাদপরাধোহয়ং মহাদেবাতিসাহসাৎ॥
কৃতো ময়া যদজ্ঞানাদ্বিমর্দ্দোহয়ং ত্বয়া সহ
শরণং সম্প্রপন্নায় তৎ ক্ষমস্বাদ্য শঙ্কর॥

অর্থাৎ হে মহাদেব! তুমি জটাজূটধারী, সমস্ত প্রাণীর অধীশ্বর, তৃতীয় নয়ন দিয়ে তুমি মদনকে ভস্ম করেছ। হে নীলকণ্ঠ ! তুমি দেবতাদেরও দেবতা। আমি জানি তুমি ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্তাদের মধ্যে প্রধান, ত্রিলোচন, সর্বব্যাপক, দেবগণেরও গতি এবং এই জগৎটা তোমারই সৃষ্টি।

দেবদানব মুনষ্য সমন্বিত হে অজেয় পুরুষ! তুমি একাধারে বিষ্ণুরূপী শিব এবং শিবরূপী বিষ্ণু; দক্ষযজ্ঞ বিনাশকারী হে বীরভদ্র ! তোমাকে প্রণাম করি। তুমি ললাটনেত্র অর্থাৎ মহাযোগীদের ধ্যানলভ্য তৃতীয় নেত্রস্বরূপ, জগতের সৃষ্টি ও সংহারকর্তা, শূলপাণি, পিনাকধনুর্ধারী, সূর্যস্বরূপ, মঙ্গলময় এবং বিধাতা। তোমাকে পুনরায় প্রণাম করি।

ভগবন্! মহেশ্বর! তুমি প্রমথদের অধিপতি, জগতের মঙ্গলবিধানকারী; সৃষ্টিকর্তাদেরও সৃষ্টিকর্তা, প্রকৃতি পুরুষের অতীত; শ্রেষ্ঠদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ, পরমসূক্ষ্ম তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ ; হে দয়াল ! তুমি প্রসন্ন হও ; আমি যে অপরাধ করেছি, তা নিজগুণে ক্ষমা কর। দেবাদিদেব। আমি তোমারই দর্শনাকাঙ্ক্ষী হয়ে তপস্বীদের উত্তম আশ্রয়, তোমার প্রীতিপদ এই মহাপর্বতে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভগবন্! তুমি সমগ্র জগতের দ্বারা নমস্কৃত পুরুষ, তুমি কৃপা কর, প্রসন্ন হও, আমি যে তোমার দর্শনালাভের জন্য দুঃসাহস দেখিয়েছি, তাতে আমার কোন অপরাধ নিও না প্রভু।

আমি তোমার শরণাগত। সুতরাং আমি যে সংঘর্ষ করেছি অর্থাৎ যে পথে ইষ্টসিদ্ধি হয়, সে পথে না গিয়ে বিপরীতে মার্গে এতকাল ভ্রমণ করেছি, তার জন্য আমার অপরাধ মার্জনা কর, ক্ষমা কর।

স্তবপাঠ শেষ হলে মোহান্তজী নতমস্তকে দু'মিনিটকাল দাঁড়িয়ে থাকলেন, তাঁর দুচোখে বেয়ে বিন্দু বিন্দু অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ছে। নাগা ভক্তরা জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন —

হর নর্মদে হর। নর্মদা মাতাকী জয় হো।
বিভূতি-নারায়ণকী জয় হো॥
নর্মদাতটবাসী সাধুয়োঁকী জয় হো।
বিশ্বকী কল্যাণ হো॥

এই বিচিত্র পদ্ধতিতে পূজা শেষ করে মোহান্ত মহারাজ সেই নাগজটা সমন্বিত ত্রিশূলটি কাঁধে নিয়ে তাঁবুর দিকে ফিরলেন। আমাকে মৃদু কণ্ঠে জানালেন — এই যে স্তব শুনলে এইটি সিদ্ধমন্ত্র।

অর্জুন হিমালয়ে তপস্যা করতে গিয়ে ইন্দ্রকাল পর্বতে যখন কিরাতবেশী মহাদেবের দর্শন পান, তখন তিনি এই স্তবেই ভগবানের আরাধনা করেছিলেন। মহাদেব তুষ্ট হয়ে অর্জুনকে দিব্য পাশুপত অস্ত্র দান করেছিলেন। মহাভারতের বনপর্বে পঁয়ত্রিশ অধ্যায়ে এই মন্ত্র পাবে। ভগবান দত্তাত্রেয় আমাদের নাগফণী সম্প্রদায়ে এই স্তবের প্রবর্তন করে গেছেন। নির্বানী নিরঞ্জনী প্রভৃতি নাগাদের আখড়ায় এই স্তব পাঠের প্রচলন নাই। এটি আমাদের

সম্প্রদায়ের নিজস্ব জিনিষ। এই মন্ত্র তেজ-বীর্যের সাধনা, অর্জুন যেমন সিদ্ধকাম হয়েছিলেন, তেমনি সকলের পক্ষেই এই মন্ত্র সিদ্ধিপ্রদ।

তাঁবুতে ফিরে আসতেই ভোজন পর্ব সুরু হল। রুটি পুরী ঘৃতসিক্ত অড়হর ডাল, কড়াই প্রসাদ প্রভৃতি এই ভোজন তালিকার অন্তর্ভুক্ত। ভোজনের শেষে মোহান্ত মহারাজ হুকুম দিলেন — কৌপীন বাঁধো, ছাউনি উঠাও। সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যদের মত তৎপরতায় তাঁবুর আসবাবপত্র বাঁধা ছাঁদা সুরু হয়ে গেল মিলিটারী ডিসিপ্লিনে, সবাই লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে এক টুকরো করে কৌপীন কোমরে জড়িয়ে ফেললেন। পথে চলার সময় নাগা সাধুরা মন্ত্রপাঠ করে এই কৌপীন পরেন। মন্ত্রটি হল —

ওঁ গুরুজী বন্ধকর, বন্ধকর, বজ্রকর বজ্রকর।
না মরে যোগী না পড়ে ফন্দ, চৌষট্ যোগিনী খেলৈ ছন্দ।
সাতকা ধাগা সন্তোষকী কৌপীন, নাগা-পহরে নাগফণী হনুমান বাঁধে লেঙ্গোট।
বালগোপাল কৌপীন্ বাঁধে অনন্তকোট্ সিদ্ধাকী ওট্।।

শিঙা, ভেরী ও তুরী বাজাতে বাজাতে যাত্রা সুরু হয়ে গেল। প্রায় দেড়শ নাগা সাধুর সঙ্গে পঞ্চাশ জন ভীল কুলি। যখন লাইন দিয়ে সবাই কৌপীন বাঁধেন তখন গুনেছিলাম প্রায় ত্রিশ জনের কোমরে মোহান্তজীর মত মোটা শিকল এবং একই রকম ভাবে লোহার আংটায় লিঙ্গ বিদ্ধ। প্রায় প্রত্যেক নাগাসাধুই দীর্ঘদেহী, প্রত্যেকের হাতেই চিমটা ও বড় ত্রিশূল; প্রত্যেকেরই মাথায় বড় বড় জটাকে কুণ্ডলী করে জড়ানো আছে। দূর থেকে দেখলে মনে হবে নর্মদাতটে একদল রেজিমেন্ট বা যোদ্ধদল চলেছে অভিযানে। নর্মদার তট ঘেঁষে রাস্তা চলে গেছে, সেগুন, বুনোনিম, অগস্তি গাছের জঙ্গল, সেই একই রকম পাথরের চাঙড়। বেলা বারটায় আমরা যাত্রা করেছিলাম, বেলা তিনটার সময় আমরা সাকলখেড়া নামক একটা জঙ্গলে এসে পৌঁছলাম। বড় বড় গাছ, নানা রকম কাঁটা গাছ ও লতা পাতা এমন জড়াজড়ি করে আছে যে সূর্যের আলো খুব ক্ষীণভাবে সেখানে এসে পড়েছে। এই ঘন বনে ঢুকবার আগে একজন প্রবীণ নাগা উচ্চৈঃস্বরে চিৎকার করে উঠলেন — হুঁশিয়ার। হুঁশিয়ার। একসঙ্গে পঞ্চাশ ষাটটা তুরী ভেরী শিঙা বেজে উঠল। একদল বুনো কুকুর এবং শিয়ালের ডাক শোনা গেল। তুরী ভেরীর আওয়াজ ছাপিয়ে বহুদূর হতে ভেসে এল বাঘের গর্জন। বাঘ দূরেই থাক আর কাছেই থাক আজ আমার মনে কোন ভয়ের সঞ্চার হল না। একদল অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত নাগা ও ভীলদের মধ্যে থাকায় নিজেকে খুবই নিরাপদ বলেই মনে হল। নাগাদের মিছিলও এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়াল না। আর যাই হোক, এ জঙ্গলকে ত আর লাখড়াকোটের জঙ্গলের মত অন্ধকারময় এবং দুষ্প্রবেশ্য বলে মনে হচ্ছে না। এখানে জঙ্গল যতই ঘন হোক না কেন, এখানে ত আলোর আভাস জেগে রয়েছে। প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর ঐ ঘন বনটা পেরিয়ে অপেক্ষাকৃত পাতলা বনে ঢুকলাম। এখানে দেখছি ময়ূরেরই রাজত্ব। এত মানুষের পদশব্দ এবং চিমটার আওয়াজে ময়ূর ও অন্যান্য পাখীরা ভয় পেয়ে উড়ে পালাল। একটু পরেই ফাঁকা প্রান্তরে এসে পড়লাম। কোমরের শেকলে ঝোলানো একটি সোনার পকেটঘড়ি দেখে মোহান্তজী বলে উঠলেন — ছ' বাজনেসে ঔর পন্দর্ মিনট বাকী হ্যায়। আভী বস্ করোজী, আজ রাতনেঁ ইধরই ঠারেঙ্গে। সবেরে পাঁচ মিল জানেসে পেমগড়মেঁ পৌঁছ জাবেগা। আভি রুকো। মোহান্তজীর হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই মাথা ও কাঁধের বোঝা ফেলে সেই

পার্বত্য প্রান্তরে বসে বিশ্রাম করতে লাগলেন। মোহান্ত মহারাজ কোন তাঁবু খাটাতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ চৈত্রমাস শেষ হয়ে আসছে , গরম পড়েছে , সেই ফাঁকা প্রান্তরে সকলের সঙ্গে তিনি শুয়ে থাকতে চাইলেন। কিন্তু কয়েকজন প্রবীণ নাগা সাধু তা হতে দিলেন না। শুধু তাঁর জন্যই একটি তাঁবু খাটানো হল। তাঁবুর মধ্যে কেবল সেই ত্রিশূল ও বিভূতি-নারায়ণ তথা ভস্মের গোলাসহ তাঁরই শোবার ব্যবস্থা হল। কয়েকজন ভীল কুড়ুল টাঙি দিয়ে সেগুন গাছের ডাল কেটে চারদিকে সেগুলি পুঁতে দিয়ে মশাল জ্বালাল। কয়েকজন নাগার সঙ্গে গিয়ে নর্মদাতে স্নান করে এলাম। বড় সতরঞ্চি পেতে যে যার আসন পাতলেন, আমিও আসন বিছালাম। আধঘণ্টা ধরে শিঙা ও ভেরী বাজিয়ে বিভূতি-নারায়ণের আরতি ও স্তব করা হল। মোহান্ত মহারাজ তাঁবুর ভিতরে ঢুকে যেতেই গাঁজার আসর বসে গেল। প্রতি প্রহরে চারজন করে পাহারা দিবার ব্যবস্থা হল। প্রায় ঘন্টাখানিকের মধ্যে পাহারাদাররা ছাড়া আর সবাই শুয়ে পড়লেন।

বিজন কান্তারে মুক্ত আকাশের তলায় এইরকমভাবে রাত্রিযাপনের অভিজ্ঞতা পরিক্রমাকালে এই প্রথম ঘটল। এতদিন যে আমি পরিক্রমা করছি প্রায় সর্বদিনই নর্মদাতটের কোন না কোন শিবমন্দিরে আশ্রয় পেয়েছি। শুয়ে শুয়ে আকাশের তারার দিকে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইলাম। বাবার কথা ভাবতে লাগলাম। বিচার করতে লাগলাম যে বৈদিককাল হতে এই যে নর্মদা-তপস্যার কথা চলে আসছে, এ কি শুধু একটি বিশিষ্ট জলধারার গতিপথকে তার উৎপত্তিস্থল হতে সঙ্গমস্থল পর্যন্ত কোনমতে পরিক্রমা মাত্র? না — এর মধ্যে তপস্যারও কিছু আছে? পরিক্রমাবাসীদের তপ জপ ও বিভিন্ন সাধুসঙ্গ ও নূতন নূতন জ্ঞানলাভ ছাড়াও এতে যে বিরুদ্ধ পরিবেশের মধ্যে পড়ে স্বতঃই যে সম দম ত্যাগ তিতিক্ষা হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল দুর্গম অরণ্যের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে প্রতিপদে যে ঈশ্বর নির্ভরতা বাড়ছে সঙ্কটকালে যখন দিশেহারা হয়ে পড়ছি, নিজেকে একান্ত অসহায় ভাবছি, তখন যেভাবে আচম্বিতে অভাবনীয়ভাবে রক্ষা পাচ্ছি, হঠাৎ হঠাৎ যেভাবে দরদী সঙ্গী ও সাথীরা জুটে যাচ্ছেন তাতে স্পষ্টতই মনে হচ্ছে কেউ যেন আড়ালে থেকে রক্ষা করছেন। যেহেতু নর্মদা পরিক্রমা করছি, তাই যেন কেবলই মনে হচ্ছে নর্মদামাতা রক্ষা করছেন, নর্মদেশ্বর শিব রক্ষা করছেন। এই শরণাগতির ভাবটাই এই তপস্যার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি।

কিছুক্ষন বসে জপ করলাম। তারপর কখন যে শুয়েছি এবং ঘুমিয়ে পড়েছি, আমার মনে নাই। স্বপ্ন দেখছি, আমার শিয়রের কাছেই একটা তুবড়ীর আলোর মত আলো জ্বলে উঠল। আলোর ঝরণা ক্রমে উর্ধ্বগামী হচ্ছে, আলোর ফোঁটাগুলো ঝরে পড়ছে আমার মাথায়, কপালে, নাকে মুখে, বুকে ও নাভিতে। ফোঁটাগুলো নিভছে না, আমার সারা শরীরের উপর আলোর ফুল ফুটে উঠেছে যেন। আলোর শিখা আরও উর্ধ্বগামী হচ্ছে। আকাশ ভেদ করে উঠে যাচ্ছে সেই শিখা। তুবড়ীটা যেন ফেটে গেল প্রচণ্ড শব্দে। লক্ষ যোজন দূরে আকাশের অনেক অনেক উপরে শোনা যাচ্ছে — ওঁ ওঁ ওঁ।

আমি জেগে উঠলাম। কিন্তু চোখ খুলতে পারছি না। অনেকক্ষণ পরে চোখ মেলে তাকাতে পারলাম। পূব আকাশে শুকতারা জ্বলজ্বল করছে। এখনও চারদিক অন্ধকারে ঢেকে থাকলেও বুঝতে পারলাম ভোর হয়ে আসছে। উঠে বসলাম।

পাহারাদার বদল হয়েছে। তাঁরা ত্রিশূল হাতে ধীরে ধীরে পায়চারী করছেন। বনের মধ্যে

বন্য মোরগ ডেকে উঠল। হঠাৎ বনের মধ্যে ঝড়্ ঝড়্ শব্দে কয়েকটা বণ্য জন্তু দৌড়ে গেল যেন। মুহূর্তের মধ্যে চারজন নাগার হাতে চারটা বড় বড় টর্চ একসঙ্গে জ্বলে উঠল। তারা দেখলেন, আমিও দেখতে পেলাম সাত-আটটা নেকড়ে বাঘ আমাদেরকে ঘিরে ধরেছে, তাদের চোখগুলো জ্বলছে। কেবল মশালের আলো দাউ দাউ করে জ্বলছে বলে তারা কারও উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে নি। পলকের মধ্যে দুজন ভীল নেকড়ের দিকে সাঁই সাঁই শব্দে তীর ছুঁড়ল। অব্যর্থ লক্ষ্য। তন্দুর বিষ মাখানো তীর দুটো নেকড়ের গায়ে বিঁধলো। গোঁ গোঁ করে আর্তনাদ করতে লাগল দুটো নেকড়ে আর বাকীগুলো হুড়মুড় করে দৌড়ে পালাল। মোহান্তজী তাঁবুর মধ্য থেকে হাঁক পাড়লেন — ক্যা হুয়া ?

একজন নাগা উত্তর দিলেন — হুড়াল বা।

একে একে সবাই জেগে উঠলেন। তুরী, ভেরী, শিঙ্গা বেজে উঠল। এবার মঙ্গল আরতি হবে বিভূতি-নারায়ণের। আরতির পরে সবাই প্রাতঃকৃত্য করতে গেলেন। যাত্রাদলে সাজপোষাকের বাক্সের মত এই জমায়েতের সঙ্গে বাক্স পেঁটরা কম নাই। গতকাল থেকেই সব বাঁধা ও গুছানো আছে। তাঁবুটা গুটিয়ে সতরঞ্চি প্রভৃতি বাঁধা হয়ে গেল। সকাল সাতটা নাগাদ আবার যাত্রা সুরু হল। তুরী, ভেরী, শিঙ্গা বেজে উঠল। সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ সৈন্যদের মতই মার্চ করে চলেছেন দুর্ধর্ষ নাগাসাধুর দল। প্রায় পাঁচশ গজ হাঁটার পর একজন ভীল দেখতে পেল সেই তীরবিদ্ধ দুটো নেকড়ে একটু দূরে পাথরের গায়ে মুখ গুঁজে পড়ে আছে। মারাত্মক তন্দুর বিষ মাখানো তীরের ঘা সহ্য করেও এই দুটো প্রাণী এতদূর দৌড়ে আসতে পেরেছিল, এইটাই আশ্চর্য। দুদিন আগে লাখড়াকোটের প্রান্তরে দেখে এসেছি, দুখীরামের রক্তাক্ত মৃতদেহ, এখানে ভেটাখেড়ার জঙ্গল পেরিয়ে দেখতে পেলাম তীরবিদ্ধ রক্তাক্ত দুটো হিংস্র নেকড়ের মৃতদেহ। নিরীহ দুখীরামকে হত্যা করেছিল রক্তখেকো বাঘ আর এখানে রক্তখেকো নেকড়েকে খতম করেছে মানুষ। প্রকৃতির রাজ্যেও প্রতি ক্রিয়ারই সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে ! To every action there is an equal and opposite reaction-এ যুগের ঋষিপ্রতিম নিউটনের এই উপলব্ধি সর্বৈব সত্য।

এবারে জঙ্গলের মধ্যে চড়াই সুরু হল। নাগাদের জমায়েৎ (শুধু নাগাদের জমায়েৎ বা বলছি কেন, আমাদের জমায়েৎ বলাই ঠিক হবে, কারণ দলে ত আমিও আছি!) ধীরে ধীরে 'চড়াই-এর পথে উঠে এল, নর্মদার জলস্রোত থেকে প্রায় পাঁচ ছয়শ ফুট উঁচু দিয়ে চলছি আমরা। সূর্যের আলো ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। নিচের দিকে তাকিয়ে অনেক কষ্টে গাছপালার ফাঁক দিয়ে নর্মদাকে দেখতে হচ্ছে। একপাল নীল গাই চরে বেড়াচ্ছে দেখতে পেলাম। আমাদের পথের প্রায় পঞ্চাশ ফুট নিচ দিয়ে একপাল বন্য বরাহ ছুটে গেল। নাগারা শিঙা ও ভেরীর আওয়াজ তুললেন। সেই শব্দে বরাহগুলো পড়ি কি মরি করে দৌড়ে পালাল। পরিক্রমাকারী নাগারা জানেন কোথায় নীরবে কোথায় সরবে হাঁটতে হবে। চড়াই পথে প্রায় আধঘন্টা হাঁটার পর উৎরাই সুরু হল। আমরা ক্রমে নর্মদার সন্নিকটস্থ পার্বত্যপথে এসে পৌঁছলাম। আজ আমরা দেখতে পেলাম একদল কৃষ্ণসার মৃগ। নর্মদার বিস্তার যেন ক্রমেই বাড়ছে। বেলা সাড়ে নটায় আমরা পেমগড় এসে পৌঁছে গেলাম। তটের ধারেই বিশাল শিবমন্দির। মন্দিরের পিছনেই বিশাল প্রান্তর। সেগুন, সাজা, বেল ও নিমগাছ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। এখানে কিছুকাল আগে বোধহয় কোন বড় জমায়েৎ এসে ছাউনী ফেলেছিল! যত্রতত্র নির্বাপিত ধূনির চিহ্ন, ছাই এবং আধপোড়া কাঠ পড়ে আছে। মোহান্তজী জানালেন

— আজ ঔর কাল দোরোজ হমলোগ্ ইধরই ঠারেঙ্গে। আচ্ছিতরেসে ইন্তেজাম করো। কাল গুরুজীকা জনম তিথি হ্যায়। ইহ পেমগড় মেঁ প্রেমিক-পুরুখ কা পূজা করনেসে আচ্ছাই হোগা। এইবলে তিনি একজন নাগাকে কাছে ডেকে বললেন — কেয়া কোঠারীজী, আপকা পাশ জো সামান হ্যায়, উসিমেঁ দোরোজ চলেগা ? নেহি ত সদাবর্তসে মাগানে হোগা। কোঠরী অর্থাৎ তাঁর আশ্রমের কোষাধ্যক্ষ জানালেন — ভগবন্। আপকা জমায়েৎ মে কোঈ চিজকা কমি নেহি হ্যায়। সদাবর্তসে কোঈ চিজ লেনেকা জরুরৎ নেহি। দো রোজকা বাদ হমলোগ্ ত চব্বিশ অবতারমেঁ আপনা আস্থান মেঁ চলা জায়েগা। এঁদের কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু অন্যান্য নাগারা বসে নেই , তাঁবু খাটানোর কাজ সুরু হয়ে গেছে। রান্না, কাঠ কাটা, ধূনির ব্যবস্থা, তাঁবু খাটানো, সতরঞ্চি পাতা, জল আনা, পূজার ফুল সংগ্রহ — প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি কাজের দায়িত্ব এক এক দলের উপর সুষমভাবে ন্যস্ত আছে বলে এরা সব কাজ তৎপরতার সঙ্গে অতি দ্রুত সেরে ফেলতে পারেন। চোখের সামনে দেখলাম, এক ঘন্টার মধ্যে সব সাজানো গোছানো হয়ে গেল।

আমি মোহান্তজীর অনুমতি নিয়ে নর্মদায় স্নান করতে গেলাম। একে একে নাগারাও এসে স্নান ও মন্ত্রপাঠ করে গেলেন। মন্দিরে দেখলাম, দশ বারোজন লোক পূজা করতে এসেছেন। এখানে সদাবর্ত আছে, আগেই শুনেছি, এই লোকগুলিকে দেখে বুঝলাম — এই অঞ্চলটা জনমানবশূন্য নয়। স্নান-তর্পণাদি সেরে, মন্দিরে পূজা করতে ঢুকলাম। প্রায় তিনফুট উঁচু সাদা পাথরের শিবলিঙ্গ। যাঁরা পূজার্থী, তাঁদের মধ্যে একজন জানালেন — মহাদেওজীকা নাম পেমেশ্বর অর্থাৎ প্রেমেশ্বর। প্রাণভরে পূজা জপ সেরে ফিরে আসব ভাবছি, এমন সময় শিঙা ভেরী বেজে উঠল। বুঝলাম, মোহান্তজী আসছেন পূজা করতে। সেই নাগফণী জড়িত রূপার ত্রিশূলটি নিয়ে মোহান্তজী সেই একই পদ্ধতিতে শিবলিঙ্গে ত্রিশূল ঠেকিয়ে মহাভারতোক্ত সেই অর্জুনকৃত শিবস্তব পাঠ করলেন। মোহান্তজীর সঙ্গেই ফিরে এলাম। রন্ধনপর্ব চলছে, খেতে দেরী হবে, তাই ভাঙ-এর সরবত সকলেই খাচ্ছেন। দশজন নাগা সিদ্ধি বেটে সরবৎ করতে ব্যস্ত। মোহান্তজী তাঁবুর ভিতরে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি সিদ্ধি খেতে রাজী না হওয়ায় তিনি আমাকে লাড্ডু খেতে দিলেন। আমাকে বললেন — সুমেরদাসজী পঁহুছে হুয়ে মহাত্মা হ্যায়। হম্‌লোগ অলগ্ অলগ্ সম্প্রদায় কি হ্যায়, লেকিন দোনো দোস্ত একই গাঁওমে পয়দা হুয়া। উনকা পাশ আপনে দীকছা লিয়া?

আমি বললাম — আমার বাবাই আমার দীক্ষাগুরু, শিক্ষাগুরু এবং ইষ্টদেবতা। ১৯৪৯ সালে আমি বাবার হুকুমে অমরকন্টক যাই, তখন বিলাসপুরে নেমে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় ঘটে। সেই থেকে তিনি আমাকে ভালবাসেন। তাঁর এই অহৈতুকী ভালবাসার কারণ আমার জানা নাই।

— তুমি আসন মুদ্রা যোগক্রিয়াদি জান কি ? নৌলী, ধৌতি, কপালভাতি, যোনিমুদ্রা, মহামুদ্রাদি হঠযোগের প্রক্রিয়া না জানলে যোগে উন্নতি করা যায় না। বিশেষতঃ সমাধিলাভ করতে হলে খেচরীমুদ্রা আয়ত্ত করা বিশেষভাবে প্রয়োজন। এই বলে তিনি একজন নাগাকে ডেকে খেচরীমুদ্রা দেখাতে বললেন। তিনি তাঁর জিহ্বা কণ্ঠকূপের মধ্যে আলজিহ্বার উপর দিয়ে চালিয়ে হাঁ করে তা দেখালেন।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, জিহ্বার ঐ অবস্থা স্বাভাবিকভাবে ধ্যান বা মন্ত্র জপের দ্বারা হয়েছে? না — মর্দন দোহন ছেদনাদি দ্বারা বহুদিনের পরিশ্রমের ফলে হয়েছে।

— খেচরীমুদ্রায় সিদ্ধ হতে হলে ছেদন, দোহন ও মর্দনক্রিয়া অপরিহার্য। যোগশাস্ত্রে আছে —

জিহ্বাধো নাড়ীং সংছিন্নাং রসনাং চালয়েৎ সদা।
দোহয়েন্নবনীতেন লৌহযন্ত্রেণ কর্যয়েৎ॥
এবং নিত্যং সমব্যাসাল্লম্বিকা দীর্ঘতাং ব্রজেৎ।
যাবদ্গচ্ছেৎ ভ্রুবোর্মধ্যে তদা গচ্ছতি খেচরী॥

অর্থাৎ জিহ্বার নিম্নভাগের সঙ্গে মুখগহ্বরের মধ্যে নিচের দিকে যে শিরা সংলগ্ন আছে তা ছেদন করে জিহ্বার অগ্রভাগকে চালনা করতে হবে। জিহ্বাকে প্রতিদিন ননীমাখন দিয়ে দোহন করে লৌহযন্ত্র দ্বারা কর্ষণ করতে হয়। কিছুদিন এইভাবে করতে করতেই জিহ্বা ক্রমশঃ দীর্ঘতর হয়ে যাবে। যখন দেখা যাবে যে জিহ্বা ভ্রূমধ্যস্থান স্পর্শ করতে পারছে, তখন ঐ জিহ্বাকে তালুর মধ্যপথে ঊর্ধ্বদিকে কপালকুহরে প্রবেশ করিয়ে, ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থির করতে হয়। এর নাম খেচরী মুদ্রা। খেচরী মুদ্রায় ভালভাবে অভ্যস্ত হলে তবেই সাধকের নাদযোগ সমাধি অভ্যাসের অধিকার জন্মে।

মোহান্তজী খুব উচ্ছ্বাসের সঙ্গে খেচরী মুদ্রার প্রশংসায় আরও বলতে লাগলেন — ভগবান দত্তাত্রেয় রচিত দত্তাত্রেয় সংহিতা ছাড়া শিবসংহিতাতেও খেচরীর মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে এইভাবে,

করোতি রসনাং যোগী প্রবিষ্টাং বিপরীতগাম্।
লম্বিকোর্ধ্বেযু গর্তেযু ধৃত্বা ধ্যানং ভয়াপহম্॥

যোগী ব্যক্তি জিহ্বাকে বিপরীতগামী করে লম্বিকার অর্থাৎ আলজিহ্বার ঊর্ধ্বস্থিত গর্ত তালুকুহরে ঢুকিয়ে দিয়ে ঐ স্থানে জিহ্বাকে স্থির রেখে ধ্যান করতে থাকবেন তাতে সকল রকম কর্মবন্ধনের ভয় দূর হয়। ঐ ধ্যান পরিপক্ক হলে, প্রগাঢ় ধ্যানের অবস্থায় সহস্রার চক্রক্ষরিত সুধা বা মধুক্ষরণ হতে থাকে, সেই মধুপান করলে শরীর রোগহীন হয়, অতীন্দ্রিয় জগতের অনেক অলৌকিক দৃশ্যের দর্শন ঘটে। আমাদের নাগফণী সম্প্রদায়ের সাধকদেরকে প্রথমে নৌলি ধৌতি কপালভাতি প্রাণায়াম যোনিমুদ্রা মহামুদ্রাদির শিক্ষা দিই। দ্বিতীয় স্তরে তাদেরকে খেচরী মুদ্রার কৌশল শেখাই। এই দুটি স্তর অতিক্রম করলে ভগবান দত্তাত্রেয় কথিত তৃতীয় ক্রিয়ার ধ্যানকৌশল শিক্ষা করতে হয়। সেই ধ্যানকৌশল হচ্ছে,

শিরঃ কপালে রুদ্রাক্ষো বিবিধং চিন্তয়েদ্ যদি।
তদা জ্যোতিঃ প্রকাশঃ স্যাৎ বিদ্যুত্তেজঃ সমপ্রভঃ॥

সাধক যদি শিবনেত্র হয়ে অর্থাৎ দুটো চোখের তারাকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থলে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত দিব্য জ্যোতির্ময় অন্তরাত্মার ভাবনা করেন, তাহলে বিদ্যুৎপ্রভা সদৃশ ব্রহ্মজ্যোতিঃ প্রত্যক্ষ হয়। ব্রহ্মজ্যোতি প্রত্যক্ষ হলে আর কি কোন সাধনা বাকী থাকে ?

এবার তুমি বল, তোমার বাবার কাছে তুমি কি উপদেশ পেয়েছ. ? তিনি কি তোমাকে খেচরী মুদ্রা সম্বন্ধে কিছু বলেন নি ? তাঁর এতগুলি বাণী বচনের উত্তরে বললাম — জিহ্বার শিরাছেদন, জিহ্বাকে দোহন মর্দন আকর্ষণ করে যেভাবে যোগীসমাজে জিহ্বাকে খেচরী মুদ্রার উপযোগী করা হয়, এই কৃত্রিম পদ্ধতিকে বাবা আদৌ পছন্দ করতেন না, এ বিষয়ে বরং

তাঁর স্পষ্ট নিষেধবাক্য আছে। ঐ সব ক্রিয়াকসরত এর চেয়ে 'ক্রিয়াযোগ' প্রবর্তক কাশীর সুপ্রসিদ্ধ যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী যেভাবে খেচরী মুদ্রার কৌশল শিখিয়ে গেছেন সেই ক্রিয়াকে তিনি সহজতর নিরাপদ পদ্ধতি বলে ভাবতেন।

মোহান্তজী — সেই পদ্ধতিটি জানতে পারি কি ?

আমি — যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ীজীও খেচরী মুদ্রার জন্য ছেদন দোহনাদির বিষম বিপক্ষে ছিলেন। তালুতে জিহ্বার অগ্রভাগ বিপরীতভাবে ঠেকিয়ে টাকরায় মৃদুভাবে তালে তালে ঠোক্কর মারতে থাকলে কিছুদিন পরে জিহ্বা স্বতঃই তালুকুহরে প্রবিষ্ট হয়। বর্তমানে ক্রিয়াযোগী সম্প্রদায়ে এই মূল পদ্ধতির বিকৃতি ঘটেছে। তাঁদের দু'চারজন ছাড়া অধিকাংশ গুরুবর্গ পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসে জিহ্বাকে বিপরীতগামী করে প্রাণায়াম অভ্যাস করতে বলেন। তাতেও দীর্ঘকাল অভ্যাসের পর জিহ্বা তালু কুহরে প্রবেশ করে সন্দেহ নাই; কিন্তু যোগীরাজ প্রবর্তিত মূল পদ্ধতি হতে তা ভিন্ন। লাহিড়ী মশাই যে পদ্ধতির উপদেশ দিতেন, তার নাম তালব্যমুদ্রা। তিনি রহস্য করে বলতেন ঠোক্করের ক্রিয়া।

মোহান্তজী—লাহিড়ীজী কি বলতেন থাক। তোমার বাবা কোন পদ্ধতিতে খেচরী করতেন তা আমাকে বল।

আমি — আমার বাবা ছিলেন সম্পূর্ণভাবে বেদপন্থী। বৈদিক ঋষিদের আচরিত মার্গই ছিল তাঁর সাধ্যসাধন তত্ত্ব। ঋগ্বেদের একটি বিশেষ মন্ত্র আছে। পদ্মাসন বা সিদ্ধাসনে বসে জিহ্বার অগ্রভাগ উলটিয়ে তালুতে ঠেকিয়ে সেই সিদ্ধ বেদমন্ত্র ছন্দানুসারে উচ্চারণ করতে থাকলে, সেই মন্ত্রের এমনই বর্ণবিন্যাস যে তা উচ্চারণ করতে আরম্ভ করলেই প্রতি বর্ণের উদ্‌ঘাত ও স্পন্দন অভ্যাসকালের মধ্যেই জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবিষ্ট হতে বাধ্য করে। বেদে কুত্রাপি 'খেচরী' শব্দের উল্লেখ নাই, বৈদিক ঋষিরা নাম দিয়েছিলেন 'বিশ্বমিৎ'। বেদোক্ত সেই বিশ্বমিৎ ক্রিয়াকেই বাবা খেচরীর সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি বলতেন। এই বাহ্য। কোনপ্রকার ক্রিয়া কসরৎ করে জিহ্বাকে তালুকুহরে প্রবেশ করানোকে বাবা 'খেচরী' হিসাবে স্বীকারই করতেন না। তিনি বলতেন — খেচরীর অর্থ 'খ' তে বিচরণ করা। 'খ' এর অর্থ আকাশ। আকাশ শব্দ নিষ্পন্ন হয়েছে 'কাশ্‌' ধাতু থেকে। কাশ্‌ ধাতু দীপ্তৌ। কাজেই আকাশ অর্থাৎ দীপ্তিমন্ত ব্রহ্মতত্ত্বে তা সম্ভব হয়। প্রভুর জন্য যদি প্রাণে আর্তি থাকে শরণাগতির ভাব নিয়ে বুকভরা কান্না নিয়ে ধ্যান করতে থাকলে নিবিড় ধ্যানে প্রভুর দর্শন মিলে। প্রগাঢ় ধ্যানাবস্থায় জিহ্বা স্বতঃই বিপরীতগামী হয়ে যায়। ধ্যান ভাঙলে সাধক অনুভব করতে পারেন দিব্যানুভূতির কালে বিনা চেষ্টায় বিনা কসরতেই তাঁর জিহ্বা তালুকুহরে প্রবিষ্ট ছিল। শিবনেত্র হয়ে চোখের তারা দুটোকে নাসামূলের অতি নিকটে এনে ললাটের অভ্যন্তরে প্রণব বিজড়িত অন্তরাত্মার জ্যোতির্ময় রূপ কল্পনা করতে করতে যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে থাকে, বাবার ভাষ্যানুসারে সে জ্যোতি ব্রহ্মজ্যোতির আভাস হতে পারে, সর্বাংশে তাকে ব্রহ্মজ্যোতিঃ বলা যাবে না। 'কান্না' শব্দের অর্থ বাবা করতেন — কেঁদে আনা। সাধকের আকুতি এবং আশুতোষের কৃপা — এই হল ব্রহ্মদর্শনের মূল কথা। বাবা বারবার আমাদেরকে একজন মুসলমান সুফী সাধকের একটি উক্তি শোনাতেন — রোবে ত রব পাবে। ফারসী ভাষায় 'রব' মানে আল্লা বা পরমেশ্বর। 'রোবে' অর্থ কাঁদবে। অর্থাৎ নিষ্কামভাবে ঈশ্বরের জন্য কাঁদলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। বাবার মতে ব্রহ্ম কোনমতেই কোন ক্রিয়া সাপেক্ষ বস্তু নন। খেচরী মুদ্রা শাম্ভবী

মুদ্রা প্রভৃতি কোন ক্রিয়া কসরতেই তাঁকে প্রকট করা যায় না। তিনি নিজেই প্রকটিত হন। চোখ কান মুখ টিপে খেচরী বা শাম্ভবী দ্বারা সাময়িকভাবে যে জ্যোতির প্রকাশ ঘটে সে জ্যোতিকে দিব্যজ্যোতি বলে না। বাবার মতে —

অকল্পিতোদ্ভবং জ্যোতিঃ স্বয়ং জ্যোতিঃ প্রকাশিতম্।
অকস্মাদ্ দৃশ্যতে জ্যোতিস্তৎ জ্যোতিঃ পরমাত্মনি।। (যোগসন্ধ্যা)

অর্থাৎ যে জ্যোতি বিনা কল্পনায় উৎপন্ন হয়, যে জ্যোতি স্বয়ং প্রকাশিত হয় এবং যে জ্যোতি হঠাৎ দেখা যায় সেই জ্যোতি পরমাত্মায় অবস্থিত বলে জানবে। সেই দিব্যজ্যোতিই যথার্থত — ব্রহ্মজ্যোতিঃ।

মোহন্তজীর দিকে তাকিয়ে দেখি তাঁর চোখে মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন পরিস্ফুট। তিনি হয়ত আমাকে কিছু বলতেন কিন্তু তার আর সুযোগ পেলেন না। তাঁবুর বাইরে সহসা সোরগোল উঠল — হুঁশিয়ার! হুঁশিয়ার। একসঙ্গে শিঙা তুরী ভেরী বেজে উঠল। দাপাদাপি দৌড়াদৌড়ির সঙ্গে গোঁ গোঁ ফোঁস ফোঁস ক্রুদ্ধ গর্জন। দুজনেই তাড়াতাড়ি বাইরে এসে দেখি তাঁবু থেকে প্রায় একশ হাত দুরে একদল বুনো মহিষ এসে ফোঁস ফোঁস গোঁ গোঁ করছে। নাগারা এবং ভীলরা পাথর ছুঁড়ছে কয়েকটা জ্বলন্ত মশালও তাদের দিকে ছুঁড়ে মারা হল। তবুও কি তারা থামে? ক্রমাগত পাথর বৃষ্টি এবং মশালের ছেঁকা উপেক্ষা করে তারা ক্রুদ্ধ আবেগে তেড়ে ফুঁড়ে এগিয়ে আসতে চায়। মোহান্তজী একজন নাগাকে ডেকে বললেন আরে সেবাদাস মশাল কি খেল খেলো! মোহান্তজীর নির্দেশ পেয়ে সেবাদাস দ্রুত প্রস্তুত হয়ে গেলেন। তিনি একটা প্রায় সাতফুট লম্বা লাঠির দু'দিকে মশাল জ্বালিয়ে ওস্তাদ লাঠোয়ালের মত সেই অগ্নিদণ্ড মহিষদের সামনে এগিয়ে গিয়ে ঘোরাতে লাগলেন। পাথর ছোঁড়া বন্ধ করা হল। সেই ঘূর্ণমান অগ্নিগোলকের চক্র দেখে মহিষগুলো থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। সকল মহিষের গা দিয়ে রক্ত ঝরছে তবুও পাথরের ঘা তাদেরকে রুখতে পারে নি। অগ্নিচক্রে দেখে তারা বনের মধ্যে পালাতে লাগল। পশু-মানুষের এই তাণ্ডবযুদ্ধ থামল।

প্রায় আড়াইটা নাগাদ ভোজনপর্ব সমাধা হল। এখন বিশ্রাম। বেলা পাঁচটার সময় মশাল জ্বালার সব ব্যবস্থা করে রাখা হল। জমায়েতের চারদিকে চারটা ধূনি জ্বালারও বন্দোবস্ত হল। সন্ধ্যার পরেই মোহান্তজী বিভূতি-নারায়ণের কর্পূর জ্বালিয়ে আরতি করলেন। আরতির পর তিনি তাঁবুর বাইরে এসে একটা পৃথক জাজিমের উপর বসলেন। মশাল জ্বালা হয়েছে. পাহারাদার মোতায়েন করা হল। আরম্ভ হল ভজন কীর্তন। দত্তাত্রেয় বন্দনার পর শিব. নর্মদামাতা, বিভূতি-নারায়ণ প্রভৃতি দেবতার কোরাসে বন্দনাগান করা হল। দত্তাত্রেয় অবধূত থেকে এই মোহান্ত পর্যন্ত সকলের নাম ও কীর্তিগাথা তাঁদের প্রত্যেকের অলৌকিক ঋদ্ধি সিদ্ধির কাহিনী কীর্তনের ঢংএ গান করা হল। এই কীর্তন শুনে জানতে পারলাম যে এই মোহান্ত মহারাজের নাম মহেশ গিরি। তাঁর গুরুর নাম মদন গিরি। এইবার আরম্ভ হল মোহান্ত মহারাজের উপদেশ। তিনি হঠযোগের প্রশংসা করে প্রথমেই বললেন —

হঠবিদ্যা পরা গোপ্যা যোগিনা সিদ্ধিমিচ্ছতা।
ভবেৎ বীর্যবতী গোপ্যা নির্বীর্যা তু প্রকাশিতা।।

হঠযোগ সাধনা গোপনে করতে পারলে তবেই তা বীর্যবতী হয়। যারা নাগফণী সম্প্রদায়ের নয়, তাদের কাছে আমাদের গুরুপরম্পরাগত সাধনা প্রকাশ হয়ে পড়লে সেই সাধনার ক্রম

নির্বীর্য হয়ে পড়বে। হঠযোগ অভ্যাসে শরীরের দৃঢ়তা, ইন্দ্রিয়গণের স্থিরতা মনের শান্তভাব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনতে হলে হঠযোগই তার একমাত্র চাবুক। সাধনায় উন্নতি করতে হলে আগে চাই দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ দেহ, শান্ত মন, তারপর বুদ্ধিকে ঈশ্বর বিষয়ে সমাধান করবার যোগ্য করে তুলতে হয়।

খুব যত্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন খেচরী মুদ্রার অভ্যাস করবে অত্যন্ত সংগোপনে। আজকাল অনেকে সহজে খেচরী মুদ্রা আয়ত্তের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায়। তোমরা কাশী বা বাংলাদেশে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণকালে যদি কোথাও ঐ সব পন্থার বিবরণ শুনতে পাও, সে সব কথায় কর্ণপাত করবে না। ছেদন দোহন মর্দন ছাড়া খেচরী মুদ্রা সম্পন্ন করা যায় না, তালু গহ্বরে ঢুকিয়ে কপাল কুহরে জিহ্বাকে উলটিয়ে তুলতে হলে জিহ্বাকে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দীর্ঘতর করতেই হবে। নতুবা কোনভাবে জিহ্বা উল্‌টিয়ে সামান্য ভিতরে গেলেও তা কণ্ঠকূপে গিয়ে হিল্ হিল্ করে নড়তে থাকবে — তাঁর ভাষায় 'লুড়ুর লুড়ুর' করবেই করেগা।

মোহান্তজীর ভাষণ শুনে বুঝতে পারলাম যে, সকালে খেচরী প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছিল, তিনি পরোক্ষভাবে তারই জবাব দিলেন। এর বেশী তাঁর কাছে আর কিছু আসা করিনি। কারণ আমি জানি যে সম্প্রদায়গত সংস্কার গোঁ বা গোঁড়ামি এমনই এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার বিনাশ নাই। মোহান্তজী বাণী বচন দিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করা মাত্রই নাগারা পর্যায়ক্রমে গাঁজায় দম দিতে বসে গেলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই মোহান্তজীসহ সকলেই ঘটি ঘটি সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছেন ; এখন টানছেন গাঁজা। যেদিন যে নাগাদের উপর পাহারার দায়িত্ব থাকে তাদেরই কেবল পরিমিত পরিমাণে সিদ্ধির সরবৎ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ ধরে গাঁজার ধোঁয়া এবং গন্ধে ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগলাম। নির্জন নিশুতি রাত, গভীর নিঃশব্দের মধ্যে অনন্ত আকাশের পরমাশ্চর্য রূপ আমাকে ধীরে ধীরে মোহাবিষ্ট করে তুলল। বাইরের নৈঃশব্দ্য নেমে এল মনে।

যখন জেগে উঠলাম, তখন ভোর হয়ে আসছে। কয়েকজন নাগা সাধুকে দেখলাম স্থির হয়ে বসে ধ্যান করছেন, হয়ত খেচারী মুদ্রার সাহায্যে ভ্রূদ্বয়ান্তবর্তীস্থানে কপালকুহরে জিহ্বা ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁরা প্রণব বিজড়িত জ্যোতির কল্পনা করে ধ্যানে বসেছেন।

দু'তিনজন নাগাকে দেখলাম লোটা হাতে নর্মদাঘাটের দিকে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও নর্মদা স্নান সেরে এলাম। সকাল হয়ে গেছে, মশালগুলো নেভানো হয়েছে। দলে দলে নাগারা স্নান করে এসে ভস্ম মাখতে লাগলেন। এখনও সূর্যোদয় হয়নি। এদিকে সূর্যোদয় হতে দেরী হয়। একে ত ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত তার উপর বিন্ধ্য সাতপুরার সুউচ্চ পর্বতের আড়াল ভেদ করে সূর্যকে প্রকট হতে হয়। রাত্রে বেশ গরম পড়েছিল। এখন স্নান করে আসার পর ভোরের বাতাস লেগে মন প্রফুল্ল হয়েছে। মন্দিরে গিয়ে শিবপূজা করার ইচ্ছা হল। কমণ্ডলু হাতে মন্দিরের দিকে যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় মোহান্তজীর তাঁবুতে টং করে একটা আওয়াজ হল। একজন নাগা দৌড়ে গেলেন তাঁবুর ভিতরে। মোহান্তজীর কাছে একটা পেটা ঘড়ি আছে দেখেছি, কাউকে ডাকার প্রয়োজন হলে তিনি ঘড়িতে ঠুকে আওয়াজ করেন। সেই নাগা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি যেতেই মোহান্তজী বললেন — আজ হমারা গুরুজীকা জনম্ তিথি হ্যায়। আপ বেদমন্ত্র উদ্বোধন

নির্বীর্য হয়ে পড়বে। হঠযোগ অভ্যাসে শরীরের দৃঢ়তা, ইন্দ্রিয়গণের স্থিরতা মনের শান্তভাব ধীরে ধীরে উৎপন্ন হয়। প্রমত্ত ইন্দ্রিয়গণকে বশে আনতে হলে হঠযোগই তার একমাত্র চাবুক। সাধনায় উন্নতি করতে হলে আগে চাই দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ দেহ, শান্ত মন, তারপর বুদ্ধিকে ঈশ্বর বিষয়ে সমাধান করবার যোগ্য করে তুলতে হয়।

খুব যত্ন করে নিষ্ঠার সঙ্গে প্রতিদিন খেচরী মুদ্রার অভ্যাস করবে অত্যন্ত সংগোপনে। আজকাল অনেকে সহজে খেচরী মুদ্রা আয়ত্তের নূতন নূতন পন্থা আবিষ্কার করেছেন বলে শোনা যায়। তোমরা কাশী বা বাংলাদেশে ভিক্ষার জন্য ভ্রমণকালে যদি কোথাও ঐ সব পন্থার বিবরণ শুনতে পাও, সে সব কথায় কর্ণপাত করবে না। ছেদন দোহন মর্দন ছাড়া খেচরী মুদ্রা সম্পন্ন করা যায় না, তালু গহ্বরে ঢুকিয়ে কপাল কুহরে জিহ্বাকে উলটিয়ে তুলতে হলে জিহ্বাকে স্বাভাবিক অবস্থার চেয়ে দীর্ঘতর করতেই হবে। নতুবা কোনভাবে জিহ্বা উল্‌টিয়ে সামান্য ভিতরে গেলেও তা কণ্ঠকূপে গিয়ে হিল্ হিল্ করে নড়তে থাকবে — তাঁর ভাষায় 'লুড়ুর লুড়ুর' করবেই করেগা।

মোহান্তজীর ভাষণ শুনে বুঝতে পারলাম যে, সকালে খেচরী প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে যে সব আলোচনা হয়েছিল, তিনি পরোক্ষভাবে তারই জবাব দিলেন। এর বেশী তাঁর কাছে আর কিছু আসা করিনি। কারণ আমি জানি যে সম্প্রদায়গত সংস্কার গোঁ বা গোঁড়ামি এমনই এক দুরারোগ্য ব্যাধি যার বিনাশ নাই। মোহান্তজী বাণী বচন দিয়ে তাঁবুতে প্রবেশ করা মাত্রই নাগারা পর্যায়ক্রমে গাঁজায় দম দিতে বসে গেলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই মোহান্তজীসহ সকলেই ঘটি ঘটি সিদ্ধির সরবৎ খেয়েছেন ; এখন টানছেন গাঁজা। যেদিন যে নাগাদের উপর পাহারার দায়িত্ব থাকে তাদেরই কেবল পরিমিত পরিমাণে সিদ্ধির সরবৎ দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ ধরে গাঁজার ধোঁয়া এবং গন্ধে ঘুম এল না। শুয়ে শুয়ে আকাশের তারা দেখতে লাগলাম। নির্জন নিশুতি রাত, গভীর নিঃশব্দের মধ্যে অনন্ত আকাশের পরমাশ্চর্য রূপ আমাকে ধীরে ধীরে মোহাবিষ্ট করে তুলল। বাইরের নৈঃশব্দ্য নেমে এল মনে।

যখন জেগে উঠলাম, তখন ভোর হয়ে আসছে। কয়েকজন নাগা সাধুকে দেখলাম স্থির হয়ে বসে ধ্যান করছেন, হয়ত খেচারী মুদ্রার সাহায্যে ভ্রূদ্বয়ান্তবর্তীস্থানে কপালকুহরে জিহ্বা ঢুকিয়ে দিয়ে তাঁরা প্রণব বিজড়িত জ্যোতির কল্পনা করে ধ্যানে বসেছেন।

দু'তিনজন নাগাকে দেখলাম লোটা হাতে নর্মদাঘাটের দিকে যাচ্ছেন। আমিও তাঁদের সঙ্গে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য ও নর্মদা স্নান সেরে এলাম। সকাল হয়ে গেছে, মশালগুলো নেভানো হয়েছে। দলে দলে নাগারা স্নান করে এসে ভস্ম মাখতে লাগলেন। এখনও সূর্যোদয় হয়নি। এদিকে সূর্যোদয় হতে দেরী হয়। একে ত ভারতের পশ্চিমপ্রান্ত তার উপর বিন্ধ্য সাতপুরার সুউচ্চ পর্বতের আড়াল ভেদ করে সূর্যকে প্রকট হতে হয়। রাত্রে বেশ গরম পড়েছিল। এখন স্নান করে আসার পর ভোরের বাতাস লেগে মন প্রফুল্ল হয়েছে। মন্দিরে গিয়ে শিবপূজা করার ইচ্ছা হল। কমণ্ডলু হাতে মন্দিরের দিকে যাবার উদ্যোগ করছি এমন সময় মোহান্তজীর তাঁবুতে টং করে একটা আওয়াজ হল। একজন নাগা দৌড়ে গেলেন তাঁবুর ভিতরে। মোহান্তজীর কাছে একটা পেটা ঘড়ি আছে দেখেছি, কাউকে ডাকার প্রয়োজন হলে তিনি ঘড়িতে ঠুকে আওয়াজ করেন। সেই নাগা সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে আমাকে ডাকলেন। আমি যেতেই মোহান্তজী বললেন — আজ হমারা গুরুজীকা জনম্ তিথি হ্যায়। আপ বেদমন্ত্র উদ্বোধন

করিয়ে, এহি হমারা বিনতি হ্যায়। বেদমন্ত্রে জন্মতিথির উদ্বোধন, এ বড় বিচিত্র অনুরোধ বটে। কোন মন্ত্র পাঠ করব ভাবছি, তিনি নিজেই বললেন — সূর্য উদিত হচ্ছেন, বেদে যদি সূর্যের বন্দনা থাকে, সেই সূর্য-বন্দনা গেয়ে শোনাও। সূর্যের উদয় হলে যেমন অন্ধকারের পর্দা সরে গিয়ে দিনের উদ্বোধন ঘটে, তেমনি বেদমন্ত্রের স্নান করে আমরা গুরুদেবের শুভ জন্মদিনের উদ্বোধন করতে চাই।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বাইরে এসে যুক্তকরে দাঁড়ালেন পূর্বদিকে মুখ করে। বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষদেশ অতিক্রম করে সূর্যরশ্মির প্লাবন জেগেছে। সঙ্গে সঙ্গে নাগারাও আমাদের দুজনকে চক্রাকারে বেষ্টন করে যুক্তকরে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি বলতে লাগলাম, বৈদিক ঋষিরা জড়সূর্যের উপাসনা করতেন না। জড়সূর্যের অন্তরালে যে হিরণ্ময় ভর্গজ্যোতিঃ তাঁরই উপাসনা করতেন। বেদমন্ত্রের দ্রষ্টা মহর্ষি কণ্বের পুত্র প্রকণ্ব ঋষি সেই ভর্গ সূর্যের দর্শন পেয়ে যেসব মন্ত্রে তাঁর আবাহনি স্তুতি গেয়েছিলেন, ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে চুয়াল্লিশ সূক্ত হতে পঞ্চাশৎ সূক্ত পর্যন্ত সেইসব মন্ত্র লিপিবদ্ধ আছে। পঞ্চাশৎ সূক্তের দশটি মন্ত্র আমি গেয়ে শোনাচ্ছি —

ওঁ উদু ত্যং জাতবেদসং দেবং বহন্তি কেতবং।★ দৃশে বিশ্বায় সূর্যম্॥ ১॥
অপ ত্যে তায়বো যথা নক্ষত্রা যান্তি অক্তুভিঃ। সূরায় বিশ্বচক্ষসে ॥ ২॥

বিশ্বজগৎ দেখবে বলে রশ্মি তাঁহার ঊর্ধ্বে বহে।
দীপ্তসূর্য জানেন সবই বিশ্বে প্রাণী যতেক রহে॥
বিশ্বপ্রকাশ সূর্য এলে রাত্রি সহ চোরের মত।
নিমেষ মাঝে অপগত আকাশ ভরা তারা যত॥

অদৃশ্রমস্য কেতবো বিরশ্ময়ো জনাঁ অনু। ভ্রাজন্তো অগ্নয়ো যথা ॥ ৩॥
তরণির্বিশ্বদর্শতো জ্যোতিষ্কৃত অসি সূর্য। বিশ্বমা ভাসি রোচনম্॥ ৪॥

কিরণ তোমার বিশ্বজনে একে একে দীপ্ত করে,
দীপ্তিমন্ত সূর্যশিখা দ্যুতিছটা ছড়ায় ঘরে।
ক্ষিপ্র তুমি বিশ্বদ্রষ্টা জ্যোতির্লোকের কর্তা তুমি,
জ্বলৎ তোমার দিব্যভাতি দীপ্ত কর বিশ্বভূমি ।

প্রত্যঙ্ দেবানাং বিশঃ প্রত্যঙ্ঙুদেষি মানুষান্। প্রত্যঙ্ বিশ্বং স্বর্দৃশে ॥ ৫॥
যেনা পাবক চক্ষসা ভুরণ্যন্তং জনাঁ অনু। ত্বং বরুণঃ পশ্যসি॥ ৬॥

উদয় তব দেবলোকে উদয় তব মানুষ লাগি,
স্বর্গলোকের দৃষ্টপথে নিত্য তুমি রহ জাগি।
বিশ্বজনে পোষণ করি দেখছ তুমি যে আলোকে,
পাবক সূর্য তারি মোরা স্তুতি করি বিশ্বলোকে॥

বি দ্যামেষি রজস্পৃথ্বহা মিমানো অক্তুভিঃ। পশ্যান্ জন্মানি সূর্য॥ ৭॥
সপ্ত ত্বা হরিতো রথে বহন্তি দেব সূর্য। শোচিষ্কেশং বিচক্ষণ ॥ ৮ ॥

★ উল্লেখিত মন্ত্রে কেতব শব্দের অর্থ সায়নাচার্যের মতে — সূর্যাশ্বাঃ যদ্বা সূর্যরশ্ময়ঃ অর্থাৎ সূর্যের অশ্ব বা সূর্যরশ্মি। যাস্কাচার্যের নিঘণ্টুতে অশ্ব শব্দের অর্থ দেওয়া আছে — সূর্যরশ্মি বা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মজ্যোতিঃ। বরুণ সূর্যেরই অপর নাম। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের উল্লেখ আছে। তদনুসারে পুরাণকারদের মতে আদিত্য বারজন। কিন্তু ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে ৭২ সূক্তে ৮ জন আদিত্যের উল্লেখ আছে। তাঁরা হলেন — ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র ও বিবস্বান্। সূর্যালোকে নিহিত সপ্তবর্ণ রশ্মিকেই সূর্যের সপ্তাশ্ব রূপে কল্পনা করা হয়েছে।

প্রকাশ কর দিবারাত্র, দৃষ্টি কর বিশ্বজগৎ
বিস্তৃত ঐ অন্তরীক্ষে যখন তোমার যাত্রা জ্বলৎ।
হে দেব তুমি দীপ্ত ভানু, জ্যোতি তোমার জ্বলছে কেশে
হরিৎ নামক সপ্তরশ্মি বইছে তোমার চারু বেশে।।

অযুক্ত সপ্ত শুন্ধ্যুবঃ সুরো রথস্য নপ্ত্যঃ। তাভির্যাতি স্বযুক্তিভিঃ ॥ ৯ ॥
উদ্বয়ং তমসস্পরি জ্যোতিষ্পশ্যন্ত উত্তরম্। দেবং দেবত্রা সূর্যমগন্ম জ্যোতিরুত্তমম ॥ ১০॥

রথে আপন জুড়ে নিলেন সাতটি শোভন রশ্মি-নারী
স্বয়ংযুত সে রথে আজ আকাশ পথে ভ্রমণ তাঁরি।
তিমির পারাবারের পারে দেখব মোরা জ্যোতির্ময়ে,
ভজব তাঁরে শ্রেষ্ঠ যিনি দিব্য কিরণ সমুচ্চয়ে।।

বন্দনা শেষ হল। মোহান্তজীর অনুরোধে আবার এক একটি মন্ত্র ধীরে ধীরে উচ্চারণ করতে হল। আমার সঙ্গে গলা মিলিয়ে তাঁরাও সমবেত কণ্ঠে গাইলেন। সমবেত কণ্ঠের সেই বেদধ্বনিতে নর্মদাতটে এক অপূর্বভাবের পরিমণ্ডল সৃষ্টি হল। নদী সৈকতে গাছপালায় ঘেরা সেই অরণ্য-প্রান্তরে এতগুলি জটাজূট সাধুর উপস্থিতি দেখে মনে হল, বৈদিক যুগেরই কোন তপোবনেই দাঁড়িয়ে আছি।

বেদমন্ত্র পাঠের পরেই মোহান্তজী স্বয়ং গুরুবন্দনা করলেন। ঘটা করে বিভূতি-নারায়ণের পূজা করলেন। তারপর জনা পাঁচেক নাগাসাধুকে সঙ্গে নিয়ে মন্দিরে গেলেন শিব পূজা করতে। আমিও সঙ্গে গিয়ে শিবের পূজা করে এলাম। তাঁবুতে রূপার ত্রিশূলটি রেখে সিদ্ধির সরবৎ পান করলেন। আমাকে ডেকে বললেন — বৈদিক খেচরী ইয়া বিশ্বমিৎ ক্রিয়া মুঝে একদফা দেখলাইয়ে ত ! যো মন্ত্রসে জিহ্বা উলট যাতা হৈ, উহ্ আয়েস্তা আয়েস্তা বলিয়ে, হম্ লিখ লেঙ্গে। আমি বললাম — এ পদ্ধতি বা মন্ত্র আপনার জেনে লাভ কি? বিশ্বমিৎ ক্রিয়া বা যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী প্রবর্তিত পন্থায় জিহ্বা ত কাল সন্ধ্যাতেই আপনি জানিয়েছেন "লুড়ুর লুড়ুর করবেই করেগা।" আপনি ত খেচরীসিদ্ধ হয়ে গেছেন। আপনার জিহ্বা নিশ্চয়ই ছেদন দোহন মর্দন আকর্ষণ প্রভৃতির প্রভাবে এত লম্বা হয়ে গেছে যে অবলীলাক্রমে তা কপাল কুহরে গিয়ে ঠেকে যায়। কাজেই আমাকে বিড়ম্বিত বা ছলনা করে লাভ কি প্রভু !

তিনি গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। আমি তাঁবুর বাইরে বেরিয়ে এলাম। হয়ত তিনি রুষ্ট হয়েছেন। তা হোন্, স্পষ্ট কথায় আর কষ্ট কি?

একটু পরে ভোজনপর্ব আরম্ভ হল। আজ গুরুর জন্মতিথি বলে ভুরি ভোজনের ব্যবস্থা। মধ্যাহ্নভোজনের পরেই মোহান্তজী ঘোষণা করে দিলেন আপনা আপনা সামান বাঁধ্‌কে তৈয়ার রহেগা। কাল সবেরে যাত্রা করেঙ্গে। চব্বিশ অবতারমেঁ পৌঁছকর পরিক্রমা সমাপ্ত করেঙ্গে। ঔর কেয়া কাল ত আপনা মোকানমেঁ যাউঙ্গা।নাগাদের মধ্যে আনন্দের রোল পড়ে গেল। প্রায় ছ'মাস ধরে তাঁরা জমায়েৎ নিয়ে পরিক্রমা করছিলেন, আগামী কালই তার বিরতি ঘটবে। আমার ত এখনও অনেক দেরী। গাঁজা সেবার পর উৎসাহের সঙ্গে তাঁরা জমায়েতের আসবাবপত্র গোছাতে লাগলেন। আমি শুয়ে থাকতে থাকতে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে গেছলাম, হঠাৎ দুজন নাগার মধ্যে মারামারি হওয়ায় উঠে বসলাম। একজন একজনের

গাঁজা নিয়েছিল, সেইজন উভয়ের মধ্যে কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি এবং গালাগালি থেকে মারামারি সুরু হয়ে গেল। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে মোহান্তজী উভয়কে থামালেন।

সন্ধ্যার পর আজও ভজন-কীর্তন সুরু হল। মোহান্তজী নিজের গুরুর কিছু মহিমা বর্ণনার পর নাগফণী সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা বলতে লাগলেন — আমাদের নাগফণী সম্প্রদায় স্বয়ং ভগবান দত্তাত্রেয়ের নিজস্ব সম্প্রদায়। উলঙ্গ হলেই কেউ নাগা হয় না। সাধনা করে তবে নাগফণী নাগা হওয়া যায়। নির্বানী, নিরঞ্জনী, জুনা, নির্মলী এবং অটল প্রভৃতি সম্প্রদায়েও নাগা দেখা যায়। তারাও হঠযোগের কিছু ক্রিয়া অভ্যাস করে। কিন্তু নাগফণী সম্প্রদায়কে ভগবান দত্তাত্রেয় খেচরী ও শাম্ভবী মুদ্রা শিখিয়ে গেছেন। শংকরাচার্যের দশনামী সম্প্রদায়ের গিরি, পুরী, বন, পর্বত আরণ্য ব্রহ্মচারী প্রভৃতি উপাধিধারী সন্ন্যাসীদের যেমন দণ্ড কেড়ে শংকরাচার্য কেবল আশ্রম, তীর্থ ও সরস্বতী নামা সন্ন্যাসীদেরকেই দণ্ড ধারণার অধিকার দিয়ে গেছেন, তেমনি ভগবান দত্তাত্রেয়, নিরঞ্জনী ও নির্বানীরা যতই দত্তাত্রেয়ের নাম নিক, তাদেরকে তিনি খেচরী বা শাম্ভবী ক্রিয়া সরাসরিভাবে (directly) দিয়ে যান নি। তাঁর প্রত্যক্ষ শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা যোগে উন্নত ছিলেন তাঁদের বৈশিষ্ট্য এবং শ্রেষ্ঠত্ব চিহ্নিত করার জন্য নাগজটা ধারণের অধিকার দিয়ে গেছেন। অপরাপর আখড়ার নাগারা শম্ভুজটা বা বাবরাণ্ জটা ধারণের অধিকার পেয়েছে। দণ্ড ধারণের অধিকার থাকায় যেমন দণ্ডী সন্ন্যাসীদের একটা বিশেষ মর্যাদা আছে তেমনি আমরা নাগফণী সম্প্রদায়ের নাগারাও অন্যান্য আখড়ার নাগাদের চেয়ে অধিকতর মর্যাদার পাত্র। কত বড় গর্বের কথা একবার তোমরা ভাব দেখি। ভগবান দত্তাত্রেয় বারবার বলে গেছেন —

অন্তঃকপালবিবরে জিহ্বাং ব্যাবৃত্ত বন্ধয়েৎ।
ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিরপোযা মুদ্রাভবতি খেচরী॥

অর্থাৎ কপাল বিবরের অভ্যন্তরে জিহ্বাকে ব্যাবৃত্ত ও বন্ধ করে ভ্রূমধ্যে দৃষ্টি স্থাপন করবে। এরই নাম খেচরী। এই খেচরী সাধনার অধিকার একমাত্র নাগফণী সম্প্রদায়ের নাগাদের নিজস্ব বস্তু। কারণ যোগেশ্বর দত্তাত্রেয় দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে উপদিষ্ট। অনেকে নিজেদের ইচ্ছামত অন্যভাবে খেচরী মুদ্রার অভ্যাস করে থাকে। তাতে জিহ্বা কপালকুহরে প্রবিষ্ট হলেও, তাতে সিদ্ধিলাভের আশা সুদূর পরাহত। য্যায়সে কহা যাতা হৈ —

রামানুজকে ফৌজমে বারা গাড়ি পোল।
আপাপন্থী মনমুখী ফিরে টোলে টোল॥

অর্থাৎ রামানুজের সৈন্যদলে অনেকগুলি ভগ্নগাড়ী আছে। মন্‌মুখী আপাপন্থী গলিতে গলিতে ভ্রমণ করে থাকে। মোহান্তজীর শেষের কথাগুলি স্পষ্টতই আমার প্রতি ব্যঙ্গোক্তি ! যেহেতু আমি বাবার কাছে খেচরী শিখেছি, বাবা কোন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, আমিও কোন সম্প্রদায়ে নাম লেখাই নি, কাজেই আমি আপাপন্থী কারণ নিজেই নিজের মতানুসারেই চলছি। কোন জমায়েত এর সঙ্গে না এসে "আপই আপ্" অর্থাৎ নর্মদাতটের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছি, অকাজেই মন্-মুখী! বুঝলাম, সকালে তিনি যে বোদোক্ত বিশ্বমিৎ ক্রিয়া শিখবার জন্য আবদার ধরেছিলেন, তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করায় তাঁর মনে বড় বেশী তাপ সৃষ্টি হয়েছে। আমি মনে মনে হাসলাম। রাত্রিটা নিরুপদ্রবেই কাটল।

ভোরে উঠেই দেখি সাজ সাজ রব। একজন নাগা জানালেন যে এক ঘন্টার মধ্যেই জমায়েতের যাত্রা সুরু হবে। আমরা তের মাইল হেঁটে গেলেই চব্বিশ অবতারে গিয়ে পৌঁছে যাব। সেখানেই গিয়ে স্নান পূজা সেরে পরিক্রমা শেষে করব। আমি তাঁর কথা শুনে তাড়াতাড়ি গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। শিঙা, তুরী, ভেরী বাজিয়ে নাগা বাহিনী চলতে থাকল। পার্বত্যপথে মিনিট পনের হাঁটার পরেই একটা স্থানে কুড়ি-পঁচিশ জন সন্ন্যাসীসহ কিছু লোককে দূর থেকে দেখতে পেলাম। একজন নাগাকে জিজ্ঞেস করায় বললেন — রেওয়া মহারাজের সদাবর্ত। বুঝলাম, মোহান্ত মহারাজ এই সদাবর্তের কথাই সেদিন বলেছিলেন। বড় সদাবর্ত। অনেক গুলো প্রকোষ্ঠ। আটা, ডাল, বাজরা, গম সাধুদেরকে দেওয়া হচ্ছে। সদাবর্তের ধার দিয়েই আমরা হেঁটে চলেছি। একজন বৈরাগীর কণ্ঠে তুলসীর মালা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উচ্চৈঃস্বরে "হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ' করছিলেন। আমাদের দলের একজন নাগা বৈরাগীর চিবুক নাড়িয়ে হাসতে হাসতে মন্তব্য করলেন —

নীকী নীকী বাত করো হক, না হক করতে দুঁদা।
কণ্ঠী বান্ধে হরি মিলেঁতো, বান্দা বাঁধে কুঁদা॥

— ভাল কথা, বৃথা চীৎকার করে মরছো কেন ; গলায় কণ্ঠী বাঁধলে যদি হরিকে পাওয়া যায়, তবে এ অধীন কাঠের কুঁদা গলায় বাঁধবে।

এই কথায় আরও কয়েকজন নাগা হো হো করে হেসে উঠল। সদাবর্তের লোক এবং কয়েকজন সাধু এই ইতরামির প্রতিবাদ করতেই নাগারা তাদেরকে মারধোর সুরু করে দিল। মোহান্তজী অনেকটা আগে ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি পিছিয়ে এসে ঝগড়া থামালেন। অহেতুক কলহ-প্রিয় এবং উগ্রপ্রকৃতির বলে নাগাদের যে দুর্ণাম আছে, তা নিছক রটনা নয়।

সেই সদাবর্ত অতিক্রম করার পরেই আবার ঘোর জঙ্গলে প্রবেশ করলাম। নাগারা যেহেতু চব্বিশ অবতারে তাঁদের নিজেদের ডেরায় আজ পৌঁছে যাবেন, এজন্য তাঁদের উল্লাস দেখে কে ? তাঁরা সমবেত কণ্ঠে "মোহান্ত মহারাজ কী জয়, মহেশ গিরিজী কী জয়" ধ্বনি দিতে দিতে দ্রুত হাঁটছেন। চলতে চলতে কেউ গাছের গায়ে ত্রিশূলের খোঁচা মারছেন, কেউ বা চিমটার আঘাতে ঝোপ ঝাড় ছিঁড়ছেন। কেউ নিজের মাথার বোঝা, কাঁধের বোঝা একবার পাথরের উপর ফেলছেন আবার তুলে নিচ্ছেন। যেন যুদ্ধ জয় করে কোন সেনাবাহিনী ঢুকছেন নিজেদের রাজধানীতে। গোটা পাঁচেক কৃষ্ণসার মৃগ আমাদের হাঁটা পথের ঢাল দিয়ে দৌড়ে পালাচ্ছিল। অহেতুকভাবে একজন নাগা তাদের দিকে ত্রিশূল ছুঁড়ে মারলেন। হরিণের গায়ে লাগল না, লাভের মধ্যে ত্রিশূলটা জঙ্গলের মধ্যে হারিয়ে গেল। কিন্তু সেদিকে গ্রাহ্য করছে কে ? এমনই স্ফূর্তির বহর!

নাগাদের সঙ্গে তাল রেখে হাঁটতে আমার কষ্ট হচ্ছে। প্রায় ছয়-সাত মাইল হাঁটা হয়ে গেল। একটা পাথরে হোঁচট খেলাম, ডান পায়ের বুড়ো আঙ্গুল থেকে রক্ত বেরোচ্ছে। চার পাঁচজন খুব সমবেদনা জানালেন। একজন তাঁর ঝোলা থেকে এক টুকরো ন্যাকড়া বের করে, আঙুলটায় পটি বেঁধে দিলেন। আমি পিছনের দিকে ছিলাম। কাজেই পেছনের নাগারা থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন; অগ্রবর্তী দল, যে দলে মোহান্তজী আছেন, তাঁরাও থমকে দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কি হয়েছে জিজ্ঞাসা করায় একজন নাগা চীৎকার করে খবর দিলেন — বঙ্গাল কী ব্রহ্মচারী বাবাকো চোট লাগা হৈ। আমরা একটু পরেই গিয়ে তাঁদের সঙ্গ ধরলাম। আমার

দিকে তাকিয়ে মোহান্তজী বললেন — কাঠিয়াজী ইহ ওঁকার কী ফাঁড়ি হ্যায়, মাকী গোদ নেহী অর্থাৎ এটা ওঁকারেশ্বরের জঙ্গল; মায়ের কোল নয় ! আমি কাঠের কৌপীন পরি বলে আমাকে কাঠিয়াজী বলে বিদ্রুপ করা হল।

খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দলের সঙ্গে প্রাণপণ চেষ্টায় হাঁটতে লাগলাম, মনে মনে সংকল্প করলাম, কোনমতে চব্বিশ অবতারে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। এদের সঙ্গ বর্জন করতে পারলেই মঙ্গল।

যতই জঙ্গল অতিক্রম করে চব্বিশ অবতারের নিকটবর্তী হচ্ছি, ততই নাগাদের উল্লাস উদ্দাম হয়ে উঠল। শিঙা, তুরী, ভেরী বাজিয়ে নিরন্তর জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। বেলা এগারটা নাগাদ চব্বিশ অবতারের ঘাটে পৌঁছে গেলাম। সেখানেও একদল নাগা দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের নাগজটা দেখে বুঝলাম, তাঁরাও এই নাগফনী সম্প্রদায়েরই লোক। তাঁরা এগিয়ে এসে মোহান্তজীর পায়ে ফুল দিয়ে পূজা করলেন। পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করলেন। একটু দূরেই বিরাট মন্দির এবং আরও কিছু বাড়ীঘর দেখা যাচ্ছে। আমাকে মোহান্তজী বললেন — কহিয়ে কাঠিয়াজী আপ হিঁয়াসে আপনা পথমে চলেঙ্গে ইয়া হিঁয়াসে এক মিল দূল হমারা আশ্রমমেঁ পধারেঙ্গে? উস্ তরফ দক্ষিণতটমেঁ কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ, ইস্‌কা বাদ এরণ্ডী সঙ্গম, ওঁঙ্কারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গমেঁ সমঝো আ গিয়া। আমি তাঁকে জানালাম যে আপনার দয়ার কথা কোনদিন ভুলব না। আমাকে এখনও বহু পথ পরিক্রমা করতে হবে, এখন আমাকে বিদায় দিন। আমাকে দয়া করে বলুন, এখানে কমলভারতীজী, যিনি মহামুনি মার্কণ্ডেয় প্রবর্তিত নর্মদা-পরিক্রমাকে সাধুসমাজে জনপ্রিয় করেছিলেন, তাঁর কি কোন আশ্রম আছে? আমি বালানন্দ ব্রহ্মচারীজীর জীবনীগ্রন্থে তাঁর অনেক যোগৈশ্বর্যের কাহিনী শুনেছি।

— উহ্ কেতাব মেঁ হমারা নাগফনী সম্প্রদায়কা বারে মেঁ, হমারা গুরু মদন গিরিজীকা জমাৎ কী বারে মেঁ কুছ লিখা হ্যায় কি নেহি?

— না, সে সম্বন্ধে কিছু লেখা নাই। তাঁর জীবনীতে সংক্ষেপে কমলভারতীজী, গৌরীশংকরজী এবং কিছু কিছু নর্মদাতীর্থের নামোল্লেখ আছে মাত্র। আপনাদের নাগফনী সম্প্রদায়ের কথা এই বইএ পড়িনি।

আমার কথা শুনেই তিনি নাগাদের দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন — কাঠিয়াজী বলতে হেঁ কোঈ বালানন্দ-ফালানন্দনে চব্বিশ অবতারমেঁ কোঈ বখৎ আয়ে থে। উনকা কেতাবমেঁ কমলভারতীকা বারে মেঁ লেখা হ্যায় লেকিন হমারা মহাযোগী গুরুজী ঔর নাগফনী জমাত্ কী বারে মেঁ কুছ নেহি লিখ্যা। উহ্ কেতাব ভি ফালতু হ্যায়, ইস বাতভি বেকার হ্যায়। লৈও, তুমলোগ পরিক্রমা সমর্পণকী ইন্তেজাম করো।

আমার মনে খুব আঘাত লাগলো। মহাপুরুষ বালানন্দজী নর্মদা পরিক্রমান্তে দেওঘরে আশ্রম করলেও বহু বাঙালীর তিনি পূজনীয় মহাত্মা ছিলেন। আমরা বাঙ্গালীরা তাঁকে নিজজন বলেই ভাবি এবং ভালবাসি। তাঁর সম্বন্ধে এইরকম হীন মন্তব্যে মন আমার বিরক্তিতে ভরে গেল। আমি কোনমতে শিষ্টাচার রক্ষার জন্য সকলকে নমস্কার জানিয়ে মন্দির লক্ষ্য করে হাঁটতে লাগলাম।

চৈত্রমাস শেষ হতে আর মাত্র তিনদিন বাকী, সূর্যের তাপে চলার পথও তেতে উঠেছে। আমি নর্মদার ঘাটে নেমে আগে স্নান পূজা শেষ করলাম। গিয়ে পৌঁছলাম চব্বিশ অবতারের মন্দিরে। ভক্তের ভীড় এখন কম দেখছি। মন্দিরে চব্বিশ জন অবতারের মূর্তি আছে।

জয়দেবকৃত দশ অবতার ছাড়াও দত্তাত্রেয় ঋষভদেব বেদব্যাস কপিল প্রভৃতিকে অবতার হিসাবে এখানে দেখানো হয়েছে। প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক মূর্তি আছে। আমি এইখানে মন্দিরের এককোণে বসে রেবাখণ্ড খুলে ভাণ্ডারী তীর্থ সম্বন্ধে পড়তে লাগলাম। বালানন্দজীর জীবনীতে পড়েছিলাম যে ভাণ্ডারী তীর্থে কুবের একমাস ছয় দিনের সংকল্প করে যজ্ঞান্তে তপস্যা করতে আরম্ভ করেন কিন্তু সেই তপস্যায় তাঁর একশত বৎসর কেটে যায়। প্রসন্ন হয়ে মহাদেব আবির্ভূত হয়ে তাঁকে বর দিতে চাইলে কুবের মহাদেবের নিকট যক্ষের রাজ্য সকল প্রার্থনা করেন। মহাদেবের বরে কুবের সর্বযক্ষপতি হন। রেবাখণ্ডে মার্কণ্ডেয়জী অন্যরকম বিবরণ দিয়েছেন। মহামুনি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরকে কুবের ভাণ্ডারী তীর্থ সম্বন্ধে যে বিবরণ দিয়েছিলেন তাতে বলা হয়েছে, কুবের এখানে পদ্মসম্ভব ব্রহ্মার তপস্যা করেছিলেন, শিবের নয় —

ধনদেন তপস্তপ্তবা প্রসন্নে পদ্মসম্ভবে।
তত্রৈব স্বল্পদানেন প্রাপ্তং বিত্তস্য রক্ষণম্॥
তত্র গত্বা তু যো ভক্ত্যা স্নাত্বা বিত্তং প্রযচ্ছতি।
তস্য বিত্ত পরিচ্ছেদো ন কদাচিৎ ভবিষ্যতি॥

অর্থাৎ ভাণ্ডারী তীর্থে ধনদ কুবের তপস্যা দ্বারা পদ্মযোনি ব্রহ্মার সন্তোষ সাধন করেন এবং অল্পমাত্র দান করে ধনের রক্ষাধিকার প্রাপ্ত হন। যে লোক ভাণ্ডারী তীর্থে গিয়ে ভক্তিপূর্বক স্নান ও দান করে সে কোনদিন ধনহীন হয় না। এই তীর্থ 'দারিদ্রচ্ছেদকরণং' অর্থাৎ দারিদ্রনাশকারী। হণ্ডিয়াতে সিদ্ধিনাথের মন্দিরে শুনে এসেছিলাম যে, সেখানের উভয়তটে কঠোর তপস্যা করে শিবের বরে কুবের দেবতাদের ধনাধ্যক্ষতা এবং সর্বযক্ষপতিত্ব লাভ করেছিলেন।

তা যাক্‌গে, পুরাণের বিবরণে একটু আধটু বৈপরীত্যে না থাকলে তা পুরাণ পদবাচ্য হবে কেন? প্রচণ্ড ক্ষুধা পেয়েছে, এদিকে ঝুলিতে কন্দমূল ছাড়া কিছু নাই। শেষ পর্যন্ত কি কন্দমূল খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হবে? নিজে ত রান্না করতে জানি না, সদাবর্ত থেকে কিছু যে আটা এনে রুটি তৈরী করে নেব, সে বিদ্যাও জানা নাই। বাইরে রোদের তাপ বড্ড বেশী বলে মনে হচ্ছে। কিছুক্ষণ আগে স্নান করে এসে মন্দিরের এককোণে বসে আছি বলে কোন কষ্ট হচ্ছে না। মন্দিরের চারপাশের পরিবেশ দেখে স্থানটিকে তপোবনের মত স্নিগ্ধ শান্ত এবং মনোরম বলে মনে হচ্ছে। কন্দমূল বের করে তার কিছু অংশ খাবার উপক্রম করছি, এমন সময় শতছিন্ন জামা গায়ে, একটা ময়লা কাঁথা বগলে একটি লোক এসে আমার সামনে একটা বড় তাজা কন্দমূল ফেলে দিয়ে বলল চিবিয়ে খা। কন্দমূলের গায়ে মাটি লেগে আছে। আজই বা দু'একদিন আগে এই কন্দমূল সংগ্রহ হয়েছে বলে মনে হল। লোকটির হাবভাব পাগলের মত। কিন্তু তার মুখে বাংলা বুলি শুনে আমি চমকে উঠলাম। কতদিন প্রাণের ভাষা বাংলা ভাষা শুনতে পাইনি। দীর্ঘকাল নর্মদাতটের কত তীর্থে ঘুরে বেড়ালাম, আর কোথাও ত বাঙ্গালী দেখতে পাইনি। মধুনিস্যন্দিনী মাতৃভাষাও কানে ঢোকেনি। লোকটি পাগল হোক বা পাগল সেজে থাকুন, তাঁর খোঁচা খোঁচা দাড়ি চুল, অতি অপরিচ্ছন্ন বেশভূষা সত্ত্বেও তাঁকে আমার অত্যন্ত প্রিয়দর্শন বলে সেই মুহূর্তে মনে হতে লাগল। মন্দিরের বাইরে রোদে পাথরের উপর বসে তিনি বিড়বিড় করে কি যেন বকে চলেছেন। মন্দিরের একটা প্রকোষ্ঠ থেকে একজন ব্রাহ্মণ যুবক বেরিয়ে এসে লোকটিকে তাড়া করতেই তিনি দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। সেই যুবক আমাকে বলল — উহ্ আদমী পাগল হ্যায়, বঙ্গাল দেশসে আয়া। আজ

তিন সাল ইধরই হ্যায়। এক শেঠ উজ্জায়িনীসে তীর্থ করনেকে লিয়ে আয়ে থে। উনকো লিয়ে একঠো কুটীর বানা দিয়া। পাগল দিনভর জঙ্গলমেঁ ইধর উধর ঘুমতা হৈ। কভী আপনা কুটীরমেঁ, কভী জঙ্গলমেঁই পড়া রহতা হৈ। সাধুজী আপ্ পরিক্রমাবাসী হ্যায়?

আমি তাঁকে বললাম — পরিক্রমা করতে করতেই এখানে এসে পৌঁচেছি। লাখড়াকোটের জঙ্গল পেরিয়ে নাগফণী সম্প্রদায়ের একটা জমায়েতের সঙ্গে ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসে পৌঁচেছি। তুমি ভাই বলতে পার এখানে কমলভারতীজীর আখড়া কোন দিকে ?

যুবক উত্তর দিল — বাবুজীর মুখে শুনেছি কমলভারতীজী উচ্চকোটির মহাত্মা ছিলেন। তাঁকে এ যুগের মার্কণ্ডেয় মুনি বলা হত। এইখানে একটু দূরে তাঁর একটা আশ্রম আছে বটে তবে তিনজন সন্ন্যাসী ছাড়া এখন সেখানে কেউ নাই। ঐ আখড়ার মোহান্তজী এখন মর্কটিসংগমে আছেন বা পরিক্রমায় বেরিয়ে অন্য কোথাও আছেন তা বলতে পারব না? নাগফনী নাগাদের সঙ্গে যে আপনি কিছুদিন কাটাতে পেরেছেন, সেইটাই আশ্চর্য! ওরা খুব 'ঝঞ্ঝাটি আদমী'। বছর তিনেক আগে কমলভারতীজী প্রতিষ্ঠিত আখড়া তুচ্ছ কারণে ওরা আক্রমণ করেছিল। দুর্দান্ত নাগাদের বারবার অত্যাচারের জন্যই মোহান্তজী তিক্তবিরক্ত হয়ে কমলভারতীজীর মর্কটি সংগমস্থ আশ্রমে গিয়ে বাস করছেন। তাঁদের অনুগামীর সংখ্যা অনেক। কিন্তু সাধক প্রকৃতির শান্তিপ্রিয় সন্ন্যাসীরা দুর্দান্ত নাগাদের সঙ্গে পেরে উঠবেন কেন? ভাল কথা, আপনার এখনও ভিক্ষা হয়নি। আমি মন্দিরের প্রসাদ এনে দিচ্ছি।

এইবলে মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই শালপাতায় করে ঠাকুরের ভোগ এনে দিল। ক্ষুধার্ত সন্তানের জন্য নর্মদামাতার দয়া দেখে আমার চোখে জল এল। পুরী, লাড্ডু, ডাল, ক্ষীর পরিতৃপ্তির সঙ্গে খেলাম। যুবক বলল, বেলা একটা বেজেছে। আমার বাবা এবং চাচাজীই এই মন্দিরের পুরোহিত। এখন গরমকাল তাই তীর্থযাত্রীর ভীড় কম। গ্রীষ্ম ও বর্ষা ছাড়া আর সব ঋতুতেই এখানে তীর্থযাত্রীর ভীড় হয়। হাজার হাজার পরিক্রমাবাসীরা এখানে আসেন। হোলকারদের ষ্টেট থেকে এই মন্দিরের সমূহ খরচ চলে। ওঁকারেশ্বর মহাতীর্থে যাঁরা আসেন তাঁদের অনেকেই এখানে আসেন, কুবের ভাণ্ডারী তীর্থেও যান।

কথায় কথায় জানতে পারলাম — ব্রাহ্মণ যুবকের নাম দীনদয়াল পাণ্ডে। সে ওঁকারেশ্বরের সংস্কৃত পাঠশালায় এখন পাণিনি ব্যাকরণের মধ্যমা পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছে। আমাকে বলল — মন্দিরের পিছনেই খালি ঘর পড়ে আছে। আপনি সেখানেই স্বচ্ছন্দে রাত্রিবাস করবেন। আপনার কোন অসুবিধা হবে না।

আমি তাকে বললাম — কাল সকালেই আমি ওঁকারেশ্বর যাত্রা করব।

— দু'একদিন থেকে যান, আমি অনুরোধ করছি। কারণ তাহলে আপনি একজন উচ্চকোটির মহাত্মার দর্শন পাবেন। আমাদের গুরুদেব মহাত্মা রামদাসজী কাল সকাল ন'টা দশটা নাগাদ এখানে এসে পৌঁছে যাবেন। দু'একদিন থেকেই তিনি পুনরায় তাঁর ওঁকারেশ্বরের আশ্রমেই ফিরে যাবেন। তাঁর আশ্রমে থেকেই আমি লেখাপড়া করি; তাঁর সঙ্গে আমিও যাব। আপনিও আমাদের সঙ্গেই যেতে পারবেন।

আমি তার প্রস্তাবেই সম্মতি দিলাম। সে মন্দিরের পিছন দিকে একটা পৃথক বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে একটি দরজা খুলে দিল। নর্মদামুখী দক্ষিণ দুয়ারী ঘর। মন্দির থেকে প্রায় দু'শ গজ দূরে চব্বিশ অবতারেই দীনদয়ালের বাড়ী। আমি গাঁঠরী পেতে শুয়ে পড়লাম। দূরে সাতপুরা পর্বতের গভীর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। এখানেও ঘনঘোর জঙ্গল আছে, তবে অনেকখানি

দূরে। বেলা তিনটা নাগাদ দীনদয়াল আবার এল। এসেই বলল — বাবুজী এবং দু কাকাকে আপনার কথা বলেছি। তাঁরাও খুব খুশী হয়েছেন। আমার বাবা খুব ভক্ত এবং ধার্মিক লোক। এসময়ে ত এখানে সাধু সন্ন্যাসী আসেন না। একজন পরিক্রমাবাসী এসে মন্দিরের অতিথি হয়েছেন জেনে তিনি খুবই আনন্দিত।

— শুয়ে থাকতে আর ভাল লাগছে না। আমাকে সেই পাগল সাধুর আস্তানায় নিয়ে যাবে?

— বদ্ধ পাগলের আস্তানায় অহেতুক যাবেন কেন? সে কুটীরে আছে বা হেথায় সেথায় ঘুরছে তার ঠিক নাই।

— দেশওয়ালী ভাইকে কার ভাল লাগে না বল! চল একবার যাই, না থাকে ফিরে আসব। তার সঙ্গে প্রায় আধমাইল রাস্তা হেঁটে গিয়ে পাগল সাধুর আস্তানায় পৌঁছলাম। আস্তানা বলতে প্রায় সাতফুট উঁচু একটা পাথরের ঘর, ছাউনী তালপাতার। ঘরের মধ্যে বসে সাধু বিড়বিড় করে বকে যাচ্ছেন। আমাদেরকে দেখেই হো হো করে হেসে উঠলেন। তারপর পূর্বের মত বিড়বিড় করে কখনও মৃদুকণ্ঠে কখনও উচ্চৈঃস্বরে বকতে লাগলেন — পরিষ্কার বাংলা ভাষায় বলছেন —

১ — বলি রাঁধুনী নাই ত রাঁধলে কে, রান্না হয়নি ত খেলেন কি ? উনি আবার বলেন, রাঁধতে জানেন না। যে রাঁধলে সেই খেলে, এই ত দুনিয়ার ভেল্কি!

২ — যেয়েও আছে, থেকেও নাই। তেমনি তুমি আর আমি রে ভাই! আমরা মরে বাঁচি, বেঁচে মরি। গোঁসাইএর একি বিষম চাতুরী। গোঁসাইএর একি বিষম চাতুরী।

৩ — তুমি যাই, তিনি তাই। যা তুমি, তাই তুমি। তুমি আমি ভেবে হায়রে মোরা অধোগামী। (এই বলে তিনি কপালে করাঘাত করে কাঁদতে থাকলেন)।

৪ — যম বেটা ভাই দু'মুখো থলি, তাই জন্য বেটার আঁত্ খালি। ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কি কিছু থাকছে?

৫ — চক্ষু মেলিলে সকল পাই, চক্ষু মুদিলে কিছুই নাই। দিনে সৃষ্টি রেতে লয়। নিরন্তর ইহাই হয়।

৬ — সাধনা, সাধনা — সেধে আনা। সাধলে তিনি আসেন না। যখন আসেন, নিজেই আসেন, ওরে আমার রসিক নাগর!

৭ — দুনিয়া, দুনিয়া। দুই-নিয়া, তাই দুনিয়া। যথক্ষণ দুই, ততক্ষণ তুই আর মুই। দুই নাই ত তুইও নাই, মুইও নাই। বলি, দুই তোকে করতে বলেছিল কেরে মুখপোড়া? (এইবলে একটা লাঠি নিয়ে দেওয়ালে মারতে লাগলেন)।

৮ — দে দোল দে দোল। বুকে তোল বুকে তোল, বলি, বুকে তুলে লুটোপুটি খেলে তোমার রসের খেলটি জমবে কি করে ? রসের লীলা তখন যে শুকিয়ে চচ্চড়ি হবে! (কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর)

৯ — ওলো রেবা, তুই ত মা বিয়েও করিস্‌নি বাচ্চাও হয়নি। আঁটকুড়ি ! বাঁজি। সন্তনের বেদনা তুই বুঝবি কি করে লো? সবাই বলে তো সন্তানরা নাকি সন্তদের মধ্যে স্থান পায়। তবে আজ আমার এ দশা কেন? (এই বলে হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন)।

অঝোরে কাঁদছেন তিনি। কান্না কিছুতেই থামছে না দেখে আমি প্রণাম করে উঠে পড়লাম। আমাকে প্রণাম করতে দেখে দীনদয়ালও প্রণাম করল। কিছুক্ষণ আমি কথা বলতে

পারলাম না। দীনদয়াল জিজ্ঞাসা করল, আপনি কি এই পাগলটাকে সাধক ভাবছেন?

— শুধু সাধক নয়, ভাবোন্মাদ সিদ্ধ সাধক। ইনি যেসব কথা বলে গেলেন, তা ব্যাখ্যা করে ভাষ্য লিখলে, একটা বই হয়ে যাবে। এঁর ভাষা তোমরা বুঝ না বলে এঁকে পাগল বলে অনাদর কর। এঁর প্রত্যেকটি কথা দ্ব্যর্থবোধক, গভীর অর্থবহ। কি নাই এঁর কথায়? ভাবজগতের নিগূঢ় তত্ত্ব ছাড়াও এঁর কোন কোন কথায় অদ্বৈত চেতনার আভাস আছে। রসের উচ্চতম ভূমিতে ইনি নিরন্তর বিচরণ করছেন। প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা জ্ঞান করে এই ধরণের সাধক আত্মগোপন করে থাকেন, পাগল সেজে থাকেন। ইনি এমন স্থানে এসে আস্তানা পেতেছেন যেখানে এঁর ভাষা কেউ বুঝেন না। সাধুর ভাষা না বুঝলে সাধুর ভাব ধরা যায় কি? এই অঞ্চলের লোক যদি এঁর ভাষা বুঝতে পারতেন, তাহলে দেখতে, এখানে হাজার হাজার লোকের ভীড় জমে যেত, মঠ মন্দির গড়ে উঠত। প্রচার প্রতিষ্ঠা এঁরা চান না। তাই নিজেকে লুকিয়ে রাখেন। ভারতের কোণে কোণে পাহাড়ের গুহায় জঙ্গলে এই ধরণের কত মহাত্মাই আছেন, তার ইয়ত্তা নাই। বুজরুকদেরই আড়ম্বর বেশী, প্রচার প্রতিষ্ঠা বেশী। তারা সেইটাই চায়, তাই তা পায়। এঁরা চান না, তাই পান না।

কথা বলতে বলতে মন্দিরে ফিরে এলাম। আরতির পূর্বেই ফিরব বলে আমি নর্মদার ঘাটে চলে গেলাম স্নান সন্ধ্যা সেরে যখন ফিরে এলাম তখন আরতি আরম্ভ হয়ে গেছে। ত্রিশ চল্লিশ জন লোকের ভীড় হয়েছে। দীনদয়ালের বাবা এবং দুই কাকা আরতি করছেন। প্রতিটি মূর্তির কাছে ঘুরে ঘুরে আরতি পর্ব শেষ করতে দু'ঘন্টা সময় লাগল। আস্তানায় গিয়ে দেখি, দীনদয়াল ঘরের মধ্যে একটি প্রদীপ জ্বেলে দিয়ে গেছে। যতক্ষণ ঘুম না ধরল, ততক্ষণ ঐ দিব্যোন্মাদ বাঙালী সাধকের কথাই চিন্তা করতে লাগলাম। আমি প্রচণ্ড ক্ষুধায় যখন কাতর, তখন যে ছুটে এসে কন্দমূল দিয়ে গেলেন, একি কোন কাকতালীয় ঘটনা? না, অন্য কিছু? পাগলের কথা ভাবতে ভাবতে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমই এল না। পাগলের একটি বাণীর মর্মার্থ যতই চিন্তা করতে লাগলাম ততই মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাল যে তাঁর কথাগুলি প্রলাপ নয়, গভীর অনুভূতির কথা। শেষরাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে যখন উঠলাম, তখন সূর্য উঠে গেছে। তাড়াতাড়ি নর্মদায় গেলাম। শরীর মন জুড়িয়ে গেল। কাকচক্ষু স্নিগ্ধ জলে সাঁতার কাটতে ইচ্ছা হল। কিন্তু বাবার নিষেধ বাক্য মনে পড়ল — নর্মদায় কোমর পর্যন্ত ডুবিয়ে স্নান করবি, কিছুতেই তার বেশী জলে নামবি না। স্নান তর্পণ সূর্যার্ঘ্য নিবেদন করে মন্দিরে গেলাম। দীনদয়ালের বাবা ও কাকারা সবাই মন্দিরে এসে পূজার আয়োজন করছেন। দীনদয়ালের বাবা এগিয়ে এসে বললেন — আপনার কথা ছেলের কাছে শুনেছি। আপনি নাকি এখানকার পাগলটাকে দিব্যোন্মাদ সাধক বলে মনে করেন? আজ আমাদের গুরুদেব আসছেন ওঁকারেশ্বর থেকে। তিনি রাম নামে তন্ময় হয়ে থাকেন। চিত্রকূট থেকে এসে তিনি আজ দশ বৎসর কাল ধরে ওঁকারেশ্বরে রয়েছেন। তাঁকে দেখলে আপনার খুব ভাল লাগবে।

এই বলে তিনি মন্দিরের মধ্যে ঢুকলেন পূজা করতে। আমি আমার আশ্রয়স্থলে এসে ভিজা গামছা রোদে শুকাতে দিয়ে পাগলের আস্তানার দিকে রওনা হলাম। দীনদয়ালকে দেখতে পেলাম না। সে বোধহয় মন্দিরে গেছে। রাস্তা চিনে চিনে সেই আস্তানায় পৌঁছে দেখি, সেখানে পাগলা সাধু নাই। ছেঁড়া কাপড় চোপড়, ময়লা কাঁথা, একটা ছেঁড়া কম্বল, গোটা কয়েক মাটির ভাঁড় এবং কলসী পড়ে আছে। ফিরে আসব বলে মুখ ঘুরিয়েছি, এমন সময়

দেখি একটা মাটির ভাঁড়ে পোয়া খানিক দুধ নিয়ে পাগলা আসছেন বিড়বিড় করতে করতে। উৎকর্ণ হয়ে শুনলাম, তিনি বলছেন — দেখ্ ভেল্কি! দেখ্ দেখ্, মন্দিরে মন্দিরে নকল দানারই চল বেশী। নকলি দানা, ভুলিয়ে দিয়েছে মিছরীর পানা। ওঁকারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর সাজলেন, পড়ে রইলেন আকাশের নিচে, কালোমুখো আর সাদামুখোর জন্য প্রাসাদ হয়েছে।

দুধের ভাঁড়টা এগিয়ে দিয়ে বলতে লাগলেন — হয় এই দুধটুকু খা নয়ত যমের বাড়ী যা।

উঠে দাঁড়িয়ে হাততালি দিয়ে নাচতে নাচতে বলে চললেন — যম বেটা ভাই দুমুখো থলি, তাই জন্য বেটার আঁত খালি। ও কেবল খাচ্ছে, খাচ্ছে, খাচ্ছে, ওর পেটে কি কিছু থাকছে? থাকছে, থাকছে।

আমি বসে বসে তাঁর হাবভাব লক্ষ্য করতে লাগলাম। মনে মনে ভাবছি এঁর কাছে কিছু সাধনতত্ত্ব জেনে নেব কিনা। পাগল সেজে নাচছেন, ইনি বলবেন কি ? ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কাছে এসে বাঁ হাতে আমার চিবুক নেড়ে, ডানহাতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে বলতে লাগলেন — সে গুড়ে বালি! সে গুড়ে বালি! কেন বকাস্ খালি! বলি ও মা রেবা, তখন ত সেই জলে ভাসা মর্কট মুনিটার★ কাছে বড় মুখ করে বলেছিলি, যে তোর পাড়ে পাড়ে ঘুরে মরবে তার পেট তুই ভরিয়ে দিবি। তবে দে না এই বামুনের ছেলের পেটটা ভরিয়ে। হ্যাঁগো! বুড়ো হয়ে কি তোর চোখে ছানি পড়েছে? আঁটকুড়ির আবার 'ছেলে ছেলে' বলে আদিখ্যেতা ! ঝেড়ে দে, ঝেড়ে দে, ধরনা বায়না, বসে বসে কাঁদনা। কান্নার বন্যায় বেটিকে দে চুবিয়ে — তখন দেখবি বেটিও আসছে, তার বাপও আসছে। বেটি! তুই নাকি বাপসোহাগী? তবে ক্যানে এই বাপ-সোহাগে বামুনের ছেলেটাকে দেখবি না?

এই বলে পলক ফেলতে না ফেলতে দৌড়ে পালিয়ে গেলেন। কতক্ষণ আর বসে থাকব। আমি চব্বিশ অবতারের মন্দিরে ফিরে এলাম। এসে দেখি দীনদয়ালের গুরুদেব এসেছেন । মনে হল এই মহল্লার সব লোক এসেছে মহাত্মা রামদাসজীকে দর্শন করবার জন্য। সাধু দাঁড়িয়ে আছেন, স্ত্রী পুরুষ যেই প্রণাম করছে, তিনি সকলেরই দুটো হাত জড়িয়ে ধরে 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলে ভক্তদের হাতে মাথা ঠেকাচ্ছেন। সৌম্যকান্তি সাধুর মস্তক মুণ্ডিত গলায় মোটা তুলসীর মালা, চোখগুলো অস্বাভাবিক ভাবে শিশুদের চোখের মত সাদা। চোখের এই স্বচ্ছতা নির্মল হৃদয়ের লক্ষণ। প্রথমে দর্শনে সাধুকে ভালই লাগল।

আমাকে দেখতে পেয়েই ভীড় ঠেলে দীনদয়াল এগিয়ে এসে বলল — আপনি কোথায় গেছলেন? বাবা চিন্তা করছিলেন। গুরুজী বিশ মিনিট আগে এসেছেন। চলুন পরিচয় করিয়ে দিই। আমি বললাম — ভক্তের ভীড় কমুক, আমি দেখা করব। আমার জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে বসে থাকলাম। মিনিট পনের পরেই স্বয়ং সাধুজী 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলতে বলতে আমার ঘরে ঢুকলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

— দীনদয়াল বলতে থে আপ্ চিত্রকূট ভি গয়ে থে? উহ্ হমারা অভীষ্ট তীর্থ হৈ, মহাতীর্থ হৈ।

— আপনি নর্মদাতটে এসে বলছেন, চিত্রকূট মহাতীর্থ। আর আমি ওঁকারেশ্বরকেই মহাতীর্থ জ্ঞানে ছুটে এসেছি। সারা ভারতের লোকই আমাদের বাংলাদেশে মহর্ষি কপিলের

★ বোধহয় মহামুনি মার্কণ্ডেয়ের কথা বলছে।

তপস্যা ক্ষেত্র গঙ্গাসাগরকে মহাতীর্থ জ্ঞানে দেখতে যায়, আর আমরা বাংলাদেশের লোকরা উত্তর-দক্ষিণ ও মধ্য ভারতের বিভিন্ন দুর্গম স্থানে ভগবানের লীলাক্ষেত্রকে মহাতীর্থ জ্ঞানে সহস্র কষ্ট সহ্য করেও দেখতে ছুটি।

— ইহ্ বাত সচ্ হ্যায়। চিত্রকূটমেঁ কোন কোন স্থান আপনে দর্শন কিয়া ?

— মন্দাকিনী তটের তুলসীঘাট থেকে সতী অনুসূয়া স্থান পর্যন্ত সব জায়গাতেই গিয়েছি, কামদগিরির শ্রীমুখারবিন্দম্ দেখেছি এবং পরিক্রমা করেছি।

— আচ্ছা কহিয়ে ত, কামদগিরিমেঁ কুছ লিখা হ্যায়?

— সারা চিত্রকূট জুড়ে পথে ঘাটে মহাত্মা তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের বহু দোঁহা এবং শ্লোক লেখা আছে। তার মধ্যে কামদগিরির প্রধান ফাটকে যে দোঁহাটি লেখা আছে তা বলছি শুনুন —

কামদ ভয়া গিরি রাম পরসাদা।
অবলোকন টুটত সব অবসাদা॥

অর্থাৎ ভগবান রামচন্দ্রের অনুগ্রহে পর্বতটি সর্বাভীষ্ট প্রদানকারীর মর্যাদা পেয়েছে। এই পর্বতশিখর (যেখানে প্রভু বনবাসকালে মা জানকীকে সঙ্গে নিয়ে কিছুকাল বাস করেছিলেন) দর্শন করা মাত্র মনের সব অবসাদ দূর হয়।

— বলুন, পরীক্ষায় পাশ ত?

সাধু আমাকে জড়িয়ে ধরে 'সিয়ারাম সিয়ারাম' বলে আদর করতে লাগলেন। বললেন — আভি চলিয়ে মন্দির পরিক্রমা করুঙ্গা। আমি তাঁর সঙ্গে চব্বিশ অবতারের মন্দিরে এলাম। দীনদয়ালও সঙ্গে এল। সাধু সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে করতে সমগ্র মন্দির পরিক্রমা করলেন।

আমার পাশের ঘরটিতেই সাধুর থাকার জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে। পরিক্রমা সেরে এসে বসতেই আমি সাধুকে বললাম, এখান থেকে ভাণ্ডারী তীর্থ কোন পথ দিয়ে যাবো? তিনি বললেন — বেফিক্কর রহিয়ে। ওঁকারেশ্বরের মহাতীর্থ হতে দু'মাইল পূর্ব দিকে গেলেই নর্মদা ও কাবেরীর সংগমে ভাণ্ডারী তীর্থ। আমি নিজে সঙ্গে করে ভাণ্ডারী তীর্থ এবং এরণ্ডী সংগম দেখিয়ে আনব। ওঁকারেশ্বরে আমার একটা 'ভজনকুটীর' আছে। সেখানেই তুমি থাকবে। আমি কিছুতেই তোমাকে ছাড়ব না। আমিই ওঁকারের সব মন্দির দর্শন করিয়ে দিব। কাল সকালেই আমরা ওঁকারেশ্বরে যাত্রা করব।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় যে যার ঘরে ভোগ পরিবেশন করা হল। কিন্তু সাধুজী দীনদয়ালকে হুকুম করলেন, আমার ভোগও তার পাশে পরিবেশন করতে। আমি পাশের ঘর থেকেই শুনতে পাচ্ছি তাঁর কণ্ঠস্বর। আমার নিজেরই খুব সঙ্কোচ হল। কাল থেকে এই ভক্ত পরিবারকে দেখছি, গুরুগতপ্রাণ ভক্ত যখন গুরুকে ভোগ নিবেদন করে সে ত কেবল খাদ্যসম্ভার মুখের কাছে এগিয়ে দেওয়া নয়, সেও এক রকমের পূজা। আমি তাঁকে সাড়া দিয়ে বললাম — আমার একা একা খেতে ভাল লাগে। আমি এ ঘরেই বসে খাই। কিন্তু তিনি কিছুতেই শুনলেন না। নিজে এসে আমার হাত ধরে তাঁর পাশে বসতে বাধ্য করলেন।

ভোজনের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করার পর তাঁকে পাগলা সাধুর বিবরণ বললাম। পাগলার কয়েকটা কথা যা লিখে রেখেছি ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে তাও ব্যাখ্যা করে শোনালাম।

সব শুনে তিনি বললেন — এতো সিদ্ধ অবধূতের লক্ষণ। ভক্তিপথের পথিকরাও অবধূত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। চল দেখি গিয়ে আমরা তাঁর দর্শন পাই কিনা। দীনদয়ালের বাবা কাকারা বাধা দিলেন। বললেন — গুরুজী ইহ বেহদ পাগল হ্যায়। তিনি তাঁদের কোন কথাই শুনলেন না। দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে আমরা পাগলার আস্তানা অভিমুখে যাত্রা করলাম। কিন্তু আস্তানায় পাগলা সাধু নাই। কুটীর ফাঁকা। সকালের সেই দুধের ভাঁড় পড়ে আছে। প্রায় ঘন্টাখানিক অপেক্ষা করেও তাঁর দেখা পাওয়া গেল না। ফিরে এলাম। সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে আমি নর্মদায় গেলাম। স্নান, সন্ধ্যা সেরে আসার সময় দেখি মন্দিরে আরতি সুরু হয়ে গেছে। দলে দলে লোক এসে মন্দিরে জমায়েৎ হয়েছে। দীনদয়াল জানালো, আপনি ঘরে গিয়ে ভিজা গামছা এবং কমণ্ডলু রেখে আসুন। মন্দিরের মধ্যে বসে গুরুজী জপ করছেন। আজ তিনি রাম মহিমা গাইবেন। তাই মহল্লার লোকজন এসেছে। এক ঘন্টার মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। কারণ পাহাড় জঙ্গল এলাকায় বেশীক্ষণ বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। আমি ঘরে গিয়ে গামছা কমণ্ডলু রেখে মন্দিরে ফিরে এলাম। সাধু জপ সেরে বাইরে এসে বসেছেন। লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি সঙ্গে নিয়ে ভক্তরাও বসে আছে। আমাকে দেখেই সাধুজী বললেন, প্রভু রামচন্দ্রের দোহাই , তুমি একটা স্তব শোনাও। তাঁর কথার ভঙ্গীতে আর না বলার উপায় রইল না। আমি কেবল বললাম, আমি সংস্কৃতে একটা স্তব করছি, কিন্তু হিন্দীতে তা ব্যাখ্যা করতে পারব না। আপনি এঁদেরকে বুঝিয়ে দেবেন। আমি স্তবপাঠ করতে লাগলাম —

ওঁ ভবোদ্ভবং বেদবিদাং বরিষ্ঠম
আদিত্য-চন্দ্রানল-সুপ্রভাবম্।
সর্বাত্মকং সর্বগতস্বরূপম্
নমামি রামং তমসঃ পরস্তাৎ।।
নিরঞ্জনং নিষ্প্রতীম্ নিরীহং
নিরাশ্রয়ং নিষ্কলম্ প্রপঞ্চম্।
নিত্যং ধ্রুবং নির্বিষয়স্বরূপম্
নিরন্তরং রামমহং ভজামি।।
ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজং তং
ভক্তপ্রিয়ং ভানুকূলপ্রদীপম।
ভূতত্রিনাথং ভুবনাধিপং তং
ভজামি রামং ভবরোগবৈদ্যম্।।

সাধুজী এই মন্ত্রের ব্যাখ্যা করবেন, তাই তাঁর মুখের দিকে তাকালাম। দেখি, তাঁর দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। তিনি 'সিয়ারাম, সিয়ারাম' বলে কেঁদে উঠলেন। আর ব্যাখ্যা! সঙ্গে সঙ্গে ঢুলুক বাজিয়ে রামা হো রামা হো কীর্তন সুরু হয়ে গেল। ভগবানের নাম উচ্চারণ হচ্ছে বলে 'কীর্তন' বলছি আসলে চীৎকার, হৈহল্লা! কিছুক্ষণ পরে নিজেকে কতকটা সামলে নিয়ে হাত তুলে তিনি ভক্তদেরকে নিরস্ত করলেন। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন — সবাই বলে শিবভূমি বলে নর্মদাতটে শিবই উপাস্য। কিন্তু তোমরা বিশ্বাস কর, বেদ-পুরাণে মহাপুরুষরা বলে গেছেন, যিনি শিব তিনিই রাম, যিনি রাম তিনিই শিব। মা জানকী এবং আদ্যাশক্তিতে কোন ভেদ নাই। ত্রেতাযুগের বাল্মিকী মুনি এযুগে তুলসীদাসরূপে অবতীর্ণ

হয়েছিলেন। তুলসীদাসজীকৃত 'রামচরিতমানস' এ যুগের নব রামায়ণ। রাম নামে মুক্তি হয়, সর্বসিদ্ধি লাভ হয়। রামভক্তের মৃত্যুকালে অন্নপূর্ণারূপিনী মা জানকী মৃত ব্যাক্তির কর্মপাশ ছেদন করেন। বিশ্বনাথ মহাদেব স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে মৃত ব্যক্তির সূক্ষ্মদেহের কর্ণকুহরে তারক ব্রহ্ম নাম অর্থাৎ রাম মন্ত্র দান করেন। অহরহ রাম নাম করলে মহাদেব তুষ্ট হন, সব দেবতাই তুষ্ট হন। 'রামচরিতমানসের' প্রত্যেক দোঁহাতে অমৃত আছে। তোমরা তা নিত্য পাঠ করবে। যেখানে রামচরিতমানস পাঠ হয় সেখানে প্রভু রামচন্দ্র সপরিবারে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন।

রামচন্দ্র শিবের মতই আশুতোষ, করুণাময় এবং ভক্তবৎসল। ভগবান তুলসীদাসজীর জীবনের একটা ঘটনা বলছি, মন দিয়ে তোমরা শোন। চিত্রকূটে মন্দাকিনীতটে বসে তুলসীদাসজী একদিন তাঁর নিত্যপূজার আয়োজন করছেন। ঝুলি হতে চন্দনকাঠ ও শিলা নিয়ে চন্দন ঘষছেন, হঠাৎ একটি অপূর্ব সুন্দর বালক সেখানে এসে উপস্থিত হল। শ্যামলকান্তি বালকের চোখে মুখে অপরূপ লাবণ্যের ছটা, হাতে আবার একটি ছোট ধনুক। এসেই বালক আবদার করতে লাগল — ওগো তুমি আমার কপালে একটা চন্দনের তিলক এঁকে দাওনা গো! তুলসীদাসজী যতই বলেন, ঠাকুরের জন্য চন্দন ঘসছি, আগে ঠাকুরকে দিই, ততই বালক কচি দুটি হাত দিয়ে তাঁর দুটো হাত জড়িয়ে ধরে আব্দার করতে থাকে — একটুখানি চন্দন আমার কপালে লাগিয়ে দাও না গো! বালকের হস্তস্পর্শে তুলসীদাসজী ভাবাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। তিনি বালকের কপালে তিলক এঁকে দিতে দিতে কম্পিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন —

বালক শুনহ বিনয় মম এহুঁ।
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহুঁ॥

তাঁর চোখের সামনে ভগবান রামচন্দ্রের মঞ্জুল মোহন দিব্যমূর্তি উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তিনি ভাবাবেগে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিস্থ হয়ে পড়লেন। জ্ঞান হওয়ার পর প্রেমাশ্রু মুছে লিখে রাখলেন —

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভই সব সন্তন কী ভীড়।
তুলসীদাস চন্দন ঘসে তিলক দেই রঘুবীর॥

তামাম হিন্দুস্থানের সব লোকেই এই ঘটনা জানে। এইভাবে দিব্যানুভূতি হবার পরে তুলসীদাসজী রামচরিতমানসের প্রতিটি শ্লোকে তা লিখে গেছেন। তোমরা সবাই আমার সঙ্গে রামনাম কীর্তন কর। এই বলে তিনি কীর্তন ধরলেন। ঢুলুক বাজিয়ে তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে সকলেই কীর্তন করতে লাগলেন। মহাত্মা রামদাসজীর কণ্ঠ খুবই মিষ্টি, তার উপর রামনামের মাদকতা কীর্তনস্থলীতে এমন ভাবে হিল্লোল তুলেছে যে সবাই স্থান কাল সময়ের কথা ভুলে গেছে। রাত্রি বোধহয় আটটায় বা সাড়ে আটটায় কীর্তনের আসর ভাঙল। সকলেই একে একে সাধুকে প্রণাম করে যে যার ঘরের পথে রামনাম করতে করতে চলে গেল। প্রত্যেকের মুখে চোখে এমন একটা পরিপূর্ণ পরিতৃপ্তির ভাব দেখলাম, যাতে আমারও মন ভরে উঠল। দূর থেকে তাদের ঢুলুকের শব্দ এবং রামনাম ভেসে আসছে। রামনামে সবাই এতক্ষণ ধরে এমন মাতোয়ারা ছিল যে, ওঁকারের ঝাড়ির বাঘ হায়না নেকড়ের ভয় তাদের চিন্তার মধ্যে স্থান পায় নি।

বাসায় এসে দুজনে গল্প করতে থাকলাম। তিনি এখন আমাকে একান্তে পেয়ে বললেন — সকাল থেকে আমি তোমার কোন ব্যক্তিগত পরিচয় জানতে চাই নি কেন জান?

জব্বলপুর হতে মহাত্মা সুমেরদাসজী পরিক্রমাকারী জমায়েতের জনৈক সাধুর হাতে একটি পত্র দিয়েছেন তিনমাস আগে। তাতে লিখেছেন — একজন কাঠের কৌপীনধারী বাঙালী যুবক-সাধু পরিক্রমা করতে করতে ওঁকারেশ্বরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তুমি তার দেখা পেলে গরম কালটা তোমার কাছেই আটকে রেখো। এই ভিক্ষা আমি তোমার কাছে চাচ্ছি। আজ আটদিন আগে একটা জমায়েৎ মুণ্ডমহারণ্য থেকে ওঁকারেশ্বরে এসে তাদের জপ সমর্পণ করেছে। সেই দলেরই একজন আমাকে দেখ এই চিঠিটা দিয়ে গেছে। এই বলে তাঁর ঝুলি থেকে হিন্দীতে লেখা চিঠিটা আমার হাতে দিয়ে বললেন — দেখিয়ে আপকা উপর উনকা মহব্বৎ ক্যায়সা হ্যায়।

চিঠিটা পড়ে দেখলাম, তিনি আমার নাম ধাম শিক্ষা দীক্ষা, বেদ এবং পিতার প্রতি অন্ধভক্তি, পিতৃ-আজ্ঞা পালনের জন্য নর্মদা পরিক্রমার ব্রত গ্রহণ সব কিছুই লিখেছেন। এমন কি আমার তার্কিক প্রকৃতির কথাও বাদ দেন নি। পত্রের ছত্রে ছত্রে আমার জন্য তাঁর আকুলতা ফুটে উঠেছে। চিঠি পড়তে পড়তে জব্বলপুর ভিড়াঘাটের সেই বৃদ্ধ মহাত্মার স্নেহ ও দয়ার কথা ভেবে বুকের মধ্যে কান্না উজিয়ে আসতে লাগল। আর একবার অনুভব করলাম যে ভালবাসা অন্ধ হয়।

ভাবতে লাগলাম, আমি তাঁর শিষ্যও নয়, ভক্তও নয়, তাঁর কোন সেবাও করিনি, তবুও আমার প্রতি তাঁর অহেতুক ভালবাসা কেন? ১৯৪৯ সালে প্রথম যখন অমরকন্টক যাই, তখন পেণ্ড্রা রোডে নেমেই তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়। সেই থেকে তিনি আমাকে আপন সন্তানের মত ভালবেসেছেন। একি কোন জন্মান্তরীণ সম্বন্ধ ? না — অন্য কিছু ?

রামদাসজীর কণ্ঠস্বরে আবার যেন জেগে উঠলাম। তিনি বললেন, একবার তিনি মুণ্ডমহারণ্য অতিক্রম করে মান্দালায় এসে এক কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে পথের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়েছিলেন। মহাত্মা সুমেরদাসজী তাঁকে পথ থেকে কুড়িয়ে নিয়ে 'ভীষ্মাশ্রমে' তিন মাস রেখে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলেছিলেন। সেই থেকে ইনি সেই মহাপ্রাণ মানুষটির কাছে ঋণী আছেন। সেই ঋণ শোধের সুযোগ তিনি এতদিন পরে পেয়েছেন। সুমেরদাসজীর স্নেহের পাত্র অর্থাৎ আমাকে যত্ন করে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করতে চান। বললেন — মহাত্মা সুমেরদাসজী হমারা শ্রদ্ধাভাজন দোস্ত্ হ্যায়। হম উনকা বচন জরুর রক্ষা করেঙ্গে। অব ত আপ্ হমারা বন্দী হো গিয়া। ইহ গরমী কা বখৎ আপকো ছোড়েঙ্গে নেহি। কাল সুবাসে ১৩৬১ সন কি পহেলা তারিখ সুরু হোগা। বিহানমেঁ আপকো সাথমেঁ লেকর ওঁকারেশ্বর যাত্রা করেঙ্গে। এই বলে হাসতে লাগলেন। তাঁর দোস্ত কথাটাতেই আমি চমকে উঠলাম। নাগফণী সম্প্রদায়ের শালপ্রাংশু মহাভুজ বৃষস্কন্ধ নাগা মোহান্ত মহেশ গিরিও ত মহাত্মা সুমেরদাসজীর দোস্ত ছিলেন। ইনি কিরকম 'দোস্তির' পরিচয় দিবেন! কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে তাঁর নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণব-প্রকৃতি এবং প্রসন্ন সাত্ত্বিক মুখমণ্ডল দেখে মন আশ্বস্ত হল। আমি তাঁকে নমস্কার করে এসে পাশের ঘরে শয্যা পাতলাম।

শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, ১৩৬০ সালের ১লা আশ্বিন অমরকন্টক হতে পরিক্রমা আরম্ভ করেছিলাম। আগামীকাল ১৩৬১ সালের ১লা বৈশাখ তাহলে ওঁকারেশ্বর পদতলে গিয়ে প্রণাম করব। সাতমাস সময় কেটে গেল। এখনও রেবা-সংগম কতদূরে? কানে ভেসে এল রামদাসজীর কণ্ঠস্বর। তিনি গুণগুণ করে গাইছেন —

বিশ্বরূপ রঘুবংশমণি করহু বচন বিশ্বাসু।
লোক-কল্পনা বেদ কহ অঙ্গ প্রতি জাসু॥
পদ পাতলা, সীস অজধামা অপর লোক অঙ্গ অঙ্গ বিশ্রামা,
ভ্রূকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কালা, নয়ন দিবাকর কচ ঘনমালা।
জাসু ঘ্রাণ অশ্বিনীকুমারা নিশি অরু দিবস নিমেষ অপারা।
শ্রবণ দিশা দশ, বেদ বখানী, মারুত শ্বাস, নিগম নিজবাণী।
অধর লোভ, যম দশন করালা, মায়া হাস্য বাহু দিগপালা।

অর্থাৎ 'রামচরিতমানসে' তুলসীদাসজী দোঁহা মুখে বলেছেন — আমার কথা বিশ্বাস কর — রঘুবংশমণি রামচন্দ্র বিশ্বরূপে বিশ্বব্যাপ্ত। পাতাল তাঁর চরণকমল, শিরোদেশ ব্রহ্মলোক, অন্যান্য ভুবনও তাঁর বিভিন্ন অবয়বে অবস্থিত। তাঁর ভ্রূকুটি বিলাস ভয়ঙ্কর কাল, দিবাকর তাঁর চক্ষু, মেঘমালা তাঁর কুণ্ডল, অশ্বিনীকুমার তাঁর নাসিকা, তাঁর অশেষ অবিরাম পলকপাতেই দিন ও রাত্রি, দশদিক তাঁর কর্ণ, স্বয়ং বেদ এই কথা বলেছেন। বায়ু তাঁর নিঃশ্বাস, নিগম তাঁর শ্রীমুখের বাণী, লোভ তাঁর অধর, তাঁর করাল দ্রংষ্টা হল যম, মায়া তাঁর হাসি এবং দিকপালগণ তাঁর বাহু।

বুঝলাম, রামদাসজী শ্রীরামচন্দ্রের মধ্যে সর্বব্যাপী মহাবিষ্ণুরূপের অনুধ্যান করছেন।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত নানা কথা চিন্তা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরে উঠেই উভয়ে স্নান করে এলাম। তিনি চব্বিশ অবতারের মন্দির সাষ্টাঙ্গে পরিক্রমা করে এসে ভক্তদের কাছে বিদায় নিয়ে দীনদয়াল আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। আমরা তাঁর পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগলাম। আমাকে বললেন — আমরা নীমাড় জেলার মধ্য দিয়ে চলছি নর্মদাতটের শ্রেষ্ঠ তীর্থ ওঁকার মান্ধাতার দিকে। ১৩৬১সালের ১লা বৈশাখের এই দিনটিকে (বুধবার, ১৪। ৪।১৯৫৪) তুমি তোমার জীবনের পরম শুভদিন বলে মনে রাখবে। কারণ তুমি আজ দর্শন পাবে সূর্যবংশের সম্রাট মান্ধাতা প্রতিষ্ঠিত জ্যোতির্লিঙ্গ ওঁকারেশ্বরের।

আমি বাধা দিয়ে বললাম — কারও প্রতিষ্ঠিত শিবলিঙ্গ স্বয়ম্ভূ হন কি করে?

মহাত্মা রামদাসজী সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিলেন সম্রাট মান্ধাতা বৈদূর্য পর্বতে এমন কঠোর শিব তপস্যা করেছিলেন যে, তাঁর তপস্যা প্রভাবে জ্যোতির্লিঙ্গ প্রকটিত হয়েছিল।

মান্ধাতার তপস্যায় ওঁকারেশ্বরের উদ্ভব বলে নর্মদার বুকে জেগে ওঠা ওই পর্বতের নাম — ওঁকার মান্ধাতা। এই দ্বীপে বহু মন্দির আছে। সেগুলি শিবপুরী, ব্রহ্মাপুরী এবং বিষ্ণুপুরী — এই তিনভাগে বিভক্ত। এই তিনপুরীর চারদিকে নর্মদা এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছে যে মনে হয় যেন 'ওঁ' এই অক্ষরের আকারে তা বিছিয়ে আছে, জলের প্রবাহ সেইভাবেই এঁকেবেঁকে গেছে। দ্বীপটি প্রায় সাড়ে তিন মাইল লম্বা, দুমাইল চওড়া। দ্বীপের মধ্যবর্তী সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী একটি উপত্যকা দ্বারা দু'ভাগে বিভক্ত। পূর্ব দিকে নদী থেকে চার পাঁচশ ফুট উঁচু পর্বতমালা উঠে পশ্চিম দিকে ধীরে ধীরে ঢালু হয়ে সমতল ভূমিতে মিশেছে। মান্ধাতার বিপরীত দিকে নর্মদার দক্ষিণ তীর পর্বত সমাকীর্ণ। কাবেরী এবং নর্মদার মধ্যস্থলে ওঁকার মান্ধাতা আর দুই নদীর সংগমস্থলে কুবেরের তপস্যাস্থল ভাণ্ডারী তীর্থ। তাই তোমাকে বলছিলাম, ভাণ্ডারী তীর্থে যেতে হলে এই ওঁকার মান্ধাতা থেকেই যাওয়া সুবিধাজনক। আচ্ছা তুমি বল দেখি মান্ধাতা সম্বন্ধে তোমার কতটুকু জানা আছে?

— রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও মহাভারতে যা বলা আছে, সেইটুকুই কেবল জানি। জানি যে মান্ধাতা সূর্যবংশের সম্রাট। নর্মদার তট থেকে হিমালয় পর্যন্ত প্রায় আর্যাবর্তেই তিনি আপন আধিপত্য বিস্তার করেন। তিনি রাজসূয় এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। আমি গত বছর কৈলাস-মানস সরোবর গিয়েছিলাম। মানস সরোবর এবং রাবণ হ্রদের উত্তর পশ্চিমে এক জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। তার নাম গুরেলা-মান্ধাতা। সেখানকার হিন্দু এবং লামা সাধুদের মতে গুরেলা মান্ধাতাও মহারাজ মান্ধাতার তপস্যাক্ষেত্র। তাঁর যজ্ঞাগ্নি এখনও আগ্নেয়গিরির মত দেদীপ্যমান।

বৈবস্বত মনুর পুত্র ইক্ষাকু ছিলেন মান্ধাতার আদি পূর্বপুরুষ । মান্ধাতার পিতার নাম যুবনাশ্ব, পুত্রের নাম মুচুকুন্দ। মান্ধাতার জন্মরহস্য বড়ই বিচিত্র। অপুত্রক রাজা যুবনাশ্ব পুত্রলাভ কামনায় এক যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছিলেন। মধ্যরাত্রে যজ্ঞ শেষ হলে মুনিরা মন্ত্রপুত জল একটি কলসীতে রেখে নিদ্রা যান, এদিকে রাত্রি শেষে তৃষ্ণার্ত হয়ে রাজা সেই জল পান করেন, ফলে তাঁর গর্ভসঞ্চার হয়। পরে তাঁর পার্শ্বদেশ ভেদ করে মান্ধাতা ভূমিষ্ঠ হন। মাতৃস্তনের অভাবে শিশু কিভাবে বেঁচে থাকবে এই চিন্তায় যুবনাশ্ব কাতর হলে ইন্দ্র সেখানে আবির্ভূত হয়ে বলেন — ধাস্যতি মাময়ং। এই বলে ইন্দ্র তাঁর দক্ষিণ হস্তের 'প্রদেশিনী' অর্থাৎ তর্জনী শিশুর মুখে পুরে দিয়ে বললেন — মাম্‌ধাতা মাম্‌ধাতা। আমার দ্বারা তুমি পালিত হও। ইন্দ্রের সেই উক্তি অনুসারেই শিশু মান্ধাতা নামে প্রসিদ্ধ হন।

বিষ্ণুপুরাণে মতে, মান্ধাতা রাজা শশবিন্দুর কন্যা বিন্দুমতীকে বিবাহ করেন এবং তাঁর গর্ভে পুরুকুৎস, অম্বরীষ ও মুচুকুন্দ নামে তিনপুত্র এবং পাঁচকন্যা জন্মগ্রহণ করে। অম্বরীষ অসাধারণ হরিভক্ত ছিলেন। দুর্বাসার কোপে পড়ে অম্বরীষ নানা দুঃখ নির্যাতনে পড়লে স্বয়ং ভগবান তাঁকে রক্ষা করেন। সুদর্শনচক্র সর্বত্র মহর্ষিকে তাড়া করে ফিরতে থাকে। দুর্বাসা অম্বরীষের সঙ্গে প্রসন্ন ব্যবহার করতে বাধ্য হন। মান্ধাতা একবার স্বর্গজয় করতে গেলে, ইন্দ্র তাঁকে বলেন যে, তিনি যেন সমগ্র পৃথিবী জয় করার পর স্বর্গ জয়ের স্বপ্ন দেখেন। মধুদৈত্যের পুত্র লবণাসুর ত এখনও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে না! এই কথা শুনে মান্ধাতা লবণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যান এবং সেইখানেই তিনি লবণাসুর কর্তৃক নিহত হন।

— মান্ধাতার কনিষ্ঠ পুত্র মুচুকুন্দ পিতার মতই দিগ্বিজয়ী সম্রাট হয়েছিলেন। তিনি এই নর্মদাতটে এক বিরাট নগরী স্থাপন করেন। মুচুকুন্দের মৃত্যুর পর হৈহয়রাজ মাহিষ্মতী সেই নগরী জয় করে নেন এবং তাঁর নামানুসারে নগরীর নাম মাহিষ্মতী। মহারাজ কৃতবীর্যের পুত্র রাবণজয়ী কার্তবীর্যার্জুন ছিলেন হৈহয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট। তাঁর আমলে মাহিষ্মতী দুর্জয় দুর্গনগরীতে পরিণত হয়। কিন্তু এখন সেই মাহিষ্মতী নগরীর চিহ্নমাত্র নাই। তবুও লক্ষ লক্ষ ভক্তের হৃদয়ে জেগে আছেন মান্ধাতা পূজিত ওঁকারেশ্বর, অমর হয়ে আছে নর্মদা বক্ষের ঐ শৈল দ্বীপ মান্ধাতা ক্ষেত্র। ঐ দেখ কথা বলতে বলতে আমরা সেই মান্ধাতা ক্ষেত্র ওঁকারেশ্বরের ঘাটে এসে পৌঁছে গেছি। আজ পয়লা বৈশাখের শুভদিনে এখান হতে প্রণাম কর নর্মদাবক্ষের বৈদুর্যপর্বতস্থিত ওঁকারেশ্বর মহাদেবকে।

ঘাটে দুটি নৌকা ভিড়ানো আছে। বেলা বোধহয় দশটা। আমি নর্মদাস্পর্শ করেই রামদাসজীকে জিজ্ঞাসা করলাম — নর্মদার উপর দিয়ে নৌকাতে করে যে ওঁকারেশ্বর দর্শন করতে যাব, তাতে আমার পরিক্রমা খণ্ডিত হবে না? তাছাড়া আমি কপর্দকহীন পরিব্রাজক, নৌকার পারানি ত আমি দিতে পারব না।

— সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না। তুমি ত পরিক্রমাবাসী, পরিক্রমাবাসীকে বিনা শুল্কে পারাপার করাবার জন্য মাঝিরা নাগপুরের রাজদরবার হতে পয়সা পায়। তাদের মাসিক বেতন নির্দিষ্ট করা আছে। আর পরিক্রমা খণ্ডিত হবে কেন? তুমি ত নর্মদাকে লঙ্ঘন করে একেবারে দক্ষিণতটে পৌঁছাচ্ছ না। নর্মদা বক্ষের দ্বীপে যাবে। ওঁকারক্ষেত্র দর্শন করে পুনরায় ত এখানে এই উত্তরতটে এসে পরিক্রমা আরম্ভ করবে। তাহলে লঙ্ঘনটা হচ্ছে কিভাবে? আমি জানি, অনেক পরিক্রমাবাসী উত্তরতট দিয়েই হোক, দক্ষিণতট দিয়েই হোক পরিক্রমা করতে করতে পরিক্রমা ভঙ্গের ভয়ে ওঁকারেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করতে যায় না। এটা তাঁদের মনের অন্ধ সংস্কার এবং গোঁড়ামী মাত্র। তুমি বল, নর্মদাতটের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাজ্যোতির্লিঙ্গ ওঁকারেশ্বরের দর্শন ও পূজা না করে তাঁর মন্দিরের নিকট দিয়ে চলে যাওয়ায় কি অপরাধ হবে না? সে অপরাধ কি শিবপুত্রী নর্মদা ক্ষমা করবেন? তিনি কি তাতে প্রসন্ন হবেন? তুমি অহেতুক কোন আশঙ্কা করো না। এতে যদি অপরাধ হয়, সে পাপ আমার হবে। এস নৌকাতে ওঠ — এই বলে তিনি আমার হাত ধরে নৌকাতে উঠিয়ে নিলেন।

নর্মদার নিস্তরঙ্গ শান্ত সবুজ স্বচ্ছ জলের উপর দিয়ে নৌকা তরতর করে বয়ে চলল। মহাত্মা রামদাসজী জয়ধ্বনি দিতে লাগলেন। সিয়ারাম কী জয়, জয় ওঁকারেশ্বরকী জয়। কোটিতীর্থের ঘাটে এসে নৌকা ভিড়ল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে কোটিতীর্থের ঘাট অতি অতি বিশাল। বৈদুর্য পর্বতের ঢাল ঘিরে অর্ধচন্দ্রাকার এই ঘাট। পর্বতের ঢালুদেশে সোজা বাঁধানো ঘাটের উপর নেমে এসেছে। কাশীতে দশাশ্বমেধঘাট প্রয়াগঘাটে যেমন এখানেও সেইরকম ছায়া-ঢাকা চৌকি স্নানার্থীদের জন্য পাতা আছে। কোণে কোণে কয়েকটা গহ্বর এইগুলো সাধুদের আশ্রয়। কয়েকজন সাধুকে সেইরকম গুম্ফাতে বসে থাকতে দেখলাম। সিঁড়ির ধারে কয়েকজন ভিক্ষুক এবং শিবপূজার বেলপাতা ও ফুল সাজিয়ে নিয়ে বিক্রীর জন্য কয়েকজন স্ত্রীলোকও বসে আছেন।

ঘাটে নেমেই রামদাসজী দীনদয়ালকে বললেন — প্রভু ওঁকারেশ্বরকে প্রণাম করেই দ্রুত 'ভজন আশ্রমে' চলে যাও। মঙ্গলদাস ও অচ্যুতদাসকে আমাদের কথা জানাবে। ঠাকুরজীর ভোগরাগের ব্যবস্থা যেন যথাসময়ে করা হয়। আমরা বারটা সাড়ে বারটা নাগাদ আশ্রমে পৌঁছাব। দীনদয়াল চলে গেল। তিনি কোটিতীর্থের জল আমার মাথায় ছিটিয়ে দিয়েই বললেন—ওঁকারেশ্বরের মহাতীর্থের আমিই তোমার তীর্থপাণ্ডা বা তীর্থগুরুর কাজ করব, সমস্ত ভাল করে দেখিয়ে দিব। ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রও তোমাকে সঙ্গে নিয়ে পরিক্রমা করিয়ে দেব।

হাসতে হাসতে বললেন — জান ত, তীর্থগুরুর কথা মান্য করতে হয়। মহাত্মা সুমেরদাসজীর দয়ায় আমি করাল ব্যাধির হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলাম। একথা তোমাকে আগেই বলেছি। তাঁর সেই সেবার ঋণ আমাকে শোধ করতে দাও। গরমকাল শেষ না হওয়া পর্যন্ত তুমি আমার আশ্রমে থাক। সেই হবে আমার তীর্থপাণ্ডা হিসাবে দক্ষিণা। আমি কোন উত্তর দিলাম না। কোটিতীর্থের ঘাটে কমণ্ডলুতে জল ভরে আমি তাঁর পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম।

পাহাড়ের গা বেয়ে সিঁড়ি উঠেছে। পাহাড়ের ঢালুতে লোকজনের ঘরবাড়ী চোখে পড়ছে। পাহাড়ের ঢালুতেই মন্দির। দুপাশে ছোট বড় অনেক মন্দির অনেক বিগ্রহ দেখতে দেখতে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের সামনে এলাম। সুন্দর শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। তার প্রান্তে শ্বেত ধবল সুউচ্চ মন্দির, যার সামনে নর্মদার সবুজ জল শান্ত স্থির, পিছনে পাহাড়ের গায়ে সবুজ গাছপালার সমারোহ, এই অপূর্ব পটভূমিকায় এই মন্দিরকে অপরূপ দেখাচ্ছে। মন্দিরের সামনে এবং আশেপাশে কত যে দেবমূর্তি। জালেশ্বর নন্দী গণপতি মহাবীর (হনুমান), দুর্গা, অবিমুক্তেশ্বর, শুকদেব, মান্ধাতা সবাই আছেন। রামদাসজী একে একে সব বিগ্রহ দর্শনান্তে আমাকে নিয়ে ঢুকলেন মূল ওঁকারেশ্বর মন্দিরের নাট মন্দিরে। পশ্চিমমুখী মন্দির। বিশাল বিশাল লাল পাথরের স্তম্ভ পর্বতগাত্রে এই মহাদেব মন্দিরকে সুউচ্চ ভিত্তির উপর খাড়া রেখেছে। স্তম্ভগুলি কারুকার্যমণ্ডিত। নাটমন্দিরের কক্ষতলে সাদা এবং কালো চৌকো পাথর বসানো আছে। নাটমন্দিরের প্রান্তে মন্দিরের গর্ভগৃহ, তার দরজা উত্তরমুখী। সেই গর্ভগৃহে মান্ধাতা পূজিত ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ স্বমহিমায় বিরাজমান।

প্রচণ্ড গরমের জন্য এ সময় তীর্থযাত্রীর ভীড় নাই বললেও চলে। নাটমন্দিরে কয়েকজন সাধু বসে জপ করছেন, দু'চারজন পাণ্ডাও ঘোরাফেরা করছেন পূজার্থী ভক্তের প্রতীক্ষায়। নাটমন্দিরের একপাশে গাঁঠরী এবং লাঠিটি ফেলে রেখে কমণ্ডলু হাতে এগিয়ে যাচ্ছি গর্ভমন্দিরের দিকে, এমন সময় পেছন থেকে আলখাল্লায় টান পড়ল। চোখ ফেরাতেই দেখতে পেলাম একজন লোলচর্ম বৃদ্ধ সাধু আমার আলখাল্লাকে ধরে আছেন। আমি থমকে দাঁড়াতেই রামদাসজী সে সাধুকে উদ্দেশ্য করে বললেন — ক্যা মাঁগতে হো জী?

বৃদ্ধ সাধু উত্তর দিলেন—মুঝে একদফে রেবাখণ্ডসে ওঁকারেশ্বরজীকা মহিমা শুনা দিজিয়ে।

রামদাসজী — আভী ইন্‌কো ছোড় দো। পূজা করকে আপকো পাঠ শোনায়েগা।

বৃদ্ধ সাধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন — ঔর ভি দো চার আদমী এ্যায়সাই বলকে গয়া। লেকিন্ গয়া ত গয়া। পূজাকা বাদ কোঈ আদমী লোটা নেহি। আঁখ হমারা খারাব হো গয়া। কুছ নেহি দেখাই দেতা।

আমি রামদাসজীকে বললাম — কে কখন কোন্ মুর্তিতে দেখা দেন তার কোন স্থিরতা নাই। ভক্তের কথা না রাখলে, ভক্তকে তুষ্ট না করে পূজা করতে গেলে হয়ত ওঁকারেশ্বর আমার পূজাই গ্রহণ করবেন না। ভক্তকী বঢ়াই ভগবানসে জ্যাদা হৈ। এই বলে আমি মেঝেতে কমণ্ডলু রেখে বৃদ্ধ সাধুর কাছে বসে পড়লাম। ময়লা গেরুয়া কাপড়ে জড়ানো দেবনাগরী অক্ষরে ছাপানো 'স্কন্দপুরাণম্' নামক বিরাট পুঁথি খুলে তিনি কম্পিত হস্তে আমার দিকে এগিয়ে দিতে দিতে বলতে থাকলেন — বড়ি কিরপা, বড়ি কিরপা। ভগবান ওঁকারেশ্বর আপকা ভালা করেঁ। আমি পুঁথি খুলে মহামুনি মার্কণ্ডেয় কথিত ওঁকারেশ্বর মহিমা পড়তে লাগলাম —

শ্রীবিশ্বেশ্বর উবাচ —

দ্ব্যধিকং দেবি জানীহি পঞ্চাশত্তমমীশ্বরম্।
ওঁকারেশ্বর ইত্যাখ্যা যস্যাস্তি ভুবনত্রয়ে॥
প্রাকৃতে কল্পসংজ্ঞেতু প্রথমে প্রথমং ময়া।
বক্ত্রাদুৎপাদিতো দেবি পুরুষঃ কপিলাকৃতিঃ॥

অর্থাৎ স্বয়ং বিশ্বেশ্বর মহাদেব পার্বতীদেবীকে বলছেন, হে দেবি, যিনি জগতে ওঁকারেশ্বর

নামে প্রসিদ্ধ, আমি সেই দ্বিপঞ্চাশত্তম ★ লিঙ্গের মাহাত্ম্য কীর্তন করছি, তুমি শুন। আমি পূর্বে প্রাকৃত কল্পে মুখ হতে এক কপিলাকৃতি পুরুষ সৃষ্টি করি। তাঁকে বলি — তুমি নিজের আত্মাকে বিভক্ত কর। 'কিভাবে আত্মাকে বিভক্ত করি' — সেই চিন্তায় যখন ধ্যানাবিষ্ট, সেই সময় আমার প্রসাদে তাঁর দেহ ভেদ করে ত্রিবর্ণস্বররূপী চর্তুবর্গফলপ্রদ ঋক্-যজুঃ- সাম নামক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবাত্মক ওঁকার স্বীয় প্রভাবে অখিললোক পরিব্যাপ্ত করে আবির্ভূত হলেন। ঐ সময় আমার উদার বাণী দ্বারা সমলঙ্কৃত হয়ে ঐ ওঁকারের হৃদয় হতে বষট্‌কার ধ্বনি উত্থিত হল। আর ছন্দঃশ্রেষ্ঠা চতুর্বিংশতিঅক্ষর বিশিষ্ঠা পঞ্চশীর্ষা মধুরভাষিণী দেবী গায়ত্রীও তাঁরই পাশে প্রকট হলেন। এই গায়ত্রী দেবীই সাবিত্রী নামে জগতে প্রসিদ্ধ।

গায়ত্রী মধুরা ভাষা সাবিত্রী লোকবিশ্রুতা॥
স চোঙ্কোরো ময়া প্রোক্তো গায়ত্র্যা সহ পার্বতি।
সৃষ্টিং কুরু মমাদেশাদ্বিচিত্রামনয়া সহ॥

হে পার্বতি ! আমি গায়ত্রী অনুস্যুত ঐ ওঁকারকে বললাম — তোমরা উভয়ে বিচিত্র সৃষ্টির প্রবর্তন কর। আমার কথা শুনে হিরন্ময় ত্রিশিখ ওঁকার স্বীয় জ্যোতিঃ থেকে বিবিধ সৃষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন। সর্বপ্রথমে বেদ প্রকট হলেন; পরে ক্রমে ক্রমে ৩৩ জন বৈদিক দেবতা, কয়েকজন ঋষি ও মানুষ সৃষ্টি হল ঐ ওঁকার থেকে। হে পর্বতাত্মজে! এই জগৎপ্রভু ভগবান ওঁকার কল্পান্তকালে দেবতা অসুরসহ সমগ্র জীবকুল সংহার করে নিজের মধ্যে লীন করে নেন পুনরায় সমগ্র ভূতজগৎ সৃষ্টি করে থাকেন। ওঁকারদেব অব্যক্ত, শাশ্বত এবং সর্বজগতের স্রষ্টা।

কর্তা চৈব বিকর্তা চ সংহর্তা চ মহাংস্তু যঃ।
ওঁকারপূর্বকা বেদা যজ্ঞাশ্চোঙ্কার পূর্বকাঃ॥
ওঁঙ্কারপূর্বকং জ্ঞানং তপশোচাঙ্কার পূর্বকম্।
স্বয়ম্ভুরিতি বিজ্ঞেয়ঃ স ব্রহ্মা ভুবনাধিপঃ॥

ওঁকারই কর্তা, বিকর্তা, সংহর্তা ও মহান্। ওঁকার হতেই বেদ, যজ্ঞ, জ্ঞান ও তপস্যার উৎপত্তি ঘটেছে। ওঁকারই ভূবনাধিপ স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মা, বায়ু, বিশ্বদেব, সাধ্য, রুদ্র, আদিত্য, অশ্বিনীকুমার, প্রজাপতি, সপ্তর্ষি, বসু, যক্ষ-রক্ষ-পিশাচ, দৈত্য, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র, ম্লেচ্ছাদি, চতুষ্পদ ও তির্যকযোনি; সর্বভূতে তিনি, ভূতনাথও তিনি। সমস্ত সৃষ্টিকার্য সমাপ্ত হলে ওঁকার আমার কাছে তাঁর স্থিতিযোগ্য পবিত্র স্থান নির্দিষ্ট করে দিতে বললে, আমি শূলেশ্বর দেবের পূর্বভাগে (অর্থাৎ শূলপাণি ঝাড়ির শূলপাণির পূর্বদিকে) মহাকাল বনকে (অর্থাৎ ওঁকারেশ্বর ঝাড়িস্থিত এই স্থানটি) তাঁর আবাসস্থল হিসাবে নির্দিষ্ট করে দিই —

মহাকালবনং দিব্যং সর্বসম্পৎকরং শুভং।
তত্র তে ভবিতা কীর্তিঃ শাশ্বতী নাত্র সংশয়ঃ॥
শূলেশ্বরস্য দেবস্য পূর্বভাগে ব্যবস্থিতম।
ত্রিকল্পপ্রভবং লিঙ্গং তন্নাম্না খ্যাতিমেষ্যতি।
ওঁঙ্কারেশ্বর ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি জগত্রয়ে॥
ইত্যুক্তা হি ময়া দেবি ওঙ্কারো হৃষ্টমানসঃ।
দদর্শ তত্র তল্লিঙ্গং তস্মিন্ লিঙ্গে লয়ং গতঃ॥

★ স্কন্দপুরাণের অবন্ত্যখণ্ডে 'চতুরশীতিলিঙ্গ মহাত্ম্যম' নামক অধ্যায়ে ৮৪ টি লিঙ্গের বর্ণনা আছে। ওঁকারেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ তাঁদের মধ্যে ৫২ তম।

এই মহাকাল বনে ত্রিকল্পকালে ব্যেপে যে লিঙ্গ বিরাজমান আছেন ঐ লিঙ্গ তোমার নামে ওঁকারেশ্বর নামে প্রসিদ্ধিলাভ করবেন। আমার এই কথা শুনে ওঁকার আনন্দিত হয়ে ঐখানে ঐ লিঙ্গকে দর্শন করে তাতেই লয়প্রাপ্ত হন। তদ্‌বধি ব্রাহ্মণগণ যাগ যোগ তপস্যা এবং যে কোন পুণ্য কার্যে ওঁকারকেই প্রথমে স্থান দিয়ে আসছেন। সহস্র যুগাদ্যায়, শত ব্যাতিপাত যোগ এবং সহস্র অয়নে তপস্যায় নিমগ্ন থাকলে কিংবা চতুর্বেদ অধ্যয়ন করলে যে পুণ্য হয়, ওঁকারেশ্বর দর্শনে সেই পুণ্যই লাভ হয়ে থাকে।

পুঁথি পাঠ করে বৃদ্ধ সাধুর দিকে তাকাতেই দেখলাম, লোলচর্ম বৃদ্ধ মেরুদণ্ড খাড়া রেখে 'সমকায়শিরোগ্রীব' হয়ে গভীর ধ্যানে মগ্ন আছেন। তাঁর দু'চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে। আমি কমণ্ডলু হাতে নিয়ে উঠে পড়লাম। চলেছি গর্ভ মন্দিরের দিকে ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে। এইমাত্র ওঁকারেশ্বরের যে মহিমার কথা পড়ে এলাম, তাতে মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছে। ত্রিকল্পকাল ব্যেপে যে মহাজ্যোতির্লিঙ্গ এখানে স্বমহিমায় প্রকট আছেন, তাঁকে স্বহস্তে পূজা করতে যাচ্ছি , মনের দৈন্য ধরা পড়ছে। সাধন-ভজনের অভাব, তপোবীর্যের অভাব, ভক্তির অভাব — সব কিছু মনে করিয়ে দিতে লাগল যে আমি অযোগ্য, অযোগ্য! অ উ ম — ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের সমন্বয় মূর্তি ওঁকার। তাঁর পূজা করার মত উপকরণ আমার নাই! যিনি একাধারে প্রণব ও পরপ্রণবতত্ত্ব, তাঁর সেই অতলান্ত নিগূঢ় তত্ত্ব বা রহস্য আমি ত স্বাধ্যায় করিনি! ওঁকারের মাহাত্ম্য শুনতে শুনতে বৃদ্ধ সাধুর যেমন ধ্যানলোকে, চৈতন্যভূমিতে উত্তরণ ঘটে গেল; তেমন সাধনা বা সাধ্য আমার কোথায়? দেবোভূত্বা দেবং যজেৎ, দেবং ভজেৎ, দেবং রসেৎ — ঋষিদের এই চেৎবাণী আমার মনে পড়ে গেল। মনে হচ্ছে আমার গোত্রপুরুষ, সেই প্রকৃষ্টরূপে বরণীয় ঔর্ব, চ্যবন, জামদগ্ন্য, শুক্রাচার্য প্রভৃতি ঋষিরা আমার দিকে ভ্রূকুটি করে বলছেন — এই মহাপূজায় তুই অনধিকারী! আমার শরীর থর থর করে কাঁপতে লাগল। হাতের কমণ্ডলুটাও কাঁপছে, এই বুঝি হাত থেকে পড়ে যায়। আমি থমকে দাঁড়িয়ে জলপূর্ণ কমণ্ডলু জাপটে ধরলাম। সহসা চোখের সামনে ভেসে উঠল — বাবার তেজোদীপ্ত মুখখানি। তিনি বলছেন — তুই অনধিকারী কিসে? আমার দীক্ষাবীর্য এবং মহাদেবের সপ্তাক্ষর মহাবীজই ত তোকে মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বরের পূজাবেদী মূলে টেনে এনেছে। নিজেকে অযোগ্য এবং অনধিকারী ভাবছিস্, লজ্জা করে না? ওঁকারেশ্বরের মহিমা যতই থাক, তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ মহিমা — তিনি ভক্তবৎসল আশুতোষ! তাঁকে পুণ্যপাবন কেউ বলে না, বলে পতিতপাবন। তাঁকে ধনী-বন্ধু আখ্যা কেউ দেয়নি, তাঁকে সবাই ডাকে দীনবন্ধু, দীনদয়াল বলে! এইসব কথা মনে জাগা মাত্রই আমি গর্ভগৃহের চৌকাঠ দ্রুত অতিক্রম করে ওঁকারেশ্বরের সামনে গিয়ে লুটিয়ে পড়লাম।

প্রণাম করে উঠে দু'চোখে ভরে দেখতে লাগলাম, অমল-ধবল ওঁকারেশ্বরের মহালিঙ্গকে। লিঙ্গমূলে নর্মদার সঙ্গে যোগ আছে, তাই নিত্য জলপূর্ণ চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মত একটি কুণ্ডের মধ্যস্থলে জেগে আছেন ওঁকারেশ্বর। ডানদিকে জ্বলছে ঘি এর জাগ-প্রদীপ যার শিখা কখনও নিভে না। পিছনে রয়েছে শ্বেতপাথর দিয়ে তৈরি মা পার্বতীর একখানি বিগ্রহ। অন্যান্য শিবলিঙ্গের মত ওঙ্কারেশ্বরের কোন যোনিপীঠ নাই। মহাত্মা রামদাসজী আমাকে জানালেন যে প্রকৃত জ্যোতির্লিঙ্গে কোন যোনিপীঠ থাকে না।

আমি কম্পিতহস্তে ওঁকারেশ্বরের মাথায় জল ঢালতে ঢালতে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলাম —

ওঁ নমো শিবায় বিষ্ণুরূপায় শিবরূপায় বিষ্ণবে।
শিবস্য হৃদয়ং বিষ্ণুঃ বিষ্ণোশ্চ হৃদয়ং শিবঃ ॥
ওঁ মুনীন্দ্রগুহ্যং পপিপূর্ণকামং কলানিধিং কল্মষনাশহেতুম্
পরাৎপরং যৎ পরমং পবিত্রং নমামি শিবং মহতো মহান্তম্।
নমামি শিবং মহতো মহান্তম্।
নমামি রামং মহতো মহান্তম্ ॥

পূজা করে বেরিয়ে এলাম। তিন চারজন পাণ্ডা রামদাসজীকে বললেন — সিয়ারাম সিয়ারাম! ইহ্ মূর্তি কাঁহাসে আয়াজী?

— বঙ্গালসে। ইনোনে পরিক্রমাবাসী হৈ।

এখানকার পাণ্ডারা পরিক্রমাবাসীদের পূজা করান না । এরা ধরেই নেন, পরিক্রমাবাসী মাত্রেই পূজাপদ্ধতি জানেন। অন্যান্য তীর্থযাত্রীদের সঙ্গেও এঁরা অত্যন্ত ভদ্র এবং সদয় ব্যবহার করে থাকেন। পাণ্ডাদের সামনেই রামদাসজী আমকে বললেন — ওঁকারেশ্বরের দর্শন ও পূজা করলেই পূজা সম্পূর্ণ হয় না।

এই মন্দিরের পঞ্চশিবের মধ্যে মাত্র একজনেরই পূজা করলে। আজ অনেক বেলা হয়েছে। কাল আবার নিয়ে আসব। দুমাস ত থাকবে। শিবপুরীসহ ব্রহ্মাপুরী বিষ্ণুপুরীস্থ সমস্ত শিবের পূজা করিয়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওঁকারেশ্বর পরিক্রমা করাব। এই সবকিছু নিয়ে ওঁকারেশ্বর।

নাটমন্দিরে এসে দেখি, সেই বৃদ্ধ সাধু এখনও ধ্যানস্থ। আমি গাঁটরীটি তুলে নিয়ে রামদাসজীর পিছনে চলতে থাকলাম। দ্বীপের দক্ষিণগাত্র দিয়ে পশ্চিমদিকে চলতে থাকলেন তিনি। যেদিকের ঢালুতে জনপদ দেখেছিলাম সেইদিকে। হাঁটছি সরু পাহাড়ী উঁচু নিচু পথ দিয়ে। মনে মনে ভাবছি, স্কন্দপুরাণ পাঠের পর আমার মন এত বিহ্বল হয়ে উঠেছিল কেন? পুরাণের বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠার মত লোক ত আমি নয়! আমার মানসিকতাতে ভক্তিরসের লেশমাত্র নাই। তবে কি, তবে কি বাবা যে বলতেন — Spirtuality is neither bought nor taught but can be caught like any othe infection from the Master soul অর্থাৎ অধ্যাত্মচেতনা কারও কাছ হতে কিছু মূল্য বা দক্ষিণা দিয়ে কেনা যায় না, শেখাও যায় না, যে কোন সংক্রামক রোগের বীজের মত অধ্যাত্মচেতনাও সংক্রামিত বা সঞ্চারিত হয় অধ্যাত্মপুরুষের চিন্ময় স্পর্শ থেকে! বৃদ্ধ সাধুর ভাবাবেগই সংক্রামিত হয়েছিল আমার মধ্যে, তাঁর স্বতঃস্ফূর্ত চোখের জলই আমার চোখে বান ডেকে এনেছিল। এমনও হতে পারে আমার এই সাময়িক ভাব বিহ্বলতা নিছকই বস্তুগুণ; ওঁকারেশ্বরের অমোঘ ও অনিবার্য প্রভাব!

— ব্যস্, ভজনাশ্রমমেঁ হমলোগ আ গিয়া জী। সামনে তাকিয়ে দেখি, একটি ছোট একতলা পাকা বাড়ীকে ঘিরে চারটি ছোট ছোট কুটীর, ফাটকে গৈরিক পতাকা পত্‌পত্ করে উড়ছে। একটি ছোট সাইনবোর্ডে হিন্দীতে লেখা আছে — 'ভজন আশ্রম'। আশ্রম থেকে ভেসে আসছে মৃদুকণ্ঠে —

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

মনে পড়ল, এই ত্রয়োদশাক্ষর যুক্ত মহাসিদ্ধ রামবীজ সমর্থ রামদাসস্বামী দিয়েছিলেন ছত্রপতি শিবাজীকে; এই মন্ত্রের চৈতন্যশক্তিতে উদ্দীপ্ত হয়ে তবেই ত তিনি তেজোদৃপ্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছিলেন —

একধর্ম রাজ্যপাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
বেঁধে দিব আমি　　　　রবীন্দ্রনাথ — (শিবাজী উৎসব)

অভীষ্ট এবং আদর্শ-রামচন্দ্রের মত চরিত্রবল, দেশাত্মবোধ, ক্ষাত্রবীর্য এবং সত্যনিষ্ঠা প্রভৃতি লোকদুর্লভগুণ সঞ্চারিত হয়ে জেগে উঠেছিলেন শিবাজী ঐ মহামন্ত্রেরই বলে।

আশ্রমে প্রবেশ করলাম। দীনদয়াল দৌড়ে এসে আমার গাঁঠরী ও কমণ্ডলু নিয়ে আমাকে একুট কুটীরে নিয়ে গেল। খুবই পরিচ্ছন্ন কুটীর, পাথরের মেঝে সিমেন্ট দিয়ে মাজা। একটা জলের কলসী ও ভাঁড় ছাড়াও মেঝেতে পাতা আছে একটি বড় কৃষ্ণসার মৃগচর্ম। আমি প্রথমেই গেলাম আশ্রম দেবতাকে প্রণাম করতে। একতলা মূল বাড়ীটির একটি প্রকোষ্ঠে রামদাসজী বাস করেন, অন্যটিতে ঠাকুরঘর। সীতারাম হনুমানজীর মূর্তি ছাড়াও একটি স্ফটিক লিঙ্গ এবং একটি শালগ্রাম শিলাও আছেন। প্রণাম করলাম। রামদাসজী আশ্রমিকদের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন — মঙ্গলদাস, অচ্যুতদাস এবং ষড়ঙ্গী মহারাজ। প্রথমোক্ত দুজন ব্রহ্মচারী, তৃতীয়জন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী — তিনজনই রামদাসজীর শিষ্য।

শ্রীশ্রীঠাকুরের পূজা ও ভোগ নিবেদন সমাপ্ত হয়ে গেছে। সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম।

কুটীরে ঢুকে মৃগচর্ম গুটিয়ে রেখে নিজের কুশাসনটা বিছিয়ে নিলাম। এমন গরম পড়ে গেছে যে কুশাসনে শুয়েও অস্বস্তি হচ্ছে। শুধু মেঝেতেই গড়াতে লাগলাম।

বেলা চারটা নাগাদ উঠে পড়লাম। উঁকি মেরে দেখলাম — সবাই যে যার ঘরের বারান্দায় বসে মৃদুকণ্ঠে ভজন করছেন — শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের স্বর্ণচূড়া দেখতে পেলাম। ভজন আশ্রমটি যে মূল মন্দিরের এত কাছে, আগে আন্দাজ করতে পারিনি। রামদাসজী বললেন — রেডি হো জাইয়ে, আভি এক জাগা আপ্‌কো লেকর যাউঙ্গা। 'রেডি' হবার আর কি আছে? সব সময় ত 'রেডিই' আছি। চোখে মুখে জল দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে আঁকা বাঁকা পথে এ বাড়ী সে বাড়ীর ধার দিয়ে মিনিট পনের হাঁটার পর আমাকে এক বিশাল বাড়ীর সামনে এসে দাঁড় করালেন। বাড়ীটা এখনও নির্মীয়মান। পাঁচতলা বিরাট অট্টালিকার তিনতলার কাজ সমাপ্ত হয়েছে মাত্র। একেবারে নদীর কিনার থেকে এই অট্টালিকার বনিয়াদ গেঁথে তোলা হয়েছে। সমস্ত ঢালু জুড়ে মোটা মোটা পাথরের থাম, তার উপরে পাথরেরই দুর্জয় খিলান। স্তম্ভের সারিগুলো একে একে নদীগর্ভ থেকে উঠেছে। সেই স্তম্ভগুলির উপর ভর দিয়ে চারদিকে চওড়া চওড়া বারান্দা টানা হয়েছে। অট্টালিকার পশ্চিমদিক থেকে লাল পাথরের পাকা সিঁড়ি নেমে গেছে নর্মদার ঘাট পর্যন্ত। নির্মাণকার্য সমাপ্ত হলে এই অট্টালিকা যে এক বিশাল প্রাসাদের রূপ নিবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। তিনতলার বারান্দায় একটি সাইনবোর্ড ঝুলানো আছে, তাতে লেখা আছে — বিকানীর নিবাসী গোপীকিষণ জয়কিষণ বাহাতী ধর্মশালা। এটি ওঁকারেশ্বর শৈলদ্বীপের বৃহত্তম ধর্মশালা।

আমি ভেবে অবাক হলাম, রামদাসজী আমাকে ধর্মশালায় নিয়ে এলেন কেন? সিঁড়ি বেয়ে রামদাসজী উপরে উঠতে লাগলেন, দোতালাও অতিক্রম করা হল। প্রত্যেক তলাতেই

সারি সারি অজস্র ঘর; গরমকালের জন্য ধর্মশালা খালি পড়ে আছে। তিনতলাতে আমরা উঠছি এমন সময় পঞ্চাশ বা পঞ্চান্ন বৎসরের একজন গৌরকান্তি প্রৌঢ় মানুষ শশব্যস্তে এসে রামদাসজীকে প্রণাম করলেন।

— সিয়ারাম, সিয়ারাম। লাডলীলালজী অব দেখিয়ে ইনকো তালাস কি লিয়ে আপনা পাশ হম্ তিন চার দফে আয়ে থে। ইনকা বারেমেঁই মহাত্মা সুমেরদাসজী মুঝে লিখ্যা থা।

লাডলীলালজীর পরিচয় দিতে গিয়ে আমাকে বললেন — এর নাম লাডলি লাল মুনিব। এই ধর্মশালার নির্মাণকার্য এবং রক্ষণাবেক্ষণের ভার এঁর উপর ন্যস্ত আছে। কথা বলতে বলতেই আমরা তিনতলার বারান্দায় উঠে এসেছি। মুনিবজী সেখানে বসার জন্য দুটি মৃগচর্ম পেতে দিলেন কিন্তু রামদাসজী বসলেন না। একেবারে পাঁচতলার ছাদে উঠতে চাইলেন। মুনিবজী বললেন — কৃপা করকে থোড়া ঠারিয়ে। এইবলে বারান্দা থেকে মাথা নুইয়ে দুজন মজুরকে ডেকে পাঠালেন। তাদেরকে বললেন, সিঁড়ির উপর লোহা লক্কড়াদি থাকলে তা সাফ করতে। চারতলা পাঁচতলার ছাদ সবে ঢালা হয়েছে মাত্র। ছাদ ঢালার সময় ছাদের তলায় যেসব সেগুন কাঠের ঠেকা দেওয়া হয়, সেগুলো এখনও দাঁড় করানই আছে। লোহালক্কড় ছাড়াও ইঁট পাথর চারিদিকে ছড়ানো। কোথাও আঘাত লেগে যেতে পারে এইজন্য মুনিবজী কয়েকবার নিষেধ করলেন। কিন্তু কে শোনে কার কথা। রামদাসজী সর্বোচ্চতলার শেষ ছাদে উঠবেনই। অগত্যা মুনিবজী অতি সাবধানে পা ফেলে ফেলে আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পাঁচতলার সর্বোচ্চ ছাদে উঠে এলেন। বলতে লাগলেন — গোপীকিষণজীকো হালৎ বহুৎ বুরা হ্যায়, উনকা ভারী বীমার হুয়া। নর্মদামায়ীকা কিরপাসে উন্‌কা তবিয়ৎ আচ্ছা হো জাবেগা ত দো-চার সাল্‌কা অন্দর ইহ্ পুরা কাম হাসিল হোগা, নেহি ত সারীকাম খতম করনেমে বহোতই মুস্কিল হোগা।

রামদাসজী তাঁর কথাগুলো কানে নিলেন বলে মনে হল না, তিনি ছাদে উঠেই আমাকে বললেন, ঐ দেখ সামনে বিষ্ণুপুরী, ঐ দেখ ব্রহ্মাপুরী, ঐ দেখ অমরেশ্বর বা মামলেশ্বরের মন্দির। বাঁ দিকে তাকাও, ঐ দেখ ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের স্বর্ণচূড়া সূর্যকিরণে ঝকমক করছে, সূর্যোকরোজ্জ্বল ঐ স্বর্ণদ্যুতি মনে করিয়ে দিচ্ছে ওঁকারেশ্বরের দিব্য হিরন্ময় দ্যুতিকে। ডানদিকে দেখ নর্মদামায়ীর বিস্তীর্ণ জলপ্রবাহও কি রকম চিক্‌চিক্ করছে। নর্মদাধারার দুইতটের গহন অরণ্যানী অদ্ভুত শোভা ধারণ করেছে!

খোলা ছাদের উত্তর পূর্বকোণে আমাকে টেনে এনে বললেন ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ, এই দ্বীপ থেকে মাইল দুই পূর্বে কুবের-ভাণ্ডারী। সেইখানে দক্ষিণ থেকে কাবেরী নদী এসে নর্মদার সঙ্গে মিলেছেন, আর দ্বীপের পূর্বতট ছুঁয়ে কাবেরী কিছুটা পূর্ব দিয়ে দ্বীপকে প্রদক্ষিণ করে দ্বীপের উত্তর তীর ধরে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়েছেন। সেই প্রবাহ আবার দ্বীপের পশ্চিম প্রান্ত ছাড়িয়ে গিয়ে উত্তর থেকে নর্মদায় গিয়ে মিশেছে। ওঁকারদ্বীপকে মাঝখানে রেখে কাবেরী নর্মদার যুগলধারা কেমন সুন্দরভাবে প্রাকৃতিক ওঁকারচক্র সৃষ্টি করছে! দেখতে পাচ্ছ ত?

সত্য কথা বলতে কি আমি পূর্বদিকের দু'মাইল দূরে অবস্থিত কুবের ভাণ্ডারী বা নর্মদা-কাবেরীর যুগল সংগমকে আদৌ চিহ্নিত করতে পারছিলাম না। কিন্তু তাঁর চোখের দৃষ্টি এত তীক্ষ্ণ ও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে যে মনে হচ্ছে তিনি ঐ দূরবর্তী স্থান এবং ওঁকারের আকারে

নর্মদার গতিপথ যেন স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছেন! তিনি বলে চলেছেন — ওঁ এর তলার দিকের শেষ বিন্দু যদি 'অ' অর্থাৎ ব্রহ্মা হন্ মধ্যস্থলের মণ্ডলটা 'উ' অর্থাৎ বিষ্ণু এবং শিরোদেশের প্রথম বিন্দুটা 'ম' অর্থাৎ মহেশ্বর। এই তিন তত্ত্বই উদ্ভূত হয়েছে ওঁকার বা প্রণব থেকে। তটস্থা পেরিয়ে চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুটাই পরপ্রণবতত্ত্ব। নর্মদামায়ী বুকে করে ধরে রেখেছেন এই প্রণব ও পরপ্রণবতত্ত্বকে; তাই মায়ের জলধারাও সেই তত্ত্বকে সূচিত করবার জন্য ওঁ এর আকারে বাঁক নিয়েছেন।

রামদাসজীর চোখের দৃষ্টি ক্রমেই অস্বাভাবিক হয়ে উঠছে! এ দৃষ্টি আমি চিনি। তাই সকলে তাঁকে জাপটে ধরে খোলা ছাদের প্রান্ত থেকে টেনে এনে ছাদের মধ্যস্থলে বসিয়ে দিলাম। দু তিন মিনিট পরেই ধাতস্থ হলেন। অব্ চলিয়ে নিচা মেঁ। এতক্ষণে বুঝতে পারলাম যে সর্বোচ্চ স্থানে দাঁড়িয়ে যাতে এক নজরে ব্রহ্মাপুরী শিবপুরী বিষ্ণুপুরীসহ নর্মদার গভীর অর্থব্যঞ্জক গতিপথকে দেখতে পাই, তা দেখাবার জন্যই তিনি আমাকে এই ধর্মশালাতে টেনে এনেছেন । তিনতলায় এসে বারান্দায় বসতেই, মুনিবজী তাঁর ঘর থেকে ওঁকার দ্বীপের একটি চিত্র এনে আমাদের সামনে মেলে ধরলেন। রামদাসজী ছাদে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ ধরে আমাকে যা বুঝাবার এবং দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন, মানচিত্রের মত এই চিত্রখানিতে সেইসব স্থান দেখতে পেলাম। চিত্রে নর্মদা-কাবেরীর গতি ওঁকারের মতই দেখাচ্ছে। আমি সেইকথা মহাত্মাকে বলতেই তিনি বললেন — হাঁ হাঁ, আমি যখন তোমাকে ওঁকারেশ্বর দ্বীপ পরিক্রমা করাব, তখন নিজের চোখেই নর্মদামায়ীর এই রূপ দেখতে পাবে, স্পষ্টভাবে বুঝতে পারবে। আমরা 'ভজন আশ্রমে' ফিরে এলাম। সূর্য অস্তমিত হচ্ছেন। একটু পরেই সন্ধ্যারতি ও ভজন আরম্ভ হয়ে গেল।

আশ্রমের প্রতিটি ঘরে প্রদীপ জ্বলছে। আরতির পর দীনদয়াল তার ঘরে প্রদীপের আলোতে পাণিনি ব্যাকরণ পড়তে বসল। আর সকলে যে যার ঘরে বসে ভজন ও ধ্যানে মন দিলেন। আমি আশ্রমের প্রাঙ্গণে নেমে পায়চারী করতে লাগলাম। হঠাৎ পিছন ফিরে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের চূড়ায় আলোকস্তম্ভ। বৈদ্যুতিক আলোর প্রভায় শ্বেতশুভ্র মন্দিরটিকে অপরূপ দেখাচ্ছে। ওঁকারেশ্বরের স্ফটিক লিঙ্গ স্মৃতিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল, যুক্তকরে প্রণাম করতে করতে উদাত্ত কণ্ঠে গেয়ে উঠলাম —

ওঁ গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতম্ হস্তে কপালং সিতং
খট্টাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্ধনি
সোহয়ং সর্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং সর্বদা॥

— যে পশুপতির গাত্র ভস্ম দ্বারা শুভ্র, যাঁর হাসি শুভ্র, যাঁর হস্তধৃত নরকপাল এবং খট্টাঙ্গ শুভ্র, যাঁর বৃষভ শুভ্র, কানের দুটি কুণ্ডলও শুভ্র, যাঁর জটা গঙ্গার ফেনায় শুভ্র এবং যাঁর মস্তকস্থিত চন্দ্র শুভ্র — এইভাবে যিনি সর্বশুভ্র তিনি আমায় পাপক্ষয়ের আশীর্বাদ (ঐশ্বর্য) সর্বদা দান করুন।

নিজের কণ্ঠস্বরে নিজেই সাবধান হলাম। অন্যান্য আশ্রমিকদের অসুবিধা হচ্ছে বিবেচনা করে, মনের উচ্ছ্বাস থামিয়ে ঘরে ঢুকে শুয়ে পড়লাম। শিব এবং বাবার কথা ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়লাম। পরদিন ভোরবেলা মঙ্গল আরতির শঙ্খ ও ঘন্টাধ্বনিতে ঘুম ভাঙল। আজ

২রা বৈশাখ। যড়ঙ্গী মহারাজ আরতি করছেন, রামদাসজী বসে আছেন ধ্যানাসনে। ঠাকুরকে প্রণাম করে আমি প্রাতঃকৃত্য শেষ করলাম। সকাল সাতটা নাগাদ রামদাসজী বললেন — চল ওঁকারেশ্বর মন্দিরে। কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান করে আজ ওঁকারেশ্বরসহ শূলপাণির অন্যান্য রূপের দর্শন ও পূজা করবে। আমরা ঢাল বেয়ে সরু পাহাড়ী পথে উপরের দিকে হাঁটতে হাঁটতে কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে প্রবেশ করলাম শ্বেত পাথরের সিঁড়ি বেয়ে। নাটমন্দিরে ঢুকে আজ আর সেই গতকালকার বৃদ্ধ সাধুকে দেখতে পেলাম না। অন্যান্য কয়েকজন সাধু বসে ধ্যান জপ করছেন। এই শৈলদ্বীপ এবং কাছাকাছি এলাকা থেকে কিছু ভক্ত এসেছেন পূজা করতে। পাণ্ডারা তাঁদেরকে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন। এক ফাঁকে আমি এবং রামদাসজীও ওঁকারেশ্বরকে পূজা করলাম।

গর্ভগৃহেরই এক কোণে একটি ছোট দরজা দিয়ে রামদাসজী একটি সরু সিঁড়ির মুখে আমাকে এনে দাঁড় করালেন। উঁচু উঁচু পাথরের ধাপ উপরের দিকে উঠে গেছে। রামদাসজীর পিছনে পিছনে সেই ধাপ বেয়ে উঠতে লাগলাম। বাইশটি ধাপ উঠার পরেই একটি কক্ষতলে পৌঁছিলাম। এতক্ষণ সিঁড়ি বেয়ে উঠে এসেছি আধো অন্ধকারে। দু'পাশে অন্ধকার পাথরের দেওয়াল। মন্দিরের এই দ্বিতল প্রকোষ্ঠে একটি মাত্র বড় জানালা। সেই জানালা দিয়ে আলো, বাতাস প্রবেশ করছে। এই কক্ষে এক শিবলিঙ্গ সমাসীন। রামদাসজী ওঁ নমো ভগবতে মহাকালেশ্বরায়, ওঁ নমো ভগবতে মহাকালেশ্বরায় বলে প্রণাম করলেন। বুঝলাম ইনি মহাকালেশ্বর। আমি শিবলিঙ্গে কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম —

মহাকালং মহাঘোরং তারকং ব্রহ্মরূপিনম্।
সর্বভূতাত্মভূতস্থং মহাদেবং নমাম্যহম্।।

আবার উঠতে লাগলাম অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে, তৃতীয় কক্ষতলে পৌঁছে দেখলাম সেখানেও মহাদেব। রামদাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বলে উঠলেন — ওঁ নম ভগবতে সিদ্ধনাথায়। সিদ্ধনাথের মাথায় জল ঢেলে আমিও প্রণাম করলাম —

নমাম্যহং সিদ্ধনাথং শ্রীনিবাসং পরাৎপরং।
ভূতেশং উমাপতিং ভদ্রং বিভূতিং ভূতিভূষণম্।।

সিদ্ধনাথ দর্শনের পর এবার চতুর্থতলে অর্থাৎ চারতলায় উঠতে হবে। যে সিঁড়ি দিয়ে উঠছি, সেই সিঁড়ি আরও সরু, অন্ধকার আরও ঘন। সেই শ্বাসরুদ্ধকর অন্ধকারে ঠাণ্ডা পাথরের দেওয়ালে হাত দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে কোনমতে একটি প্রকোষ্ঠে পৌঁছানো গেল। এই প্রকোষ্ঠের জানালা এত ছোট যে কেবল একটি ক্ষীণ আলোর রশ্মি ঢুকছে সেই ঘরে। ঘরে ঢুকেই মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন রামদাসজী। আমি কার্যতঃ কিছু দেখতে পাচ্ছি না। অপেক্ষা করছি রামদাসজী কি বলেন তা শোনার জন্য, রামদাসজী বারবার বলতে লাগলেন —

ওঁ নমো ভগবতে গুপ্তেশ্বর-মহাদেবায় জন্মকর্মবিনাশিনে।।

ইতিমধ্যে আমার চোখ হতেও অন্ধকারের ঘোর কেটে গেছে। আমি দেখতে পেলাম প্রকোষ্ঠের মধ্যস্থলে একটি ছোট নর্মদালিঙ্গ। মহাদেবের কাছে গিয়ে লিঙ্গের মাথায় জল ঢেলে প্রণাম করলাম —

সূর্যমণ্ডলমধ্যস্থং গুপ্তেশ্বরং নমাম্যহং।
মায়ামোহনিরাশায় প্রপন্নজনসেবিনে।।

রামদাসজী এবার বললেন — দর্শন এখনও বাকী। আরও একতলা বাকী, সোজাভাবে দাঁড়িয়ে সিঁড়ি ভাঙতে পারবে না। একপেশে হয়ে গুঁড়ি মেরে উঠতে হবে। এই বলে তিনি মাথা ঝুঁকিয়ে গুঁড়ি মেরে একপেশে হয়ে উঠতে লাগলেন। রামদাসজীর বয়স হয়েছে, তিনি হাঁপাচ্ছেন। আমিও তাঁকে অনুকরণ করে একই ভঙ্গীতে অনুসরণ করলাম। অনেক কষ্টে উঠে এলাম সর্বোচ্চ প্রকোষ্ঠে, পাঁচ তলায় মন্দির চূড়ার ঠিক নিচে, ক্ষুদ্র গোলাকার প্রকোষ্ঠ — সামনের সমস্ত দেওয়াল জুড়ে জানালা, আলো হাওয়ার ঝর্ণা বইছে যেন। ঘরটির মাঝখানে সিঁদুর মাখানো একখানা ত্রিশূল, ত্রিশূলের গায়ে রক্তপতাকা। রামদাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললেন — ইনিই ওঁকারের পঞ্চম রূপ, নাম ধ্বজাধারী।

ত্রিশূলের মাথায় কমণ্ডলুর শেষ জলটুকু ঢেলে দিয়ে আমি প্রণাম করলাম —

শ্রীত্রিশূলং মহাবাহুং মহান্তং দীপ্ততেজসম্।
সর্বদৈত্যনিসূদনং নমস্তে ধ্বান্তধ্বংসিনম্॥

ওঁকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সিদ্ধনাথ, গুপ্তেশ্বর এবং ধ্বজাধারী — শিবপুরীস্থিত ওঁকরেশ্বর মন্দিরের এই পঞ্চ শিবের পূজা হয়ে গেল। একই পথে সেই হাঁফধরা অন্ধকারাচ্ছন্ন সিঁড়ি ভেঙে পিতৃদত্ত মহাবীজ জপ করতে করতে নেমে এলাম একতলার সেই গর্ভগৃহে, যেখানে ওঁকারেশ্বর লিঙ্গ বিরাজিত। পুনরায় ওঁকারেশ্বরকে প্রণাম ও পূজা করা বিধি। মন্দিরের প্রধান পাণ্ডা আমার কমণ্ডলু খালি দেখে জল ভরে দিলেন। আমি মন্ত্রোচ্চারণ করে ওঁকারেশ্বরের মাথায় জল ঢালার উদ্যোগ করছি, এমন সময় পিছন থেকে কেউ বলে উঠলেন — হম মন্ত্র বাতাউঁ ? চমকে তাকিয়ে দেখলাম — সেই বৃদ্ধ সাধু যাঁকে গতকাল নাটমন্দিরে আমি স্কন্দপুরাণ পড়ে ওঁকারের মাহাত্ম্য শুনিয়েছিলাম। তিনি আমার সম্মতি অসম্মতির জন্য অপেক্ষা করলেন না, বম্-বম্-ববম্-বম্ গালবাদ্য করতে করতে মন্ত্র পড়তে লাগলেন —

ওঁ প্রত্যগানন্দং ব্রহ্মপুরুষং প্রণবস্বরূপম্। অকার-উকার-মকার ইতি।
ওঁ সর্বভূতস্থং একং বৈ নারায়ণং কারণপুরুষং অকারণম্ পরং ব্রহ্ম ওম্॥
ওমিতি ব্রহ্ম। ওমিতি ব্রহ্ম।

অর্থাৎ অকার উকার মকারাত্মক আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। তিনিই সর্বজীবের অন্তরশায়ী কারণস্বরূপ নারায়ণ। অন্তরশায়ী প্রত্যগাত্মা তাই নারায়ণই শিব, শিবই নারায়ণ, নরগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল। তিনি স্বয়ং কোন কারণসম্ভূত নন, তিনিই পরমব্রহ্ম ওঁকার। ওঁকারই ব্রহ্ম। ওঁকারই ব্রহ্ম।

আমি যতক্ষণ শিবের মাথায় জল ঢাললাম, এক একটি করে চন্দনলিপ্ত বিল্বপত্র সমর্পণ করলাম, ততক্ষণই বৃদ্ধ সাধু মন্ত্রটি পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করে গেলেন। সাধুর মন্ত্র পড়তে কোন ক্লান্তি নাই। প্রণাম করে উঠে দেখি রামদাসজী বৃদ্ধ সাধুর হাত ধরে নাটমন্দিরের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন। নাটমন্দিরে তাঁকে বসিয়ে দিবার পর জিজ্ঞাসা করলাম — এইমাত্র মন্দিরে যে মন্ত্রপাঠ করলেন, ঐ মন্ত্র কোথায় আছে?

— নারায়ণ উপনিষৎ মেঁ, ঔর অর্থবশির উপনিষৎ মেঁ।

তিনি আর কথা বললেন না। আমি তাঁকে প্রণাম করে রামদাসজীর সঙ্গে 'ভজন আশ্রমে' ফিরে এলাম। ষড়ঙ্গী মহারাজ আশ্রম দেবতার পূজা করছেন। মঙ্গলদাস এবং অচ্যুতদাস সমস্বরে গাইছেন —

শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

পূজারতি ও ভোগ নিবেদনের পর আমরা প্রসাদ পেলাম। এই আশ্রমে প্রতি মঙ্গলবার, বৃহস্পতিবার এবং শনিবার অর্থাৎ সপ্তাহে তিন দিন সৎসঙ্গ হয়। ত্রয়োদশাক্ষর রামনামের ভজনগান ত অহরহ হচ্ছেই। আজ বৃহস্পতিবার, তাই সৎসঙ্গের আসর বসল। কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাও এসেছেন, ধর্মশালার কার্যাধ্যক্ষ লাডলীলালজীও এসেছেন। আশ্রম প্রাঙ্গণেই ভক্তদের জন্য আসন পাতা হয়েছে। আমি দুপুরে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মুখ হাত ধুয়ে আমিও আসরে বসলাম। তুলসীদাসজীর রামচরিতমানস হতে রামদাসজী বন্দনা গেয়ে শোনালেন। তারপর বলতে লাগলেন — কাল এই শৈলেন্দ্রনারায়ণজী ওঁকারেশ্বরজীকে যে মন্ত্রে পূজা করেছিলেন, সেই মন্ত্র আমার খুব ভাল লেগেছিল। মন্ত্রের তাৎপর্য ছিল — যিনি শিব, তিনিই বিষ্ণু — নমঃ শিবায় বিষ্ণুরূপায়, শিবরূপায় বিষ্ণবে। একথা ধ্রুবসত্য যে রামচন্দ্র, মহাদেব এবং বিষ্ণুতে কোন ভেদ নাই। তবে যে যার ইষ্টনিষ্ঠা থাকা ভাল। শিবের কৃপা না হলে রাম নামের রহস্য বুঝা যাবে না, আবার রামের কৃপা না হলে শিবতত্ত্বের অতল রহস্য কিছুতেই উপলব্ধিতে ফুটবে না। তবুও কেউ যদি রামচন্দ্রের উপাসক হন, শিব ও বিষ্ণুর বিগ্রহে রামচন্দ্রকেই দর্শন করার রতি থাকা চাই। আবার শিব বা বিষ্ণু মন্ত্রের উপাসক হলে শ্রীরামবিগ্রহের মধ্যে নিজের ইষ্টকে দর্শন করার জন্য ব্যাকুল প্রাণে কান্না চাই। এরই নাম ইষ্টনিষ্ঠা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ রামগতপ্রাণ ভক্তরাজ মহাবীরজী বিষ্ণু ভগবানকে দর্শন করে বলেছিলেন —

শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদ পরমাত্মনি।
তথাপি মম সর্বস্বঃ রামঃ রাজীবলোচনঃ।।

প্রভুঃ! আপনি লক্ষ্মীপতি স্বয়ং বিষ্ণু ভগবান। আপনাতে এবং সীতাপতি রামচন্দ্রে কোন প্রভেদ নাই। আমি জানি উভয়ে একই পরমাত্মা। তথাপি আমার হৃদয় সর্বস্ব হলেন কমললোচন রামচন্দ্র। আপনি দয়া করে আমার কাছে সেই প্রিয়তমরূপে প্রকট হউন। ভক্তরাজের ঐকান্তিক প্রার্থনায় সুদর্শনধারী বিষ্ণু ধনুর্ধারী রামচন্দ্ররূপেই তাঁকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করেছিলেন। তুলসীদাসজীর জীবনেও এইরকম ঘটনা ঘটেছিল। এ যুগের ঋষি বাল্মীকিতুল্য যিনি, সেই তুলসীদাসজী নিজেই 'রামচরিতমানস' মহাগ্রন্থে তা উল্লেখ করে গেছেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে নানাস্থানে পরিভ্রমণ করতে করতে বৃন্দাবনে গিয়ে পৌঁছান। গোটা বৃন্দাবন জুড়ে রাধে রাধে, রাধাকৃষ্ণ নামের জয়ধ্বনি শুনতে শুনতে তাঁর মনে ধাক্কা লাগে, কৈ কোথাও ত তাঁর আরাধ্য দেবতা সীতারামের নাম কীর্তন হয় না! বৃন্দাবন তাঁর ভাল লাগল না, মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে বিষণ্ণ অন্তঃকরণে বসে থাকেন তিনি। ঝুলন পূর্ণিমা এসে গেছে। সেদিন সারা বৃন্দাবনে মহামহোৎসব। রাধাকৃষ্ণের নামকীর্তনে সারা বৃন্দবন মুখরিত, সকলের মধ্যে আনন্দের সাড়া পড়ে গেছে। একজন ভক্ত তুলসীদাসজীকে একরকম জোর করেই মদনগোপালজীর মন্দিরে নিয়ে গেলেন। মনোরম সাজে শ্রীবিগ্রহকে সাজানো হয়েছে সেদিন। শ্রীবিগ্রহকে দর্শন করে তাঁর মত ভক্তের কিছুতেই মন ভরে উঠছে না! একি ভাব বিপর্যয়! শ্রীবিগ্রহকে ভক্তিভরে প্রণাম করতেও তাঁর ইচ্ছে হচ্ছে না। ভক্তচূড়ামণি তখন বংশীধারী মদনমোহনজীর দিকে তাকিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলেন —

কহা কহোঁ ছবি আজকী ভলে বনো হে নাথ।
তুলসী মস্তক জব নবৈ ধনুরবাণ লো হাথ।।

অর্থাৎ হে নাথ। আজ তোমার এই নয়নাভিরাম সুষমার কি বর্ণনা আমি দিব? অপরূপ মনোহরণ বেশে তুমি সেজে রয়েছ। কিন্তু তুলসী যখন তোমার চরণকমলে মাথা নত করবে তখন বাঁশী ফেলে হাতে ধনুর্বাণ নাও দয়াল, রাজীবলোচন রঘুনাথকে না দেখতে পেলে তার মনে ত তৃপ্তি আসবে না!

তুলসীদাসজীর জীবনী পাঠক মাত্রেই জানেন যে, ভক্তের এই প্রার্থনা পূরণের জন্য সেদিন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু মদনমোহনজী ধনুর্ধারী রামচন্দ্র রূপেই প্রকট হয়েছিলেন, তুলসীদাসজী স্বয়ং তাঁর এই দিব্যদর্শনের কথা লিখে গেছেন।

কিরীট মুকুট মাথে ধর্যো ধনুষ বান লিয়ো হাথ।
তুলসী নিজ জন কারণে নাথ ভয়ে রঘুনাথ॥

অর্থাৎ ভক্তবৎসল ভগবান সেদিন নিজজন তুলসীদাসের আবদার রক্ষার জন্য মাথায় নেন রাজমুকুট, হাতে তুলে নেন ধনুর্বাণ।

সৎসঙ্গ সাঙ্গ হল, তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে আরতির আয়োজন চলছে, ঘন্টা বাজছে, ঢং ঢং ঢং। রামদাসজী বললেন — দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে আরতি দেখে এস। কাল ভোরেই তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ব্রহ্মাপুরী বিষ্ণুপুরী দেখিয়ে নিয়ে আসব। মন্দিরের ঢাল বেয়ে আমরা দুজনে মন্দিরে গিয়ে প্রবেশ করলাম। মন্দিরের সমস্ত প্রকোষ্ঠ আলোকমালায় সুসজ্জিত। ওঁকারেশ্বরের সামনে জ্বলছে — ঘৃতপ্রদীপ, অনির্বাণ এই দীপশিখা। স্বয়ম্ভূ শিবলিঙ্গ যেন ধ্যানমগ্ন ধূর্জটি, তাঁর পিছনেই রয়েছেন বিশ্বার্তিহারিণী মা পার্বতী।

মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জয়ানন্দ গোঁসাই। ভক্তিভরে আরতি করলেন অনেকক্ষণ ধরে। প্রাণভরে আরতি দেখলাম। মন্দিরের যেসব বাসিন্দা থাকেন, গৃহী ও সাধু, নারী ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় ত্রিশজন ভক্ত আরতি দেখতে উপস্থিত হয়েছেন। আরতির পর গর্ভমন্দিরের সামনে একটি রৌপ্যনির্মিত দোলা খাটালেন পূজারীরা। এবার ওঁকারেশ্বর শয়ন করবেন, বিশ্রাম করবেন, মন্দিরদ্বার বন্ধ হবে। ভক্তরা অন্তরের অনুরাগ মিশিয়ে এইভাবে সেবার অভিনয় করে থাকেন, কারণ আত্মবৎ সেবা করাই বিধি। নতুবা সৃষ্টি স্থিতি সংহারের বিধাতা ত্রিলোকব্যাপ্ত মহেশ্বরের আবার শয়ন ও বিশ্রাম কি ! তাঁতেই ত অন্তঃকালে সমগ্র প্রাণীজগৎ স্থূল সূক্ষ্ম কারণজগৎ শয়ন করে থাকে। (শেরতে শেতে ইতি শিবঃ) শিব যদি শয়ন করেন অর্থাৎ জগদাদি কার্য হতে নিবৃত্ত হন, তাঁর সেই শয়ন বা বিভ্রান্তিই ত মহাপ্রলয় ডেকে আনবে!

মন্দির থেকে দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে আসছি, সামনেই দেখলাম সেই বৃদ্ধ সাধু দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁর কাছে গিয়ে 'নমো নারায়ণায়' বলে অভিবাদন করা মাত্রই আমার হাতটা জাপটে ধরে বললেন —শিবমস্তু! শিবমস্তু! বেটা তুমহারা লিয়ে হম্ ইধর খাড়া হ্যায়। আইয়ে হমারা সাথমেঁ।

দীনদয়ালকে বললেন — বেটা তুম্ ইধর সিঁড়িকা উপর পন্দর-বিশ মিনট্ কি লিয়ে বৈঠো, নর্মদামাতাকো স্পর্শ করকে আভি আ যাউঙ্গা।

সেদিন দেখেছিলাম — চোখে ছানি পড়ায় ইনি ভালভাবে দেখতে পান না। অত্যন্ত ক্ষীণ দৃষ্টি! এই শৈলদ্বীপের কোথায় কোন কোটরে থাকেন তাও আমার জানা নাই। এখন অবশ্য মন্দির চূড়ার অত্যুজ্জ্বল আলোতে কোটিতীর্থের ঘাট আলোকিত হয়েছে, কিন্তু অন্ধকারে ঘাট

বেয়ে ইনি এলেন কি করে? কৈ কাউকে ত সঙ্গেও দেখতে পাচ্ছি না। বয়স যে কত তাও অনুমান করতে পারছি না। সাহস করে জিজ্ঞাসাই করে ফেললাম — আপ্‌কা ইহ্‌ শরীরকা উমর ক্যাত্‌না হুয়া জী? ইহ্‌ মূর্তিকা শুভনাম কেয়া?

— শ' সাল ত জরুর বীত গয়া। গুরুনে ইহ্‌ শরীরকো নাম দিয়া প্রলয়দাস্‌। প্রলয় কী ক্যা মতলব, মুঝে বাতাইয়ে ত? উমর কিস্‌কো কহা যাতা হৈ?

আমি বললাম — প্রলয় মানে ত সকল কিছুর ধ্বংস বা লীন হওয়া বুঝায়। আর উমর বলতে মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হবার কাল হতে এ পর্যন্ত যে সময় গত হয়েছে, সেই বয়সটাকে উমর বলে।

— না, তোমার উত্তর ঠিক হল না। মাতৃজঠরে আবদ্ধ থাকার মত কাল ও কর্মের কারাগারে জীব যতদিন আবদ্ধ থাকে, তা সন্ন্যাসীদের বয়স গণনা কালে ধর্তব্যই নয়। গুরু কৃপায় তৃতীয় চক্ষু উন্মীলিত হওয়ার পর যখন মহেশ্বরের দিব্য চেতনায় জীব আলোর জগতে উদ্ভাসিত তূরীয় চৈতন্যে জেগে উঠে, কাল ও কর্মের বন্ধন হতে মুক্ত হয়, সেই সময় হতেই সন্ন্যাসীর বয়স গণনা করাই যুক্তিযুক্ত। আর প্রলয় শব্দের যথার্থ অর্থ একটু পরেই বলব। এখন নর্মদার কাছে গিয়ে কোথাও বসি চল।

কথা বলতে বলতে আমরা নর্মদাধারার কাছে পৌঁছে গেছি। উভয়ে মাথায় জল ছিটিয়ে বাঁধানো ঘাটের এক কোণে সিঁড়ির উপর বসলাম। পিছন ফিরে একবার দেখে নিলাম দীনদয়ালকে, সে মন্দিরের নিচেই শ্বেতপাথরের সিঁড়ির উপর বসে আছে।

প্রলয়দাসজী আমাকে বলতে লাগলেন — তোমার বাবা তোমাকে এখানে পাঠিয়ে কৃতার্থ করেছেন। এই স্থান যে কিরকম অসাধারণ বৈশিষ্ঠ্যপূর্ণ তা বেদব্যাসের উক্তিতেই শোন। তাঁর রচিত মহাভারতের বনপর্বে (১০১ অধ্যায়ে) আছে, লোমশ মুনি তীর্থভ্রমণরত যুধিষ্ঠিরকে বলছেন —

দেবনামেতি কৌন্তেয়! তথা রাজ্ঞাং সলোকতাম্‌।
বৈদূর্যপর্বতম্‌ দৃষ্ট্বা নর্মদামবতীর্থ চ ॥
সন্ধিরেষ নরশ্রেষ্ঠ ! ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
এতমাসাদ্য কৌন্তেয় ! সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

অর্থাৎ হে কুন্তীনন্দন! ঐ দেখ সামনে বৈদূর্যপর্বত দেখা যাচ্ছে। এখানে নর্মদা নদীতে স্নান করলে দেবলোক ও রাজলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই বৈদুর্য পর্বত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিকালে জন্মেছিল। এই স্থানে আগমন করলে মানুষ সর্বপ্রকার পাপ হতে মুক্ত হয়।

স্বয়ং ভগবান বেদব্যাস লোমশ মুনির মুখ দিয়ে শ্লোকের মধ্যে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন —'সন্ধিরেষ' অর্থাৎ এই নর্মদাতটস্থ বৈদূর্য পর্বত ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের সন্ধিস্থল। এই সন্ধিস্থলে বসে তোমাকে যে কথাগুলি বলছি তা মন দিয়ে শোন। অর্থবশির উপনিষদে আছে —

সকৃদুচ্চরিতমাত্রং স এষ ঊর্ধ্বমুৎক্রাময়তি ইতি ওঁকারঃ।
প্রাণান্‌ সর্বান্‌ পরমাত্মনি প্রণাময়তীতি তস্মাৎ প্রণবঃ।

অর্থাৎ ওঁকার একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই দেহস্থ স্বাভাবিক নিম্নগ ক্রিয়া সুষুম্নাপথে (উৎ) ঊর্ধ্বগামী হয় বলেই এর নাম হয়েছে — ওঁকার। প্রাণাদি আভ্যন্তর বায়ু এই

ওঁকারধ্বনিতে প্রলীন হয় বলেই এর দ্বিতীয় নাম — প্রলয়। এই ওঁকারই প্রাণাদিকে পরমাত্মার অভিমুখে নমিত করে বলে এর তৃতীয় নাম — প্রণব।

ওঁকারস্তু প্লুতোস্ত্রিনাদ ইতি সংজ্ঞিতঃ
অকারস্তু অথ ভূর্লোক উকার ভুব উচ্যতে ॥
স ব্যঞ্জন মকারস্তু স্বর্লোকস্থু বিধীয়তে
অক্ষরৈস্ত্রিভিরেতৈশ্চ ভবেদাত্মা ব্যবস্থিতঃ ॥

অর্থাৎ দীর্ঘ প্রণব অর্থাৎ ওঁকারের অপর নাম "ত্রিনাদ" কারণ এটি তিনটি শব্দবিশিষ্ট — অকার, উকার এবং মকার। অকার ভূর্লোক, উকার ভূবর্লোক এবং মকার স্বর্লোক। এই ত্রি-অক্ষর সমন্বিত ওঁকারেই পরমাত্মা অবস্থিত।

অকার অর্থাৎ পৃথিবীর বর্ণ পীত, উকার অর্থাৎ আকাশ বিদ্যুৎবর্ণ আর মকার অর্থাৎ স্বর্লোক হল শুক্লবর্ণ। ওঁকারের সাধনা করতে করতে যখন পীতজ্যোতি মণ্ডিত আকাশ ভেসে উঠবে তখন জানবে ভূলোক ভেদ করলে, যখন বিদ্যুৎময় আকাশ ভাসবে তখন ভূবর্লোক ভেদ হল আর যখন শুক্লজ্যোতির্মণ্ডিত আকাশ পূর্ণ করে ওঁকারের ধ্বনি শুনবে তখন বুঝবে স্বর্লোকে তোমার গতি হল। ওঁকারই তোমাকে চিদাকাশ, দহরাকাশ, মহাকাশ, পরাকাশ, সূর্যাকাশ একে একে ভেদ করে মহ্, জন, তপঃ এবং সত্যলোকে নিয়ে ব্রহ্মময় ব্রহ্মস্বরূপ করে তুলতে সমর্থ।

এই ওঁকার কোন স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণ নয়। কণ্ঠ, তালু, ওষ্ঠ, নাসিকা দ্বারা ওঁ উচ্চারণ করা যায় না। যদক্ষরং ন ক্ষরতে কথঞ্চিৎ। এর কোন কালে অনুমাত্রও ক্ষয় না বলে একে অক্ষর বলা হয়। ওঁকার শব্দাতীত এবং আকাশ সদৃশ নির্মল ও অনন্ত। এই ওঁকারের সাধনাই বৈদিক ঋষিদের উদ্‌গীথ উপাসনা, সাক্ষাৎ ব্রহ্মসাধনা। তাই ছান্দোগ্য উপনিষদের স্পষ্ট ঘোষণা —

ওমিত্যেদক্ষরং ব্রহ্মনুদগীথমুপাসীত।

মূর্ধ্বাস্থানে এই ওঁকারের সাধনা করতে হয়। সাধনা করতে করতেই ওঁ শব্দ ক্রমে নিঃশব্দে পরিণত হয় — নিঃশব্দং তৎপরং বন্ধা পরমাত্মেতি গীয়তে।

আজ এই সন্ধিস্থলে ওঁকারেশ্বরের পাদমূলে বসে তোমাকে যা বললাম নিত্য তা মনন করবে। কোন এক সময় ঋষিদের সেই গুহ্যতম ওঁকার সাধনা তোমাকে আমি শিখিয়ে দিব। এখন তুমি যাও। আগামী কাল তোমার বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরী যাবার কথা আছে। কিন্তু সাবধান! বিষ্ণুপুরীর মন্দিরে বিষ্ণু ভগবান এবং লক্ষ্মীমাতাকে দর্শন কিংবা ব্রহ্মাপুরীতে ব্রহ্মেশ্বরকে দর্শন করতে গেলেই রামদাসজী যাই বলুন তোমার পরিক্রমা ভঙ্গ হতে বাধ্য। ওপারের দক্ষিণতটে বিষ্ণুপুরী ও ব্রহ্মাপুরীর মাঝখানে আছেন অমরেশ্বর বা অমলেশ্বর বা মামলেশ্বর। উনি জ্যোতির্লিঙ্গ, সেখানে ইন্দোরের মহারাজা হোলকারদের নিযুক্ত বাইশজন ব্রাহ্মণ দৈনিক ত্রিশহাজার শিবলিঙ্গ তৈরী করে সেইসব পার্থিব শিবলিঙ্গ পূজার পর নর্মদার জলে বিসর্জন দিতেন। সম্প্রতি রাজার রাজত্ব গেছে, কিন্তু পার্থিব শিবলিঙ্গের পূজা এখনও বন্ধ হয়নি। অমরেশ্বরের মন্দিরের পাশেই আছেন বীরেশ্বর শিবমন্দির। কিন্তু এ সবই দক্ষিণতটে। তুমি উত্তরতট ধরে পরিক্রমা করছ। নর্মদা মাতার বক্ষে জেগে উঠা এই বৈদূর্য পর্বতে এসে ওঁকারেশ্বর দর্শন করলে বা এই সারা শৈলদ্বীপটিকে পরিক্রমা করলে পরিক্রমা

ভঙ্গ হয় না। এসে ভালই করেছ, বরং না এলেই অপরাধ হত। কিন্তু খবরদার! ভ্রমক্রমে বা কারও উপদেশে দক্ষিণতটে যাবে না। রেবাসংগমসে লোটনেকা বখৎ অর্থাৎ ফিরে আসার সময় দক্ষিণতটস্থ অমলেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ এবং পুনরায় ওঁকারেশ্বরকে দর্শন ও পূজা করবে। আমি পুনরায় স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, তুমি পরিক্রমার শপথ নিয়েছ। এ বস্তু বড়ই কঠিন। শাস্ত্রানুসারে এই ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারলে স্বয়ং মা রেবাই তোমাকে শিবতপস্যার সিদ্ধি দান করবেন।

আমি তাঁকে প্রণাম করে বললাম — চলুন আপনাকে আপনার গুফায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যাই।

— কোঈ জরুরত নেহি। মন্দিরের দিকে অঙ্গুলি সংকেত করে বললেন — অন্ধাকো নয়ন কা জ্যোতি মন্দর মেঁ বৈঠল হ্যায়। এই বলে হাসতে লাগলেন।

আমি সিঁড়ি বেয়ে দীনদয়ালের কাছে পৌঁছে গেলাম। বড়জোর এখন রাত্রি আটটা হবে। মন্দির ও পথঘাট সবই এর মধ্যে জনমানবশূন্য হয়ে পড়েছে। ভজন আশ্রমে এসে দেখি রামদাসজী আশ্রম প্রাঙ্গনে পায়চারী করছেন। আমাকে দেখেই বললেন — প্রভুজীকে আরতি দর্শন আচ্ছিতরেসে কিয়া ত? আভি বিশ্রাম করিয়ে, ভজন করিয়ে, জপ করিয়ে, জো আপকা খুশ্‌।

হাসতে হাসতে আরও বললেন যে কাল সকালে তোমাকে বিষ্ণুপুরী, ব্রহ্মাপুরী নিয়ে যাব বলেছিলাম বটে কিন্তু পরে ভাল করে ভেবে দেখলাম দক্ষিণতটস্থ ঐসব মন্দির দেখতে গেলে তোমার পরিক্রমার ব্রত ভঙ্গ হবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে বরং কাল সকালে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এই দ্বীপ পরিক্রমা করিয়ে নিয়ে আসব।

— তথাস্তু! আমি আর কি উত্তর দিব?

নিজের ঘরে ঢুকে এক কমণ্ডলু জল পান করে আমার একমাত্র সম্বল কুশাসন শয্যার উপর বসে নানা কথা ভাবতে লাগলাম। সকালে এই আশ্রমে বসে রামদাসজী যে আমাকে আগামীকাল বিষ্ণুপুরীর মন্দির বা অমরেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ নিয়ে যাবার সংকল্প প্রকাশ করেছিলেন, সে কথা প্রলয়দাসজী জানলেন কি করে? আবার কোটিতীর্থের ঘাটে বসে প্রলয়দাসজী দক্ষিণতটে যেতে আমাকে যে নিষেধ করেছেন, রামদাসজী তা জানলেন কি করে? দীনদয়াল ত আমাদের কাছ হতে অনেকদূরে বসে ছিল, তার পক্ষে সেসব কথা শুনতে পাওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া শুনতে পেলেও সে যে আশ্রমে এসে রামদাসজীকে জানাবে তারই বা অবকাশ কোথায়? আশ্রমে প্রবেশ করেই ত সে তার ঘরে ঢুকে গেছে। আশ্রমের উঠানে রামদাসজী পায়চারী করছিলেন, আমি আশ্রমে পৌঁছান মাত্রই তাঁর মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করলেন। বাবার আদেশেই যে পরিক্রমা করতে এসেছি এ কথাই বা প্রলয়দাসজী জানলেন কি করে? এমনও হতে পারত যে আমি স্বেচ্ছায় কিংবা পিতা ছাড়া অন্য কোন মহাত্মা আমার দীক্ষাগুরু হলে তাঁর আদেশেও ত নর্মদা পরিক্রমায় আসতে পারতাম। গুলজা গ্রামের ঠাড়েশ্বরী মহারাজ কিংবা হোলিপুরা থেকে হণ্ডিয়া পর্যন্ত যিনি আমার সঙ্গী ছিলেন সেই দিওয়ানাজীর কথাতে দেখতাম, কোন কথাই তাঁদের অবিদিত নাই। এঁরা কি সবাই অর্ন্তযামী? নর্মদাতে আসার পূর্ব হতে এখন পর্যন্ত যখন যেখানে যাঁর সঙ্গে কথা বলে থাকি না কেন সব কথার শব্দতরঙ্গ কি ইথারের মাধ্যমে vibrated হয়ে এইসব

রহস্যময় সাধুদের কানে এসে প্রবেশ করেছে? চিন্তাসূত্র ছিন্ন হল রামদাসজীর মধুর কণ্ঠস্বরে। তিনি ভক্তিস্নিগ্ধ কণ্ঠে গেয়ে চলেছেন —

রাম নাম মণি দীপ ধরু, জীহ দেহরি দ্বার।
তুলসী ভীতর বাহিরউ, জো চাহসি উজিয়ার॥

অর্থাৎ দেহমন্দিরের যে প্রকোষ্ঠের মধ্যে জীবাত্মার বাস, সেই প্রকোষ্ঠের দুয়ারে রাম নামের মণি-প্রদীপ প্রজ্বলিত কর, তুলসীদাস বলেছেন, তাহলে ভিতর ও বাহির আলোয় আলো হয়ে উঠবে।

নাম রাম কো কল্পতরু কলি কল্যাণ নিবাস।
জো সুমিরত ভব ভাঁগতে, তুলসী তুলসীদাস॥

অর্থাৎ তুলসীদাস এই দোঁহায় বলেছেন — রামনাম কল্পদৃশ । কল্পবৃক্ষসদৃশ। কল্পবৃক্ষের কাছে যে যা প্রার্থনা করে তা যেমন পূর্ণ হয়, তেমনি রামনাম করলে জীবের কোন কামনাই অপূর্ণ থাকে না। এই ঘোর কলিযুগে রামনামে সকল কল্যাণের বীজ নিহিত। রামনাম স্মরণ ও জপ করলে ভববন্ধন ঘুচে যায়।

মধুর চেয়ে মধুরতর , মধুময় রামনাম শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম। খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল আশ্রমে মঙ্গলারতির শব্দে। ধড়ফড় করে উঠে বসলাম। বাইরে এসে তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য সেরে এলাম। ইষ্টদেবতাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে রামদাসজী বললেন — চল পরিক্রমায় বেরিয়ে পড়ি। এই শৈলদ্বীপ সাড়ে তিন মাইল লম্বা, প্রস্থে প্রায় দুমাইল । এখনই না বেরিয়ে পড়লে ফিরতে অনেক বেলা হয়ে যাবে। মঙ্গলদাসজীকে কিছু প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে লাঠি এবং কমণ্ডলু হাতে আমিও তাঁর পিছন পিছন হাঁটতে লাগলাম। ভোরের বাতাসে শরীর মন জুড়িয়ে গেল। হাঁটতে আজ আরও আরাম লাগছে, আজ কাঁধে সেই গাঁঠরীর বোঝা নাই।

দ্বীপের দক্ষিণ গাত্র দিয়ে পশ্চিম দিকে দুজনে হাঁটতে লাগলাম। পর্বতের ঢালু দিয়ে উঠা নামা চলছে। সরু পথে মাঝে মাঝে কিছু স্থানীয় লোকের কাঁচা পাকা বাড়ীঘর অতিক্রম করতে করতে অত্যন্ত সংকীর্ণ রাস্তায় ছোট বড় পাথর ডিঙাতে ডিঙাতে প্রায় আধ মাইলটাকে হেঁটে প্রথমেই পৌঁছালাম খেড়াপতি হনুমানজীর মন্দিরে। মহাবীরের মূর্তি দর্শন করে রামদাসজী সাষ্টাঙ্গ দিলেন। আমাকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন — ভগবান রামচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ ভক্ত মহাবীরজী। সিদ্ধ রামনামের চাবিকাঠি এই ভক্তরাজের হাতে। রামনামের অমৃত ইনিই কলির জীবদের জন্য বিলিয়ে চলেছেন। তুলসীদাসজী রামচরিতমানসে মহাবীরের বিশেষণ দিয়েছেন 'কলিবিটপ কুঠারী', অর্থাৎ কলিরূপ বৃক্ষের বিনাশকারী কুঠার। তুমি জান কিনা জানি না, তুলসীদাসজী যখন কাশীর তুলসীঘাটে ছিলেন, সেই সময় তিনি গঙ্গাস্নান করে এসে একটা গাছের তলায় পা ধুয়ে অবশিষ্ট জলটুকু সেই গাছে ঢেলে দিতেন। সেই গাছে ছিল এক ব্রহ্মদৈত্যের বাস। তুলসীদাসজী প্রদত্ত সেই জলে সে পিপাসা মেটাত। একদিন গভীর রাত্রে আত্মপ্রকাশ করে সে তুলসীদীসজীকে বলে — আমি তোমার উপর খুব সন্তুষ্ট হয়েছি। তোমার ইষ্টদর্শনের যদি অভিলাষ থাকে, তবে দশাশ্বমেধ ঘাটের কিছুটা উত্তরে যেখানে নিত্য রামায়ণ পাঠ হয়, সেখানে স্বয়ং হনুমানজী বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে এসে পাঠ শোনেন। তুমি তাঁকে ধর তবেই তোমার ইষ্টসিদ্ধি হবে। সেই প্রেতের নির্দেশমত তুলসীদাসজী সেই রামায়ণ পাঠের আসরে

গিয়ে একজন জরাজীর্ণ ব্রাহ্মণকে দেখতে পান। পাঠ শেষে তিনি যখন চলে যাচ্ছিলেন তখন তাঁকে অনুসরণ করতে করতে গিয়ে তাঁর পদতলে তুলসীদাসজী লুটিয়ে পড়েন। তুলসীদাসজীর কান্না এবং আর্তিতে করুণার্দ্র হয়ে স্বয়ং মহাবীরজী তাঁকে রাম সাধনার গুহ্য সংকেত দান করেন। তুলসীদাসজী তাঁর এই সদ্‌গুরুর উদ্দেশ্যে লিখে গেছেন —

বন্দউঁ গুরুপদ কল্প কৃপাসিন্ধু নররূপ হরি।

অর্থাৎ তুলসীদাসজীর ধ্যানদৃষ্টিতে হনুমানজী শৈব শক্তির মূর্ত বিগ্রহ। তুমি বিশ্বাস করবে কিনা জানি না, বিশেষ করে সুমেরদাসজী-তাঁর চিঠিতে তোমার যে বৈদান্তিক বিচারনিষ্ঠ মনের পরিচয় লিখেছেন, তাতে বলতে ভয় পাচ্ছি, তবুও বলছি, আমরা তুলসীদাসজীর ভক্তরা বিশ্বাস করি যে, স্বয়ং মহেশ্বরই রামনাম কীর্তনের লোভে ত্রেতাযুগে হনুমানজীরূপে প্রকট হয়েছিলেন।

আমি কোন মন্তব্য করলাম না। খেড়াপতি হনুমানজীর মন্দির হতে একটু দূরেই কেদারেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের দরজা খুলে কেদারেশ্বরকে দর্শন করে তাঁর মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢেলে প্রণাম করলাম। কাশীর কেদারঘাটের কেদারেশ্বর এবং হিমালয়ে গৌরীকেদার দর্শনের সৌভাগ্যও আমার ইতিপূর্বে হয়েছে, নর্মদাতটের এই কেদারেশ্বরজীকেও দর্শন করলাম। তিন স্থানেই দেখছি শিবলিঙ্গের আকৃতি একই প্রকার — ঠিক যেন একটি পাথরের ধামা উলটানো আছে। প্রভেদের মধ্যে কোথাও কিঞ্চিত ছোট; কোথাও বড়, কিন্তু রং রূপ একই।

কেদারেশ্বর মন্দির অতিক্রম করে পাথর ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে আরও আধ মাইল হাঁটার পর এমন একস্থানে এলাম যেখানে জলের ধারা প্রচণ্ড শব্দে কল কল করে বয়ে চলেছে। রামদাসজী বললেন — এ হল নর্মদা-কাবেরী সংগম। সামনে যে মন্দির দেখছ, ঐ মন্দিরে ব্রহ্মার মূর্তি আছে। এইখানে কুবের তপস্যা করেছিলেন। রাবণ যুদ্ধে কুবেরকে পর্যুদস্ত করে তাঁর নবনিধি সহ সমস্ত ধনভাণ্ডার লুট করে নিয়েছিলেন। হৃতসর্বস্ব কুবের এইখানে তপস্যা করে ব্রহ্মার বরে-পুনরায় নবনিধি প্রাপ্ত হন এবং যক্ষপতি রূপে অভিষিক্ত হন। এইজন্য এই স্থানের নাম — কুবেরভাণ্ডারী তীর্থ ; আমরা ওঁকারেশ্বরের মন্দির হতে উত্তরপূর্ব দিকে প্রায় দু'মাইল রাস্তা হেঁটে এসেছি। নর্মদার উত্তরতটের দিকে সোজা তাকিয়ে দেখ, এই ভাণ্ডারী তীর্থের ঠিক বিপরীত দিকে চব্বিশ অবতারের মন্দিরের চূড়া অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে। ঐখানেই তোমার সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হল দীনদয়ালের বাড়ীতে। এই নর্মদা-কাবেরী সংগম পরম পবিত্র স্থান। তুমি সংগমের জল মাথায় নাও এবং কিছুক্ষণ জপ কর। এখানে জপের ফল সহস্রগুণ।

আমার জপ শেষ হলে তিনি বললেন — ঔর কয় কদম আগে বারাহী সংগম, উস্‌কা বাদ চণ্ডবেগা সংগম, চলিয়ে উধার। কিছুটা এগিয়ে দেখলাম, ওঁকারেশ্বরের পর্বতশৃঙ্গ হতে পরপর ঝরণার আকারে দুটি ছোট নদী এসে নর্মদাতে মিশেছে। দুটি সঙ্গমস্থল অতিক্রম করার পর পাথরের ছোট ছোট চাঙড় ভরা পার্বত্য পথে হাঁটতে হাঁটতে রামদাসজী বললেন — চণ্ডবেগা সংগম পেরিয়ে কিছু আগে পুরাণ প্রসিদ্ধ এরণ্ডী ক্ষেত্র। আমি তোমাকে সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি। শৈলদ্বীপের এই অংশটি ছোট জঙ্গলের মত। সেগুন বুনো নিম এবং বেলগাছে ভর্তি। পথ বলতে বিশেষ কিছু নাই। উঁচু নিচু খণ্ড খণ্ড পাথরের উপর দিয়েই হাঁটতে হচ্ছে।

পথ নাই কিন্তু পাথরের উপরেই গভীর দাগ দেখে অনুভব করা যায় যে এপথে মানুষের যাতায়াত আছে। কুড়ি পঁচিশ মিনিট হাঁটার পর জঙ্গলের বাইরে এসে দেখলাম এই শৈলদ্বীপের ঢালুতে গর্জন করতে করতে নর্মদা আছড়ে পড়ছে। অতি প্রাচীন একটি পাথরের মন্দির। মন্দিরে পনের কুড়িজন নারীপুরুষের ভীড়। সবাই পূজা দিতে এসেছেন। পাঁচজন মহিলা হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। এখানে ভক্ত ছাড়াও পাণ্ডা পুরোহিতরাও আছেন, মন্দিরে পূজো করছেন পুরোহিত। শঙ্খ, ঘন্টা, শিঙা ও ডম্বরুর কলরোলে এবং মহাদেবের জয়ধ্বনিতে চারিদিক মুখরিত। অমরকন্টক মুণ্ডমহারণ্য থেকে ওঁকারেশ্বর ঝাড়ির দুই তৃতীয়াংশ মত নর্মদাতট আমি অতিক্রম করে এসেছি, কত প্রসিদ্ধ তীর্থ ও শিবমন্দির দর্শন করে এলাম, এখান ছাড়া আর কোথাও গৃহস্থ বধূকে হত্যা দিয়ে পড়ে থাকতে দেখিনি। আমি তার কারণ জিজ্ঞাসা করতেই রামদাসজী বললেন — উত্তরতটের দিকে তাকিয়ে দেখ, ঐখানে বিন্ধ্যপর্বতের শীর্ষ হতে এরণ্ডী নদী প্রবাহিত হয়ে এসে ভীষণ বেগে নর্মদাতে পতিত হয়েছে। বেগের সেই প্রচণ্ডতার দরুণই এরণ্ডীর ধারা নর্মদার জলকে উথাল পাথাল করে তুলছে, তার ফলে ওঁকারেশ্বর পর্বতের এইখানটাতে জল পর্বতের গায়ে এসে ঢেউ তুলে আবার ভেঙে পড়ছে নর্মদার বুকে। একটি নদী প্রবাহিত হয়ে এসে ঠিক যেখানটাতে অপর নদীতে মেশে, সেই স্থানকেই সাধারণতঃ সংগম বলা হয়। সেদিক দিয়ে বিচার করলে আক্ষরিক অর্থে উত্তরতটে এরণ্ডী ও নর্মদা নদীর সংগম স্থানকেই এরণ্ডীসংগম বলা উচিত। কিন্তু নর্মদার সঙ্গে মিশে এরণ্ডীর ধারা এখানেও এসে ধাক্কা দিচ্ছে বলে সংগমস্থল হতে এই শিবমন্দির পর্যন্ত ক্ষেত্রকে এরণ্ডীক্ষেত্র বা এরণ্ডীসংগম বলা হয়। মন্দিরস্থ এই শিবের নাম মন্মথেশ। স্বয়ং মন্মথ এই সুপ্রাচীন শিব স্থাপন করেছিলেন বলে এই শিবের নাম মন্মথেশ। মন্মথের অপর নাম কামদেব। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বলে মহাদেব এখানে কামদ। এ সম্বন্ধে স্কন্দপুরাণে শিববাক্য হল — ভ্রূণহত্যাহরং দেবি কামদং পুত্রবর্ধনং। মহামুনি মার্কণ্ডেয় এস্থানে তপস্যা করে এই মন্মথেশ শিবের মহিমা ব্যক্ত করতে গিয়ে যুধিষ্ঠিরকে বলেছিলেন —

অনপত্যা যা চ নারী স্নায়াদ্বৈ পাণ্ডুনন্দন।
পুত্রং সা লভতে পার্থ সত্যসন্ধং দৃঢ়ব্রতং॥

অর্থাৎ বন্ধ্যা নারীও এই তীর্থে স্নান করলে সত্যসন্ধ দৃঢ়ব্রত সন্তান লাভ করে। এখানে রাত্রি জাগরণ ও নৃত্যগীতাদির দ্বারা এই মন্মথেশের পূজা করে যাঁরা প্রত্যক্ষ ফল অর্থাৎ পুত্রলাভ করেছেন এমন কয়েকজন মহিলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে। চৈত্র মাসের শুক্লা ত্রয়োদশী তিথিতে বন্ধ্যা মায়েদের ভীড় বেশী হয়। যেখানে স্বার্থসিদ্ধির সম্ভাবনা থাকে সেখানে কি ভক্তের কোন অভাব হয়? বিশেষতঃ মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িতে হিংস্র জন্তুর যে উপদ্রব আছে, এখানে সে ভয় নাই বললেও চলে। সেই সুপ্রাচীন যুগ হতেই এরণ্ডীক্ষেত্রে এই ধারা চলে আসছে। অন্যে পরে কা কথা। মহর্ষি অত্রির পত্নী মহাসতী অনসূয়াদেবীও পুত্রলাভ কামনায় এই এরণ্ডী সংগমে এসে এরণ্ডীক্ষেত্রাধিপতি মন্মথেশের তপস্যা করেছিলেন।

তাঁর কঠোর তপস্যায় প্রীত হয়ে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর একসঙ্গে তাঁর কাছে প্রকট হয়ে বর দিতে চাইলে তিনি প্রার্থনা করেন — আপনারা তিনজনেই আমার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করুন।

মহাদেব তখন বলেন —

এবং ভবতু তে বাক্যং যত্ত্বয়া প্রার্থিতং শুভে।
প্রত্যক্ষা বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নাম নামতঃ।।
যস্যা দর্শন মাত্রেণ নশ্যতে পাপসঞ্চয়ঃ।।

— ভদ্রে! তুমি যা প্রার্থনা করলে, আমরা তা পূর্ণ করব। শুধু তাই নয়, যাঁর দর্শনে সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হয়, সেই প্রত্যক্ষ বৈষ্ণবী মায়া এরণ্ডী নামে এই স্থানে বিরাজ করুন।

অযোনিজা ভবিষ্যামস্তব পুত্রা বরাননে।
যোনিবাসে মহাপ্রাজ্ঞি দেবা নৈব ব্রজন্তি চ।।

— দেবতারা গর্ভবাসে গমন করেন না; অতএব আমরা যোনিজন্ম ব্যতীত তোমার পুত্ররূপে প্রাদুর্ভূত হব।

তদনুযায়ী ব্রহ্মা সোম নাম নিয়ে, মহেশ্বর দুর্বাশা নাম নিয়ে, এবং বিষ্ণু দত্তাত্রেয় নাম নিয়ে অনসূয়ার পুত্ররূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

রেবাখণ্ডে এরণ্ডীক্ষেত্রের বিস্তৃত বিবরণ পড়ে নিও। এখন যাও, মন্দিরে প্রবেশ করে মন্মথেশ এবং বৈষ্ণবীশক্তি মহাদেবী এরণ্ডীমাতাকে দর্শন করে এস। সেইমাত্র পূজা হয়েছে, ফুল বেলপাতায় শিবলিঙ্গ ঢাকা, ভাল করে স্বরূপ দর্শন হল না, এরণ্ডীমাতার বিগ্রহ এতই সিন্দুরলিপ্ত যে তাঁরও বিগ্রহ কারও পক্ষে স্পষ্টভাবে দেখার উপায় নাই। মন্মথেশ এবং এরণ্ডীমাতার শ্রীচরণে জল ঢেলে প্রণাম করে বেরিয়ে এলাম।

রামদাসজীর সঙ্গে আবার হাঁটতে আরম্ভ করলাম। তিনি ঢালু থেকে বৈদূর্য পর্বতের চূড়ার দিকে, পূর্বমুখে চড়াই বেয়ে উঠতে লাগলেন। ভাবলাম, চূড়ায় উঠার মতলব নাকি! না, মিনিট দশেক এইভাবে উঠে তিনি পশ্চিম দিকে বাঁক নিলেন। সেইদিকে কিছুটা হাঁটার পর পাথরের গায়ে পরিষ্কার পথরেখা চোখে পড়ল। কোটিতীর্থের ঘাট থেকেও একটি পরিষ্কার পথ রেখা এসে এই রাস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। সেখান থেকে কিছুক্ষণ হাঁটার পরেই দূর থেকে একটি মন্দির চোখে পড়ল। মন্দিরের কাছাকাছি আরও একটি পাকা বাড়ী, একটু দূরেই স্থায়ী বাসিন্দাদের কিছু বাড়ী ঘরও চোখে পড়ল। মন্দিরে পৌঁছেই রামদাসজী বললেন — এই হল ঋণমুক্তেশ্বর শিব। আচার্য শংকর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। এইখানেই আছেন রণছোড়জী শ্রীকৃষ্ণ। এখানে বিচিত্র পূজার ধারা, মন্দিরে পৌঁছে যা দেখবে, তাতে তোমার মনে হবে পূজার নামে তামাসা চলছে। রোজই এখানে ভক্তদের ভীড় হয়, দূরদূরান্ত থেকে দক্ষিণতটের বিষ্ণুপুরী ঘাট থেকে খেয়া নৌকায় পেরিয়ে ভক্তরা এসে যাঁরাই ওঁকারশ্বরকে দর্শন করেন, তাঁদের অধিকাংশ লোকই ঋণমুক্তেশ্বরের চরণে পাঁচপোয়া অড়হর ডাল ঢেলে যান। ভক্তদের বিশ্বাস এই পাঁচপোয়া ডাল ঋণমুক্তেশ্বরের চরণে অর্পণ করলেই পার্থিব সমূহ ঋণের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়া যাবে!

— তামাসা ভাবব কেন? অমরকন্টক হতে আসার পথে মুণ্ডমহারণ্যের নিকটস্থ এক পল্লীতে কুকুরামঠেও শংকরাচার্য কর্তৃক স্থাপিত আর একটি ঋণমুক্তেশ্বর শিব দর্শন করে এসেছি; সেখানেও পূজার পদ্ধতি এই রকম — মহাদেবের শ্রীচরণে পাঁচপোয়া অড়হর ডাল সমর্পণ। উভয় স্থলে ভক্তদের সংস্কার ও বিশ্বাসও এক। দেবতার চরণে পাঁচপোয়া ডাল ঢেলে দিলেই সর্বঋণ হতে মুক্তি, এই সংস্কারকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারিনি, একথা সত্য। কারণ তাহলে ত একজন মহাজনের কাছে কিংবা নিকট আত্মীয় বন্ধু বান্ধবের কাছে

সহস্র সহস্র টাকা ধার করে এখানে এসে পাঁচপোয়া মাত্র ডাল ঢেলে দিয়ে বলতে পারে — ব্যস্ আমার বিবেক পরিষ্কার আমি ঋণমুক্ত হয়ে গেলাম।

এত লঘু অর্থে আচার্য শংকর কোন শিব প্রতিষ্ঠা করে নাম দিবেন ঋণমুক্তেশ্বর, এ কথা ভাবতে আমার মন সায় দেয় না।

মানুষ জন্মানো মাত্রই কতগুলি ঋণ তার ঘাড়ে চাপে। মাতৃঋণ, পিতৃঋণ, ঋষিঋণ, দেবঋণ, সমাজ বা দেশঋণ — এই পঞ্চঋণে আমরা সবাই আবদ্ধ। তারমধ্যে মাতৃঋণ ও পিতৃঋণ অপরিশোধ্য; ভক্তিভরে তাঁদের আমৃত্যু সেবা পরিচর্যা করতে হয়। শাস্ত্রকারদের মতে ঋষিঋণ শোধ হয় ঋষি প্রণীত শাস্ত্রের অধ্যায়ন, অধ্যাপনা, মনন, স্বাধ্যায় এবং ভাষ্য প্রভৃতি রচনার দ্বারা। পূজা জপ তপস্যা যজ্ঞ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের দ্বারা দেবঋণ শোধ হয়। জনহিতকর কার্যে, দেশের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে এবং দেশকে সর্বতোভাবে সমৃদ্ধ করার কাজে আত্মনিয়োগ করলে দেশঋণও শোধ হয় বলে শুনি। শিবকল্প মহাযোগী শংকরাচার্য ঋণমুক্তেশ্বর প্রতিষ্ঠা করে হয়ত মানুষকে ঐসব ঋণ বিষয়ে অবহিত করতে চেয়েছেন; ঐসব কাজ যাতে সার্থক ভাবে সুসম্পন্ন করতে পারা যায় সেইজন্য ঋণমুক্তেশ্বর নামা মহাদেবের আশীর্বাদ ভিক্ষা করার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছেন।

এখন চলুন, মন্দিরে গিয়ে মহাদেবকে প্রণাম করি। মন্দিরের চত্বরে দেখলাম কয়েকজন ভস্মমাখা সাধু জপ ধ্যানে নিরত আছেন। মন্দিরের পাকা বাড়ীতে পুরোহিত থাকেন যাত্রীরাও সেখানে থাকতে পান। মন্দিরে ঢুকে দেখি ভক্তরা পাঁচপোয়া করে ডাল শিবের কাছে ঢেলে দিয়ে; হর নর্মদে হর, জয় ঋণমুক্তেশ্বর মহাদেও বলে জয়ধ্বনি দিচ্ছেন। এখানেও পাণ্ডারা কোন দক্ষিণা ভক্তদের কাছে দাবী করছেন না। যে যা দিচ্ছেন গ্রহণ করছেন। না দিলেও কিছু বলছেন না। পাঁচ পোয়া ডাল দিলেই তাঁরা খুশী হচ্ছেন। এই শিবলিঙ্গও কুকুরামঠের ঋণমুক্তেশ্বরের অনুরূপ। এরপর রণছোড়জীর বিগ্রহও দর্শন করলাম। মুরলী ও শিখিপুচ্ছধারী শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ।

আমি রামদাসজীকে জিজ্ঞাসা করলাম —

— দ্বারকাতে রণছোড়জীর বিশাল মন্দির এবং নয়নাভিরাম রণছোড়জীর বিগ্রহ আমি দর্শন করেছি। কৃষ্ণগতপ্রাণা মহাসাধিকা মীরাবাঈএর আরাধ্য দেবতা এই নর্মদা-সৈকতের পর্বতশীর্ষে কিভাবে অধিষ্ঠিত হলেন?

— তুমি দৈত্যরাজ বলীর পুত্র বাণাসুর এবং তৎকন্যা উষার কাহিনী পড়নি?

— পড়েছি ত বটেই, আমাদের বাংলাদেশে উষা অনিরুদ্ধকে নিয়ে যাত্রাভিনয়ও আমি দেখেছি। দ্বারকাধিপতি শ্রীকৃষ্ণের গুণধর পৌত্র অনিরুদ্ধ মহারাজ বাণের কন্যা উষার সঙ্গে অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত হয়েছিলেন। তিনি উষাকে অপরহরণ করবার চেষ্টা করলে মহারাজ বাণ তাঁকে কারারুদ্ধ করেন। পেয়ারের নাতিকে উদ্ধার করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ পুত্র প্রদ্যুম্নকে নিয়ে বাণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে আসেন। বাণ পরাজিত হন। শ্রীকৃষ্ণ উষা ও অনিরুদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে দ্বারকায় ফিরে যান।

— হ্যাঁ, কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ সেই যুদ্ধান্তে এই পর্বতশীর্ষে বসে যোদ্ধবেশ ত্যাগ করেন। সেই ঘটনারই স্মারকচিহ্ন এই মন্দির এবং বিগ্রহ। এখানে রণবেশ ছেড়ে ছিলেন বলে তাঁর নাম হয়েছে 'রণছোড়জী'।

বাণরাজার রাজধানী ছিল এই নর্মদাতটে। প্রবল পরাক্রান্ত বাণ শুধু যে অসাধারণ

শৌর্যবীর্যেরই অধিকারী ছিলেন এটাই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় নয়, তিনি ছিলেন অসাধারণ শিবভক্ত। মহারাজ বাণের উগ্র শিব-তপস্যায় ভক্তিবশ ভগবান মহাদেব এতই পরিতুষ্ট হয়েছিলেন যে তিনি নিজেই 'বাণ' নাম গ্রহণ করে ভক্তের অতুলনীয় ভক্তি ও তপস্যাকে চিরস্মরণীয় করে রেখছেন। তাই বাণ শব্দের অর্থও হয়েছে শিব। তিনি বাণলিঙ্গরূপে স্বতঃই নর্মদার জলে উদ্ভূত হয়ে নিয়ত নর্মদাতে বিরাজমান থাকবেন, এ বর তিনি বাণকে দিয়েছিলেন। তোমার পরিক্রমা পথে যখন ধাবড়ীকুণ্ডে পৌঁছবে তখন সেখানে অজস্র বাণলিঙ্গ দেখতে পাবে। ঐ ধাবড়ীকুণ্ডই ছিল বাণের যজ্ঞকুণ্ড এবং তপস্যাস্থল। এ বিষয়ে স্বয়ং মহাদেবের উক্তি হল —

স্বয়ং সংস্রবতে লিঙ্গং গিরিতো নর্মদাজলে।
পুরা বাণাসুরেণাহং প্রার্থিতো নর্মদাতটে।
অবিবসং গিরৌ তত্র লিঙ্গরূপী মহেশ্বরঃ।
বাণলিঙ্গমপি খ্যাতমতোহর্থাজ্জগতীতলে।।

ঋণমুক্তেশ্বর ও রণছোড়জী দর্শন করে রামদাসজী পশ্চিমদিক থেকে পাহাড়ের উত্তর ঢাল বেয়ে হাঁটতে লাগলেন। কিছুক্ষণ উৎরাইএর পথে হাঁটার পর আমরা পৌঁছে গেলাম বিশাল এক ধ্বংসস্তূপের কাছে। পাহাড়ের উত্তর দক্ষিণ পৃষ্ঠ জুড়ে এই ধ্বংসস্তূপ। চারদিক বেষ্টন করে আছে বিরাট চওড়া চওড়া পাথরের প্রাচীর, কোথাও আধভাঙা দু-একটা তোরণ। প্রাচীর ভেঙে পড়েছে, আদিতে তা যে কত বড় ছিল তা অনুমান করার উপায় নাই, তবুও ভগ্নাবশিষ্ট প্রাচীরের উপর দিয়ে বার চৌদ্দ ফুট রাস্তা চলে গেছে দেখে বুঝা যায় যে একসময় হয় এখানে বিরাট কোন দুর্গ কিংবা কোন দুর্ধর্ষ সম্রাটের বিশাল রাজপ্রাসাদ ছিল। কোথাও কোথাও বিরাট বিরাট চওড়া সিঁড়ির ধাপও দেখতে পাচ্ছি। নর্মদাবক্ষে জেগে ওঠা শৈলদ্বীপের উপরে পর্বতের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যে কে যে এই দুর্লঙ্ঘ্য প্রাসাদ বা দুর্গনগরী গড়ে তুলেছিলেন তা জিজ্ঞাসা করার পুর্বেই রামদাসজী নিজেই উত্তর দিলেন —

— এই হল মান্ধাতা পুত্র, মহারাজ মুচুকুন্দ নির্মিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। একদিন এই রাজপ্রাসাদের প্রতাপে সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ রাজন্যবর্গ নতশির হয়েছিলেন। অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান এবং বেদমন্ত্রের ধ্বনিতে এই প্রাসাদ একসময় সর্বদাই মুখর থাকত। কালক্রমে তাঁদের সেই শৌর্যবীর্য-সমন্বিত স্বর্ণযুগের অবসান ঘটে। হৈহয় বংশের রাজা মহিষ্মৎ এই নগরী জয় করে নেন, তাঁর নামানুসারে নগরীর নাম হয় মাহিষ্মতী, যে বিশাল নগরীর ধ্বংসাবশেষের উপর আমরা দাঁড়িয়ে আছি, এখন দেখেছো কাঁটা বাবলা আর নিমগাছ গজিয়ে উঠেছে, একসময় এই দুর্গনগর সর্বতোভাবে দুর্লঙ্ঘ্য এবং অজেয় ছিল। মুচুকুন্দ এই নগরীর আদি প্রতিষ্ঠাতা হলেও হৈহয় বংশের দিগ্বিজয়ী মহারাজা কার্তবীর্যার্জুনের আমলে মাহিষ্মতীর গৌরবগাথা আসমুদ্রহিমাচলে ছড়িয়ে পড়ে। তিনি শুধু দেবদৈত্যজয়ী রাবণকে পরাজিত করে ক্ষান্ত হননি, নর্মদার মোহনা হতে উত্তরে হিমালয় এবং দক্ষিণে সমুদ্র পর্যন্ত সমগ্র ভারতবর্ষ তিনি জয় করে নেন। মহাভারতে বেদব্যাস তাঁর বিশেষণ দিয়েছেন — 'অনূপপতির্বীরঃ কার্তবীর্যঃ' (বনপর্ব, ৯৭ অধ্যায়, শ্লোক ১৯)। মহাভারতের টীকাকার নীলকণ্ঠ এই 'অনূপপতিঃ' শব্দের অর্থ করেছেন — সমুদ্রজলপ্রায়দেশস্য রাজা অর্থাৎ সমুদ্রতীর

পর্যন্ত দেশসমূহের রাজা। মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে কাতবীর্যাজুনকে 'অনূপনিবৃৎ' বলে উল্লেখ করা হয়েছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত পার্জিটার তাঁর Ancient Indian Historical Tradition নামক পুস্তকে এবং কানিংহাম প্রণীত Ancient Geography-তে নর্মদার মধ্যবর্তী শৈলদ্বীপস্থ এই গ্রামকে মাহিষ্মতী বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাঁরা আরও বলেছেন যে মধ্যপ্রদেশের নিমাড় জেলার খাণ্ডব তহশীলের মধ্যবর্তী নর্মদা দ্বীপস্থ একটি গ্রামের নামই মাহিষ্মতী।

মহাকবি কালিদাসের রঘুবংশ পড়লে জানা যায় যে নর্মদা বা রেবানদীর তীরে বহু প্রাসাদ শোভিত 'মাহিষ্মতী' একটি সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। মহাকবি তাঁর অনুপম ভাষায় যে ভাবে ইন্দুমতীর স্বয়ম্বর সভার বিবরণ দিতে গিয়ে নর্মদা মধ্যস্থ এই মাহিষ্মতী রাজপ্রাসাদের আলেখ্য এঁকেছেন, তা তোমাকে শোনাবার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। সেই স্বয়ম্বর সভার প্রধান দ্বারপালিকা ইন্দুমতীকে সঙ্গে নিয়ে বিভিন্ন পাণিপ্রার্থী রাজা মহারাজাদের পরিচয় দিতে দিতে যখন কার্তবীর্যের বংশধর মহারাজ প্রতীপের নিকট এসে পৌঁছলেন, তখন দ্বারপালিকা ইন্দুমতীকে বলছেন —

অস্যাঙ্কলক্ষ্মীর্ভব দীর্ঘবাহোর্মাহিষ্মতীবপ্রনিতম্বকাঞ্চীম্।
প্রাসাদজালৈর্জলবেণিরম্যাম্, রেবাং যদি প্রেক্ষিতুমস্তি কামঃ।।

(রঘুবংশ, ষষ্ঠ সর্গ, ৪৩)

— এঁর অর্থাৎ মহারাজ প্রতীপের রাজধানী মাহিষ্মতী নগরীর প্রাকাররূপ নিতম্বে মেখলার ন্যায় শোভা পাচ্ছে। সেই প্রাসাদের গবাক্ষ হতে যদি রেবা নদীর রমণীয় জলপ্রবাহ তোমার দর্শন করার ইচ্ছা হয়, তবে তুমি এই দীর্ঘবাহু নরপতির অঙ্কলক্ষ্মী হও।

সাঁচীর অনুশাসন লিপিতেও মাহিষ্মতীর উল্লেখ আছে, মাহিষ্মতী হতে বহু দর্শক সাঁচীর স্তূপ দেখতে আসতেন। পারমারদের রাজা দেবপালের মান্ধাতা অনুশাসনলিপি হতে জানা যায় খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মাহিষ্মতী নগরে অবস্থান কালে রাজা দেবপাল, ওঁকার শীর্ষে বহু শিবমন্দির নির্মাণ এবং সংস্কার করান; তারপর নর্মদাতে স্নান করে এই দানপত্র লিখে দেন।

তাহলে ভেবে দেখ মান্ধাতা, মুচকুন্দ, কার্তবীর্যার্জুন, প্রতীপ হতে আরম্ভ করে পারমাররাজ দেবপাল পর্যন্ত এতগুলি প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাটের রাজধানী হওয়ায় মাহিষ্মতীর রাজপ্রাসাদ বা দুর্গ যে কিরকম বিশাল এবং ঐশ্বর্য আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল তা এখানকার এই ধ্বংসাবশেষকে দেখে শুধু তুমি আমি কেন কারও পক্ষে তার সঠিক পরিমাপ করা সম্ভব নয়। এখন মান্ধাতার স্থায়ী অধিবাসীদের সংখ্যা কোনমতেই হাজার খানিকের বেশী নয়। কিন্তু আসমুদ্রহিমাচল যাঁদের অধিকারে ছিল, তাঁদের রাজধানী বা রাজপ্রাসাদ কিরকম ঐশ্বর্যময় এবং সুরক্ষিত হওয়া উচিত তা অনুমান করা কি খুব শক্ত কাজ?

ভগবান পরশুরাম কিভাবে কার্তবীর্যার্জুনের সহস্রবাহু 'বিচ্ছেদ নিশিতৈর্ভল্লৈর্বাহূন্ পরিঘসন্নিভান্' অর্থাৎ শাণিত ভল্লের দ্বারা ছেদন করে তাঁকে নিহত করেন এবং পরে কার্তবীর্যের পুত্রগণ ধ্যানমগ্ন মহর্ষি জমদগ্নিকে হত্যা করলে তিনি 'প্রতিযজ্ঞে বধঞ্চাপি সর্বক্ষত্রস্য' — সমস্ত ক্ষত্রিয় জাতিকে ধ্বংস করার প্রতিজ্ঞা করেন, সে সকল বিবরণ নিশ্চয়ই তুমি মহাভারতে পড়েছ, কাজেই সে সব কাহিনীর পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। আমি শুধু একটি কথা স্মরণ করাতে চাই যে, পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিবার জন্য পরশুরাম যখন নির্বিচারে ক্ষত্রিয়

নিধন করছিলেন, সেই সময় তাঁর পিতামহ মহর্ষি ঋচিক সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে তাঁকে অহেতুক নরহত্যা বন্ধ করে তপস্যায় ব্রতী হতে নির্দেশ দেন। পিতামহের প্রত্যাদেশে পরশুরাম এইখানে এই মহেন্দ্র পর্বতে বসে কঠোর তপস্যা করেছিলেন।

তপঃ সুমহদাস্থায় ক্ষত্রিয়ান্তকরো নৃপ!
অস্মিন্ মহেন্দ্রে শৈলেন্দ্রে বসত্যমিতবিক্রম!

(মহাভারত, বনপর্ব, অধ্যায় ৯৮)

মহাভারতের এই ব্যাসবাক্যে বুঝা যাচ্ছে যে মাহিষ্মতী সংলগ্ন এই ওঁঙ্কারেশ্বরই মহেন্দ্র পর্বত — পরশুরামের তপস্যাস্থল। মহর্ষি অত্রি এবং অনসূয়াও এইখানকার এরণ্ডী সংগমে তপস্যা করে গেছেন। এমনকি মণ্ডন মিশ্র যিনি পরে বিশ্বরূপ নামে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন তিনিও বাস করতেন এই মাহিষ্মতীতে। মাধবাচার্যের শংকর-দিগ্বিজয়ের মতে এইখানে তিনি শংকরাচার্যের নিকট পরাজিত হন। শংকরাচার্য এবং তাঁর গুরু আচার্য গোবিন্দপাদেরও সিদ্ধিক্ষেত্র এই মাহিষ্মতী। চল এবার এই সিদ্ধ তপস্যাক্ষেত্র এবং প্রাচীন কীর্তিমতী নগরীকে প্রণাম করে এই স্থানের সোমনাথ মন্দিরে যাই।

বৈদূর্য পর্বতের গা বেয়ে চড়াই উৎরাই এর পথে ছোটবড় পাথরের চাঙড় ডিঙিয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পরেই পর্বতের উত্তর কোণে চোখে পড়ল চারতলা উঁচু এক শিবমন্দির। মন্দিরের রঙ বালিপাথরের লালচে আভাযুক্ত গৈরিক। রামদাসজী বললেন — এই মন্দিরই সোমনাথ মন্দির। কেউ কেউ বলেন — গৌরীসোমনাথ। সোমনাথ বললেই যথেষ্ট, পৃথকভাবে গৌরী সোমনাথ বলা বাহুল্য মাত্র। কারণ, সূতসংহিতার ঋষি বলেছেন,

ন শিবেন বিনা শক্তি র্ন শক্তিরহিতঃ শিবঃ।
উমাশংকরয়োরৈক্যং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি॥

অর্থাৎ শিব ভিন্ন শক্তি থাকেন না, আর শক্তি ছাড়া শিবও থাকেন না। শিব মানেই একত্রে অর্ধনারীশ্বর। যে উমাশংকরের ঐক্য দর্শন করে সেই যথার্থ দর্শন করে।

এই প্রসঙ্গে রুদ্রহৃদয়োপনিষৎএর একটি শ্লোক মনে পড়ছে, সেটিও তোমাকে বলছি শোন —

ব্যক্তং সর্বমুমারূপমুব্যক্তন্তু মহেশ্বরম্।
উমাশঙ্করয়োর্যোগঃ স যোগো বিষ্ণুরুচ্যতে।।

অর্থাৎ যা কিছু বস্তু বা ব্যক্তি সবই উমার ব্যক্তরূপ, মহেশ্বরও আছেন তবে তিনি অব্যক্ত। উমাশংকরের এই যোগকেই বিষ্ণু বলা হয়।

সারকথা, শিব বিষ্ণু এবং শংকরীর মধ্যে কোন ভেদ নাই। তুমি প্রথম দিন ওঁকারেশ্বরজীর পূজা করতে গিয়ে সেই যে নমঃ শিবায় বিষ্ণুরূপায় মন্ত্র পড়েছিলে, তা শুনে আমার গভীর পরিতৃপ্তি হয়েছিল। আজ স্কন্দোপনিষৎ এর ঐ মন্ত্র তোমাকে আমি পড়াব। তুমি পূজা করবে। চল গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করি। সোমনাথকে দর্শন করে তুমি চমকে যাবে। মন্দিরের প্রবেশ পথে দেখলাম নন্দিকেশ্বর ভৈরব, হনুমান, গণেশ, ষাঁড় প্রভৃতির মূর্তি বিরাজিত। মন্দিরে দুজন পাণ্ডা, দুজন সাধু এবং মোটে পাঁচজন ভক্ত ছাড়া আর কেউ নাই।

দেখবার মত শিবলিঙ্গই বটে। বিশাল, বিশাল শিবলিঙ্গ, ঘন কৃষ্ণবর্ণ — এমন ঝক্‌ঝক্‌ করছে মনে হচ্ছে যেন সবেমাত্র কয়েকদিন আগে পালিশ করা হয়েছে। এত বিশাল কলেবর যে দুজন লোক পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে ঘিরে ধরলেও শিবলিঙ্গকে বেষ্টন করতে

পারবে না। একজন পাণ্ডা আমাকে এই শিবলিঙ্গের ইতিবৃত্ত শোনাতে লাগলেন। তিনি বললেন যে আদিতে সোমনাথজী ছিলেন স্ফটিকস্তম্ভ। দর্শক পরজন্মে কি হবে, জানবার ইচ্ছা নিয়ে শিবলিঙ্গের সামনে দাঁড়ালেই তা তার চোখের সামনে প্রতিভাসিত হয়ে উঠত। একবার বাদশাহ্ আওরঙ্জেব হিন্দুদেবতার এই খ্যাতি শুনে তাঁর ভবিষ্যৎ জন্ম জানার জন্য ছদ্মবেশে এসে সোমনাথজীর সামনে দাঁড়ান। তিনি দেখতে পেলেন, লিঙ্গগাত্রে এক ঘৃণিত শূকর-মূর্তি ভেসে উঠেছে। ক্রুদ্ধ বাদশাহ শিবলিঙ্গে আগুন ধরিয়ে দেন। তার ফলেই শ্বেতলিঙ্গ কৃষ্ণলিঙ্গে পরিণত হয়েছে।

বলাবাহুল্য, পাণ্ডাজীর এই গল্পের একটি অক্ষরও বিশ্বাস করতে পারলাম না। বুঝলাম সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিজাত, হলাহল মাখানো এই কিংবদন্তী রচনা করে সমকালীন হিন্দুরা প্রচণ্ড হিন্দুবিদ্বেষী মোগল সম্রাটের হিন্দু নির্যাতনের প্রতিশোধ নিয়েছেন!

যাই হোক রামদাসজীর ইঙ্গিতে একটা পাথরের বেদীর উপর দাঁড়িয়ে হাত উঁচু করে তুলে শিবের মাথায় জল ঢালতে থাকলাম; রামদাসজী মন্ত্র পড়লেন —

যথা শিবময়ো রামরেবং রামময়ঃ শিবঃ
যথাহন্তরং ন পশ্যামি তথা মে স্বস্তিরায়ুষি
যথাহন্তরং ন ভেদাঃ স্যুঃ শিবরাঘবয়োস্তথা॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র যেরকম শিবময়, শিবও সেইরকম রামময়; আমার জীবন এমন মঙ্গলময় হোক যেন আমি ভেদদর্শন না করি। অবান্তর ভেদসমূহের বিনাশের মত শিব ও রামচন্দ্রের ভেদদর্শন নষ্ট হোক।

'আমি যেন ভেদদর্শন না করি' — এই অভেদ ভাবের দ্যোতক মন্ত্র পাঠ করে আমার মনে খুব তৃপ্তি হল। মনে মনে এই ভেবে রামদাসজীকে ধন্যবাদ দিলাম যে, তিনি স্থান কাল বিবেচনা করে যথোপযুক্ত মন্ত্র শুনিয়েছেন আমাকে। সোমনাথকে প্রণাম করতে করতে প্রার্থনা করলাম — প্রভু, তুমি মঙ্গলময় শিবশংকর। তুমি ভূতনাথ ; প্রতি জীবের মধ্যে তুমি নিত্যকাল ধরে বর্তমান। তোমার যাঁরা উপাসনা করেন তাঁদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি থাকবে কেন? হে রুদ্ররূপী মহাকাল — তুমি মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে অজ্ঞানতাবশতঃ যে ভেদবুদ্ধি আছে, তা দূর কর প্রভু !

মন্দিরের বাইরে এসে রামদাসজী বললেন — চল, এবার ফেরা যাক্। যেটুকু বাকী থাকল, কাল সকালে মঙ্গলদাস ব্রহ্মচারীকে সঙ্গে দিয়ে সে সব স্থান পরিক্রমা এবং দর্শন করতে পাঠাব।

আমরা সোমনাথের মন্দির থেকে, উত্তরকোণ থেকে পশ্চিমদিকের ডাল ধরে প্রায় আধঘণ্টা হেঁটে কোটিতীর্থের ঘাটে এসে পৌঁছলাম। উভয়ে স্নান করলাম নর্মদায়। ওঁকারেশ্বজীকে প্রণাম করে বেলা একটা নাগাদ ফিরে এলাম ভজন আশ্রমে। আশ্রমে তখন পূজা এবং ভোগারতি শেষ হয়েছে। রামনামের ভজন চলছে — শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম। শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম।

মধ্যাহ্নভোজন এবং দিবানিদ্রার পর সন্ধ্যার মুখে দীনদয়ালকে সঙ্গে নিয়ে ওঁকারেশ্বরের আরতি দেখতে গেলাম। মন্দিরের সর্বত্র, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করতে লাগলাম প্রলয়দাসজীর সাক্ষাৎ পাই কিনা। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। আরতির শেষে দীনদয়ালকে

সঙ্গে নিয়ে কিছুক্ষণ কোটিতীর্থের ঘাটে বসলাম। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম — তুমি তোমাদের গুরুদেবের পূর্বাশ্রমের কিছু বিবরণ জান কি ?

— তাঁর বিষয়ে ষড়ঙ্গী মহারাজই বেশী বলতে পারবেন। আমি শুনেছি গুরুজী পূর্বাশ্রমে এলাহাবাদের বাসিন্দা ছিলেন। খুবই কৃতী ছাত্র ছিলেন তিনি; এম. এ. পাশ করে পি. এইচ. ডি. করেছেন। কিছুদিন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে কাজ করতে করতেই তিনি একবার চিত্রকূট যান। সেখানকার জানকী কুণ্ডে তখন তিলকদাসজী নামে একজন রামায়েৎ সম্প্রদায়ের বৈষ্ণব মহাত্মা বাস করতেন। তিনি অহোরাত্র রামনামে বিভোর থাকতেন। মাঝে মাঝেই বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে সমাধিতে মগ্ন হয়ে যেতেন তিনি। একদিন তিনি অর্ধবাহ্যদশায় আমাদের গুরুজীকে স্পর্শ করেন। তাঁর সেই দিব্যস্পর্শ পাওয়ার পর কি যে হল গুরুজীর, তিনি আর এলাহাবাদে ফিরলেন না। ঘর সংসার সমাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী সবই ভেসে গেল। তিনি সেই জানকী কুণ্ডে গুরুজীর কাছেই পড়ে রইলেন। মহাত্মা তিলকদাসজীর অন্তর্ধানের পর কয়েক বৎসর তিনি চিত্রকূট এবং অযোধ্যাতে কাটানোর পর প্রায় বছর দশেক হল ওঁকার মান্ধাতাতে এসে বাস করছেন। এখনও প্রায় প্রতি বৎসরই তিনি একবার করে চিত্রকূট গিয়ে দু'একমাস বাস করে আসেন। গুরুজীর কনিষ্ঠ গুরুভ্রাতা কামদগিরির দক্ষিণ পার্শ্বে ভরত-মিলাপ নামক মন্দিরের একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে ভজনে মগ্ন আছেন। তিনি সেখানে 'পাঞ্জাবী ভগবান' নমে প্রসিদ্ধ। তাঁর পাঞ্জাবী শরীর বলে ভক্তবৃন্দ তাঁকে ঐ নামে ভূষিত করেছেন।

আমরা কোটিতীর্থের ঘাট থেকে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। আশ্রমে ঢুকতে ঢুকতে রামদাসজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি কাতর কণ্ঠে রামচন্দ্রের পুণ্য চরিত্র অনুস্মরণ করছেন। অন্যান্য কুটীরেও মঙ্গলদাস, অচ্যুত দাস, ষড়ঙ্গী মহারাজ — সকলেই রাম ভজনে রত। আমি চিত্রকূটের এক মহাত্মার মুখে শুনেছিলাম যে বিশিষ্ট চিত্তপ্রসাদ ভিন্ন তুলসীদাসজীর রামচরিতমানসের মাধুর্য তথা রামলীলার অমৃত কারও পক্ষে আস্বাদন করা সম্ভব নয়। সেই চিত্তপ্রসাদ সম ও দৈন্য, শরণাগতি এবং আত্মনিবেদনের ভাব হতেই জন্মে থাকে। সেই আধ্যাত্মিক মনোভাব এই আশ্রমের সর্বত্র পরিস্ফুট দেখছি। ঘরের মধ্যে কুশ-শয্যায় বসে আমি রামদাসজীর আকুতি নিবেদনের মর্মস্পর্শী ভাষা স্পষ্টভাবে শুনতে পাচ্ছি। তিনি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে গাইছেন —

নান্যস্পৃহা রঘুপতে হৃদয়ে অস্মদীয়ে
সত্যং বদামি চ ভবানখিলান্তরাত্মা।
ভক্তিং প্রযচ্ছ রঘুপুঙ্গব নির্ভরাং মে
কামাদিদোষরহিতং কুরু মানসঞ্চ।।

— হে রঘুপতি, আমার অন্তরে অন্য কোন বাসনা নাই, একথা সত্য করে বলছি আর তুমিও তা জান, কারণ অখিল জগতের তুমি অন্তর্যামী, পরিপূর্ণ ভক্তি আমাকে দাও। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! আমার অন্তরকে কামনা বাসনা প্রভৃতি-কলুষ হতে মুক্ত করে তোমার রাতুল চরণে শরণাগতি দাও প্রভু !

পরদিন সকালে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে আসার পরই রামদাসজী মঙ্গলদাসজীকে ডেকে বললেন — তুমি শৈলেন্দ্রনারায়ণজীকে নিয়ে ভৈরব শিলা রাবণনালা আশাপুরী মাতার

মন্দির এবং সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতি দেখিয়ে নিয়ে এস। ঠাকুর সেবার কাজ আমি করব। তাঁর নির্দেশ পেয়ে মঙ্গলদাসজী আমাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। পাহাড়ের গা বেয়ে পায়ে চলা সরুপথ নেমে গিয়ে আবার উঠেছে। উভয়ে গল্প করতে করতে হাঁটছি। মঙ্গলদাসজী জানালেন — ওঁকারেশ্বরের মন্দির হতে গোপীকিষণ জয়কিষণ বাহাতী ধর্মশালা পর্যন্ত এই আধমাইলটাক রাস্তার দুপাশে যা কিছু বাড়ী ও দোকানপাট। পাহাড়ের দক্ষিণ গায়ে চাষী, গোয়ালা এবং পাণ্ডাদের কয়েকটা বাড়ী আছে। একটি সংস্কৃত পাঠশালাও আছে। সেগুলো বোধহয় গুরুজীর সঙ্গে পরিক্রমায় বেরিয়ে দেখেছেন। তবে দক্ষিণতটে বিষ্ণুপুরীর পিছনে পোষ্ট অফিস, প্রাইমারী স্কুল, লাইব্রেরী, গ্রাম পঞ্চায়েত দপ্তর এবং একটা পুলিশ চৌকী আছে। অনেকগুলি পাকাবাড়ী ধর্মশালা এবং চার পাঁচটা মন্দিরও আছে সেখানে। এই শৈলদ্বীপে লোকজন কম, কিন্তু গ্রীষ্মকাল এবং বর্ষাকাল ছাড়া অন্যান্য ঋতুতে এইস্থান হাজার হাজার সাধু মহাত্মা এবং গৃহী ভক্তের ভীড়ে পূর্ণ থাকে।

এইসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ মঙ্গলদাসজী কিছুদূরে পাহাড়ের গায়ে একটি ছোট্ট কুটীর দেখিয়ে বললেন — এই কুটীরে আমার এক পরিচিত লোক থাকে; নাম শম্ভুনাথ। সে নাগপুরে বি.এ অবধি পড়েছে। রাবণনালা প্রভৃতি সম্বন্ধে সে অনেক কিছু জানে, অনেক কিছু পড়াশুনা করেছে। তাকে ডেকে নিয়ে আসি। সে সঙ্গে থাকলে আপনাকে সবকিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ দিতে পারবে। শম্ভুনাথের জীবনটা বড় দুঃখের, খাণ্ডোয়ায় বাড়ী, এখন বয়স ত্রিশ বত্রিশের বেশী নয়। বেশ সম্পন্ন পরিবারের সন্তান, ক্ষেতি উতি বেশ আছে। আমাদের এ দেশের যা রীতি, অল্প বয়সেই সে বিবাহ করেছিল, একটি চার পাঁচ বছরের সুন্দর ফুটফুটে ছেলেও আছে। হঠাৎ কোথা থেকে কি যে হল! শম্ভুনাথের এক বিধবা দিদি আছে, সে তার মনে স্ত্রীয়ের চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ ঢুকিয়ে দিল। মাথার উপর মা বাবা নাই, তাঁরা বহুকাল আগেই গত হয়েছেন, দিদিই গার্জেন। দিদির প্ররোচনায় শেষপর্যন্ত সে নিজের ধর্মপত্নী এবং একমাত্র সন্তানকে ত্যাগ করে এইখানে পালিয়ে আসে। ঐ কুটীরে একজন সাধু থাকতেন। তিনি গত হওয়ার পর ঐ কুটীরটা খালি পড়েছিল। ঐখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। কি খায়, কিভাবে সে থাকে তা একমাত্র রামচন্দ্রই জানেন। ওর স্ত্রী শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে বাপের বাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। মাঝে মাঝেই শম্ভুনাথ কিষেণ কিষেণ বলে কাঁদে। লোকে ভাবে ও হয়ত শ্রীকৃষ্ণকে ডাকছে, কিন্তু আমি জানি কিষেণ ওর ছেলের নাম।

কুটীরের দ্বারে এসে আমরা পৌঁছে গেছি। একখণ্ড ছেঁড়া কাপড় ব্রহ্মচারীদের মত করে পরা, চুল উস্কোখুস্কো, চোখ দুটো বুদ্ধিদীপ্ত বটে তবে চোখের গোড়ায় কালি, রুগ্ন অপরিচ্ছন্ন মলিন বেশ। মঙ্গলদাসজী আমার পরিচয় দিয়ে ভৈরবশিলা যেতে অনুরোধ করতেই সাগ্রহে সে উঠে পড়ল খান দুই চটি বই হাতে নিয়ে। মঙ্গলদাস জানালেন — যখন যাত্রীদের ভীড় হয় তখন শম্ভুভাই অনেক সময় গাইডের কাজ করে।

যাই হোক, আমরা তিনজন উত্তরদিকের পাহাড়ের ঢাল থেকে ধীরে ধীরে পৌঁছে গেলাম দক্ষিণদিকের ঢালু পর্বত পৃষ্ঠে। নর্মদাতটের এই পর্বতরেখা দ্বীপের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত পৌঁছেছে। সেখানে আবার নর্মদা-কাবেরী সংগম। সেখানে স্নানের উপযোগী ঘাট নাই, এত ঢালু যে একটু পা পিছলোলেই নিশ্চিত মৃত্যু। আমরা পর্বতের শিরোরেখা ধরে অতি সাবধানে চলতে চলতেই দূরে একটা জৈন মন্দির দেখতে পেলাম, তার অদূরেই এক বিষ্ণুমন্দির।

এই দুই মন্দিরের মধ্যস্থল দিয়ে বয়ে আসছে একটি নালা। শম্ভুনাথ বললেন — এই নালার নামই রাবণ-নালা। সাবধানে লাঠি ঠুকে ঠুকে সেই নালার ধারে পৌঁছে দেখি এক বিরাট রাক্ষুসে মূর্তি দণ্ডায়মান। মূর্তিটির দশটি বাহু, লম্বায় মূর্তিটি দশফুট। মূর্তির গলদেশে সাপের হার, হাতে তলোয়ার এবং নরমুণ্ড। মূর্তির শূন্য উদর মনুষ্যরক্তে পূর্ণ হওয়ার জন্য অপেক্ষা করছে। সেই উদরে বাঁকানো এক বৃশ্চিক মূর্তি।

ঐ বীভৎস ভয়াবহ মূর্তির পরিচয় জিজ্ঞাসা করতেই শম্ভুনাথজী বললেন — কেউ বলেন এটি রাবণের মূর্তি আবার কারও কারও মতে এটি ভৈরবপত্নী মহাকালীর মূর্তি। মন্দিরের দক্ষিণ পূর্ব কোণে দেখুন ঐ যে পর্বতশৃঙ্গ পূর্বে ঐখান থেকে ভৈরবের ভক্তরা লাফিয়ে নিচে শিলাময় পাদদেশে পড়ে আত্মাহুতি দিয়ে মহাকালীর রক্তপিপাসা মিটাত। ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন ভরত সিং মান্ধাতা দখল করেন, তখন ঐ মহাকালী বা ভৈরবের পূজারী মাত্র একজনই ছিলেন তাঁর নাম গোঁসাই দরিদ্রনাথ। অন্যেরা ভয়ে কেউ পূজার কাজে এগিয়ে আসত না। কিংবদন্তী এই যে গোঁসাই দরিদ্রনাথ কঠোর তপস্যাবলে মহাকালীকে ভূনিম্নস্থ এক গহ্বরে আবদ্ধ করে রাখেন এবং সেখানে আর একটি কালীমূর্তি স্থাপন করে পূজা করতে থাকেন। দরিদ্রনাথের পূজায় মহাকালী সন্তুষ্ট হন। ভৈরবের কাছে দরিদ্রনাথ মানত করেন এবং প্রতিশ্রুতি দেন প্রতিবৎসর মধ্যে মধ্যে তিনি নরবলি দিয়ে ভৈরব ও মহাকালীর উদরে নররক্ত দিয়ে পূর্ণ করবেন তবে সর্ত এই যে, তাঁরা অপারপর যাত্রীদের প্রাণ হরণ করে যখন খুশী নিজেদের উদর পূর্তি করতে পারবেন না।

এই নরবলিপ্রথা যখন প্রচলিত ছিল, তখন মান্ধাতা দ্বীপ গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার অধীনে ছিল। সুতরাং তদানীন্তন ইংরেজ শাসনকর্তা এই 'ভৈরবশিলায়' নরবলির যে বর্ণনা দিয়েছেন তা পড়ছি শুনুন। এই বলে শম্ভুনাথজী হাতের একটি ছোট ইংরাজী বই পড়ে শোনাতে লাগলেন। বইএর লেখক বলছেন—'যেদিন নরবলির উৎসব হবে, সেদিন আমি খুব ভোরে উঠে ভৈরব মুর্তির কাছে গেলাম। যে ভক্ত ভৈরবের কাছে আত্মবলি দিবে সে বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে শোভাযাত্রা করে উপস্থিত হল, তার চোখে মুখে দুরন্ত উল্লাস। আমি কিছু পরে তার কাছে গেলাম এবং তাকে এই ভীষণ কাজ হতে নিবৃত্ত হওয়ার জন্য অনেক করে বুঝালাম; সারাজীবন তার রক্ষণাবেক্ষণ ও ভরণ পোষণ করব, এ প্রতিশ্রুতিও দিলাম। আমার সঙ্গে নৌকা ছিল, আমি তাকে অতি অল্প সময়ের মধ্যে জনতার কাছ হতে দূরে পালিয়ে নিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু আমার সব অনুরোধ ব্যর্থ হল; সে দৃঢ়তার সঙ্গে উত্তর দিল যে ভৈরবের বলি বন্ধ করা মনুষ্যশক্তির অতীত। দেখলাম এই অবস্থায় বলপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোন উপায় নাই। সে যখন ভৈরবমূর্তির সম্মুখীন হল, তখন তার চারদিক থেকে বর্বর ভীল জনতা চেঁচিয়ে আর হাততালি দিয়ে তাকে উৎসাহিত করতে থাকল। সে তার দৃপ্তভঙ্গী দ্বারা আমাকে বুঝিয়ে দিল যে, সে আমার কথা সম্পূর্ণ অবজ্ঞা করছে। প্রথমেই সে ভৈরবের সামনে নারকেল উৎসর্গ করে নৈবেদ্য দিল। তারপর একটা শুকনো লাউ বের করে তার ভিতর থেকে তার সঞ্চিত অর্থ পূজারিণীর সামনে ঢেলে দিল। পূজারিণী এক নারকেলের মালায় কতকটা মদ ঢেলে তাকে পান করতে বলল। মদ দেবার পূর্বে পূজারিণী খানিকটা তার ছেলেকে খাইয়ে দেখাল যে তাতে বিষাক্ত পদার্থ কিছু নাই। কিছুটা মদ ভৈরব বা সেই মহাকালীর মূর্তির উপর ঢেলে দিয়ে ভীলভক্ত তা পান করল।

পূজারিণী ভক্তকে তার হাতের রূপোর আংটিগুলো খুলে দিয়ে দিতে বলল। ভক্তটি তার প্রথম আংটি খুলে নিজের মুখে রেখে দিল, তারপর একে একে দু'হাতের আংটিগুলি খুলে পূজারিণীর হাতে সমর্পণ করল। জনতার দিকে উচ্চৈঃস্বরে সে ডেকে বলল, উজ্জয়িনী থেকে যে লোকটি তার সঙ্গে এসেছে, তাকে আমার কাছে আসতে দাও। সে লোকটির নাম ধরে ডাকতে লাগল, সে ভীড় ঠেলে কাছে এগিয়ে আসতেই তার হাতে সে মুখের ভিতর হতে বের করে শেষ আংটিটি উপহার দিল। এই সময় দেখা গেল অনেক লোক তাদের হাতের রূপার বাজু, গয়না, সুপারি প্রভৃতি তার হাত দিয়ে স্পর্শ করাতে চায়। সে প্রত্যেকের দ্রব্যগুলি মুখে রেখে আবার তাদেরকে ফিরিয়ে দিল। এইবার পূজারিণী তাকে একটা পান খেতে দিল। পান খেয়েই সে পাহাড়ের চূড়ার দিকে দৃঢ় পদক্ষেপে এগোতে লাগল। জনতা হাততালি দিতে লাগল। সে যখন পাহাড়ে চড়ছিল, তখন মাঝে মাঝেই লতাগুল্মে তার দেহ ঢেকে যাচ্ছিল। অবশেষে সে পাহাড়ের উচ্চতম চূড়ায় গিয়ে দাঁড়াল। যদিও সে মৃত্যুর মুখোমুখি দণ্ডায়মান তবুও ঐ সময় তার ঋজুদেহের বীরত্বব্যাঞ্জক হাবভাব দেখে আমি অবাক হলাম। বেশ কিছুক্ষণ ধরে দুবাহু দোলাতে দোলাতে কিছু মন্ত্র উচ্চারণ করল, বলে মনে হল। দু'হাত জোড় করে জনতাকে বিদায় অভিনন্দন জানিয়ে কোমরের থলি হতে নারকেল আয়না চিরুণী এবং চূর্ণ ইত্যাদি ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। পরম পবিত্র জ্ঞানে তা কুড়াবার জন্য জনতার মধ্যে লাফালাফি এবং হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। এরপর কয়েক মুহূর্ত কিছুটা পিছু হটে দৌড়ে এসে পাহাড়ের চূড়া থেকে ঝাঁপ দিল। প্রথমে সে সামনে পা রেখে প্রচণ্ড বেগে নিচে পড়তে লাগল কিন্তু অর্ধপথে একটা টিলার চূড়ায় লেগে মাথা নিচু হয়ে পা দুটো উল্‌টে গেল এবং সেই অবস্থায় ৯০ ফুট নিচে পড়ে তৎক্ষণাৎ সে মারা গেল। সেই বীভৎস রাক্ষুসে মূর্তির সামনে চাতালে (যার নাম ভৈরববেদী বা ভৈরবশিলা) পড়ে রইল তার বিধ্বস্ত দেহ, গলগল করে রক্ত পড়ছে ; পূজারিণী দৌড়ে গিয়ে একটা নারকেল মালায় সেই রক্ত ধরে ভৈরবের সেই বৃশ্চিক চিহ্নিত উদরের মধ্যে ঢেলে দিল। এদৃশ্য যেমনই বীভৎস তেমনই হৃদয়বিদারক'। শম্ভুনাথ বই পড়ে এই বিবরণ দিয়ে বলল পরিশেষে ইংরাজ শাসক মন্তব্য করেছেন — 'হায় ঐ বর্বর কুসংস্কারাচ্ছন্ন যুবক, তার ভিতর যে দৃঢ়তা শৌর্য এবং বলিষ্ঠ বিশ্বাস ছিল, তা যদি সে এইভাবে ধ্বংস না করে জগতের কোন বড় কাজে লাগাত!'

শম্ভুনাথ বলতে লাগল — কার্তিক মাসের প্রথম ভাগে মান্ধাতার বাৎসরিক মেলা বসত। প্রায় পঁচিশ ত্রিশ হাজার যাত্রী জমায়েৎ হত। এই সময়েই হত ঐ নরবলির আয়োজন। ১৮২৪ সালের পর যখন মান্ধাতা ইংরেজের অধীনে আসে, তখন নরবলি অর্থাৎ পাহাড়ের চূড়া থেকে ভৈরবের সামনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মবলির প্রথা জোর করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। সাধারণত এই মেলায় ভক্তদের প্রদত্ত সমূহ বস্তু নজরাণা হিসাবে মান্ধাতার রাজারই প্রাপ্য। কিন্তু ভীলদের প্রাচীন প্রথানুসারে ভীল পরিবারের লোকেরা চারদিনব্যাপী মেলার নজরাণা জোর করে লুট করে নিত। এর ফলে রাজার লোকদের সঙ্গে ভীলদের প্রকাশ্যে যুদ্ধ বেঁধে যেত। মেলার বহু পূর্ব হতেই উভয়পক্ষের লোকজন প্রস্তুত হয়ে আসত। উভয়পক্ষের লোকেরাই নাকি বেশ লম্বা লম্বা নখ রাখত যাতে নজরাণা ও নৈবেদ্য কেড়ে নিতে পারে।

মান্ধাতার রাজা জাতে 'ভীলালা'। এই রাজারা চৌহান রাজপুত ভরতসিংহের বংশধর;

ইনি ১১৬৫ খ্রীষ্টাব্দে একজন ভীল সর্দারের কবল হতে মান্ধাতা অধিকার করে নেন। দরিদ্রনাথ গোঁসাই এর আমন্ত্রণে চৌহান ভরতসিংহ এসে সর্দার মাথু ভীলকে হত্যা করেন এবং তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন। রাজপুতরা ক্রমে রক্তপিপাসু ভৈরবের ভক্ত এই পার্বত্য জাতির সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ স্থাপন করেন। তাদের বংশধররাই বর্তমানে 'ভীলালা' নামে পরিচিত। ভীল খাঁটি পার্বত্যজাতি কিন্তু ভীলালা হচ্ছে রাজপুত ও পার্বত্যজাতির সংমিশ্রণ।

বর্তমানে ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের পুরোহিতরা পূর্বোক্ত দরিদ্রনাথ গোঁসাই এরই বংশধর।

ভৈরবশিলা হতে কিছুদূর হাঁটার পর একটি পুরাণো পাথরের দোতলা বাড়ী দেখিয়ে শম্ভুনাথ বললেন — ঐ বাড়ীতে ওংকারের বর্তমান রাজবংশের লোকেরা বাস করেন। জাতিতে এঁরাও ভীলালা। রাজবাড়ীর কাছেই তাঁদের বংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আশাপুরী মাতার মন্দির। দেখতে যাবেন নাকি?

— আজ পরিক্রমার উদ্দেশ্যেই বেরিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত শিবভূমি ওঁকারতীর্থের নূতন কোন শিবমন্দির সকাল থেকে দেখতে পাইনি। রাবণনালা ভৈরবশিলা ইত্যাদি দেখতে দেখতেই অনেক সময় নষ্ট হল। এখন এখানে যদি কোথাও প্রসিদ্ধ শিবমন্দির থাকে, সেইখানে আগে চলুন। সারা গ্রীষ্মকালটাই এখানে থাকব। কোন একসময় এসে আশাপুরী মাতাকে প্রণাম করে যাব। কোন মূর্তি বা বিগ্রহ দেখে চরিতার্থবোধ করার মত ভক্ত চরিত্রের লোক আমি নই। প্রাচীন যুগ হতে যে সমস্ত সিদ্ধক্ষেত্রে তপস্যা করে ঋষিরা ঋষিত্ব অর্জন করেছেন, সেই সব ঋষিদের আরাধ্য মহাজাগ্রত শিবলিঙ্গ যদি কোথাও থাকেন, যা এখনও আমি দর্শন করিনি, দয়া করে আমাকে সেই সব পবিত্র স্থানে নিয়ে চলুন।

— তাই হবে, আপনাকে আমি ওঁকারতীর্থের প্রাচীনতম ও শ্রেষ্ঠতম স্থান সিদ্ধনাথের মন্দিরে নিয়ে যাচ্ছি চলুন। এখান থেকে বেশীদূর নয়। এঁকে কেউ কেউ সিদ্ধেশ্বরও বলে থাকেন। প্রাচীনকালে এই মন্দিরই ছিল ওঁকার-তীর্থের সর্বশ্রেষ্ঠ মন্দির। প্রাচীন ঋষি মুনিগণ এবং বর্তমানেও যাঁরা শ্রেষ্ঠ তপস্বী তাঁরা ধ্যান-দৃষ্টিতে নাকি দেখেছেন, ইনিই আদি ওঁকারেশ্বর। মার্কণ্ডেয় মুনি যে ওঁকারলিঙ্গের মাহাত্ম্য উচ্ছ্বসিতভাবে বর্ণনা করেছেন, এই সিদ্ধেশ্বর নাকি সেই মহাদেব, ওঁকারশ্বের পর্বতের পূর্ব কিনারে অবস্থিত। এখান থেকেই চড়াইয়ের পথে একটি সংকীর্ণ রাস্তা আছে, পর্বতপৃষ্ঠের শির বেয়ে উঠতে হবে।

তিনজনে হাঁটতে হাঁটতে খাড়াই বেয়ে উঠে এলাম বিশাল এক চাতালের সামনে । মোটা মোটা পাথরের উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম মন্দির চত্বরে। বিরাট এক প্রস্তরময় আয়তক্ষেত্র, নিখুঁত জ্যামিতিক নিয়মে পাথর কুঁদে যেন আয়তক্ষেত্রটি স্থাপন করা হয়েছে। তার ধার ঘেঁষে লাল পাথরের স্তম্ভের পর স্তম্ভ। মন্দিরের যেটি কুঁদে যেন আয়তক্ষেত্রটি স্থাপন করা হয়েছে। তার ধার ঘেঁষে লাল পাথরের স্তম্ভের পর স্তম্ভ। মন্দিরের যেটি মূল গর্ভগৃহ ছিল তার দুপাশে আঠারটি স্তম্ভ, প্রায় চৌদ্দফুট করে উঁচু তার উপরে ছাদ ছিল কিন্তু সে ছাদ এখন ধ্বংস হয়ে গেছে। স্তম্ভগুলিতে এবং মন্দিরের উঁচু ভিত্তিগাত্রে পাথর কুঁদে কুঁদে বহু হস্তীমূর্তি খোদিত আছে। হস্তীযূথের কোন কোনটির পদতলে মনুষ্যমূর্তি শায়িত। হস্তীগুলির অধিকাংশ যুদ্ধ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান; এই সব রণহস্তীর রণোন্মত্ত ভঙ্গিমা নিপুণ ভাস্করদের শিল্প-প্রতিভার অপূর্ব নিদর্শন। খোদিত হস্তী ছাড়াও স্তম্ভগুলিতে আরও বহু কারুকার্য আছে।

শম্ভুনাথ জানালেন যে কালক্রমে মন্দির জীর্ণদশায় পতিত হওয়ায় অনেকগুলি মূর্তি স্থানান্তরিত করা হয়েছে, তার মধ্যে ছয়টি নাগপুর মিউজিয়ামে রাখা হয়েছে।

প্রতিটি স্তম্ভের মাথায় পাথরের মোটা মোটা খিলানও লক্ষ্য করার মত। মধ্যে দুই খিলানের উপর চড়ানো রয়েছে পাথরের ভারী ভারী কড়ি। তার উপরে আর কিছুই নাই। সহজেই অনুমান করা যায়, প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট মুচুকুন্দ, কার্তবীর্য প্রভৃতির কালে যখন ওঁকার মান্ধাতার স্বর্ণযুগ ছিল, তখন নিশ্চয়ই এই সব খিলান কড়ি আর স্তম্ভরাজির মাথায় ছাদ এবং কারুকার্যমণ্ডিত হয়ত সারি সারি স্বর্ণকলস সহ স্বর্ণখচিত চূড়াও ছিল। সেই সময় এই সিদ্ধেশ্বরের মন্দির ওঁকারদ্বীপে ত বটেই হয়ত সারা ভারতবর্ষেই শ্রেষ্ঠ শিবমন্দির রূপে পরিগণিত ছিল। সে সকল কালের আঘাতে বহুকাল আগেই ধূলিস্যাৎ হয়ে গেছে , কেবল যাঁর ক্ষয় ব্যয় নাই, শাশ্বত পুরাণ পুরুষ সেই মন্ত্রমূর্তি মহেশ্বের লিঙ্গরূপে মুক্ত আকাশের নীচে, অদ্ভুত নির্জন পরিবেশে এখনও বিরাজমান আছেন। যোনীপিঠ হতে প্রায় একফুট উঁচু মধুপিঙ্গলবর্ণের আদি ওঁকারেশ্বরের কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। কমণ্ডলুর জল ঢেলে হাত দিয়ে ঘষে লিঙ্গটিকে ভাল করে নিরীক্ষণ করতে লাগলাম। লিঙ্গের মধ্যে কালো কালো কুণ্ডলী পাকানো রেখা চোখে পড়ল। সবচেয়ে চমকে উঠলাম এই দেখে যে উন্মুক্ত আকাশতলে বৈশাখের খরতাপে পাথরের লিঙ্গ গরম হয়ে উঠার কথা। কিন্তু লিঙ্গটি বড়ই স্নিগ্ধ, লিঙ্গস্পর্শে আমার ভক্তিহীন প্রাণে যেন চন্দনের প্রলেপ পড়ছে!

আমার নিত্যসঙ্গী 'শিলাচক্রার্থবোধিনী' নামক বইটি ঝোলা থেকে বের করে এই শিবলিঙ্গের লক্ষণ মিলিয়ে স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করতে লাগলাম। পাতার পর পাতা উল্‌টিয়ে অবশেষে 'হেমাদ্রিধৃত-লক্ষণকাণ্ডে' দেখতে পেলাম, নারদ একজন শিবভক্ত ব্রাহ্মণকে বলছেন —

অথ বক্ষ্যামি তে বিপ্র গুহ্য চিহ্নং অতঃপরম্।
শ্রবণাৎ যস প্রাপানি নাশমায়ান্তি তৎক্ষণাৎ।।
মধুপিঙ্গলবর্ণাভং কৃষ্ণকুণ্ডলিকাযুতম্।
স্বয়ম্ভুলিঙ্গমাখ্যাতং সর্বসিদ্ধৈর্নিষেবিতম্।।

অর্থাৎ হে ব্রাহ্মণ! অতঃপর তোমাকে মহাদেবের একটি গোপন চিহ্নের কথা বলছি, যা শ্রবণ করা মাত্রই সমস্ত পাপের নাশ হয়। শিবলিঙ্গটি যদি মধুপিঙ্গল বর্ণের হয় এবং তা কৃষ্ণকুণ্ডল যুক্ত হয়, তবে তাঁকে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বলে জানবে। সকল সিদ্ধপুরুষদের দ্বারা তিনি পূজিত হন।

আদি ওঁকারেশ্বর নামে কথিত স্বয়ম্ভু সিদ্ধেশ্বরকে পুনরায় প্রণাম করে উঠে পড়লাম। আমি শম্ভুনাথজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কি কোন লোক আসে না? পূজা করে না? ফুল-চন্দন-বিল্বপত্র কোথাও কিছু দেখছি না কেন?

— এখানে লোক বলতে ত দেখছেন দূরে দূরে কিছু ভীল এবং গোয়ালাদের বাড়ী। ভৈরবশিলার কাহিনী শুনেই ত বুঝতে পারছেন, একশ পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর আগেও এখানকার লোকের মানসিকতা কি রকম ছিল! তাদেরই বংশধররাই এদিকে সেদিকে এখনও ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। মন্দির নাই, কোন জাঁকজমক নাই, মন্দিরে এসে প্রসাদ প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই এইরকমভাবে উলঙ্গ ও সর্বরিক্ত হয়ে বসে আছেন যিনি, সেই ঠাকুরের পূজা করতে গৃহী আসবে কিসের আশায়? ভক্তদের যদি ভীড় না থাকে, যথেষ্ট প্রণামী যদি না পড়ে, তবে পাণ্ডারাই বা আসবে কেন? আজকালকার সমাজ দেখছেন না? লম্বশাটপটাবৃতদেরই কদর বেশী ! গ্রীষ্মকাল, বর্ষাকাল বাদ দিয়ে অন্য সময় যখন তীর্থযাত্রীদের ভীড় হয় তখন কিছু কিছু ভ্রমণকারীরা আসেন এই মন্দিরের ভগ্নাবশিষ্ঠ অংশটুকুর কারুকার্য দেখতে। এখানকার

এক বৃদ্ধের মুখে শুনেছি, এই পর্বতগাত্রে নাকি অনেক গোপন গুহা আছে। গভীর রাত্রে সেইসব গুহা থেকে অনেক সিদ্ধ মহাত্মা এই আদি ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে আসেন। এখানে জনশ্রুতি এই যে এখানে সূক্ষ্মদেহীরা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় তাঁদের কণ্ঠস্বর এবং মন্ত্র পাঠের শব্দ গভীর রাত্রে দূরাগত শব্দের মত কেউ কেউ শুনেছেন। ভৌতিক কাণ্ড ভেবে তাই এখানে কোন লোকই এই ভূতনাথের ধারে কাছে আসে না।

যে পথে গিয়েছিলাম, আবার উৎরাই এর পথে পর্বতের শিরোরেখা ধরে, রাজপুরীর ভৈরবশিলা প্রভৃতি অতিক্রম করে শম্ভুনাথের কুটীরের কাছে পৌঁছে গেলাম। মঙ্গলদাসজীর ক্রমাগত সংকেতের ফলে, আমি শম্ভুনাথজীকে বললাম — আমি ত এখন ভজন-আশ্রমে থাকব, রোজই ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে আসব আরতি দেখতে। আপনি যদি বেড়াতে বেড়াতে ওখানে যান, তাহলে কোটিতীর্থের ঘাটে বসে দুজনে গল্প করা যাবে। মঙ্গলদাসজী ত সন্ধ্যাকালে ঠাকুরসেবায় ব্যস্ত থাকেন।

— জরুর যাউঙ্গা। তবে এখানে ইয়াদোদের বাড়ীতে আমি দু'তিনটি ছোট ছেলেকে হিন্দী ও ইংরাজীর বর্ণ পরিচয় শিখাই। তাদেরই বাড়ীতে আমি আহার করি। আমি নিজেও ইয়াদো অর্থাৎ যাদব গোষ্ঠীভুক্ত। দু'বেলা আহার ছাড়াও সেই শিশুদের একটি আমার কিষেণের মত দেখতে। পড়াতে পড়াতে তাকে নেড়ে ঘেঁটে আমি তৃপ্তি পাই। এই বলে শম্ভুনাথজী ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকলেন। মঙ্গলদাসজী তাঁকে অনেক করে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। তিনি কুটীরের দিকে চলে গেলে আমরা দুজনে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের ধার দিয়ে বেলা এগারটা নাগাদ ভজন-আশ্রমে পৌঁছে গেলাম। রামদাসজী জিজ্ঞাসা করলেন — ক্যা পরিক্রমা সমাপ্ত হো গয়ি? অব, ঔর এক দফে আস্নান কর লিজেয়ে।

কুটীরে বসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে পুনরায় স্নান করতে গেলাম। শম্ভুনাথজীর কান্না দেখার পর থেকে মনটা ভারী হয়েছিল। নর্মদার কাকচক্ষু স্নিগ্ধ জলে স্নান করে শরীর ও মন দুই জুড়াল।

আশ্রমে ভোগ নিবেদন হচ্ছে। শঙ্খ-ঘন্টার ধ্বনি সহ মধুর রামনাম গানে চারিদিক মুখর হয়ে উঠেছে। রামদাসজী শ্রুতিমধুর কণ্ঠে রামচন্দ্রের বন্দনা করছেন। মধ্যাহ্ন ভোজনাদির পরে ঘরে বসে নানা কথা চিন্তা করতে করতে মহাত্মা প্রলয়দাসজীর দর্শনের জন্য মনটা বড় চঞ্চল হয়ে উঠল। বেলা পাঁচটা নাগাদ আমি চলে গেলাম ওঁকারেশ্বর মন্দিরে। মন্দিরে ঢুকেই আমি সভামণ্ডপম্ অর্থাৎ নাটমন্দিরের চতুর্দিকে খুঁজতে লাগলাম প্রলয়দাসজীকে। কিন্তু কোথাও তাঁকে দেখতে পেলাম না। মন্দিরের একজন পাণ্ডাকে জিজ্ঞেস করলাম — আপনি ত সেদিন দেখেছিলেন, একজন বৃদ্ধ সাধুকে পুঁথি পড়ে শুনিয়েছিলাম, তিনি কি সকালে মন্দিরে এসেছিলেন?

— ঐ 'বুঢ্যা অন্ধা' সাধুর মন্দিরে আসা যাওয়ার কোন নির্দিষ্ট সময় নাই। কখনও সকালে কখনও সন্ধ্যায় আসেন। আবার হয়ত দু'দশদিন এলেনই না। 'বাচপনসে' অর্থাৎ বাল্যকাল থেকেই আমি তাঁকে ঐরকমই দেখছি। আমার ঠাকুরদাকেও বলতে শুনেছি, তিনিও তাঁর 'বাচপনসে' ওঁকে ঐভাবে মন্দিরে যখন তখন আসতে যেতে দেখেছিলেন। কারও সঙ্গে কোন বাৎচিৎ করেন না, কোথাও কোন্ গুহাতে পড়ে থাকেন তাও কারও জানা নাই। ওঁকে খুঁজে বেড়ানো আর মরীচিকার পিছনে ধাওয়া করা একই কথা।

আমি বাইরে বেরিয়ে এসে কোটিতীর্থের ঘাটেও চারদিক তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম,

কিন্তু না — তিনি কোথাও নাই। সন্ধ্যা হয়ে গেল। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বেজে উঠল। আমার আরতি দেখতে ভাল লাগল না। আমি ওঁকারেশ্বরজীর উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে ফিরে এলাম। ভজন আশ্রমেও তখন আরতি হচ্ছে। সকলেই রামনাম করছেন। আমি ঘরে ঢুকে বসে থাকলাম। আরতির শেষে মঙ্গলদাসজী চুপি চুপি এসে জিজ্ঞাসা করলেন — শম্ভুনাথ ভেইয়া মন্দির মেঁ আয়ে থে?

— নেহী জী। আমার অতি সংক্ষিপ্ত জবাব পেয়ে তিনি তাঁর ঘরে চলে গেলেন।

প্রদীপের দম কমিয়ে আমি শুয়ে পড়লাম। শুয়ে শুয়ে আশ্রমিকদের সেই ত্রয়োদশাক্ষর রাম ভজন শুনতে লাগলাম। রামদাসজীও তাঁর ঘরে বসে যথারীতি তুলসীদাসজীর দোঁহা গুণগুণ করে আবৃত্তি করছেন। কিন্তু আজ সেদিকে আর কান দিলাম না। কিছুক্ষণ শুয়ে শুয়ে ছটপট করতে করতে আবার উঠে বসলাম। প্রদীপের বাতিটা উস্‌কে দিয়ে ডায়েরী খুলে পড়তে লাগলাম। প্রলয়দাসজী ওঁকারেশ্বরের তত্ত্ব সম্বন্ধে যেসব কথা বলেছিলেন, তা এক ফাঁকে ডায়েরীতে লিখে রেখেছিলাম। ডায়েরী খুলে সেইসব কথা পড়তে লাগলাম।

'সকৃদুচ্চারিতমাত্রং স এয উর্ধ্বমুৎক্রাময়তি' — ওঁকার একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই দেহস্থ প্রাণন ক্রিয়ার নিম্নগামী ধারা শুযুম্না পথে উর্ধ্বগামী হয়। এ ত সাংঘাতিক কথা! তাই যদি হয়, তবে তা সকলের বোধে ফোটে না কেন? অজস্র লোক সারাদিনই ত বহুবার 'ওঁ' উচ্চারণ করে। আচমন থেকে আরম্ভ করে যে কোন মন্ত্র উচ্চারণ করতে গেলেই ত 'ওঁ' বলতে বাধ্য হয়। গুরুদত্ত যে কোন সিদ্ধবীজ ত 'ওঁ দ্বারা পুটিত থাকে ! একবার মাত্র উচ্চারণ করলেই সুযুম্নামার্গে প্রাণশক্তি যদি উর্ধ্বপথে প্রবাহিত হতে আরম্ভ করে তবে সকলেরই সিদ্ধিলাভ হয় না কেন? নিশ্চয়ই তাহলে ওঁকার উচ্চরণের কোন গুপ্ত পদ্ধতি, গুঢ় সাধন সংকেত আছে! কিন্তু সেই পদ্ধতি কে আমাকে দেখাবেন? প্রলয়দাসজী বলেছেন — মূর্ধ্বাদেশে ওঁকার উচ্চারণ করবার চেষ্টা করবে। মূর্ধাদেশে ওঁকার তত্ত্ব মনন করবে। একি বাৎকী বাৎ! এত সহজ নাকি ? বাবার মুখে ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষৎ (১২/২৩) এর একটি মন্ত্র শুনেছিলাম —

> কাংস্যঘন্টা নিনাদস্তু যথা লিয়তি শান্তয়ে।
> ওঁকারস্তু তথা যোজ্যঃ শান্তয়ে সর্বমিচ্ছতা।
> যস্মিন্ সংলীয়তে শব্দস্তৎপরং ব্রহ্ম উচ্যতে।।

অর্থাৎ কাংস্যনির্মিত ঘন্টায় আঘাত করলে (ঢং) শব্দ যেমন ধীরে ধীরে লীন হয়ে শান্ত হয়, ঠিক সেইভাবেই ওঁ উচ্চারণ ধারণা করতে হয়। ওঁ শব্দ যাতে লয়প্রাপ্ত হয়, তাকেই পরমব্রহ্ম বলে জানবে।

বাবা আমাকে ওঁ উচ্চারণের ক্রম দেখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাতো মূর্ধাতে মনন করা নয়। যাক্‌গে কাল থেকে আমি সেই পিতৃ উপদিষ্ট পদ্ধতিই অভ্যাস করব। ওঁকারেশ্বর ক্ষেত্রই প্রণব সাধনার সর্বোৎকৃষ্ট স্থান....।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে রামদাসজীর একটি স্বগোক্তি ভেসে এল কানে —

> কাল করে সো আজ করো,
> আজ করো সো আব্।
> পলমে পরলে হোয়েগী,
> বহুরী করোগে কব?

তুলসীদাসজীর এই দোঁহার অর্থ হল — আগামীকাল যা করবে বলে ঠিক করেছ, তা আজই সমাধা কর এবং আজ করবে বলে যা ঠিক করেছ তা এখনই কর। কোন মুহূর্তে মৃত্যু হবে, তার কিছুই ঠিক নাই। মৃত্যু হলে আর কবে কি করবে?

নর্মদাতীরের সব বেটাই অন্তর্যামী নাকি। আমি যেই ভেবেছি কাল থেকে পিতৃ নির্দিষ্ট পন্থায় ওঁকারের সাধন অভ্যাস করব, অমনই উনি দোঁহা আওড়ালেন — কাল করে সে আজ করো! কোন মুহূর্তে মৃত্যু এসে হানা দিবে! মৃত্যু কি এতই সোজা নাকি ? বেদপাঠী ব্রাহ্মণকে শতবর্ষ আয়ু হবার পূর্বে মৃত্যুর সাধ্য নাই গ্রাস করে। আমি শুয়ে পড়লাম। রামদাসজীর সহসা উচ্চারিত দোঁহাকে আমি কাকতালীয়বৎ একটি ঘটনা বলে মনে করলাম। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। মাথার মধ্যে বিপরীত চিন্তা স্রোত বইতে লাগল। আচ্ছা — ভূতানি গুরুঃ ভুবনানি গুরুঃ, এই ঋষিবাক্য যদি সত্য হয়, গুরুসত্ত্বা ত কখনই সাড়ে তিনহাত দেহের মধ্যে আবদ্ধ নন, তাহলে এমনও ত হতে পারে যে রামদাসজীর মুখ দিয়েই আমার বিশ্বব্যাপ্ত গুরুসত্ত্বা আমাকে চেৎবাণী শোনালেন! তাছাড়া বাবাই ত বলতেন —

অদ্যৈব কুরু যচ্ছ্রেয়ো বৃদ্ধঃ সন্ কিং করিষ্যসি।
স্বগাত্রাণ্যপি ভারায় ভবন্তি হি বিপর্যয়ে॥

(যোগবাশিষ্ঠ, ৬।২।১৬২।২০)

অর্থাৎ যা শ্রেয়ঃ, তা আজই করতে লেগে যাও, এখনই করতে লেগে যাও, বৃদ্ধ হয়ে আর কতটুকু করতে পারবে? তখন ত নিজের শরীরই নিজের কাছে একটা ভারি বোঝা বলে মনে হবে, তখন শ্রেয়ো সাধনার অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে!

কুশশয্যা থেকে উঠে বসলাম। বাবা এবং ওঁকারেশ্বরের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম জানিয়ে ওঁকারতত্ত্ব মননের চেষ্টা করতে লাগলাম।

ক্রিয়া করতে করতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না, সহসা এক আলৌকিক কণ্ঠস্বর গুঞ্জরিত হতে লাগল —

অনন্তের রন্ধ্রে রন্ধ্রে বাজে ধ্বনি যাঁর
সেই ত ওঁকার —
বিশ্বের চেতনা।
ক্রিয়া নিষ্ক্রিয়া পারে
আনবিক অনুলোম প্রতিলোমাঘাতে
বাজে তারই অনন্ত মূর্চ্ছনা।
.... আদি উদ্বোধনা।
অনন্তের শ্রবণ কুহরে
বিরাম বিহীন অনিবার
ওঠে কার মধুর ঝঙ্কার
গুণগুণাত্মক সগুণ নির্গুণ
সেই ত ওঁকার॥

এ কার কণ্ঠস্বর? বাবার? কিন্তু তাঁর স্বর বলে ত মনে হচ্ছে না! তাঁর স্বর চিনতে এ অভাগার কোনদিন ভুল হবে না। তবে কি প্রলয়দাসজীর? না, তাও ত নয়। তাছাড়া তিনি

ত বাংলা জানেন না। একটা অদ্ভুত সুখাবেশে দেহ-মন আচ্ছন্ন। উঠে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু শরীর টলছে। আবার ধপ্ করে বসে পড়লাম। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি; রৌদ্রে ঝলমল করছে চারিদিক। মঙ্গলদাসজীকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকেই হাতের ইসারায় ডাকলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — মঙ্গলারতি হো চুকা?

— কব্ হো গয়ে। জাগনে মেঁ আপকো আজ দের হুয়া। আভি করীব সাড়ে ছয় বাজ গিয়া।

— আপ্‌কো গুরুজী কাঁহা হৈ?

— জপ মেঁ বৈঠা হৈ। আভি উন্‌কো হোঁস নেহি।

আমি ধীরে ধীরে প্রাতঃকৃত্য সেরে কোটিতীর্থের ঘাটে গেলাম স্নান করতে। অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। কিছুক্ষণ রেবামন্ত্র জপ করে প্রণাম করতে লাগলাম দেবীর উদ্দেশ্যে —

ওঁ শিবস্বেদোদ্ভবে দেবি সর্বপাপা প্রণাশিনি।
নমামি নর্মদে মাতঃ! ভূয়ো ভূয়ঃ নমম্যহম্।

কমণ্ডলুতে জল ভরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে লাগলাম ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে। মন্দিরে ঢুকে চারদিকটা একবার দেখে নিলাম, আজ মন্দিরে অনেক ভক্ত। কিন্তু না প্রলয়দাসজীকে কোথাও দেখতে পেলাম না। পাণ্ডারা মন্ত্রোচ্চারণ করে ভক্তদেরকে পূজা করাচ্ছেন। এক ফাঁকে জয়রাম গোস্বামীজী আমাকে পূজা করার সুযোগ করে দিলেন। আমি অথর্ববেদের কয়েকটি মন্ত্র উচ্চারণ করে ওঁকারেশ্বরের পূজা করতে লাগলাম —

ওঁ ঈড্যো বন্দ্যশ্চ। (অথর্ব, ৫।১২।৩)
ওঁ ইমা ব্রহ্ম ক্রিয়ত আবর্হিঁ সীদ। (ঐ, ২০।২৩।২৩)
স চেতসো মে শৃণুতেদ মুক্তম্। (ঐ, ১।৩০।২)
ওঁ দদামি তদ যৎ তে অদত্তো অস্মি।
দেহিনু মে যন্ মে অদত্তো অসি।
সখা নো অসি পরমং চ বন্ধুঃ।। (ঐ, ৫।১১)

হে অর্চনীয়, হে বন্দনীয়, এই কয়টি ব্রহ্মবাণী দিয়ে পূজা করছি। তুমি আমার হৃদয়ে আসন গ্রহণ কর, দয়া করে মনোযোগ দিয়ে আমার এই বেদমন্ত্রগুলি শ্রবণ কর। তোমাকে আমার যা দেয়া হয়নি, তাই আজ আমি শ্রীচরণে নিবেদন করছি। তুমিও আমাকে যা এখনও দাওনি, তা আমাকে দাও দয়াল। তুমি যে আমাদের সকলের সখা, আমাদের সকলের পরম বন্ধু।

ওঁকারেশ্বরকে পূজা ও প্রণাম করে নাটমন্দিরে এসে বসে রইলাম। আজ বৈশাখ মাসের সাত তারিখ, মঙ্গলবার। ১লা বৈশাখ বুধবার ওঁকারেশ্বরের মন্দিরে এসে প্রথম দিনেই বৃদ্ধ সাধুর দর্শন পেয়েছিলাম, সেদিন দুবেলাই তাঁর সঙ্গে দেখা হল, কিন্তু এ কয়দিনের মধ্যে আর তাঁর দেখা হচ্ছে না কেন? আর কি দেখা পাব না? বেলা ১১টা পর্যন্ত অপেক্ষা করে ভজন আশ্রমে ফিরে এলাম। এসে ঘরে বসেছি, এমন সময় রামদাসজী নিজেই এক গ্লাস সরবৎ হাতে করে আমার ঘরে ঢুকে বললেন — পি লিজিয়ে।

আমি তাঁকে সেই বৃদ্ধ সাধুর কথা জিজ্ঞাসা করলাম, আর একটিবার তাঁর দর্শন পাওয়ার জন্য মনের ব্যাকুলতার কথাও অকপটে জানালাম। তিনি বললেন এর আগে কখনও আমি

ঐ বৃদ্ধ সাধুকে দেখিনি। সেইদিনই যা তোমার সঙ্গে দেখেছি। এই তপোভূমিতে কোথায় কে যে কোন মূর্তিতে বিরাজমান আছেন, তা কারও পক্ষেই সঠিকভাবে জানা সম্ভব নয়। তবে উনি যে একজন মহাযোগী তা প্রথম দর্শনেই বুঝেছি। তুমি তাঁকে যখন ওঁকার মাহাত্ম্য পড়ে শোনাচ্ছিলে, তখন তাঁর ধ্যানাবিষ্ট দেহের চারদিকে আমি এক অলৌকিক জ্যোতির আভা দেখতে পেয়েছিলাম। তাঁর জন্য তোমার ব্যাকুলতার কারণ, হয়ত তাঁর সঙ্গে তোমার পূর্বজন্মের কোন সম্বন্ধ আছে, হয়ত কোন লেনদেনের ব্যাপার আছে, নতুবা যাঁর কথায় তুমি দুর্গম পথে পেরিয়ে এসেছ, তোমার গুরু পিতাজী কিংবা যাঁকে লক্ষ্য করে যাঁর মুখ চেয়ে তুমি ভয়ঙ্কর মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বরের ঝাড়িপথ নির্ভয়ে অবলীলাক্রমে অতিক্রম করতে পারলে সেই বরাভয়দায়িনী মাতা নর্মদাই হয় চাচ্ছেন কোন মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ঐ মহাত্মার সঙ্গে তোমার দেখা হোক। তুমি প্রভুর উপর ভরসা রাখ; প্রয়োজন থাকলে তিনি যথা সময়ে উভয়কে মিলিয়ে দেবেন। তুমি আমার ঘরে চল। আমি তোমাকে একখণ্ড রামচরিতমানস পড়তে দিব। রামকথা পড়লে তুমি শান্তি পাবে, সাধনায় সাহায্য পাবে। সাধনার অনেক গূঢ় সংকেত তুলসীদাসজী রামায়ণে মধুর ভাষায় দিয়ে গেছেন। ঠেট্ এবং খোড়িবোলি ভাষার সংমিশ্রণে লেখা বলে যদি কোন শব্দার্থ কঠিন মনে হয় তবে আমার কাছে জেনে নিও।

চিত্রকূটে থাকার সময় রামচরিতমানসের কিছুটা আমি পড়েছিলাম, তাতে রসও পেয়েছিলাম। কাজেই রামদাসজীর কাছ হতে সাগ্রহে বইখানি নিয়ে এলাম।

বিকালে পাঁচটা বাজার কিছু আগেই ওঁকারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে পৌঁছলাম। কোটিতীর্থের ঘাট থেকে মন্দিরের সর্বত্র ঘুরে বেড়ালাম। একটাই উদ্দেশ্য প্রলয়দাসজীকে যদি একবার দেখতে পাই। আজও হতাশ হতে হল। মন্দিরের সিঁড়িতে বসে আছি, এমন সময় শম্ভুনাথজী এসে পৌঁছলেন। আমি তাঁকে বললাম — ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করে আসুন। মন্দিরে কিছু ভক্তের সমাগম হচ্ছে। বোধহয় সবাই আরতি দেখতে আসছেন। মন্দির থেকে কাঁদতে কাঁদতে শম্ভুনাথজী বেরিয়ে এসেই আমার হাত ধরে টানলেন। নিয়ে গেলেন নাটমন্দিরে। গৌরকান্তি উলঙ্গ একটি দু'তিন বছরের শিশুকে দেখিয়ে তিনি বললেন — দেখিয়ে উহ লেড়কা হমারা কিষেণ কী মাফিক। শিশুটি দেখতে সত্যই বড় সুন্দর। শম্ভুনাথজীর চোখে জল। আমি তাঁর হাত ধরে কোটিতীর্থের ঘাটের একধারে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আমি বললাম — মঙ্গলদাসজীর মুখে আপনার পারিবারিক অশান্তির কিছু কিছু বিবরণ আমি শুনেছি। যদি আপত্তি না থাকে, তাহলে আপনি আপনার ধর্মপত্নীকে কেন ত্যাগ করেছেন বলবেন কি ? বন্ধুভাবে জিজ্ঞাসা করছি, কোন অপরাধ নেবেন না। আপনি কি তপস্যা করার জন্য পত্নী ও পুত্র ত্যাগ করে এসেছেন।

— না, না অপরাধের কোন প্রশ্ন নয়। আমি আপনাকে সব কথা বলতে পারলে বরং অনেক হাল্কাবোধ করব। আমি অল্প বয়সে বাবা মাকে হারিয়েছি। আমাদের কিছু ভূসম্পত্তি ছিল। আমার কাকারা এখনও জীবিত, তাঁরাই আমার জমি জায়গার দেখাশুনা করেন, আমাকে তাঁরা ভালওবাসেন। খাণ্ডোয়া হতে তিন মাইল দূরে আমাদের মহল্লা। খাণ্ডোয়াতে আমার দিদির বাড়ী। তাঁর আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল। তিনি বিধবা। তিনিই আমাকে কাকাদের কাছ হতে নিয়ে এসে কাছে রাখেন, লেখাপড়া শেখারও ব্যবস্থা করেন। আপনি বোধহয় জানেন আমাদের দেশে অল্প বয়সেই বিবাহ হয়। বি.এ পড়তে পড়তে দিদি আমার বিবাহ

দেন। বিবাহের বছর দুই পরেই কিযেণ জন্মায়। বিন্নী এবং কিযেণকে নিয়ে আমি সুখের সাগরে ভাসছিলাম। তাদেরকে ছেড়ে নাগপুরে থেকে আমার লেখাপড়ায় আর মন বসছিল না। বি.এ পরীক্ষায় ফেল হয়ে আমি লেখাপড়া ছেড়ে দিলাম। এই সময় হতেই আমার জীবনে অশান্তি দেখা দিল। দিদির সঙ্গে বিন্নীর তুচ্ছাতিতুচ্ছ কারণে প্রায়ই খিঁটিমিটি লাগত। কানাইয়া নামে আমার এক বন্ধু ছিল, নিকটতম প্রতিবেশী। স্কুলজীবনে আমরা সহপাঠী ছিলাম। সে আমার কিযেণকে খুব ভালবাসত। সে প্রায়ই আমাদের বাড়ীতে আসত, আমিও তার বাড়ীতে যেতাম। ধীরে ধীরে লক্ষ্য করতে লাগলাম দিদি আকারে ইঙ্গিতে বিন্নী এবং কানাইয়াকে জড়িয়ে আমার কাছে অনেক অশোভন মন্তব্য করছেন কিন্তু বিন্নীর সরল মুখখানির দিকে তাকিয়ে এবং তার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার পেয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ জাগত না। দিদির ব্যবহার দিন দিন উগ্র হতে উগ্রতর হয়ে উঠল। বিন্নী প্রায়ই রাত্রে কাঁদাকাটা করত। আমি তাকে বুঝিয়ে সুজিয়ে শান্ত করতাম। ঐ সময় আমার কাকার খুব শক্ত অসুখ হয়। খবর পেয়ে আমি তাঁকে দেখতে চলে যাই। পাঁচদিন পরে ফিরে এসে দেখি আমার কপাল পুড়েছে। দিদি জানালেন তিনি খাণ্ডোয়া হতে মাইল খানিক দূরে তাঁর এক চাষীর কাছে ভুট্টা আর মকাই এর দাম আদায় করতে গেছলেন, ফিরে এসে আমার শোবার ঘরে বিন্নী এবং কানাইয়াকে একসঙ্গে দেখতে পান। এতবড় অনাচার তিনি সহ্য করতে পারেননি। তাই মারধর করে বিন্নীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। বিন্নী কিযণেকে নিয়ে তার বাপের বাড়ী চলে গেছে। আমি কানাইয়ার খোঁজ করতে গেলাম। তার মা বাবা দুজনেই আমার দিদিকে গালাগালি করতে লাগল। শুনে এলাম, কানাইয়া তার মামা বাড়ী গেছে। আমার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামেই কানাইয়ার মামা বাড়ী। আমি শ্বশুরবাড়ী রওনা হলাম। খাণ্ডোয়া থেকে মাত্র ছয় মাইল দূরেই সেই মহল্লা। সেখানে পৌঁছে দূর থেকে দেখতে পেলাম, কানাইয়া কিযেণকে কোলে নিজে দাঁড়িয়ে আছে। বিন্নী হাসতে হাসতে কি যেন কথা বলছে।

মাথায় আগুন জ্বলে উঠল, তার সঙ্গে দুরন্ত অভিমান। আমি সেই মুহূর্তেই রাস্তা থেকে ফিরে এলাম। দিদির বাড়ীতেও গেলাম না। মোরটক্কাতে এসে আশ্রয় নিলাম একটি মন্দিরে। তার পরদিন বিষ্ণুপুরীর ঘাটে নৌকা পেরিয়ে ওঁকারেশ্বরে এসে পৌঁছলাম। প্রথম তিনদিন এইখানে এই মন্দিরেই কাটল। তারপরে এক সাধুর পরিত্যক্ত কুটীরের সন্ধান পেয়ে সেইখানেই বাস করছি। আমার থাকবার স্থান ত আপনি দেখে এসেছেন। বিন্নী বিশ্বাসঘাতিনী হলেও তার মুখ চোখের চেহারা আমার সামনে মাঝে মাঝেই ভেসে উঠে। তার ব্যভিচারের কথা ভেবে মনের মধ্যে বিতৃষ্ণা আনার চেষ্টা করেও পারিনি। শত চেষ্টা করেও ভুলতে পারছি না, আমার কিযেণ চাঁদের কচি মুখখানা। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে তার কল্‌কলে হাসি মাখা মুখখানা মানসচক্ষে ভেসে উঠে আমাকে ব্যাকুল ও বিহ্বল করে তুলেছে।

এই বলে শম্ভুনাথ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। আমি কোন বাধা দিলাম না, কোন সান্ত্বনার কথাও বললাম না। কিছুক্ষণ পরে নিজেই স্থির হয়ে বলতে লাগলেন — সত্যি কথা বলতে কি আমি তপস্যা করার মনোভাব নিয়ে এখানে আসিনি। অকথ্য মানসিক মর্মযাতনায় কাতর হয়ে পালিয়ে এসেছিলাম ওঁকারেশ্বরের পদতলে। তারপর এখানে থাকতে থাকতে নানা সাধুর সঙ্গ করতে করতে এখন ভাবছি, কোন সিদ্ধ মহাত্মার দর্শন পেলে দীক্ষা নিয়ে জপ ধ্যানে মন দিব। রামদাসজীর সৎসঙ্গ কিছুদিন শুনেছি। তিনি তুলসীদাসজীর জীবনী

শোনাতে শোনাতে বলেছিলেন যে তাঁর পত্নীর কাছে তিনিও নাকি মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে রামচন্দ্রের তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। কাজেই রাম নাম নিয়ে পড়ে থাকলে আমারও সিদ্ধিলাভ হতে পারে। পত্নী পুত্র সবই মায়ার বন্ধন। মায়ার বন্ধন কাটাতে পেরেছি, এ নাকি আমার সৌভাগ্য।

— সত্যিই কি আপনি মায়ার বন্ধন কাটাতে পেরেছেন?

— না, না এই পবিত্রস্থানে বসে মিথ্যা কথা বলব না। আমি স্ত্রী-পুত্রের কথা ক্ষণেকের জন্যও ভুলতে পারিনি। দিদি বলেছেন বিন্নী ব্যভিচারিনী, কিন্তু তার ব্যভিচারের কথা আমার মনে পড়ে না; তার প্রেমপূর্ণ ব্যবহার এবং নানা খুঁটিনাটি মিষ্টি কথাই মনে পড়ে। রামনাম জপ করতে করতে কিষেণ কিষেণ বলে ফেলি। রামচন্দ্রের শ্রীমূর্তি ধ্যান করতে গেলেই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে কিষেণের হাসিভরা মুখখানি, সেই ঢলঢল লাবণ্যভরা মুখ, তার আধো আধো বুলিতে বা-বু, বা-বু ডাকই আমার কানে ভেসে আসে। যেকোন শিশুকে দেখলে আমার কিষেণের কথা মনে পড়ে, তাকে কোলে নিতে ইচ্ছা করে; ইচ্ছা করে কিষেণকে কাঁধে নিয়ে যেমন ঘুরে বেড়াতাম, তেমনি সেই বাচ্চাটিকে কাঁধে তুলে নিয়ে সেইভাবে ঘুরে বেড়াই। এই একটু আগে মন্দিরে কিষেণের মত একটি বাচ্চাকে দেখে তাই আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম।

আমার বুকে দিবারাত্র সাহারা মরুভূমির জ্বালা। মাঝে মাঝে নর্মদার জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা হয়।

এই বলে শম্ভুনাথ দু'হাতে কপাল চেপে নিচের দিকে মুখ করে বসে রইল। বুঝতে পারলাম তার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে।

— মহাত্মা রামদাসজী আপনাকে যা বলেছেন, তাতো বৈরাগীদের কথা। যে কোন বৈরাগী সাধুই আপনাকে এইরকম কথাই শোনাবেন। তিনি আপনাকে শুনিয়েছেন, তুলসীদাসজী তাঁর পত্নী রত্নাবলীর কাছে মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে রাম ভজনে মেতেছিলেন এবং পরিশেষে সিদ্ধ মহাত্মারূপে সর্বজনবন্দিত হয়েছিলেন, কাজেই আপনিও যখন স্ত্রীর কাছে আঘাত পেয়েছেন তখন রামনাম জপ করলে আপনিও একদিন দ্বিতীয় তুলসীদাস হয়ে উঠবেন। সহজ সমাধান এবং সহজতর সিদ্ধান্তই বটে! কিন্তু জগৎ ও জীবন এইরকম সহজ ফরমূলা অনুযায়ী চলে না। আপনি দিদির কথায় স্ত্রীকে ব্যভিচারিনী ভেবে মনঃকষ্টে ভুগছেন এবং তা থেকে শান্তি পাবার জন্য মাঝে মাঝে 'রাম' 'রাম' করছেন! রামদাসজী আপনাকে কোন দৃষ্টিকোণ হতে আপনাকে ঐ ধরণের উপদেশ দিয়েছিলেন, তা আমার জানা নাই ; তবে তিনি এত কথা বলতে পেরেছিলেন, এ কথা বলেনি যে কোটি কোটি জন্মের তপস্যার ফলে সাধকের জীবনে যখন মহাসিদ্ধিলাভের মহালগ্ন উপস্থিত হয়, তখন গুরু বা যে কোন লোকের মুখনিঃসৃত একটি শব্দের তড়িৎকণাই সাধকের জীবনে ঈশ্বরপ্রেমের সুপ্তবীজকে ফুটিয়ে তোলে, তাঁর জীবনে আমূল পরিবর্তন ঘটে যায়?

তুলসীদাসজী পত্নীকে ছেড়ে একমুহূর্তও থাকতে পারতেন না। পাড়ার লোক তাঁকে স্ত্রৈণ মোহান্ধ বলে নিন্দা করত। একবার তুলসীদাসজীর শ্বশুর মৃত্যুশয্যায় এই সংবাদ পেয়ে রত্নাবলী তুলসীদাসজীর অনুপস্থিতিতে পিতৃগৃহে চলে যান। সে সময় তুমুল জল ঝড় হচ্ছিল, সে সব উপেক্ষা করে বর্ষণসিক্ত কাদামাখা ছিন্নবস্ত্রে একান্তে উদ্‌ভ্রান্তের মত শ্বশুরবাড়ীতে

গিয়ে পৌঁছেন তুলসীদাসজী। রত্নাবলী তাঁর এই স্ত্রৈণ স্বভাব দেখে সহসা কঠোর ভৎর্সনা বাক্য উচ্চারণ করলেন, যেন ভগবানই তাঁর মুখ দিয়ে বললেন রূঢ় জাগরণী মন্ত্র —

অস্থিচর্মময় দেহ মেরী, তামেঁ জৈসী প্রীতি।
তৈসী শ্রীরাম মেঁ হো ত ন তু ভবভীতি॥

অর্থাৎ আমার হাড় মাংসের এই দেহটার প্রতি তোমার যে আসক্তি একে প্রেম বলে না। এ শুধু কামের জ্বালা। এই পরিমাণ আসক্তি বা অনুরাগ যদি রামচন্দ্রের চরণে নিবেদন করতে পারতে তা হলে তোমার ভববন্ধন ঘুচে যেত, তোমার সর্বসিদ্ধি করায়ত্ত হত। তুমি অবিলম্বে এই স্থান পরিত্যাগ কর। তোমার মত কামুক লোকের দর্শন করতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

পত্নীর রূঢ় র্ভৎসনা বাক্যে তুলসীদাসজীর চৈতন্যোদয় ঘটল, জন্মার্জিত তীব্র বৈরাগ্য সাধনার ফল স্ফুটনোন্মুখ হল, তাঁর মানসপটে ঝলসে উঠল রামচন্দ্রের মঞ্জুলমোহন দিব্যরূপ; অসহায়ের সহায়, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, অগতির গতি সেই মোহনরূপের সন্ধানে তদ্দণ্ডেই তিনি বেরিয়ে পড়লেন পথে।

বলুন ভাই, আপনার জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য কোথায়? আপনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছেন আশাভঙ্গ মনস্তাপ এবং তীব্র অন্তর্বেদনা বুকে নিয়ে। এখন আপনি বলছেন, এখানে তিন চার বছর থাকাতে সাধুর কথায় রামনামে মন বসাতে চেষ্টা করছেন, অথচ আপনার মনকে অধিকার করে আছে পত্নী-পুত্রের সুখস্মৃতি। এখানে বৈরাগ্য নাই, আছে বিরহের অন্তর্দাহী জ্বালা। একে বড়জোর মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্য বলা চলে। বোধহয়, তাও নয়। ঈশ্বরপ্রেম বা প্রকৃত বৈরাগ্য ছাড়া সাধনা সফল হয় না। মর্কট বৈরাগ্য এবং শ্মশান বৈরাগ্যে মানুষের ইষ্টসিদ্ধি হয় না। বরং ক্রমে এমন একটা অবস্থা আসে, যাতে বলা যেতে পারে — না ঘরকা, না ঘাটকা। এটা সম্পূর্ণভাবে ভাবের ঘরে চুরি! পেটে ক্ষুধা মুখে লাজ নিয়ে সসেমিরা অবস্থায় সাধু সাজলে বড়জোর আর একজন ভিখ মাঙ্গা বৈরাগীর সংখ্যা বাড়বে মাত্র। ভেখ্ এবং ভেষ্ মানুষকে কখনই প্রকৃত বৈরাগ্যের পথে নিয়ে যায় না। প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মার্জিত সাধনার ফলেই জন্মে থাকে; যেমন জন্মেছিল তুলসীদাসজীর জীবনে।

আমি শম্ভুনাথকে বলতে লাগলাম — ভাই, আপনি শিক্ষিত লোক, আপনি আমার কথাগুলো অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। আমি আপনাকে একটা গল্প বলছি শুনুন। পূর্বে মোগল সম্রাটদের হারেমে প্রত্যেক সম্রাটেরই বহুসংখ্যক বেগম থাকতেন। সম্রাট আকবরেরও কয়েকজন বেগম ছিলেন। তারমধ্যে পরমাসুন্দরী উদিপুরী বেগমের প্রতি সম্রাটের পক্ষপাতিত্ব ছিল বেশী। অন্যান্য বেগমরা সেজন্য উদিপুরী বেগমকে হিংসা করতেন। আপনি ইতিহাসে নিশ্চয়ই পড়েছেন, সর্বদা অসংখ্য খোজা প্রহরী দ্বারা বেষ্টিত থাকলেও তার মধ্যেও হারেমে অনাচার ব্যভিচার খলতা হিংসা এবং ষড়যন্ত্রের কোন অভাব ছিল না। মোগল হারেমের ষড়যন্ত্রে অনেক রাজপুরুষের উত্থান পতন ঘটত। উদিপুরী বেগমও এইরকম ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিলেন। অন্যান্য বেগমরা ঈর্ষাবশতঃ যে কোন ভাবে হোক সম্রাটের কানে একথা পৌঁছে দিয়েছিলেন যে উদিপুরী বেগমের হারেমে গোপনে পরপুরুষের যাতায়াত আছে। উদিপুরী বেগম অবৈধ প্রণয়ে লিপ্ত। আকবর লঘুচিত্ত ব্যক্তি ছিলেন না, তিনি অন্যান্য মোগল সম্রাটের মত হলে এই সংবাদ শোনামাত্রই উদিপুরী বেগমকে কোতল করার হুকুম দিতেন। তিনি তার পরিবর্তে উদিপুরী বেগম ও তাঁর বিবাহের যিনি মাধ্যম ছিলেন, তাঁর সেই রাজস্ব-

সচিব টোডরমলকে ক্ষুব্ধকণ্ঠে সবকিছু জানালেন। বিচক্ষণ টোডরমল তাঁকে বললেন — 'জাঁহাপনা, আপনি চঞ্চল হবেন না, এই গুজবের মূলে হয়ত কোন ষড়যন্ত্র আছে। আমাদের হিন্দুশাস্ত্রে আছে যবতক্ না দেখো নিজ নয়নী, তব তক্ না মানো গুরুকা বাণী। এই জটিল সমস্যার সন্মুখীন হলে নিজের চোখে না দেখা পর্যন্ত এমন কি গুরুর কথাকেও বিশ্বাস করতে নাই। শোনা কথা প্রায়শই মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়। আপনি দয়া করে ধৈর্য ধরুন, সত্যাসত্য নির্ণয়ের জন্য এখন নির্ভরযোগ্য কোন মহিলা গুপ্তচর নিযুক্ত করুন। বেগম যখন হাতেনাতে ধরা পড়বেন, আপনি নিজের চোখে যখন দেখবেন, তখন আমার আর কিছু বলার থাকবে না।' আকবর বরাবরই তাঁর এই রাজস্ব সচিবের পরামর্শকে মূল্য দিতেন, কাজেই ধৈর্য্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলেন। ইতিহাসের বিজ্ঞতম সম্রাট হলেও তবুও ত তাঁর রক্তমাংশের শরীর। আপন প্রাণাধিকা প্রিয়তমা ভার্যা সম্বন্ধে ঐ রকম সর্বনাশা সন্দেহ মনে ঢুকিয়ে দিলে, যে কোন মানুষের মনে ক্রোধ ও অভিমান স্বতঃই জন্মে থাকে। আপনার যেমন হয়েছে, সেই সময় তেমনি দশা হয়েছিল আকবরের, তিনি উপযুক্ত মহিলা গুপ্তচর নিযুক্ত করে উদিপুরীর মহলে যাতায়াত বন্ধ করে দিলেন।

ইতিমধ্যে একদিন উদিপুরী স্নানের সময় গোসলখানায় ঢুকেছিলেন। তাঁর খোজা ভৃত্য তাঁর শয্যা রচনা করার জন্য বেগমের ঘরে ঢোকে। পালকের গদির উপর বহুমূল্য দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করার পর হাত দিয়ে টিপে টিপে তার লোভ হয় একটিবার শুয়ে দেখতে। সে মনে মনে ভাবে বেগম দুধে স্নান করবেন, গাত্র মার্জন করে সুগন্ধি গোলাপ জলে স্নান করবেন। তাঁর আসতে অনেক দেরী হবে। এই ভেবে সে সেই শয্যায় শুয়ে পড়ল চাদর মুড়ি দিয়ে। সারাজীবন যাদের ধূলিশয্যায় শুয়ে জীবন কাটে ; তারা যদি হঠাৎ অত্যন্ত সুখকর আরামপ্রদ শয্যায় শোবার সুযোগ পায় তাহলে নিদ্রাভিভূত হতে সময় লাগে না। সে ঘুমিয়ে পড়ল। রাণী স্নান কর এসে দেখলেন, কেউ একজন তাঁর শয্যায় শুয়ে আছে। সম্রাট ছাড়া এত সাহস কার? তিনি ভাবলেন, পরিহাসপ্রিয় সম্রাটই শুয়ে আছেন। তিনিও নিঃশব্দে শুয়ে পড়লেন। ইত্যবসরে গুপ্তচর মারফৎ বিকৃত সংবাদ সম্রাটের কানে পৌঁছে গেছে। তিনি দ্রুত টোডরমলকে সঙ্গে নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেলেন। উত্তেজিত সম্রাট তরবারি কোষমুক্ত করতেই টোডরমল তাঁর হাত ধরে মিনতি জানালেন —'জাঁহাপনা! শিকার আপনার হাতের মুঠোয়, আপনার পায়ে ধরছি, আর কয়েক মূহূর্ত অপেক্ষা করুন'। খোজা ভৃত্যের ঘুম ভাঙতেই সে বেগমকে পাশে দেখে আঁতকে উঠল,'ইয়া আল্লাহ্ 'বলে ধড়ফড় করে পালঙ্ক থেকে নেমে পড়ল। ভয়ে সে থরথর করে কাঁপছে। বেগম 'কুত্তা কাঁহাকা' বলে ছুরি ছুঁড়ে মারলেন।

বন্দেগী জাঁহাপনা বলে হাসতে হাসতে টোডরমল দ্রুত সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। মহানুভব সম্রাট সব শুনে ভৃত্যকে ক্ষমা করলেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটল।

ভাই শম্ভুনাথজী, আপনি এই ঘটনা থেকে বুঝে নিন মুহূর্তের ভুলে কিভাবে সংসার ভেঙে যায়। সাপ কামড়ালে তার ঔষধ আছে কিন্তু মানুষ কামড়ালে তার বিষ সহজে যায় না। আপনি নিজের চোখে আপনার পত্নীর ব্যভিচারের প্রমাণ পান নি। আপনার দিদি বলেছেন আর আপনি তা সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করে বসে আছেন। ধিক্ আপনাকে, ধিক্

আপনার প্রেমকে। অনেক সংসারেই তো শ্বাশুড়ী ও পুত্রবধূ , ননদ ও ভ্রাতৃবধূর মধ্যে দ্বন্দ বর্তমান। শাশুড়ীর অহেতুক বিদ্বেষবশে কিংবা ভ্রাতৃবধূর প্রতি ননদের ঈর্য্যানলে কত সংসার যে নষ্ট হয়ে গেছে, সেই রকম ঘটনা কি কখনও শোনেন নি? এর মূলে থাকে অনেক মনস্তাত্বিক রহস্য। আপনার দিদি আপনাকে মানুষ করেছেন, লেখাপড়া শিখিয়েছেন, বিবাহও দিয়েছেন। কিন্তু বিবাহের পর আপনি হয়ে পড়লেন স্ত্রীর অনুরক্ত। লেখাপড়াও বিসর্জন দিলেন। এটা ভাল চোখে গ্রহণ করা আপনার দিদির পক্ষে সম্ভব হয়নি। আপনি হয়ত স্ত্রীর কথাতেই উঠাবসা করতেন, প্রত্যেক স্ত্রৈণ তাই করে থাকে। এতে আপনার দিদির অধিকারবোধ ক্ষুণ্ণ হল। আমি জানিনা কিন্তু আপনি আপনার জীবনের খুঁটিনাটি সব বিবরণ জানেন। আমার কথা শুনে আপনি মিলিয়ে নিন, হয়ত আপনার স্ত্রী কোন কোন সময় আপনার দিদির মুখের উপর উত্তর দিতেন। তাতে তাঁর অহংএ ঘা লাগলে অনেক লোকই হিংস্র হয়ে উঠে। তায় আবার যদি মহিলা বিধবা হয় তাহলে ত আর কথাই নাই । অল্পবয়সে যারা বিধবা হন তাঁদের অধিকাংশই অবদমিত কামচেতনার প্রতিক্রিয়ায় অত্যন্ত ঈর্ষাপরায়ণা এবং ছিদ্রান্বেষী স্বভাবের হয়ে পড়েন। আপনার দিদি অল্পবয়সেই শুধু বিধবা হন নি, তিনি বন্ধা, অপুত্রিকা। অশিক্ষিতা বলে তিনি আরও বেশী সন্দেহবাতিক হয়েছেন।

আপনার সমূহ ঘটনা ধৈর্য ধরে বিচার এবং পর্যালোচনা করা উচিত ছিল। দিদি বলেছেন আর আপনি সুবোধ বালকের মত তা বিশ্বাস করেছেন। আপনার পত্নী, শিশুপুত্র এবং নিজের জীবন এই তিন তিনটে জীবন আপনি তছনছ করতে বসেছেন। আপনি নিজেই একটু আগেই আমাকে বলেছেন যে আপনার প্রতিবেশী বন্ধু কানাইয়া আপনার কিষেণকে খুব ভালবাসে। কাজেই আপনার শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে তার মামাবাড়ী বেড়াতে গিয়ে যদি আপনার স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে দেখা করতে যায় সেটা কি খুব দোষের হয়েছে? বিশেষতঃ সন্দেহবশে আপনার দিদি যে তুলকালাম কাণ্ড বাঁধিয়েছিলেন, সেই ঘটনার পরে পরেই মামাবাড়ী গিয়ে আপনার স্ত্রী পুত্রের খোঁজ নেওয়া ত স্বাভাবিক। আর সেই খোঁজ নিতে গিয়ে যদি আপনার বাচ্চাটি তার কোলে উঠে, তাকে কোলে নেওয়া কিংবা আপনার স্ত্রীর পক্ষে সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে উপভোগ করায় কি অপরাধ হয়েছে? অথচ আপনি সেই দৃশ্য দেখে গৃহত্যাগ করে পালিয়ে এসেছেন। আপনার বুকে দগ্দগে ঘা, সেখানে নিয়ত রক্তক্ষরণ হচ্ছে। আর আপনি বলছেন, রামনাম মুখে নিয়ে তপস্যায় মন বসাবার চেষ্টা করছেন! তবে রামমূর্তি চিন্তা করতে গেলেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠছে কিষেণের কচি মুখখানি। এইরকম আত্মপ্রতারণা করে লাভ কি? আপনি শিশুপুত্র এবং পত্নীর প্রতি নির্বিচারে যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করছেন, তাতে রামচন্দ্র ওঁকারেশ্বর কেন, কোন ঈশ্বরই আপনার দিকে মুখ তুলে চাইবেন না। কারণ ঈশ্বর প্রেমময়। প্রেমময় ঈশ্বর নিষ্ঠুরকে শান্তি দেন না।

আমার অনুরোধ শুনুন, আপনি ভাই ঘরে ফিরে যান। তাতে বরং ঈশ্বরই আপনাকে ক্ষমা করবেন, দয়া করবেন।

— যে কোন ঘটনায় হোক আমি গৃহত্যাগ করে চলে এসেছি। পত্নী পুত্রের মায়ায় এখনও কাঁদছি বটে তবে এইভাবে এই মহাতীর্থে পড়ে থাকতে থাকতে হয়ত একদিন আমার তপস্যায় মন বসবে, তখন রাম নামে শান্তি পাবো। আপনি বলছেন আবার ঘরে ফিরে

মায়ার ফাঁস গলায় পরতে! আপনার কথায় আমার বুক আলোড়িত হয়েছে, আমি তৃপ্তি পাচ্ছি আপনার কথা শুনে কিন্তু যে দু'চারখানা ধর্মপুস্তক পড়েছি, তাতে ত স্পষ্ট লেখা আছে স্ত্রী-পুত্র বন্ধনের কারণ। শংকরাচার্য বলেছেন — কা তব কান্তা কস্তে পুত্র! বৈরাগ্যশতকও পড়েছি, সাধুরা ত বলেন, সংসার ত্যাগ করতে না পারলে তপস্যা হয় না। মায়ার কারাগারে থেকে মুক্তিলাভ সম্ভব নয়।

— বৈরাগ্যশতকে যে বৈরাগ্যের প্রশংসা আছে, তা মেকী বৈরাগ্য, না খাঁটি বৈরাগ্য? বৈরাগী সাধুরা বৈরাগ্য শব্দের স্থূল অর্থ আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করে বৈরাগ্য শব্দের অর্থ বিভ্রাট ঘটিয়েছেন। অন্তর থেকে আসক্তি ত্যাগ করতে পারলে তবেই যথার্থ বৈরাগ্য লাভ হয়। নতুবা সেটা বৈরাগ্যের নামে প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। গৃহত্যাগ করে এসে মঠ মিশন ঐশ্বর্য প্রতিপত্তির পিছনে দৌড়িয়ে, আসক্তি অন্যভাবে অন্যরূপে এসে গ্রাস করে। তফাৎ কেবল, একটার নাম — সাদা কাপড়ে কুটীরে আসক্তি, আর একটার নাম — গেরুয়া কাপড় পরে মঠ নামক অট্টালিকায় বাস করার আসক্তি। মূলে দুটোই আসক্তি। গেরুয়া কাপড়ে মুড়ে আসক্তির নাম 'বৈরাগ্য' দিলে তা বৈরাগ্য হয়ে যাবে না। হীরাকে সাদা কাঁচ বললেও তাতে কি হীরা-ভোগ আটকায়? কবীর সাহেব একেই রহস্য করে বলেছেন — মুড় মুড় মায়া ঘেরি। গৃহে থেকেও, নিজ প্রিয় পরিজনের মধ্যে থেকেও অনাসক্ত হওয়া যায়। 'কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্ত' — এ হল অর্বাচীন ভারতবর্ষের কথা। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিরা এধরণের কথা বলেন নি। বেদ উপনিষদে এ ধরণের কথা কোথাও পড়িনি। তাঁরা পত্নী, পুত্র, মাতা, পিতা ভ্রাতা প্রভৃতি প্রিয় পরিজনের মধ্যে থেকেও কর্মের মধ্যে নৈষ্কর্ম্য, বিষয়ের মধ্যে নির্বিষয় ভাবের সাধনা করতে পেরেছিলেন, সেইভাবে অনাসক্ত চিত্তে সংসারে থেকেও ব্রহ্ম সাধনার নির্দেশ দিয়ে গেছেন। তাঁদের মতে বিষয় ত্যাগ করে নির্বিষয় হওয়ার ভান করা পলায়নী মনোবৃত্তির (Escapism) পরিচায়ক। নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্। প্রাচীন ভারতবর্ষের ঋষিগণ বিষয়ের মধ্যে থেকেও বীতরাগ হতে পেরেছিলেন এবং গৃহকেই তপোবনে পরিণত করেছিলেন।

আচার্য শংকর বৌদ্ধধর্মকে স্তব্ধীভূত করার জন্য হলদে কাপড় পরা বৌদ্ধভিক্ষুদের বদলে গৈরিক বস্ত্রধারী সন্ন্যাসী — দশনামী সম্প্রদায় সৃষ্টি করে গেছেন, মায়াবাদ প্রচার করে গেছেন। তাঁর যুগে হয়ত এসবের প্রয়োজন ছিল। মায়াবাদের অর্থও গভীর। তাঁর সেই বৈদান্তিক গভীর ভাব অনেকেই বুঝেন না, তার বদলে 'মায়া মায়া' বলে তারস্বরে সবাই চিৎকার করছেন। জলাতঙ্ক রোগের মত মায়াতঙ্ক রোগে সবাইকে পেয়ে বসেছে। সংস্কৃতে 'মা' শব্দের অর্থ না, যেমন মা কুরু ধনজন যৌবন গর্বং অর্থাৎ ধনজন ও যৌবনের গর্ব করো না। কাজেই মায়া শব্দের অর্থ যা নাই তা। পারমার্থিক দৃষ্টিতে সংসারের কোন আত্যন্তিক সত্বা নাই, জগৎ নিত্য পরিবর্তনশীল, নিত্য ক্ষয়শীল। কাজেই শংকরাচার্যের উপদেশ — এই রকম অনিত্য সংসার নিয়ে মাতামাতি করে লাভ নাই অর্থাৎ যা নাই তার (মায়ার) পিছনে দৌড়িও না। নিত্য বস্তু ব্রহ্মে মনঃসংযোগ কর। তার মানে এই নয় যে তিনি নিষ্ঠুর হতে বলেছেন কিংবা নিষ্ঠুরের মত স্ত্রী-পুত্র মাতা পিতাকে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিতে বলেছেন।

"সাত ছেলে মোর সাত দিকে ছুটে করিছে ব্রহ্মোদ্ধার।
তাই ত ভিক্ষা ভাণ্ড হস্তে অন্ন জোটে না মার।।"

— এ ধরণের বৈরাগ্যসাধনা করতে আচার্য উপদেশ দিয়ে যাননি। গৃহে থেকে সাধনা হয় না, একথা কোথাও তিনি বলেছেন বলে আমার মনে পড়ছে না। ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করতে গিয়ে প্রথম সূত্র 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' মন্ত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আচার্য নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইহামূত্রফল ভোগবিরাগ, শমদমাদি ষটসম্পত্তি লাভ পরিশেষে মুমুক্ষুত্ব প্রভৃতির কথা যে বলেছেন তা গৃহে থেকেও সাধনার দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়। তার জন্য গৃহত্যাগ করে মঠ বা গুহাবাসী হওয়ার প্রয়োজন হয় না। প্রাচীন ভারতের ঋষিজীবন পর্যালোচনা করে দেখুন, তাঁরা কি গৃহত্যাগী, স্ত্রী-পুত্র ত্যাগী ছিলেন? যোগেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যের একটি নয়, মৈত্রেয়ী এবং কাত্যায়ণী নামক দুই স্ত্রী ছিলেন। তাতে তাঁদের অমৃতত্ব লাভে কোন বাধা হয়নি। বশিষ্ঠ ও অরুন্ধতী, অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা, ভৃগু ও পুলোমা, অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, অঙ্গিরা ও শ্রদ্ধা, অত্রি ও অনসূয়া, মরীচি ও কলাদেবী, পুলহ ও ক্ষমা, পুলস্ত্য ও হবির্ভূ, ক্রতু ও সন্নতি প্রভৃতি প্রত্যেকেই পত্নী পুত্রসহ বাস করেও কেউ ব্রহ্মর্ষি, কেউ মহর্ষি, কেউ শ্রুতর্ষি হতে পেরেছিলেন — তাঁরা কি এযুগের কোন মঠাধীশ মহান্ত, মহামণ্ডলেশ্বর, জগদ্গুরু শংকরাচার্য উপাধিধারী কোন সন্ন্যাসী বা বৈরাগীর চেয়ে কম ছিলেন? তুলনামূলকভাবে বিচার করলেই বুঝা যায় আজকাল মহাত্মা নামে প্রচারিত শেষোক্ত গেরুয়াধারীরা পূর্বোক্ত ঋষিবর্গের পদধূলির যোগ্য নন। বৈদিক ঋষিরাও সকলেই গৃহবাসী ছিলেন।

আমি এই নর্মদাতটেই অনেক উচ্চকোটির মহাত্মা এবং মহাযোগেশ্বরদের দর্শন পেয়েছি। তাঁদের কথা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে স্মরণ রেখেও আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, মায়াবাদের ভেল্কিতে পড়ে সম্প্রদায়ের চক্রে কত লোক যে সাধু সেজে ভেক্ নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তার ইয়ত্তা নাই। তাঁদের মধ্যে বৈরাগ্য ত দূরের কথা নৈতিক চরিত্রের মানদণ্ডে তাঁদেরকে অনেক নিম্নকোটির লোক বলেই মনে হয়েছে। একটু আগে তাঁদের সম্বন্ধেই মন্তব্য করেছি তাঁদের অবস্থা — 'না ঘরকা না ঘাটকা' আপনার জীবনে অনেক ক্ষত ও ক্ষতি হয়ে গেছে, তথাকথিত কোন সাধু বা বৈরাগীর কথার চরকিবাজিতে পড়ে আপনার জীবন একেবারে বরবাদ হয়ে যায় এ আমি চাই না। সুস্থ স্বস্থ এবং স্বাভাবিক জীবন যাপন করে এখনও আপনি আপনার গৃহকে তপোবন করে তুলতে পারেন।

পত্নীর সঙ্গে পুত্রকেও যাঁরা মায়ার বন্ধন বলেন, তাঁদের শাস্ত্রতত্ত্ব জানা নাই। শাস্ত্রের মর্মমূলে তাঁরা প্রবেশ করতে পারেনি। মহাতেজা মহর্ষি অগস্ত্যের কথাই ধরুন; তিনি সারাজীবন অকৃতদার থেকে তপস্যাতেই মগ্ন থাকবেন প্রতিজ্ঞা করেছিলেন কিন্তু একদিন পরিক্রমা করতে করতে দেখতে পেলেন, তাঁর পিতৃপুরুষরা এক গুহার ভিতর অধোমুখে লম্বমান অবস্থায় অতিকষ্টে ঝুলছেন। তাঁদের এই দুর্দশার কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁরা অগস্ত্যকে বলে, বংশরক্ষা না করলে তাঁদের সদ্গতির কোন আশা নাই। এই শুনে অগস্ত্য বিদর্ভরাজের পালিতা কন্যা লোপামুদ্রাকে বিবাহ করেন এবং এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে! ঐ পুত্রের নাম হয় ইধ্মবাহ (মহাভারতের বনপর্ব), আর কোন পুরাণের মতে দৃঢ়স্যু। যাইহোক সেই পুত্রের জন্মগ্রহণ করার পরেই পিতৃপুরুষরা মুক্ত হন, সদ্গতি লাভ করেন।

শুধু অগস্ত্য নন, আমরা যে এখানে বসে গল্প করছি, এখান থেকে কিছুটা দূরেই এরণ্ডী সংগম। আপনি এরণ্ডী সংগম দেখে এসেছেন কিনা জানি না, আপনি রেবাখণ্ডম্ পড়লেই

জানতে পারবেন, মহামুনি মার্কণ্ডেয় বর্ণনা করেছেন যে এই এরণ্ডী সংগমে বসে পুত্রলাভের জন্য তপোসিদ্ধ মহর্ষি অত্রি, অনসূয়াকে তপস্যা করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। পুত্র হেলাফেলার জিনিষ নয়, তপস্যার বস্তু। একদিন অত্রি বিশ্রম্ভালাপ করতে করতে অনসূয়ার কাছে দুঃখ করছিলেন যে —"হায়! আমার পুত্র না থাকায় আমি পিতৃকার্য হতে বঞ্চিত হলাম। কল্যানি! পিতা মহাপাতকী হলেও পুত্র জন্মানো মাত্রই পুন্নাম নরকে পতনোন্মুখ পিতাকে উদ্ধার করে। পুত্র পৌত্রাদির তপস্যায় পিতার সদ্‌গতি এমন কি পরমগতি লাভ হতে পারে। নাস্তি পুত্রসমো বন্ধুঃ ইহলোকে পরত্র চ অর্থাৎ ইহলোক এবং পরলোকে পুত্রের সমান বন্ধু নাই। স্বামীর মনোবেদনা জানতে পেরে সাধ্বী অনসূয়া কঠোর তপস্যায় মগ্ন হন এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে; সোম, দুর্বাশা এবং দত্তাত্রেয় নামে পুত্ররূপে লাভ করে কৃতার্থ হন।

এ যুগের বৈরাগী ও সন্ন্যাসীরা পুত্রকে মায়ার বন্ধনসূত্র হিসাবে চিত্রিত করেন, আর অগস্ত্য অত্রি অনসূয়া মার্কণ্ডেয় প্রভৃতি জগৎপূজ্য যোগেশ্বর ও যোগেশ্বরীরা পুত্রের জন্য তপস্যা করাকে পুণ্যকর্ম বলে অভিহিত করে গেছেন। তাঁদের মতে —

পুন্নাম্নো নরকাদ্ যস্মাৎ পিতরং ত্রায়তে সুতঃ।
তেন পুত্র ইতি প্রোক্তঃ স্বয়মেব স্বয়ম্ভুবা॥

পুত্র পিতাকে নরক হতে ত্রাণ করে ; এইজন্য স্বয়ং স্বয়ম্ভু পুত্র শব্দটির সৃষ্টি করেছেন। পণ্ডিতগণ বলেন —

অপুত্রস্য গৃহং শূন্যং দিশঃ শূন্যা অবান্ধবাঃ
মুর্খস্য হৃদয়ং শূন্যং সর্বং শূন্যং দরিদ্রতা॥

অর্থাৎ পুত্রহীনের গৃহশূন্য বন্ধুহীনের সকলদিক শূন্য, মূর্খের হৃদয় শূন্য আর দরিদ্র সর্বশূন্য।

মহামুনি মার্কণ্ডেয় গোবিন্দ নামক এক ব্রাহ্মণের মুখ দিয়ে কত উচ্ছ্বসিতভাবে পুত্র সম্বন্ধে বলেছেন দেখুন —

মৃষায় বদতে লোকশ্চন্দনং কিল শীতলম্।
পুত্রগাত্রপরিষ্বঙ্গশ্চন্দনাদপি শীতলঃ॥

অহো! লোকে বলে — চন্দন শীতল, তাদের একথা মিথ্যা। আমার মনে হয়, পুত্রের আলিঙ্গন চন্দন হতেও সমধিক সুশীতল।

শ্মশ্রুগ্রহেণ ক্রীড়ন্তং ধূলিধূসরিতাননম্।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি নিজোৎসঙ্গসমাস্থিতম্॥

পুত্র ধূলিধূসারিত হয়ে বাপের বা দাড়ির চুল ধরে যখন নাচতে থাকে তখন যে আনন্দকর দৃশ্য ফুটে উঠে একমাত্র পুণ্যবান ব্যক্তিদের দ্বারাই তা উপভোগ করার সৌভাগ্য ঘটে।

দিগম্বরং গতব্রীড়ং জটিলং ধূলিধূসরম্।
পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি গঙ্গাধরামিবাত্মজম্॥

অর্থাৎ উলঙ্গ শিশু যখন ধূলিকাদা মেখে তার ঝাঁপরঝোপড় চুল নিয়ে খেলা করে, ঘুরে বেড়ায় তখন একমাত্র পুণ্যশীল ব্যক্তিরাই তার মধ্যে দিগম্বর জটাধারী শিবরূপ প্রত্যক্ষ করেন।

শম্ভুভাই আপনি মার্কাণ্ডেয় মুনির ভাষা লক্ষ্য করুন। তিনি বারবার বলেছেন পুণ্যহীনা ন পশ্যন্তি, কাজেই নীরস বিবস শুকনো যোগীরা 'মায়া' বললেও পুত্র মায়ার বন্ধন হিসাবে কখনই উপেক্ষার বস্তু হতে পারে না। আপনি নিজেই ভেবে দেখুন না, আপনার কিষেণ যখন ন্যাংটো পঁদে ধূলো-কাদা মেখে 'বা-বু, বা-বু বলে আপনার কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ত বা আপনার কাঁধে চেপে বেড়াত, তখন আপনি যে তৃপ্তি বা শান্তি পেতেন, তার তুলনা কোথায়? আপনি কোন প্রাণে সেই শিশুকে ফেলে পালিয়ে এসেছেন তা ভেবে আমি আশ্চর্য হচ্ছি। আপনি আমার কথা শুনুন, অবিলম্বে আপনি ঘরে ফিরে যান, এখানে ওঁকারেশ্বরের প্রস্তরময় লিঙ্গরূপ দেখে আপনার তৃপ্তি হবে না। দিগম্বর কিষেণের মধ্যে দিগম্বর শিবকে প্রত্যক্ষ করতে পারলে আপনার চোখ মন দুই ভরবে।

শম্ভুনাথ কাঁদছেন। এদিকে কথা বলতে বলতে বোধহয় রাত্রি ৯টা বেজে গেছে। ওঁকারেশ্বরের আরতি শেষ হয়ছে। প্রধান দরজা বন্ধ হয়েছে। কেউ কোথাও নাই, নির্জন নিশুতিতে আমরা দুজন কেবল ঘাটে বসে আছি। আমার ফিরতে দেরী হয়েছে দেখে রামদাসজী আমাকে খোঁজার জন্য মঙ্গলদাস এবং দীনদয়ালকে মন্দিরে পাঠিয়েছিলেন। তারা অন্ধকারের মধ্যে দুজনে নীরবে আমাদের পিছনেই বসেছিল। শম্ভুনাথের সঙ্গে কথা শেষ হতেই মঙ্গলদাস সাড়া দিলেন এবং এগিয়ে এসে শম্ভুনাথের হাত ধরলেন। শম্ভুনাথ তার সঙ্গে গিয়ে নর্মদাতে নেমে চোখে মুখে জল দিয়ে এল। এইবার আমরা উঠে পড়লাম। শম্ভুনাথ আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরে বললেন — আপনার কথা আমার মনকে খুবই নাড়া দিয়েছে। আপনি আমার খুব উপকার করলেন। দু'একদিনের মধ্যেই আমি আমার কিষেণের কাছে ফিরে যাবো। মঙ্গলদাসজী তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললেন —কেবল কিষেণ নেহি, কহিয়ে কিষেণ ঔর বিন্নী। হম্ আচ্ছিতরেসে জানতা হুঁ কিষেণকো মা বেচারী ভি বহোৎ আচ্ছা আদমী হ্যায়।

শম্ভুনাথ তাঁর কুটীরের পথে এগিয়ে গেলেন, আমরা ভজন-আশ্রমের দিকে হাঁটতে লাগলাম। আশ্রমে পৌঁছে দেখি রামদাসজী আশ্রম-প্রাঙ্গনে পায়চারী করছেন, আমাকে দেখেই স্মিতহাস্যে বললেন — আপনে বহুৎ আচ্ছা প্রবচন কিয়া। আমিও হাসতে হাসতে জবাব দিলাম — আপনার আর কি কোন কাজ নাই? প্রভু রামচন্দ্রের লীলা-অনুধ্যান বাদ দিয়ে কে কোথায় কি করছে বা বলছে, তাই দেখে বেড়াচ্ছেন।

আমার কথা শুনে তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন — হম্ ত হমারা কামমেঁই লগন থা, লেকিন বৈরাগীয়োঁ কো আপ্‌নে এ্যায়সা জোরসে ঝাপট্ মারা যো হম্ ভি চমকিত হো গয়া!

আমি মুখহাত ধুয়ে ঘরে ঢুকে পেট ভরে জল খেলাম। ভাবতে লাগলাম এ সাধুটিও ত কম নন। গতকাল রাত্রে যখন ভাবছিলাম, কাল থেকে পিতৃ উপদিষ্ট পন্থায় ওঁকারতত্ত্ব মনন করব, তখন ইনি হঠাৎ বলে উঠেছিলেন —'কাল করে সো আজ করো', আর আজ দেখছি, কোটিতীর্থের ঘাটে বসে শম্ভুনাথের সঙ্গে যে সব আলোচনা করেছি আলোচনা প্রসঙ্গে বৈরাগী সাধুদের উপর যে কটাক্ষপাত করেছি তাও এঁর অজানা নেই।

শুয়ে পড়ে প্রলয়দাসজীর কথা চিন্তা করতে লাগলাম। এতক্ষণ নানা কথায় ভুলেছিলাম তাঁর কথা, এখন একা হতেই তাঁর চিন্তা আমাকে গ্রাস করল। কিছুতেই ঘুম আসছে না। বিছানা থেকে উঠে পড়ে ক্রিয়াতে বসার উদ্যোগ করছি এমন সময় পাশের ঘরে রামদাসজীর

কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তাঁর চোখে নবদুর্বাদল রামচন্দ্রের বনভ্রমণের দৃশ্য ভেসে উঠেছে। রাম-লক্ষ্মণ দুজনে পম্পা সরোবরের তীরে এসে পৌঁচেছেন, কিছুক্ষণ পরেই মাতঙ্গমুনির পালিতা কন্যা ও শিষ্যা শবরীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ ঘটবে। রামচন্দ্র পম্পাতীরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মণকে বলছেন —

পম্পানাম সুভগ গম্ভীরা, সন্ত হৃদয় জৈসে নির্মল বারি।
বাঁধে ঘাট মনোহর চারী, জঁহ তহ পিয়হি বিবিধ মৃগ নীরা,
জিনি উদার গৃহ যাচক ভীরা।
পুবইনি সঘন ওট জল বেগি ন পাইয়ে মর্ম
মায়াচ্ছন্ন ন দেখিয়ে জৈসে নির্গুণ ব্রহ্ম॥

অর্থাৎ রামচন্দ্র বলছেন — দেখ ভাই লক্ষ্মণ, এই সরোবরের নাম পম্পা — এর মনোরম গভীর জলরাশি সাধুর হৃদয় যেমন, তেমনি অতি নির্মল। চারধারে দেখ কী সুন্দর বাঁধানো ঘাট, নানা জীবজন্তু নেমে জলপান করছে — ঠিক যেন উদার হৃদয় ব্যক্তির গৃহে যেমন সদাই যাচকের ভীড়। নিবিড় শৈবালদামে জলের কিছু অংশ আচ্ছন্ন। সেগুলি সরিয়ে জলের অন্তঃস্থল খুঁজে পাওয়া কঠিন। এ যেন মায়ার আবরণ সব কিছুকে ঢেকে রেখেছে, তা ভেদ করে নির্গুণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎ সহজে পাই না।

রামদাসজীর কণ্ঠমাধুর্য এবং ভক্তিমিশ্রিত আবেগের গুণে আমার মনের সব চঞ্চলতা দূর হল। মরমী সাধক ভাবের অন্তর্লোকে বিচরণ করছেন, তিনি করতে থাকুন; কিন্তু দোঁহার ভাষা যেভাবে রূপকের প্রয়োগে ঝলমল, তার সেই বহিরঙ্গ দিকই আমাকে মুগ্ধ করল। অরূপকে রূপায়িত করার জন্যই সাধারণতঃ রূপককে ব্যবহার করা হয়। তুলসীদাসজী পম্পা নামক একটি সামান্য সরোবরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে যেভাবে রূপ-রস-শব্দ-স্পর্শ গন্ধময় লোককে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপমা দ্বারা প্রকাশ করেছেন — তা যেন জড়োয়া গহনায় সোনার বাঁধনের মাঝে মনি মুক্তার দীপ্তির মত ঝলসে উঠছে। কোন গুণে 'রামচরিতমানস' লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেয়ে সংস্কৃতে রচিত বাল্মীকি রামায়ণকে ভুলিয়ে দিয়ে কিভাবে তুলসীদাসজী হিন্দীভাষী জনসাধারণের মনকে অধিকার করতে পেরেছেন, তা যেন ধীরে ধীরে বুঝতে পারছি বলে মনে হচ্ছে।

মনে মনে স্থির করলাম, যতদিন এখানে আছি, ততদিন নিয়মিতভাবে রামদাসজীর কাছে রামচরিতমানসের পাঠ নেব। শান্ত ও তৃপ্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম।

সকালে উঠেই প্রাতঃকৃত্য সেরে দৌড়ালাম কোটিতীর্থের ঘাটে। ঘাট ও মন্দির সব তন্ন করে খুঁজে দেখলাম প্রলয়দাসজীর কোথাও দর্শন পাই কিনা। না, আজও প্রলয়দাসজী এখানে আসেন নি। স্নান সেরে মন্দিরে ঢুকলাম পূজা করতে। একে একে মন্দিরের পাঁচতলা পর্যন্ত উঠানামা করে ওঁকারেশ্বর, মহাকালেশ্বর, সিদ্ধনাথ, গুপ্তেশ্বর এবং ধ্বজাধারী — এই পঞ্চ শিবের পূজা সেরে চুপ করে বসে থাকলাম। ওঁকারেশ্বরজীর কাছে প্রার্থনা জানালাম — এই দয়াল! হয় তুমি প্রলয়দাসজীর সঙ্গে আর একটি বারের জন্য দেখা করিয়ে দাও; নয়ত ঐ রহস্যময় সাধুর জন্য আমার মনের যে কাতর প্রতীক্ষা, তার অবসান ঘটাও। এ জ্বালা আর সহ্য হচ্ছে না। আমার চোখে জল এসে গেল। মনকে দৃঢ় করার জন্য মনের মধ্যে বিপরীত চিন্তাস্রোত আনতে লাগলাম। প্রলয়দাসজী বলেছিলেন, মূর্দ্ধাদেশে কিভাবে ওঁকারের সাধনা

করতে হয়, তা শিখিয়ে দেবেন। সেই লোভই আমাকে এত ছটফট করাচ্ছে। সাধুর প্রতি এ আমার কোন ভক্তি বা অনুরাগ নয়। দু'দিন দুবার মাত্র তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে তাতে ভালবলাসার কথা আসে কি করে? নিজের মনকে শাসন করতে বসলাম — ধিক্‌ধিক্‌, শতধিক্‌ আমাকে। আমার বাবা যদি বুঝতেন, ঐ পদ্ধতি আমার শেখা প্রয়োজন, তাহলে তিনিই ত আমাকে শিখিয়ে যেতেন। আমার মনের কি অধঃপতন। মনে পড়ল প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের কথা । গয়ায় আকাশগঙ্গা পাহাড়ে সহসা আকাশপথে আবির্ভূত হয়ে মানস সরোবরের ব্রহ্মানন্দ পরমহংস যখন দ্বাদশাক্ষর বাসুদেব মন্ত্র এবং বৈদিক প্রাণায়ামের পদ্ধতি শিখিয়ে দিয়ে যান, সেই সাধনা নিষ্ঠাসহকারে অভ্যাস করে তিনি সিদ্ধকাম হয়েছিলেন। বারদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারী মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণকে প্রাণাধিক ভালবাসতেন! তিনি দাবানল এবং বহু সঙ্কটেই তাঁকে সূক্ষ্মদেহে আবির্ভূত হয়ে রক্ষা করেছিলেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বারদীর ব্রহ্মচারীকে ত্রিকালদর্শী মহাযোগী বলে জানতেন এবং অসীম ভক্তি করতেন। তবুও কৈ, তিনি ত কোনদিন ব্রহ্মচারীর কাছে যোগের কোন সূক্ষ্ম ও সিদ্ধপথ জানতে চান নি? এমন কি একবার বিজয়কৃষ্ণ যখন পুরীতে তাঁর আশ্রমে নিদ্রামগ্ন ছিলেন, সেই সময় সহসা একদিন গভীর রাত্রে দেখেন, জ্যোতির্ময় দেহ নিয়ে এক সিদ্ধ মহাপুরুষ তাঁর ঘরে আবির্ভূত হয়েছেন, সারা ঘর আলোতে ভরে গেছে। সেই মহাপুরুষ বিজয়কৃষ্ণকে এক অব্যর্থ ফলপ্রদ মহাসিদ্ধ বীজমন্ত্র দান করতে আগ্রহ দেখান। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণ তা গ্রহণ করেন নি, বরং দৃঢ় কণ্ঠে এই বলে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে — মেরা গুরুকা দরবারমেঁ কুছ্‌ কমি নেহি হ্যায়!

হায়, আমার তদ্‌বৎ গুরুনিষ্ঠাও নাই । বাবার কথা চিন্তা করতে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে মন শান্ত হল। আমি ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করে মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এলাম।

মন্দিরের বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি শম্ভুনাথজী শুকনো মুখে সিঁড়ির উপর বসে আছেন, তাঁর হাতে একটি হিন্দী বই। আমাকে দেখেই বললেন — আপনাকে নাটমন্দিরে উঁকি মেরে দেখে এসে এইখানে আপনার জন্য বসে আছি।

— আমি ত ভেবেছিলাম, এতক্ষণে আপনি নর্মদা পেরিয়ে খাণ্ডোয়াতে পৌঁছে গেছেন। অনুমান করেছিলাম, আজ সন্ধ্যা নাগাদ্‌ আপনার শ্বশুরবাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হবেন।

— আপনার কথা আমি গোটা রাত ধরে চিন্তা করেছি। রাত্রে আমি ঘুমাতে পারিনি । এই বইটি আপনি দেখুন, এই বইতে ভর্তৃহরি, শংকরাচার্য, শিবাজীর গুরু রামদাসস্বামী প্রভৃতি আরও অনেক ভারতপ্রসিদ্ধ মহাত্মার বৈরাগ্যমুলক বাণী লিপিবদ্ধ আছে। সকলেই একবাক্যে বলেছেন — স্ত্রীপুত্র মায়ার বন্ধন। কিছুতেই ফাঁদে আটকে থেক না। বৈরাগ্য অবলম্বন কর। বৈরাগ্য অবলম্বন করলেই ত 'ততঃ শান্তিমনন্তরম'। এতগুলি মহাপুরুষ কি ভুল লিখেছেন? যে কোনভাবে হোক, সংসার যখন ছেড়ে এসেছি , তখন সেখানে ফিরে যাওয়া কি সুখের হবে? এই অন্তর্দ্বন্দ্বে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। এই বইটা একবার পড়ে দেখুন।

— এ বই কার লেখা ? প্রকাশক বা লেখক কে ?

— মহারাষ্ট্রের সজ্জনগড় স্থিত চাফল মঠ হতে বইটি প্রকাশিত। লেখক গোবিন্দ রামচন্দ্র নামক জনৈক রামদাসী মঠের মোহান্ত দ্বারা মূল মারাঠী ভাষায় লেখা । তারই হিন্দি অনুবাদ ।

এই বইখানি প্রায় তিন বছর আগে আমাকে রামদাসজী দিয়েছিলেন।

আমি শম্ভুনাথকে বললাম — এই বই পড়ার প্রয়োজন আমি অনুভব করছি না। চলুন ঐদিকে গিয়ে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে বসি।

বসার পর আমি তাঁকে বলতে লাগলাম — একটি জিনিষ আপনি ভালভাবে বুঝবার চেষ্টার করুন। সাধক হতে হলেই সংসার বৈরাগী হতে হবে এমন কোন কথা নেই। ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ এবং সন্ন্যাসীদের হাতেই চিরকাল লোকশিক্ষার ভার ছিল, এখনও আছে। সন্ন্যাসী মাত্রেই সংসার-বৈরাগী। কাজেই শাস্ত্র হতে তাঁরা কেবল বৈরাগ্যের বাণীগুলিই বের করে পুস্তকাকারে প্রকাশ এবং লোকসমাজে তা প্রচার করতে অভ্যস্থ। বৈদিক যুগের পর হতে শত শত বৎসর ধরে তাঁরা বলে আসছেন — এ জগৎ মিথ্যা, সত্যের আভাস মাত্রও এখানে পাওয়া যাবে না। পুত্র কলত্র মিথ্যা, সংসার মিথ্যা, তাদের মায়া-রজ্জুতে আবদ্ধ হয়ো না, তারা যদি চোখের সামনে অনাহারে দুঃখ কষ্ট পায়, তোমার অনুপস্থিতিতে তারা অবর্ণনীয় দুঃখ শোকে মুহ্যমান হবে তা বুঝতে পারলেও কোনমতেই বিচলিত হয়ো না। চিত্তের শান্তি ক্ষুণ্ণ করো না, শান্ত সমাহিত চিত্তে তুমি কেবল ভগবানের নাম কীর্তন করে যাও। অনাহারক্লিষ্ট বিরহ সন্তপ্ত পুত্র-কলহ বা মাতাপিতার ক্রন্দনধ্বনি মৃদঙ্গ ও করতালের বাদ্যে ডুবিয়ে দাও, মৃদঙ্গ করতাল না মিলে যদি, পাথরের ত অভাব নাই, পাথর বাজিয়ে বাজিয়ে নামকীর্তন কর, নতুবা কুম্ভক অবস্থায় শ্বাসরুদ্ধ করে নামজপ করে যাও। উপবাস? উপবাসে ভয় পেয়ো না, ইহকালে উপবাস কর, পরকালে ইন্দ্রপুরী কিংবা বৈকুণ্ঠে গিয়ে পারিজাতের মালা গলায় পরে পেট ভরে অমৃত খাবে। আপনি আমাকে যে বইটি পড়তে দিচ্ছিলেন, ঐ বইয়ে এসব ধরণের বৈরাগ্যমূলক কথা ছাড়া আর কি থাকবে? বৈরাগী সন্ন্যাসীর লেখা পুস্তকে ঐসব অসার বৈরাগ্যের কথা ছাড়া আর কি থাকতে পারে? ভারতজুড়ে যত সন্ন্যাসী দেখছেন, তাঁরা বৈরাগ্যের পরিপোষক কথাগুলি নির্বাচন করে করে লোকসমাজে প্রচার করে থাকেন, তা শুনে আপনার মত অনেকেই বৈরাগ্যের ভেক নিয়েছেন, ফলে অনেক সম্ভাবনাপূর্ণ জীবন নষ্ট হয়ে গেছে। কেউ যখন শোকতাপ পায়, তখন ঐ সব সন্ন্যসীদের বাণীবচন পড়ে কিংবা কোন বৈরাগীর সংস্পর্শে এসে গৃহত্যাগ করে থাকে। এও এক ধরণের মস্তিষ্ক ধোলাই। মস্তিষ্ক ধোলাইয়ের ফলে, মর্কট বৈরাগ্য বা শ্মশান বৈরাগ্যের সাময়িক বিড়ম্বনায় কারও মনে প্রকৃত বৈরাগ্য জন্মায় না। যে বৈরাগ্য সাধকের মনকে বিশেষ রঙে অর্থাৎ প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমে রাঙিয়ে দেয়, সে বৈরাগ্য অন্তর থেকে স্বতঃই জন্মে থাকে। তা গৃহে থেকেও হতে পারে স্ত্রীপুত্র, মাতাপিতা প্রভৃতি আপনজনকে ভালোবেসেও সকলের মধ্যে প্রেমিক ঠাকুরের ঠাকুরালী অনুভব করতে সাহায্য করে। ঈশ্বর প্রেমময়, তিনি সকলের মধ্যেই আছেন। কাজেই আপনজন কি ঈশ্বর ব্যতিরিক্ত কোন বস্তু? আপনার কি আপনার স্ত্রী-পুত্রের বা মাতাপিতার যে ভালবাসা, সে ভালবাসায় কি ভালবাসাময় ভগবান প্রতিভাসিত হন না?

আপনাকে আমি আগের দিন যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, অত্রি প্রভৃতি ঋষিদের কথা বলেছিলাম। তাঁদের ঋষিজীবনের কথা অনুধাবন করলেই জানতে পারবেন, আপনজনের ভালবাসা তাঁদের পায়ে মায়ার বেড়ি পরাতে পারেনি। প্রিয় পরিজনের ভালবাসাই বরং তাঁদের স্নেহভালবাসাময় হৃদয়কে পরিশেষে সেই বিশেষ রঙ (বি—রঞ্জ্ + ঘঙ = বৈরাগ্য) ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা করে তুলেছিল। তাঁরা সুস্থ এবং স্বাভাবিক গার্হস্থ্য জীবন যাপন করে

রসস্থ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা 'রসো বৈ সঃ' যিনি, তাঁর সন্ধান পেয়েছিলেন। একেই বলে খাঁটি বৈরাগ্য, স্বতোৎসারিত এবং স্বাভাবিক বৈরাগ্য। একটি বিশিষ্ট মতের পরিপোষক বাণী বচন পড়া প্রতিনিয়ত চেষ্টার ফলে মস্তিষ্ক ধোলাই প্রসূত যে বৈরাগ্য তাকে মেকী বৈরাগ্য বলাই সঙ্গত। মেকী বৈরাগ্য Constant indoctrination এর ফলে Regimentation of Thought মাত্র। আপনি বলছেন ঐ বইটি নাকি কোন রামদাসী মঠের মোহান্ত দ্বারা প্রকাশিত। রামদাসী বলতে সমর্থ রামদাসস্বামী প্রবর্তিত সম্প্রদায়কে বুঝায়। সমর্থ রামদাসস্বামী রাম নামে সিদ্ধ হয়েছিলেন। অসাধারণ রামভক্ত ছিলেন কিন্তু তাঁর এই রামভক্তি তাঁকে সংসার বিমুখ বিরাগী করে তোলেনি। মারাঠি ভাষায় তাঁর লেখা দাসবোধ এক অসাধারণ গ্রন্থ। শিখদের যেমন গ্রন্থসাহেব, সমগ্র মারাঠা জাতির কাছে তেমনি দাসবোধ। মারাঠীরা বেদ ও পুরাণের চেয়ে এই বইটিকে বেশী সম্মান করে এবং সংসার জীবনে কোন গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হলে তার মীমাংসার সন্ধান দাসবোধেই পায়। দাসবোধ পড়লেই আপনি বুঝতে পারবেন যে ঐ মহাগ্রন্থটি লোকসেবা এবং স্বদেশপ্রেমের বেদস্বরূপ। ছত্রপতি শিবাজীকে রামমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে তাঁকে লোকসেবার আদর্শ গ্রহণ করার উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি শিবাজী বা তাঁর শিষ্যদেরকে একবারও বলেন নি যে কৌপীন পরে তিলক কেটে অহরহ রামনাম করতে লেগে পড়। পরিবর্তে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন দেশের দুরবস্থার দিকে।

পদার্থ মাত্র তিতুকা গেলা।
নুস্তা দেশ চি উরলা।
মানসা খাবয়া ধান্য নাহি
আহরণ পাংঘরুণ তে হি নাহি
ঘর করায়া সামগ্রী নাহি॥ (দাসবোধ)

হায়! তোমরা চেয়ে দেখ, দেশের ধনসম্পদ সবই গেছে, কেবল দেশ মাত্র আছে। মানুষের ঘরে খাবার ধান নাই। বিছানায় পাতবার বা গায়ে দিবার কাপড় নাই, ঘর করবার সামগ্রীও নাই।

তোমরা কর্মযজ্ঞে ঝাঁপিয়ে পড়। সুখী এবং সমৃদ্ধ পরিবার আর শক্তিশালী দেশ গড়ে তোলার ব্রত নাও। নিজেও যেমন তিনি শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা এবং প্রজাবাৎসল্যের আদর্শ প্রচার করতে করতে সারাদেশের সর্বত্র ঘুরে বেরিয়ে দেশাত্মবোধের চেতনায় সবাইকে উদ্দীপ্ত করে ছিলেন, তেমনি শিষ্যদেরকেও নির্দেশ দিয়েছিলেন, যারা এতকাল শুনে এসেছে সংসার অসার, তাদেরকে এখন বুঝাতে থাক যে প্রপঞ্চেই পরমার্থ মিলে। দেশে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, কারণ মূর্খ ভগবানের মহিমা কি করে বুঝবে? করতালের শব্দে পেট ভরে না। তুলসীর পাতা যতই পবিত্র হোক না, তার কাঠে রান্না হয় না, আম কাঁঠাল কলা প্রভৃতির মত তাতে সুস্বাদু ফল ফলে না।

আমি শম্ভুনাথকে বললাম — মোটামুটি সমর্থ রামদাসস্বামীর মতামতের আভাস ত পেলেন। সেই অসাধারণ মহাত্মার নাম নিয়ে তাঁর নামাঙ্কিত মঠ হতে যদি কেবল বৈরাগ্যের বাণী নির্বাচন করে কেউ যদি সংসারকে অসার ও মিথ্যা বলে প্রচার করতে চায়, আপনিই বলুন, সেই পুস্তকের মূল্য কতটুকু ? আপনি বৈরাগীদের আখড়া এবং মঠগুলি যদি ঘুরে

দেখেন, তাহলে তাঁদের প্রাসাদোপম অট্টালিকা এবং মন্দির দেখলে এবং বৈরাগ্যের বাণী প্রচারক মহারাজের রাজোচিত ভোগরাগ দেখলে সহজেই বুঝায়, তাঁদের একমাত্র উদ্দেশ্য লোকে তাদের প্রিয় পরিজন ত্যাগ করে এসে মঠের সেবা করুক এবং যথাসর্বস্ব মঠের কাজে ঢেলে দিক, মঠের ধনাগার বৃদ্ধি হোক।

তা সে শংকরপন্থী হোক ভর্তৃহরিপন্থী বা রামদাসপন্থী হোক, বেদান্তী বৈষ্ণব যে কোন সম্প্রদায়ের মোহান্ত মহারাজ শ্রী ১০৮ বা শ্রী ১০০৮ বিশেষণযুক্ত সন্ন্যাসীদের 'তৈলঢালা, স্নিগ্ধতনু নিদ্রারসে ভরা' এবং অনায়সলব্ধ অর্থে বিচিত্র ভোগরাগ দেখে সহজেই বুঝতে পারবেন, তাঁরা নিজেরা বৈরাগ্যের আচরণ না করে কিভাবে মিঠা মিঠা বৈরাগ্যের বুলি প্রচার করে আপনাদের মত মানসিক বেদনায় ক্লিষ্ট, হতাশা জর্জরিত কিংবা সহজ বিশ্বাসী লোকেদের মতিভ্রম ঘটিয়ে চলেছেন। সমর্থ রামদাসস্বামীর আমলেও ঐ রকম লোক ছিল। তিনি ঐ সব তথাকথিত সন্ন্যাসী ও বৈরাগীদের লেখাপড়া জানা মূর্খ বলে শ্লেষ করেছেন, ধিক্কার দিয়েছেন। তাঁর রচিত 'দাসবোধ' মহাগ্রন্থের শেষ অধ্যায়ের নাম "পঢ়ত মূর্খ লক্ষণ"; তাঁর দুটি দোঁহা শুনুন —

১। জ্ঞান বোলোন করী স্বার্থ
কৃপণা-সৌ সংচী অর্থ।
অর্থাসাধী লাবী পরমার্থ
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥
জ্ঞানের বচন বলি' স্বার্থসিদ্ধি করে।
কৃপণের মত যে ধনসঞ্চয় করে,
পরমার্থ প্রয়োগ যার অর্থলাভ তরে,
লেখাপড়া জানিলেও মূর্খ নাম ধরে

২। বর্তল্যা বীণ সিকবী।
ব্রহ্মজ্ঞান লাবনী লাবী॥
পরাধেন গোসাবী।
তো য়েক পঢ়ত মূর্খ॥
আপনার আচরণে যাহা নাহি আসে,
পরকে শিখাতে তা চায় অনায়াসে॥
ব্রহ্মজ্ঞান প্রশংসায় হয় পঞ্চমুখ,
লেখাপড়া জানা মূর্খ নাহি পায় সুখ॥

সমর্থ রামদাসজী স্পষ্টই বলে গেছেন —

আমচী প্রতিজ্ঞা ঐসী।
কাহি ন মাগাবে শিষ্যাসী॥

অর্থাৎ আমার প্রতিজ্ঞা এই যে শিষ্যের নিকট কিছু চাইব না।

প্রবাদ আছে যে, ছত্রপতি তাঁর সমস্ত রাজ্য দান করতে চাইলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে তা প্রত্যার্পণ করে বলেছিলেন — আজ হতে এ রাজ্য বৈরাগীর রাজ্য, তুমি রাজ্যের সেবক মাত্র! সেই হতে বৈরাগীর উত্তরীয় মারাঠা সাম্রাজ্যের জাতীয় পতাকা হয়েছিল। সেই পতাকার পতন ইংরেজদের কামানের গুলিতে হয়নি, তার পতন হয়েছিল মারাঠা জাতি শিবাজী এবং

রামদাসের আদর্শ হতে ভ্রষ্ট হয়েছিল বলে।

আপনি আজকালকার প্রতিষ্ঠাপরায়ণ বুলি সর্বস্ব গেরুয়া-পরা বৈরাগীদের কথা উপেক্ষা করে ভারতের যথার্থতম বৈরাগী সমর্থ রামদাসজীর আদর্শ অনুসরণ করুন। নিজের ঘরে ফিরে গিয়ে সুখী ও সমৃদ্ধ পরিবার গড়ে তোলার চেষ্টা করুন।

— আমি এখান হতেই খাণ্ডোয়া যাত্রা করব। ভজন-আশ্রমে আমার একান্ত হিতৈষী বন্ধু মঙ্গলদাসজীর সঙ্গে যাওয়ার আগে একবার দেখা করে যাবো।

আমরা উভয়ে ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করে একসঙ্গে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। আশ্রমে তখন ঠাকুরের ভোগ নিবেদনের ব্যবস্থা হচ্ছে। শম্ভুনাথের বাড়ী ফিরে যাবার সংকল্প শুনে মঙ্গলদাসজী আনন্দে কেঁদেই ফেললেন। রামদাসজী তাঁকে বললেন — প্রসাদ পাকর যায়েগা। মঙ্গলদাস তুমকো বিষ্ণুপুরী ঘাট তক্ সাথমেঁ যায়েগা।

কিছু টাকা শম্ভুনাথের হাতে দিয়ে বললেন — সিধা শ্বশুরাল কুঠীমেঁ যাবেগা। খাণ্ডোয়ামেঁ এহি রূপেয়াসে নয়া কাপড়া ঔর কোর্তা খরিদ কর লেনা। তুমহারা কিয়েণকে লিয়ে মিঠাইভি লে যাবেগা। ভগবান রামচন্দ্রজী আপকো ভালা করেঁ। ক্যা আপকো হম্ কহা হৈ কি নেহি — রাম নাম জপতে রহো। আপকো মঙ্গল হোগা। প্রভুকা কিরপা সে ইনকা সাথ (অর্থাৎ আমার সঙ্গে) আপকা ভেট হুয়া থা। শৈলেন্দ্রনারায়ণজী আচ্ছাই কিয়া, বহুত আচ্ছা কাম কিয়া।

আমি তাঁকে হাসতে হাসতে বললাম — আমি মুণ্ডমহারণ্যে শোভানন্দজী নামে এক মহাত্মার দর্শন পেয়েছিলাম। তাঁকে আপনি চেনেন কিনা জানি না, তবে মহাত্মা সুমেরদাসজীকে ত আপনি ভালভাবেই চেনেন। ঐ দুজনই আমার কাছে অত্যন্ত আদরণীয় এবং পূজনীয় মহাত্মা। আপনি যে বারবার আমাকে বলছেন —'আচ্ছাই কিয়া, বহুত আচ্ছা কিয়া' এর উত্তরে আমি ঐ দুই মহাত্মার বাচনভঙ্গীতে যে মুদ্রাদোষ আছে তাকে একত্র করে উত্তর দিচ্ছি —'ইসলিয়ে হম্ ক্যা কহুঁ .... নর্মদামেঁ অ্যায়সা হোতাই হ্যায়।'

দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পর শম্ভুনাথ খাণ্ডোয়া অভিমুখে যাত্রা করলেন। মঙ্গলদাসজী সঙ্গে গেলেন বিষ্ণুপুরী ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিতে। আজ সবচেয়ে আনন্দ দেখছি তাঁরই। আমি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে শুয়ে কাটালাম। তারপরেই রওনা হলাম ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের দিকে। মন্দিরে গিয়ে দেখি, আরতির দেরী আছে, তবুও এরই মধ্যে কুড়িপঁচিশজন স্ত্রীপুরুষের ভীড় হয়েছে। দুজন নূতন সাধুকে দেখলাম, তাঁরা সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে স্তব পাঠ করছেন। স্তব পাঠের পরেই দুজনে প্রত্যেক হাতে একজোড়া করে কাঠের খঞ্জনী (যা দুহাতে নিয়ে তালে তালে বাজালে ঝুনুর ঝুনুর করে বাজতে থাকে) নিয়ে অত্যন্ত ভক্তিসহকারে গান ধরলেন —

অবগুণ হারা গুণ নেহি মন্‌কা বড়া কঠোর,
এ্যায়সা সমরথ ওঁকারেশ্বর তুম্‌হি লাগায়ো ঠোর।
তুম্ ত সমরথ সাঁইয়া, দৃঢ় কর পাকড়ো বাঁহে,
ধুর্ হিলে পৌঁছাইয়ো নেহি ছোড়ো মগ্ মাহেঁ।
সুরত্ করো মেরে সাঁইয়া হম্ হ্যায় ভওজল মায়,
আপ্‌হি বাহে জায়েঙ্গে যব তুম্ না পাকড়ো বাঁয়।

ঘট্ সমুন্দর লখ্ না পড়ে, উঠে লহর অপার,
তুম্ যব না পাকড়েঙ্গে তব্ কোন করেগা পার?
সব ধরিতি কাগদ্ করুঁ লেখন সব বনরায়,
সাত্ সিন্দুকো মসী করুঁ, তব গুণ্ লেখা ন জায়।
মুঝে অবগুণ হ্যায় তুঝ্ গুণে, তুঝ্ গুণ অবগুণ মুঝে,
যো ম্যয় বিসরুঁ তুঝ্‌কো, তুম্ মৎ বিসরোঁ মুঝে।
যো ম্যয় ভুল বিগাড়িয়া না কর্ ময়লা চিত্,
সাহেব গেড়ুয়া লোরিয়ে নফর বিগাড়ে নিত্।
অবগুণ কিয়ে ত বহুৎ কিয়ে কর্‌তন্ মানে হার,
ভাবে গর্দন বখশিয়ে ভাবে গর্দন মার।
ম্যয় অপরাধী জনমকা নখ্ শিষ ভরা বিকার,
তুম্ দাতা দুঃখ ভঞ্জন মেরে কর্‌হো সম্‌হার।
মন্ প্রতীত ন প্রেম-রস, ন কুছ্ তনমেঁ ঢঙ্ ,
ন জানে উস পিউসে কেঁও কর্ রহসি রঙ্
ক্যা মুখলে ক্যা বিনতি করুঁ লাজ অবত মোহি ,
তুম্ দেখতা অবগুণ করুঁ ক্যায়সে গউঁ তোহি।
ভক্তিদান মোহে দিজিয়ে গুরুদেবন্ কি দেব,
ঔর কুছ ন চাহিয়ে নিশিদিন তেরি সেব।
অব্‌কে যব সদগুরু মিলে সব দুঃখ আখুঁ রোয়ে,
চরণ উপর শিশ্ রাখুঁ, কহুঁ জা কহ্‌না কোহে॥

হে দীনদয়াল! আমার মন অবগুণে ভরে আছে, মলিনতার পর্দা পড়ে পড়ে মন পাথর হয়ে গেছে। কিন্তু হে ওঁকারেশ্বর। তুমি ত সমর্থ পুরুষ, তুমি দয়া করে আমার গতি করে দিও। হে সর্বশক্তিমান স্বামিন্ তুমি দৃঢ়ভাবে আমার হাত ধরে সেই 'ধূরধামে' (স্বধামে) পৌঁছে দিও। আমি সংসার সমুদ্রের মধ্যে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছি, তুমি যদি আমার হাত না ধর, তাহলে ত একেবারে ভেসে যাব, তলিয়ে যাব। আমার দেহরূপ ঘট যে অথৈ সমুদ্রে পড়েছে, সে সমুদ্রের কোন কুল কিনারা দেখতে পাচ্ছি না, সেখানে অজস্র তরঙ্গ উত্তাল হয়ে উঠছে, পড়ছে, তুমি আমার হাত না ধরলে কে আমাকে পারে নিয়ে যাবে? সমস্ত পৃথিবীকে কাগজ এবং সাত সমুদ্রের জলকে কালি করে বনের সমস্ত বৃক্ষকে যদি একে একে কলম করে তোমার মহিমা এবং দয়ার কথা লিখে যাই, তথাপি তোমার সমস্ত গুণের কথা লিখে শেষ করতে পারব না। আমার নিজের দিকে তাকিয়ে দেখছি সেখানে অবগুণ ছাড়া আর কিছু নাই আর তোমার করুণার কথা ভাবতে গেলেই দেখছি, তোমার গুণ ছাড়া আর কিছু দেখছি না; আমি গুণহীন আর তুমি গুণময়। আমি তোমাকে ভুলে থাকতে পারি, হে গুণনিধি, তুমি কিন্তু আমাকে ভুলো না। তোমার এই নফর (দাসানুদাস) নিত্য ভুল করবে, নিত্য ধূলিকণা মেখে অপবিত্র পথে, পাপের পথে এগিয়ে যাবে, তুমি মজবুত করে (গেড়ুয়া) শক্ত হাতে আমাকে ধরে থেকো প্রভু ! আমি অনেক পাপ করছি, অপরাধের পাল্লায় সবাই আমার কাছে হেরে গেছে। ইচ্ছা হয় এই অধম বান্দাকে রক্ষা কর নতুবা অধঃপাতে যেতে দাও — তবে তাতে

তোমার অধমতারণ নামে কলঙ্ক পড়বে। আমি ত জন্ম অপরাধী, পায়ের নখ থেকে মাথা পর্যন্ত নানা বিকৃতিতে কালিমা-লিপ্ত। কিন্তু তোমার নাম ত দুঃখভঞ্জন আমার দুঃখ দূর করে, আমাকে উদ্ধার করে তোমার সেই নামের মহিমা সার্থক কর।

মনে প্রেমরস নাই, শরীরের সাত্ত্বিক ভাবের কোন সৌষ্ঠব নাই, তথাপি আমার এই বিকারগ্রস্ত দেহমনের মধ্যেও তুমি অন্তরাত্মা রূপে বিরাজ করছ ; তুমি বসে বসে সব দেখছ, তোমার চোখের সামনেই অপরাধ করে চলেছি, এ তোমার কেমন রহস্য তা বুঝি না! কি করে তোমার এসব ভাল লাগছে (গঙঁ তোহি)? হে সদ্‌গুরুদের সদ্‌গুরু। দেবাদিদেব মহাদেব আমার হৃদয়ে ভক্তি দাও, আমি যেন দিন রাত্রি তোমাকে স্মরণ করতে পারি, সেবা করতে পারি, এ ছাড়া আর কিছু আমি চাই না। এখন তোমার মত যখন সদ্‌গুরু পেলাম, তখন আমার সমস্ত দুঃখ অশ্রুজল হয়ে তোমার চরণ কমলে ঝরে পড়ুক। তোমার চরণে মাথা রেখে আমার যা বলবার তা বললাম, এখন যা করবার তুমি কর।

প্রত্যেকটি গানের কলি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এমন আবেগ এবং আকুতি মিশিয়ে গাইলেন ঐ সাধু দুজন যে সকলের চোখে জল। একটা করুণ সুরের লহর নাটমন্দিরের মধ্যে যেন ভেসে বেড়াচ্ছে, প্রত্যেক শ্রোতার বুকের মধ্যে গুমরে গুমরে উঠছে অকথিত অব্যক্ত সেই হৃদয় নিংড়ানো ব্যথা। সুরের মায়াজালে শরণাগতির ভাবরস প্রত্যেকের চোখে অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ছে, সকলেই বিহ্বল সকলেই আচ্ছন্ন, গর্ভমন্দিরে দুবার বিদ্যুতের ঝিলিক ঝলসে উঠল। চোখ মুছে ভাল করে তাকাতেই দেখলাম ওঁকারেশ্বরের লিঙ্গ অস্বাভাবিকভাবে জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছেন।

গান শেষ হতে বোধ হয় দু'ঘন্টা সময় লাগল। পাণ্ডাদের চোখেও জল। তাঁরা ভুলে গেছেন যে, আরতির সময় পার হয়ে গেছে। হঠাৎ পেছন থেকে কেউ বলে উঠলেন — প্রভুজীকী আরতি কব সুরু হোগা? চমকে তাকিয়ে দেখি মহাত্মা প্রলয়দাসজী দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত জয়ানন্দ গোঁসাই ছলোছলো চোখে গর্ভগৃহে ঢুকে আরতি আরম্ভ করলেন। আমি উঠে গিয়ে প্রলয়দাসজীর পেছনে গিয়ে বসলাম, যাতে আর তিনি চোখের নিমেষে অন্তর্হিত হতে না পারেন! বাদ্যভাণ্ড সহকারে আরতি শেষ হল। প্রলয়দাসজী সেই একইভাবে সমকায়শিরোগ্রীব হয়ে ধ্যানস্থ হয়ে বসে রইলেন। রূপার দোলা টাঙিয়ে ওঁকারেশ্বরজীর শয়নের ব্যবস্থা হল। একে একে ভক্তরা বিদায় নিলেন। প্রলয়দাসজীর এবার ধ্যানভঙ্গ হল। তিনি উঠে আমার হাত ধরলেন। এমনভাবে আমার হাত জাপটে ধরেছেন যে, যেন আমি হাত ধরে তাঁকে মন্দিরের বাইরে না আনলে তিনি আর চলতে পারবেন না। মন্দিরের মূল দরজা বন্ধ হল। তিনি আমাকে প্রথম সম্ভাষণেই বললেন — বেটা হমারা লিয়ে আপ্ বহোৎ তড়পাতে থে, উহ্ মুঝে মালুম হ্যায়। লেকিন্ হম্ বিচ্ বিচ্‌মে ঘুমনে যাতা, চারোঁ ধাম ঘুমকে আয়া। ইসী ওয়াস্তে থোড়া দের হো গঈ।

আমি বললাম — আপনার কথা আমার বোধগম্য হচ্ছে না। ২রা বৈশাখ আপনার সঙ্গে কথা হয়েছিল, আজ ৯ই বৈশাখ এই সাতদিনের মধ্যে বদরীধাম থেকে দ্বারকা পর্যন্ত আপনার পক্ষে কিভাবে পরিক্রমা করা সম্ভব হল?

আমার প্রশ্নের তিনি কোন উত্তর দিলেন না। উলটে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — তোমার ওঁকারেশ্বর পরিক্রমা শেষ হয়েছে? কোথায় কোথাও তুমি ঘুরেছ আমাকে বল!

আমি একে একে এরণ্ডী সংগম, ভাণ্ডারী তীর্থ, শঙ্করাচার্য পূজিত ঋণমুক্তেশ্বর, সোমনাথ শিব, রাবণনালা ভৈরবশিলা, সিদ্ধেশ্বর প্রভৃতির নাম করলাম।

— সিদ্ধেশ্বরজী আদি ওঁকারেশ্বর হ্যায়, উনকা পূজা কিয়া? কোন্ বিধিসে?

— আমি যেমন জল ঢেলে প্রণাম করি, তেমনভাবেই করছি। অন্য কোন বিশেষ বিধি আমার জানা নাই।

— চু-চ্চু! আদি ওঁকারেশ্বরজীকো পূজা করনেকে এক বিশেষ বিধি হ্যায়।

— কি সেই বিধি?

— আমি তোমাকে যখন পূজা করাব, তখন দেখতে পাবে। শূলপাণি ঝাড়িতে যখন পরিক্রমা করবে তখন পাথর গিরি মহারাজের আশ্রম পাবে। পাথর গিরিজীর দেহান্ত হয়েছে এখন তাঁর গদীতে আছেন ভরত গিরি। দুর্দান্ত ভীলরা সবাই তাঁর অনুগত। পাথর গিরি প্রবর্তিত ধারায় তিনি পরিক্রমাবাসীদেরকে কয়েকটি প্রশ্ন ও পরীক্ষা করেন। তার মধ্যে একটি প্রশ্ন থাকে—'আপ্ আদি ওঁকরেশ্বরজীকো পূজা কিয়া? কোন্ বিধিসে? যথাযথভাবে সেই বিধি না বলতে পারলে নাগা শিষ্যরা এসে চুটকী কেটে দেন। আর তাঁরা এগোতে দেন না, পরিক্রমা ভঙ্গ করিয়ে দেন। আর সন্তোষজনক উত্তর পেলে ঐ আশ্রম থেকে পরিক্রমাবাসীকে একটি নারোটি (নারকেল মালা দিয়ে তৈরী) দেওয়া হয়। এই নারোটি দেখালে তবে রেবা-সংগমে যাবার ছাড়পত্র মিলে। তার পারিভাষিক নাম 'নৌকার চিঠি'। তুমি আজই ভজন আশ্রমে ফিরে গিয়ে রামদাসজীর কাছ হতে চারদিনের ছুটি নাও। কাল সকাল পাঁচটায় এসে নর্মদাতে স্নান করে এইখানে অপেক্ষা করবে। আমি তোমাকে সঙ্গে করে সিদ্ধেশ্বরজীকে বিধিপূর্বক পূজা এবং মহর্ষি পতঞ্জলি ও গোবিন্দপাদজীর সাধন গুহা দর্শন করাবো। এখন তুমি যাও। লাঠি আর কমণ্ডলু ছাড়া আর কিছু সঙ্গে আনবে না।

— কাল সকালে আপনার দর্শন পাবো ত ?

— জরুর, জরুর।

অগত্যা তাঁকে প্রণাম করে ভজন-আশ্রমে ফিরে এলাম। এসে প্রথমেই রামদাসজীকে বললাম যে, প্রলয়দাসজী দিন চারেকের জন্য কোথাও নিয়ে যাবে বলেছেন, কাল ভোরেই মন্দিরে গিয়ে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

— নিশ্চয়ই যাবে। মহাত্মার সঙ্গে যাবে, তাতে সব দিক দিয়েই মঙ্গল হবার সম্ভাবনা। তাছাড়া তুমি স্বাধীনভাবে পরিক্রমায় বেরিয়েছ! তোমাকে বাধা দেব কেন? বাধা দিলে তা শোনার মত লোক ত তুমি নও। আমি প্রসন্ন মনেই বলছি তুমি ঘুরে এস। তোমার না ফেরা পর্যন্ত আমি চিন্তায় থাকবো।

রাত্রিটা কোনমতে ছটফট করে কাটল। যদি সকালে মন্দিরে গিয়ে প্রলয়দাসজীকে না দেখাতে পাই? রহস্যময় সাধু যদি আমার কথা ভুলে যান! ইত্যাদি নানাবিধ দুশ্চিন্তায়, আশা-নিরাশার দ্বন্দে পড়ে রাত্রে ভাল করে ঘুম হল না। শেষরাত্রে আশ্রম দেবতার মঙ্গল আরতি শেষ হতেই রামদাসজীকে প্রণাম করে বেরিয়ে পড়লাম। কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান সেরে ওঁকারেশ্বরজীকে প্রণাম করছি, দেখলাম, লাঠির ঠক ঠক্ শব্দ করতে করতে প্রলয়দাসজী এসে পৌঁছে গেলেন। মৃদু হেসে আমাকে বললেন — মামনুসর চ অর্থাৎ আমাকে অনুসরণ কর।

মন্দিরে দক্ষিণগাত্র দিয়ে তিনি হাঁটছেন। জরাজীর্ণ বৃদ্ধ অন্ধ সাধু কিভাবে যে দ্রুততালে পর্বতের ঢালু দিয়ে ওঠা নাম করছেন, অত্যন্ত সরুপথে ছোট বড় পাথর ডিঙিয়ে হেঁটে চলেছেন, তা নিজের চোখে না দেখলে কাউকে বিশ্বাস করানো কঠিন। নর্মদা পরিক্রমায় এসে কত কিছুই ত দেখলাম, সব জান্তা পণ্ডিতেরা যার একটা সস্তা নাম দিয়েছে mircle. Miracle বললেই যাঁদের নাসিকা বেঁকে যায় তাঁদের বিকৃত মুখ চন্দ্রমা নিয়ত স্মরণে রেখেও যা নিজের চোখে দেখেছি, দেখছি আর দেখছি বলেই জোরের সঙ্গে বর্ণনা দিতে আমার ক্লান্তি হচ্ছে না। প্রলয়দাসজী আমাকে খেড়াপতি হনুমান মন্দিরে নিয়ে পৌঁছালেন। কেদারেশ্বর মন্দির হয়ে নিয়ে এলেন চণ্ডবেগা সংগমে। পথ চিনতে পারছি, বুঝতে পারছি ইনি বোধহয় আমাকে এরণ্ডী-সংগমে নিয়ে যাচ্ছেন, রামদাসজী ত আমাকে সঙ্গে নিয়ে এসব স্থান পরিক্রমা করিয়েছেন। তবে পুনরায় এখানে তিনি নিয়ে এলেন কেন? ভাবলাম এইখানেই হয়ত কোথাও তাঁর আস্তানা আছে। মন্মথেশ্বর শিবমন্দিরে যাওয়ার পথে সেগুন বুনোনিম এবং বেলগাছের যে ছোট্ট জঙ্গলটি আছে তাও ধীরে ধীরে অতিক্রম করালেন। মন্মথেশ্বর শিবমন্দিরে আজও. দেখছি দশবারজন স্ত্রীলোক পুত্র কামনায় হত্যা দিয়ে পড়ে আছেন। প্রলয়দাসজী মন্দিরস্থ এরণ্ডী মাতার বিগ্রহের সামনে হাতজোড় করে মন্ত্রোচ্চারণ করতে লাগলেন —

ত্বং বৈষ্ণবী শক্তিরনন্তবীর্যা বিশ্বস্য বীজং পরমাসি মায়া।
সম্মোহিতং দেবী সমস্তমেতৎ ত্বং বৈ প্রসন্ন ভুবি মুক্তিহেতুঃ॥
তুমি বিষ্ণুশক্তি, তব অনন্ত মহিমা,
তুমি বিশ্ববীজ, মায়া তুমিই পরমা।
তোমারি প্রভাবে দেবী! বিমোহিত সবে,
তোমারি প্রসাদে জীব মুক্তি পায় ভবে॥

আমাকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলেন — এই মন্ত্র উচ্চারণ করে মহামুনি মার্কণ্ডেয় এরণ্ডী দেবীর পূজা করেছিলেন। মন্ত্রটি মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত চণ্ডীর একাদশ অধ্যায়ের নারায়ণী স্তুতির পাঁচ নম্বর মন্ত্র। শুম্ভবধের পর দেবতারা এই জাগ্রতা বৈষ্ণবীশক্তিকে এ মন্ত্রে স্তব করেছিলেন। তুমি মায়ের সামনে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করে আরাধনা কর। বেদমন্ত্র বলতে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর প্রথমেই যে দেবীসূক্ত আছে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৫ সূক্তের অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ অপরোক্ষানুভূতির পরমভূমিতে উঠে স্বরূপ দৃষ্টিতে অহংকারাদেশ ★ বাক্যে যে সব মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন, যা তোমার বাবার অত্যন্ত প্রিয় মন্ত্র ছিল; পিতার আদেশে তুমি যার বঙ্গানুবাদ করেছিলে, সেই মন্ত্র অনুবাদসহ পাঠ কর। বৈষ্ণবী শক্তির পূজা করলে তবে আদি ওঁকারেশ্বরকে যথাবিধি পূজার অধিকার পাবে। ভাবানুবাদ বাংলায় বলতে কোন দ্বিধা করো না, মা আমার সর্বেশ্বরী, তিনি সব ভাষাই বুঝেন।

বলা বাহুল্য, প্রলয়দাসজীর কথায় আমি রীতিমত চমকে গেছি। আমার জীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাও এঁর জানা দেখছি। রহস্যময় ঋষিতুল্য মহাত্মার আদেশে আমি আচমন করে দেবীসূক্ত

★ সর্বব্যাপক ব্রহ্মচৈতন্যের বিষয় বেদে বা শ্রুতিতে সাধারণতঃ তিন উপায়ে উপদিষ্ট হয়েছে ঃ ১। তদাদেশ বাক্যে ২। আত্মাদেশ বাক্যে ৩। অহংকারাদেশ বাক্যে। এই শব্দগুলির তাৎপর্য বুঝবার জন্য লেখক প্রণীত 'আলোক তীর্থ' পড়ুন।

পাঠ করতে লাগলাম —

ওঁ অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরাম্যহম্ অহং আদিত্যৈরুত বিশ্বদেবৈঃ।
অহং মিত্রাবরুণোভা বিভর্মি অহং ইন্দ্রাগ্নী অহমশ্বিনোভা॥ ১

রুদ্রের সাথে চলেছি শ্বসিয়া, আমি যে মাটির বুকের শিখা,
অদিতিসুতের সঙ্গিনী আমি, আমিই বিশ্বচিতের লিখা;
মিত্র ও বরুণে, অশ্বিযুগলে আমার মাঝারে বলিয়া চলি —
ইন্দ্রের অশনি, অগ্নিদহন আমারই হিয়ায় উঠিছে জ্বলি।

অহং সোমমাহনসং বিভর্ম্যহং ত্বষ্টারমুত পূষণং ভগং।
অহং দধামি দ্রবিণং হবিষ্মতে সুপ্রাব্যে যজমানায় সুন্বতে॥ ২

পাষাণের ঘায় উথলে ইন্দু — আমিই বহাই তাহার ধারা,
ত্বষ্টার শিল্প-স্বপন রচি যে — ভগের মাধুরী, পুষার তারা।
ঢালি যে আগুন তাহারই শিরায়, সঁপেছে যে জন প্রাণের হবি,
দেবতারে বুকে রেখেছে জড়ায়ে, নিঙাড়ি হৃদয় দিয়েছে সবি।

অহংরাষ্ট্রী সংগমনী বসূনাং চিকিতুষী প্রথমা যাজ্ঞিয়ানাম্।
তাং মা দেবা ব্যদধুঃ পুরুত্রা ভূরিস্থাত্রাং ভূর্যাবেশয়ন্তীম্॥ ৩

আমি ঈশ্বরী — বিশ্বে আমার বাসিছে সদাই জ্যোতির রেখা,
নিয়েছি প্রথম আরতি সবার — আমি যে চিতির অরুণ-লেখা।
তাই ত আমারে বিশ্বচেতনা রেখেছে ধরিয়া সকল ঠাঁই —
অখিল আধারে আসন পেতেছি — কোথায় আমার আবেশ নাই?

ময়া সো অন্নমত্তি যো বিপশ্যতি যঃ প্রাণিতি য ঈং শৃণোতি উক্তম্।
অমন্তবো মান্ত উপক্ষিয়ন্তি শ্রুধি শ্রুত শ্রদ্ধিবং তে বদামি॥ ৪

আমারই লীলায় অন্নাদ হল সে — আমি ফুটায়েছি আঁখির তারা,
আমার স্নেহ-চুম্বনে তার প্রাণ কন্দরে জেগেছে সাড়া।
আমারে মানেনি হেলায় যাহারা, ক্ষয় যে তাদের নেয় গো টানি।
শ্রদ্ধায় মোরে জানা যায় জেনে, শুনে রাখ মোর সত্যবাণী॥

অহমেব স্বয়মিদং বদামি জুষ্টং দেবেভিরুত মানুষেভিঃ।
যং কাময়ে তং তমুগ্রং কৃণোমি তং ব্রহ্মাণং তং ঋষিং তং সুমেধাম্॥ ৫

আমারই এ-বাণী, আর কারও নহে — ধ্বনিয়া চলেছি গভীর রবে —
শুনেছে দেবতা, শুনেছে মানুষ — শিহরি পুলকে শুনেছে সবে;
ইচ্ছা আমার হয়েছ যাহারে, দীপ্ততেজেতে অহর্নিশি
দেবতা করেছি, সুমেধা করেছি, করেছি তাহারে আমার ঋষি॥

অহং রুদ্রায় ধনুরাতনোমি ব্রহ্মদ্বিষে শরবে হন্তবা উ।
অহং জনায় সমদং কৃণোম্যহং দ্যবাপৃথিবী আবিবেশ॥ ৬

আরোপিয়া গুণ রুদ্রের তরে তুলিয়া ধরেছি পিণাকখানি,
অসুরের শর মহতে বিঁধিবে? — ছুটুক ঈষিকা তাহারে হানি।
আপন যে-জন তাঁহারে বাঁচাতে রক্ত-সায়র উথলি তুলি —

চেয়েছি দ্যুলোক অলখ-আলোকে, সিঁচেছি সুধায় ধরার ধূলি।
অহং সুবে পিতরম্ অস্য মূর্ধন্ মম যোনিঃ অপ্‌সু অন্তঃ সমুদ্রে।
ততো বিতিষ্ঠে ভুবনানু বিশ্বোতামুং দ্যাং বর্ষ্মণোপ্‌স্পশামি।। ৭
পিতা বল যারে, প্রসবি তাহারে আমিই রেখেছি নিখিল শিরে,
মূলাধার মম রয়েছে আড়াল প্রাণেরই গভীর সাগর-নীরে;
সেথা হতে আমি রূপে রূপে ফুটি, ছড়াই বিশ্বভুবন ছেয়ে,
ঐ যে দ্যুলোক ছুঁয়ে আছি তারে — আলোর নিঝরে উঠেছে নেয়ে।।
অহমেব বাত ইব প্রবামি আরভমাণা ভুবনানি বিশ্বা।
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সং বভূব।। ৮
চলেছি বহিয়া দিক হতে দিকে — চলেছি বহিয়া ঝড়ের মত,
দুটি বাহুপাশে শিশু হেন যেন আগুলি চলেছি ভুবন যত;
ছাড়ানু দ্যুলোক — এই যে পৃথিবী, ছাড়ানু তাহার মাটির মায়া,
এমনই বিপুল মহিমা আমার নিখিল আমারই নিটোল কায়া।।

এরণ্ডী মাতার পূজা শেষ হল। অনন্তবীর্যা বৈষ্ণবীশক্তির প্রতীককে প্রণাম করে তিনি নিয়ে চললেন আমাকে বৈদূর্য পর্বতের চূড়া লক্ষ্য করে। এবার সম্পূর্ণ চড়াইএর পথ। এবড়ো খেবড়ো পথ, পাথরের চাঙড় সরিয়ে কখনও বা ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে তিনি তর্‌তর্ করে উঠতে লাগলেন। প্রতি মুহূর্তে ভাবছি, এই বুঝি পড়ে যান। আমি একবার সম্ভ্রমে বললাম আমাকে আগে আগে যেতে দিন, নয়ত আমার হাত ধরে চলুন। তিনি বললেন — তুমি কি পথ চেন? পথপ্রদর্শক হবে কি করে? তুমি ভাবছ অন্ধা বুঢ্যা গির যায়েগা, লেকিন উস্‌রোজ আপকা কহা কি নেহি জো অন্ধাকো নয়ন কা জ্যোতি সর্বত্র বিরাজমান্ হৈ, উনোনে আগে চলতা হৈ, হম্ উনকো অনুসরণ কর রহা হৈ। বে ফিকর রহো। আমি আর কিছু বললাম না, নীরবে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। আমি পুর্বেই বলেছি, এই পাহাড়ের চূড়ার দিকে তাকালে স্পষ্টই দেখা যায় যে দুটি পার্বত্যধারা পূর্ব-পশ্চিমে প্রসারিত হয়ে গেছে। তার উত্তর দিকের ধারাটি কাবেরী নদীর দিকে গিয়েছে, আর দক্ষিণ দিকের ধারাটি গিয়েছে নর্মদা নদীর দিকে। এই দুই সুদীর্ঘ শৈলশিরার মাঝখানে গভীর গহ্বর দেখা যাচ্ছে। সেই গহ্বরের চারিদিকে সেগুন শাল বুনোনিম এবং বেলগাছের জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। পাহাড়ের উঁচুতে উঠে ঋণমুক্তেশ্বর সোমনাথের মন্দির, মাহিষ্মতী নগরীর ধ্বংসাবশেষের অবস্থানগুলি, কোন দিকে কোনটি তা অনুমান করতে পারছি। রামদাসজীর সঙ্গে পরিক্রমায় বেরিয়ে মাত্র কয়েকদিন আগেই দেখে গেছি এইসব। প্রলয়দাসজী আমাকে নিয়ে ক্রমে দুই পার্বত্যশিরার মধ্যবর্তী গহ্বরের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। বললেন — নীচে গভীর ঢালের মধ্যে জঙ্গল দেখা যাচ্ছে না? আমি 'হ্যাঁ' বলতেই তিনি বললেন তুমি আমার হত ধর, একেবারে ঢালু রাস্তা, রুক্ষ পার্বত্য ঢাল, গাছের শিকড় ধরে, গোড়া ধরে আমাদেরকে ঐ গহ্বরের মধ্যে নামতে হবে। মিনিট দশেক কষ্ট কর, পরে দেখবে পাহাড়ের উপর থেকে যা গভীর জঙ্গল বলে মনে হচ্ছে, বিপজ্জনক মনে হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে এই গহ্বরের মধ্যস্থল তপোবনের মত মনোরম। এই তপস্যার স্থলকে সাধারণ লোকের স্পর্শ হতে বাঁচাবার জন্য যেন প্রকৃতি নিজের হাতে

বাহ্যত গহ্বর ও জঙ্গলের বাধা রচনা করেছেন। ঘন ঘন তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন — এহি পেড়কো পাকড়ো, উসকা শিকড় পাকড়ো, থোড়া ঠার যাইয়ে, পাকড়ো মেরে হাত। ব্যস্ আভি হো গিয়া।

পাহাড়ের খাড়া ঢালু অতিক্রম করে নেমে এলাম কম ঢালুতে, যেখানে অন্ততঃ পঞ্চাশ ফুট চওড়া এমন পার্বত্য ঢাল যা প্রায় সমতল ভূমির মত, স্বচ্ছন্দে হাঁটা যায়। এই অংশে আর শাল সেগুন নিম বেলগাছের ঘন জটলা নাই; লতাগুল্মে জড়াজড়ি কোন সংকটজনক ঝোপঝাড়ও নাই। অল্প দূরে দূরে গাছ আছে তবে তা এইস্থানের শোভাবৃদ্ধি করেছেন। অল্প দূরেই নর্মদার কাকচক্ষু জল থৈ থৈ করছে। জলের মধ্যে ঢেউয়ের খেলা চলছে অর্থাৎ পাহাড় ঘেরা জল এখানে নিস্তরঙ্গ লেকের মত নয়। ময়ূর ঘুরে বেড়াচ্ছে, উড়ে উড়ে গাছের ডালে বসছে। সাত আটটা হরিণ ঘুরে বেড়াচ্ছে সবাই নিঃশঙ্ক। সূর্যের রোদ এসে পড়েছে জলের উপর, বাকী অংশ ছায়ায় ঢাকা। আমরা যে পথ দিয়ে হাঁটছি, তা দেখতে চক্রাকারে পাহাড় ঘেরা আবেষ্টনীর মত। নেমেছিলাম পাহাড়ের পূর্ব দিক হতে, এখন চলছি দক্ষিণ ঢালের পথ ধরে। আমাদের চলার পথের প্রায় বিশ পঁচিশ ফুট উপরে পাহাড়ের গায়ে একটি গাছের তলায় একটি কৃষ্ণসার মৃগ একটি মৃগীর অঙ্গ লেহন করছে। মুণ্ডমহারণ্য বা এই ওঁকারেশ্বর ঝাড়ি পথেও অনেক কৃষ্ণসার মৃগ দেখেছি; কিন্তু তারা সামান্য একটু শব্দেই মুহূর্তে অন্তর্হিত হয়ে যায় দ্রুতপদে, কিন্তু এখানে একরকম তাদের পাশ দিয়েই হেঁটে যাচ্ছি, তারা বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। মনে পড়ে গেল মহাকবি কালিদাস অঙ্কিত কুমারসম্ভবের একটি আশ্রম চিত্র, যেখানে তিনি বর্ণনা করছেন —

শৃঙ্গেন চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং —
মৃগীম্ কণ্ডুয়ত কৃষ্ণসারঃ।

প্রলয়দাসজী বলে উঠলেন — এ স্থান হিংসাশূন্য। এখানে বাঘ ভালুক প্রভৃতি কোন হিংস্র শ্বাপদ নাই।

আমি বললাম — থাকলেই বা কি ক্ষতি ছিল। প্রাচীন ভারতের তপোবনের যে বর্ণনা এতকাল শুনে এসেছি এবং পড়ে এসেছি, ঐ স্থানটি ত অবিকল সেই রকম, আপনার দয়ায় এসব যে দেখতে পেলাম, তাতেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। বাঘ থাকলে বাঘ হরিণের সহাবস্থান পরস্পরের হিংসাশূন্য ব্যবহার দেখে বাংলার কবি নবীনচন্দ্র সেনের কবিতা আমি পরমানন্দে অনুস্মরণ করে বলতে পারতাম —

এক পার্শ্বে বেদীমূলে 'সুশীলা' শার্দুল
নীরবে সেবক অঙ্গে করিছে লেহন
অর্ধনিমীলিত নেত্রে বসিয়া নীরবে
'সুলোচন' সুলোচনা কুরঙ্গ যুগল
আশ্রম পালিত মৃগ, নীরব সকল।

প্রলয়দাসজী কবিতাটি শুনে খুব তারিফ করলেন, বললেন — কবি লোগোনে ক্রান্তদর্শী হোতা হ্যায়। আভি দেখিয়ে উধর্ বড়া একঠো গুহা হৈ। ইধর পাহাড়কা চারো ঢালোমেঁ চারঠো গুহা হৈ। সবসে মহত্বপূর্ণ, সবসে বড়া গুহা এহি হ্যায়।

আমরা ইতিমধ্যে দক্ষিণদিকস্থ পর্বতগাত্র হতে পশ্চিমদিকের ঢালে এসে পৌঁছে গেছি।

— সাষ্টাঙ্গে প্রণতি লাগাও। ইহ হ্যায় ভারতকী মুকুটমণি মহাযোগেশ্বর যোগদর্শন প্রণেতা মহর্ষি পতঞ্জলি মহারাজকী গুহা। চলিয়ে থোড়াসা অন্দরমেঁ ঘুসিয়ে, জ্যাদা নেহি। তাঁর কথা শুনে অব্যক্ত আনন্দে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছে। আমি ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। গুহার কাছাকাছি হতেই বুঝলাম, গুহাভ্যন্তর হতে কোন জটাজূট সৌম্যদর্শন ঋষি তাঁর বিশাল জটাভার নিয়ে আমার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করবেন —

কিং গোত্রো নু সৌম্যামীতি?

অর্থাৎ — কুশল হউক, সৌম্য গোত্র কি তোমার?

না — অতখানি সুকৃতি আমার নাই। প্রলয়দাসজী ছাড়া আর কাউকে কোথাও দেখতে পাচ্ছি না। গুহার মধ্যে ঢুকে দাঁড়াতেই কানে ভেসে এল জলোচ্ছ্বাসের শব্দ। আমি কৌতুহলভরা দৃষ্টিতে প্রলয়দাসজীর দিকে তাকাতেই তিনি বললেন — এর পাশের গুহাতে নর্মদার জল এসে ধাক্কা দিচ্ছে। এই পাহাড়ের একটি গুহা ভেদ করে নর্মদা এই পাহাড়বেষ্টিত স্থানে এসে পড়েছে, তারপর পূর্বদিকের আর একটি গুহা ভেদ করে এই জলের ধারা নর্মদার মূল ধারায় গিয়ে পড়েছে। আপতো জানতা হ্যায়, এহি হমারা নর্মদামায়ীকি বৈশিষ্ট্য হ্যায় — ভিত্ত্বা শৈলঞ্চ বিপুলং — বিশাল বিশাল পাহাড় ভেদ করে মা আমার প্লাবয়ন্তি বিরাজন্তি অর্থাৎ বিন্ধ্য ও বৈদুর্য পর্বতের মধ্যস্থল প্লাবিত করে বিরাজমানা। তেন রেবা ইতিস্মৃতা — তাই ত মায়ের নাম রেবা।

এখনও যেমন অনেক প্রাচীন বাড়ীতে দেওয়ালের উপর দিকে কলুঙ্গী দেখা যায়, তেমনি এই গুহার ভিতরে উপর দিকে একটা বড়ো কুলুঙ্গীর মত ছোট প্রকোষ্ঠ চোখে পড়ল। এ যেন গুহার মধ্যে গুহা — অন্তর্গুহা। সহসা ফোঁস ফোঁস গর্জন শুনে উপরের দিকে তাকিয়ে দেখলাম — এক বিরাট সাপ কুণ্ডলী পাকিয়ে উঁকি মারছে। সর্পরাজের কলেবর যে কত বড় তা বুঝতে পারলাম না। কেননা তাঁর বৃহত্তম অংশ প্রকোষ্ঠ বা সেই কলুঙ্গীর অভ্যন্তরে লুক্কায়িত। তার বিশাল ফণার বিস্তৃত আয়তনই কলুঙ্গীর প্রস্তরময় বহিরারণের মুখকে আচ্ছাদিত করেছে। চোখের মণি হতে এমনই আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে যে সমগ্র গুহা আবছা আলোর আভাতে আলোকিত হয়ে উঠেছে। মনে হল, সেখানে যেন সহসা প্রভাত সূর্যের কিরণচ্ছটা এসে পড়ল। প্রলয়দাসজী চোখের ইঙ্গিতে আমাকে সাষ্টাঙ্গ দিতে বলে নিজেও ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে মন্ত্রপাঠ করতে লাগলেন —

যস্ত্যক্ত্বা রূপমাদ্যং প্রভবতি জগতোহনেকধানুগ্রহায়
প্রক্ষীণ-ক্লেশ-রাশির্বিষম-বিশধরোহনেক বক্ত্রঃ সুভোগী।
সর্বজ্ঞান-প্রসূতির্ভুজগ-পরিকরঃ প্রীতয়ে যস্য নিত্যম্
দেবোহহীশঃ যোহব্যাৎ সিতবিমল-তনুর্যোগদো যোগমুক্তঃ॥

অর্থাৎ জগতের প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য যিনি নিজের আদ্যরূপ ত্যাগ করে বহুধা অবতীর্ণ হন, যাঁর অবিদ্যাদি ক্লেশরাশি প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ, যিনি বিষম বিষধর, বহুবক্ত্র, সুভোগী এবং সর্বজ্ঞানের প্রসূতিস্বরূপ, ভূজঙ্গম সম্পর্ক যাঁকে নিত্যপ্রীতি প্রদান করে থাকে, সেই শ্বেতবিমলতনু যোগদাতা ও যোগমুক্ত অহীশ অর্থাৎ নাগদের অধিপতি আনন্দদেব আমাদেরকে রক্ষা করুন।

প্রণাম করে উঠে দেখলাম অন্তর্গুহা হতে সেই শ্বেতকায় সর্পরাজ অন্তর্হিত হয়েছেন।

প্রলয়দাসজী তখনও নতজানু হয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলে চলেছেন, তাঁর শরীর থরথর করে কাঁপছে। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিতে, আমি তাঁর হাত ধরে গুহার বাহিরে এনে বসিয়ে দিলাম। আমাকে বললেন — পাতঞ্জল যোগদর্শন ত পড়েছ। সর্বতন্ত্রস্বতন্ত্র যোগদর্শনাচার্য পতঞ্জলিদেবের অবিস্মরণীয় অক্ষয় কীর্তি ঐ বইটি। তিনি পাণিনি ব্যাকরণের মহাভাষ্য এবং যোগবার্তিকও লিখে গেছেন। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভগবান পতঞ্জলিদেব গোণ্ডানগরে জন্মগ্রহণ করেন। সেইজন্য তাঁর অপর নাম — গোনর্দীয়। বৃদ্ধ বয়সে ইনি পুষ্যমিত্রের যজ্ঞে অধ্যক্ষতা করেছিলেন। তৎ প্রণীত মহাভাষ্যে তিনি একথা স্মরণ করে লিখেছেন — পুষ্যোমিত্রো যজতে যাজকা যাজয়ন্তীতি। তত্র ভবিতব্যং পুষ্যমিত্রো যাজযতে যাজকা যাজয়ন্তীতি (৩।১।২।২৬) মন্ত্রে উল্লিখিত এই পুষ্যমিত্র মৌর্যবংশের শেষরাজা বৃহদ্রথের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। পরে তিনি বৃহদ্রথকে হত্যা করে ১৮৫ খৃষ্টপূর্বাব্দে পাটালিপুত্রের সিংহাসন অধিকার করেন।

তাঁর বাক্যস্রোতে বাধা দিয়ে আমি তাঁকে জিজ্ঞাস করলাম এইমাত্র আপনি যে মন্ত্র উচ্চারণ করে পাতঞ্জলিদেবের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানালেন এই মন্ত্র আমি পাতঞ্জলদর্শনের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যার গোড়ার দিকে আছে দেখেছি। বাচস্পতি মিশ্র এই মন্ত্রের উল্লেখ করেন নি। অবশ্য বিজ্ঞানভিক্ষু এর ব্যাখ্যা করেছেন। তাই অনেক পণ্ডিতই মনে করেন, বাচস্পতির পর এই মন্ত্র প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। ভগবান পাতঞ্জলিকে তাঁরা মহাভাষ্যকার হিসাবে মহাপণ্ডিত এবং মহাচার্য বলে মনে করেন, তাই বলে মন্ত্রে যে অহীশ অর্থাৎ স্বয়ং অনন্তদেব বলে তাঁকে বন্দনা করা হয়েছে, তা অনেক পণ্ডিতই মানেন না।

— পণ্ডিতদের কথা বাদ দাও। তাঁরা ত আর যোগী নন। শ্রেষ্ঠ যোগী হলে যে কেউ ধ্যানে ইচ্ছা করলেই জানতে পারবেন যে ভগবান পতঞ্জলি স্বয়ং অনন্তদেবের শক্তি। এইজন্যই তাঁর মহাভাষ্যের অপর নাম —ফণিভাষ্য। সেইজন্যই নৈষধচরিতের দ্বিতীয় সর্গে শ্রীহর্ষ বলেছেন — ফণিভাষিত ভাষ্যফক্কিকা বিষমা কুণ্ডল নাম বাপিতা। মহাভাষ্য দুরূহ হলেও ব্যাকরণ শাস্ত্রে এইরকম বিচারমূলক গ্রন্থ জগতের কোন স্থানে কখনও কোন ভাষায় রচিত হয় নি। একে ব্যাকরণের ব্যাকরণ বললেও অত্যুক্তি হয় না। কাত্যায়ন মুনি বার্তিক লিখলেও অষ্টাধ্যায়ীকে উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করে যেতে পারেন নি। অনন্তদেবের প্রতিভা-বীর্য বলেই পতঞ্জলিদেব অষ্টাধ্যায়ীর রহস্য উদ্‌ঘাটন করে বার্তিকের দোষ ক্ষালন করতে পেরেছিলেন। সেইজন্য প্রাচীন পণ্ডিতগণ পতঞ্জলিদেবকে বলতেন — চূর্ণীকৃৎ।

যোগসাধন ছাড়া দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি ঘটে না। শরীর মন ও বাক্য ব্যাধিশূন্য ও নির্মল না হলে পাছে উপাসনা নিস্ফল হয়, সেইজন্য ভগবান অনন্তদেব কলিহত জীবদের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য পৃথিবীতে তিনবার প্রকট হয়ে যোগসূত্রের দ্বারা মনের, মহাভাষ্যের দ্বারা বাক্যের এবং বৈদ্যরাজ চরকরূপে শরীরের ব্যাধিনাশের উপায় বলে গেছেন। এই নিগূঢ় রহস্য মনে রেখে এইজন্য মহাভাষ্যের প্রণামাঞ্জলি শ্লোকে বলা হয়েছে —

যোগেন চিত্তস্য পদেন বাচাং মলং শরীরস্য তু বৈদ্যকেন।
যোহপাকরোৎ তং প্রবরং মুনীনাং পতঞ্জলিং প্রাঞ্জলিরাণতোহস্মি॥

চরকসংহিতার টীকাকার চক্রপানি দত্তও লিখেছেন —

পাতঞ্জল মহাভাষ্যচরকপ্রতিসংস্কৃতৈঃ।
মনোবাক্কায়দোষণাং হত্রেহহিপতয়ে নমঃ॥

চক্রপানি দত্ত এই শ্লোকে যাঁকে অহিপতি বলে প্রণাম নিবেদন করছেন, আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু তাঁকেই 'অহীশঃ' বলে বন্দনা করেছেন। দুটি শব্দের একই অর্থ — অনন্তদেব। বিজ্ঞানভিক্ষু মহাযোগী ছিলেন, তাঁর ধ্যানদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে মহামুনি পতঞ্জলি স্বয়ং অনন্তদেব। ভারত-গৌরব বাচস্পতি মিশ্র শারীরিক ভাষ্যের টীকা লিখে নাম দিয়েছিলেন তাঁর পত্নীর নামানুসারে ভামতী। তিনি পাতঞ্জলদর্শনের উপর তত্ত্ববৈশারদী ভাষ্য লিখে গেছেন। তিনি তাঁর ভাষ্যে পতঞ্জলদেবকে অনন্তদেব বলেন নি বলে যে তিনি অনন্তদেব নন এমন কোন কথা নাই। তিনি যোগদৃষ্টিতে অনন্তদেব বুঝলেও ভাষ্য আলোচনাকালে সে কথা হয়ত উল্লেখ করার অবকাশ পান নি। বাচস্পতি মিশ্রের আবির্ভাব ঘটেছিল নবম খ্রীষ্ট শতাব্দীতে। তাঁর অনেক পরে ষোড়শ খ্রীষ্ট শতাব্দীতে আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর আবির্ভাব ঘটে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর ভাষ্যে যা লেখেন নি, তিনি তা লিখে স্পষ্টভাবে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে গেছেন। তাকে প্রক্ষেপ ভাবব কেন? উত্তর ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন যোগী ভাবা গণেশ ছিলেন আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষুর শিষ্য। তাঁর অপর দাসানুদাস এই প্রলয়দাস। কাজেই আমার চেয়ে তাঁকে ইদানীংকালে আর কে ভালভাবে জানবে? আমার গুরুদেব কেবল প্রবচন ভাষ্যই লেখেন নি। তাঁর লেখা সাংখ্যসার, যোগসার, যোগ বার্তিক এবং ব্রহ্মসূত্রের বিজ্ঞানামৃত ভাষ্যও বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। আধুনিক পণ্ডিতদের কথা আর কি বলব, তাঁদের অনেকেই আমার গুরুদেবের 'বিজ্ঞান' নাম এবং ভিক্ষু উপনাম দেখে তাঁকে বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বলে অভিহিত করেছেন। ভুল, ভুল, এ কথা সম্পূর্ণ ভুল। আমার গুরু নিরতিশয় ঈশ্বরপরায়ণ ছিলেন! সাংখ্যসারের প্রথমেই তিনি লিখেছেন —'সর্বাত্মনে নমস্তস্মৈ বিষ্ণবে সর্বজিষ্ণবে'। প্রবচন ভাষ্যের মঙ্গলাচরণেও তিনি বলে গেছেন —'প্রীয়তাং মোক্ষদো হরিঃ'।

চল এবার পাহাড়ের পশ্চিমঢাল ধরেই উত্তরদিকে একটু এগিয়ে যাই। তাঁর পিছনে হাঁটতে লাগলাম। প্রায় পঞ্চাশ ফুট হাঁটার পরেই তিনি থমকে দাঁড়ালেন। একটি ক্ষীণ পথরেখা দেখিয়ে বললেন, এই পথচিহ্ন পাহাড়ের উপর দিকে ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে উঠে গেছে। ঐ পথ ধরে পাহাড়ের উপরে উঠে গেলে মাত্র আধ মাইল দূরেই আদি ওঁকারেশ্বর সিদ্ধেশ্বর রূপে বিরাজ করছেন. সেখান থেকে সিকি মাইল দূরেই বিখ্যাত মাহিষ্মতি নগরীর ধ্বংসস্তূপ। তুমি ত মাহিষ্মতীর ধ্বংসস্তূপ দেখেছ? আমার মাথায় তখন ভীষণ আলোড়ন চলছে। তাঁর কথার উত্তর দিতে দেরী হল। আমি ভাবছি আমার মাথায় বুঝি গোলমাল দেখা দেবে। নানাবিধ চিন্তা আমার মস্তিষ্কের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে উঠছে। এই সাধু বলছেন কি ? ষোড়শ শতাব্দী হতে অর্থাৎ প্রায় চারশ বছর ধরে ইনি জীবিত আছেন! সাধু এবার যেন একটু ধমকের সুরেই বললেন — বলি, আমার কথা কি তোমার কানে ঢুকছে না? তুমি মাহিষ্মতী দেখেছ ত ? ইতিমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছি। আমি উত্তর দিলাম — হাঁ, রামদাসজীর সঙ্গে পরিক্রমা করতে গিয়ে দেখে এসেছি। কিন্তু আমি ভাবছি, যত দুর্গমই হোক, মাহিষ্মতীর ধ্বংসস্তূপ বা আদি ওঁকারেশ্বরের এত নিকটবর্তী এই মনোরম সিদ্ধ তপস্থলীর সন্ধান কি এখানকার মানুষ জানেন না? প্রতি বৎসর শত শত তীর্থযাত্রী এবং পরিক্রমাবাসীরা ওঁকারেশ্বরে আসেন, তাঁরা মাহিষ্মতী ও সিদ্ধেশ্বরকে দর্শন করে যান। এখানে আসতে পারেন না কেন? কিভাবে এই শান্তশ্রীমণ্ডিত তপোবন এতকাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালেই রয়ে গেছে?

— গৌরীকেদার এবং বদরীনারায়ণে ত প্রতি বছরই সহস্র সহস্র তীর্থযাত্রী যান। দেশী বিদেশী বহু অভিযাত্রীই ত দূরধিগম্য হিমালয়কে চষে বেড়াচ্ছে। তবু ঋষিসেবিত 'সিদ্ধাশ্রম' এবং 'শতোপন্থের' সন্ধান কজন পায় বলুন? এর পেছনে রহস্য আছে।

— যাই বলুন, মাহিষ্মতী যখন দেখতে গিয়েছিলাম, তখন যদি আমি এই স্থানের সন্ধান জানতাম, তাহলে সেই ধ্বংসস্তূপের উপর দাঁড়িয়ে এই স্থানের শুচিশ্রীমণ্ডিত তপোবনকে স্মরণ করে কবিগুরুর ভাষায় বলতে পারতাম —

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার
হেথা মত্ত স্ফীত স্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা। (প্রাচীন ভারত)

— তোমার কাব্যরস এখন বন্ধ কর। একটু দূরেই পাহাড়ের গায়ে দেখ আচার্য গোবিন্দপাদের গুহা। এই অধ্যাত্ম-স্পর্শমণির স্পর্শেই শংকরাচার্যের জীবন স্বর্ণজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়েছিল। একটু আগেই বলছিলে না, শৈলদ্বীপের এই তপোবন এত কাল ধরে লোকচক্ষুর অন্তরালে কিভাবে রয়েছে? অন্তরালে রয়েছে বটে কিন্তু যাঁর সুকৃতি থাকে তিনি সিদ্ধস্থানে এসে যান অর্থাৎ এখানকার কোন তপোসিদ্ধ মহাত্মা টেনে আনতে চাইলে তিনি এই রহস্যময় স্থানে এসে যান। যেমনভাবে শংকরাচার্য এসেছিলেন যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদের আকর্ষণে। একবার ভেবে দেখ, সুদূর দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত কেরলের কালাডি গ্রামে জন্মেও এখনকার মত পথ ঘাটের সুবিধা, ট্রেন পথ ইত্যাদি না থাকলেও কিশোর বয়সেই শংকরাচার্য এসে পৌঁছাতে পেরেছিলেন। সিদ্ধ মহাগুরু তাঁর জৈব আবরণের দৃশ্যপট উন্মোচন করে তাঁর মধ্যে শৈবচেতনার উত্তরণ ঘটিয়েছিলেন। শিবকল্প মহাযোগীর দিব্যস্পর্শ পেয়ে আচার্য শংকরও শিবকল্প মহাযোগী এবং যুগন্ধর পুরুষ রূপে আত্মপ্রকাশ করলেন। নির্বিশেষে পরম ব্রহ্মতত্ত্ব তথা অদ্বৈতবাদের উদ্‌গাতা মহাত্মা শংকরাচার্যের তপস্যাস্থল এটি। প্রণাম কর, প্রণাম কর এই পবিত্র স্থানকে। বহুকাল থেকেই এই গুহামুখ বন্ধ আছে। ভগবান পতঞ্জলি অপ্রকট হওয়ার পর সিদ্ধযোগাচার্যরা যোগদৃষ্টিতে দেখেছিলেন যে আচার্য গোবিন্দপাদের সিদ্ধদেহকে আশ্রয় করে ভগবান পতঞ্জলি বিরাজমান ছিলেন। শংকরাচার্য প্রণীত শরীরক ভাষ্য এবং উপনিষদাদির ভাষ্য বা টীকাগ্রন্থের পঠন পাঠন সর্বত্র হয়। তাঁর পুস্তক সুপ্রচলিত এবং সুলভ। আচার্য গোবিন্দপাদ 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' ছাড়া আর কোন গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নি। আমি তোমাকে সেই দুষ্প্রাপ্য পুঁথি পড়তে দেব। এখন আমার গুহায় চল। আমার ডেরা দেখার জন্য প্রথমদিন থেকেই তোমার বিষম কৌতূহল, এইবার তোমার সেই সাধ মিটবে।

পাহাড়ের পশ্চিমঢাল অতিক্রম করে উত্তরঢালে পৌঁছালাম। একটু উঁচুতে মনোরম গাছপালা শোভিত গুহা দেখিয়ে বললেন, উপরে উঠতে থাক। এই গুহাতেই আমি দীর্ঘকাল, দীর্ঘকাল ধরে বাস করছি। সামনেই নর্মদার জল, যেমন একটি গোলকৃতি সরোবর, চক্রাকারে পাহাড় দিয়ে ঘেরা। বিরাট গুহা, তার আবার দুটি ভাগ।সামনের দিকটা যেমন বহির্বাটি, আর ভিতর দিকটা যেন অন্দরমহল। আমাকে বাইরে বসিয়ে রেখে তিনি গুহার ভিতর দিকে ঢুকে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই একটা বড় মৃগচর্ম এনে বললেন এতেই তোমার শয্যার কাজ হবে। এখন চল নর্মদার ঘাটে নেমে স্নান করি, বেলা বোধহয় বারটা। দুজনে জলে নামলাম। জলে

নেমেই বললেন—তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যে, তুমি যে কোন অবস্থাতে, যে কোন অনিবার্য কারণ ঘটুক না কেন কিছুতেই তুমি গুহার ভিতর দিকে আমি কি করছি তা দেখতে যাবে না। যদি দাবানল জ্বলে ওঠে কিংবা বাঘের হুঙ্কারও শুনতে পাও, তবুও ভিতর দিকে উঁকি মারবে না। এইটাই তোমার পরীক্ষা বলে জানবে।

আমি তাঁকে কথা দিলাম।

স্নান করতে করতেই দেখলাম, নর্মদার জলে দুটি নারকেল ভেসে আসছে। তিনি সাঁতার কেটে গিয়ে নারকেল দুটো কুড়িয়ে আনলেন। আমি সূর্যার্ঘ্য এবং তর্পণাদি সেরে উঠে এলাম। আমাকে নারকেল দুটো ভেঙে দিয়ে বললেন — খেয়ে নাও।

আমি বললাম — আমি একটা খাই, আপনি একটা খান। হাসতে হাসতে প্রলয়দাসজী বললেন — এই শরীরে কোন স্থূল খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। এই বলে তিনি গুহার ভিতর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি নারকেল খেয়ে শুয়ে পড়লাম, দু'চার মিনিটের মধ্যেই গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হলাম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছি জানি না, হঠাৎ কর্কশ চীৎকারে ধড়্ফড়্ করে উঠে বসলাম। দেখলাম, একজন ভীল একটা রক্তাক্ত খড়্গ নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় আস্ফালন করতে করতে গুহার ভিতর দিকে ছুটে গেল। কিছু পরেই শুনতে পেলাম প্রলয়দাসজীর আর্তনাদ। হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং আর্তনাদ শুনে হকচকিয়ে গেলাম। সহসা বুঝতে পারলাম না, আমি ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছি না জেগে আছি। সামনের দিকে তাকিয়ে দেখি গাছপালার উপর দিয়ে অস্তগামী সূর্যের ম্লান রশ্মি নর্মদার জলে পড়ে ঝিকমিক করছে। আবার আর্তনাদ। বড় করুণ সেই ধ্বনি। প্রলয়দাসজীর সুস্পষ্ট ক্রন্দনধ্বনি — বাঁচাও, মুঝে বাঁচাও!

চঞ্চল হয়ে উঠে দাঁড়ালাম, কেউ যেন আমার কানে ফিস্ ফিস্ করে করে বললেন — বসে পড় শান্ত হয়ে বসে থাক্ — সাধু তোকে পরীক্ষা করছেন। এই অলৌকিক সুস্পষ্ট নির্দেশে আমি বসে পড়লাম। বাবাকে স্মরণ করতে লাগলাম প্রাণপণে। আর্তনাদ বন্ধ হয়ে গেছে। চারদিক নিঃস্তব্ধ। গাঢ় অন্ধকারে ঢেকে গেছে এই তপস্থলী। একটু পরেই একটি জলন্ত ঘিএর প্রদীপ হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বেরিয়ে এলেন মহাত্মা প্রলয়দাস। প্রদীপটি পাথরের উপর রেখে বললেন — তুম্হারা ইম্তেহান (পরীক্ষা) হো চুকা! তুম পাশ হো গিয়া। তুমহারা পিতাজী তুমকো বাঁচা দিয়া। আজ অমাবস্যা হ্যায়, ইস্ পুনীত লগ্নমে আপকো মূর্ধ্বা মে ওঁকার কী টঙ্কার বাজানে কা তরীক্কা শিখায়েগা।

আমি বিনম্র কণ্ঠে বললাম — মহারাজ, আজ ত দশই বৈশাখ, শুক্রবার, কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথি। অমাবস্যা বলছেন কেন? অমাবস্যা তিথি আসতে এখনও ত দশদিন বাকী।

— পাঁজি পুঁথি মে যো তিথি বার বগেরা লিখতা হৈ, উহ্ গৃহীকে লিয়ে। যোগীয়োঁ কা পাঁজি দুসরা হৈ। আজ অমাবস্যা ইহ বাত সহি হ্যায়।

এই বলে তিনি ভিতরে উঠে গেলেন। একটি জ্বলন্ত হোমকুণ্ড নিয়ে আমার সামনে বসলেন, আমাকে সিদ্ধাসনে বসে কমণ্ডলুর জলে আচমন করতে বললেন। আচমন হয়ে গেলেই বললেন — তোমার মহাগুরু পিতাঠাকুরকে প্রণাম কর, প্রণাম কর ভগবান পতঞ্জলি এবং যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদকে। এইবার যা বলছি মন দিয়ে শোন। জাবালদর্শন উপনিষদে

(৪। ৪০-৪৭) আছে —

পিঙ্গলায়াঃ ইড়ায়াস্তু বায়োঃ সংক্রমনং তু যৎ
তদুত্তরায়ণং প্রোক্তং মূনে বেদান্তবাদিভিঃ।
ইড়ায়াঃ পিঙ্গলায়াং তু প্রাণসংক্রমনং মুনে
দক্ষিণায়ানমিত্যুক্তং পিঙ্গলায়াং ইতি শ্রুতিঃ।
ইড়া পিঙ্গলয়োঃ সন্ধিং যদা প্রাণঃ সমাগতঃ
অমাবস্যা তদা প্রোক্তা দেহে দেহভৃতাং বরঃ॥

অর্থাৎ পিঙ্গলা নাড়ী হতে যখন বায়ু ইড়ায় গমন করে, সেই সময়কে উত্তরায়ণ বলে, বিপরীত অবস্থানের নাম দক্ষিনায়ণ। আর যখন ঈড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে বায়ু অবস্থান করে, তখন তার নাম হয় অমাবস্যা।

এই তপোভূমির প্রভাবে স্বাভাবিকভাবে তোমার প্রাণবায়ু ইড়া পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে অবস্থান করছে, শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি লক্ষ্য কর, আমার কথার সত্যতা উপলব্ধি করতে পারবে। স্থির হয়ে লক্ষ্য কর। কয়েক সেকেণ্ড পরেই বললেন — এখন বুঝতে পারছ ত? তাই তখন বলছিলাম যে এখন অমাবস্যা চলছে। ধর, কোন সময় যদি লক্ষ্য কর যে ঈড়া পিঙ্গলার সন্ধিস্থলে প্রাণবায়ুর স্থিতি নাই, তাহলে এই ছোট ক্রিয়া দেখিয়ে দিচ্ছি (ক্রিয়াটি দেখালেন) — এই অনুষ্ঠান করলে সহজেই প্রাণবায়ু, ঈড়াপিঙ্গলার সন্ধিস্থলে পৌঁছে যাবে। সিদ্ধাসনে বসেই সমূহ ক্রিয়া আদ্যন্ত অনুষ্ঠান করতে হয়। মন্ত্র জপ বা যে কোন ক্রিয়ার সাধনা, প্রাণবায়ুকে এই যৌগিক অমাবস্যা ক্ষণে না এনে অনুষ্ঠান করতে নাই, করলে তাতে সিদ্ধিলাভ সুদূর পরাহত। এই গুহ্য যৌগিক কৌশল না জেনেও যদি কাউকে সিদ্ধ হতে দেখে থাক, তাহলে বুঝবে সেই ভাগ্যবান সাধক পূর্বজন্মার্জিত তপস্যার ফলে অজ্ঞাতসারেই এই অমাবস্যার ক্ষণে দৈবাৎ জপ-তপের অনুষ্ঠানে বসে গেছলেন।

প্রলয়দাসজী আমাকে বলে চলেছেন — আর একটি কথা ভাল করে বুঝে রাখ যে প্রাণবায়ু যখন মূলাধারে প্রবেশ করে তখন তাকে আদ্যবিষুব এবং যখন পুনরাবর্তন করে তখন তাকে অন্ত্যবিষুব বলা হয়। তদ্‌যথা —

মূলাধারে যদা প্রাণঃ প্রবিষ্টঃ পণ্ডিতোত্তম
তদাদ্যং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈঃ তাপসোত্তম।
প্রাণসংজ্ঞো মুনিশ্রেষ্ঠ মূর্ধ্বানং প্রাবশৎ যদা
তদন্ত্যং বিষুবং প্রোক্তং তাপসৈস্তত্ত্বচিত্তকৈঃ॥

ঐ অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রেই অর্থাৎ প্রাণবায়ু যখন মূর্ধাদেশে প্রবেশ করে তখন ওঁকার সাধনা করলে বিশ্বব্যাপ্ত ওঁকাররূপী পরমব্রহ্মার দর্শন মেলে।

তাঁর ছোট একটি কমণ্ডলু আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন — তোমার সামনে যে হোমাগ্নি জ্বলছে, আমি মন্ত্র উচ্চারণ করে তাতে ঘৃতাহুতি দিচ্ছি, এই অনির্বাণ হোমাগ্নি মন্ত্রবলে প্রজ্বলিত করেছিলেন আমার গুরুদেব আচার্য বিজ্ঞানভিক্ষু। তদবধি এই অগ্নি জ্বলে আসছে। আমার সঙ্গে মন্ত্রোচ্চারণ করে ঘি ঢালতে থাক। বল —

১। ওঁ অগ্নিদূতং বৃনীমহে হোতারং বিশ্ববেদসম্।
অস্য যজ্ঞস্য সুক্রতুম্।

২। ওঁ প্রাণাপান ব্যানোদান সমানা মে শুদ্ধ্যন্তাম্
জ্যোতিরহং বিরজা বিপাপ্‌মা ভূয়াসং স্বাহা॥
৩। ওঁ য আকাশে তিষ্ঠন্ আকাশদন্তরো যমাকাশো ন বেদ,
যস্যাকাশঃ শরীরঃ য আকাশমন্তরো যময়তি এয ত
আত্মা অন্তর্যামী অমৃতঃ তস্মৈ নমঃ পরমাত্মনে স্বাহা॥

আমি তাঁর কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে মন্ত্রগুলি উচ্চারণ করে ঘৃতাহুতি দিলাম। উভয়ের সমস্বরে উচ্চারিত মন্ত্রের ব্যঞ্জনায় এক অদ্ভুত পরিমণ্ডলের সৃষ্টি হল। কোথা থেকে যে এত সুগন্ধি ভেসে আসছে বুঝতে পারলাম না, অথচ ধূপধুনা কোথাও জ্বালা হয়নি। হোমাগ্নির প্রভাবে আমার সারা সত্ত্বা জুড়ে একটা মধুর আবেশের ঢল নেমেছে, আমার প্রাণবায়ু রসাবেশে ঊর্ধ্বপথে উঠছে, তা বেশ অনুভব করতে পারছি।

তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়ে বললেন — তোমার বাবা তোমাকে যে বীজমন্ত্র দিয়েছিলেন তা তোমাকে উচ্চারণ করতে হবে না, আমি বলছি, শোন। তোমাকে এই অবস্থায় 'হাঁ' বা 'না' কিছুই বলতে হবে না, তুমি শুধু শুনে যাও। মনে ভালভাবে গেঁথে নাও যে আবির্ভাবের কারণকে 'বীজ' এবং প্রতিষ্ঠার কারণকে 'মূল' বলে। যে মন্ত্র জপ করলে বর্ণশক্তি প্রভাবে হৃৎপদ্মে দেবতার আবির্ভাব ঘটে, তাঁকে বীজমন্ত্র বলে এবং যে মন্ত্রের প্রভাবে ঐ স্থানে দেবতা স্থিতিলাভ করেন, তাঁর নাম — মূলমন্ত্র। তোমার পিতৃদত্ত মহাবীজের মধ্যে এই বর্ণটি .... মূলমন্ত্র। আমার মাথাটাকে উল্টোদিকে চিৎ করিয়ে যেখানে ভাঁজ বা টোল খেল, সেখানে একটা টোকা দিয়ে বললেন—এই স্থানটি হল আজ্ঞাচক্র, যোগীর প্রকৃত হৃদয়, ইতর যোগীরা বুকের মধ্যস্থলকে ভুল করে হৃদয় বলে থাকেন। এইখান থেকে সুষুন্না নাড়ীর দুটি শাখা ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে প্রবাহিত হয়ে গেছে। এর একটি শাখা কপালের মধ্যে গিয়ে আবার ঊর্ধ্বদিকে বাঁক নিয়েছে — তার নাম অপরা সুষুন্না, আর যে শাখাটি মস্তিষ্কদেশের তলায় গিয়ে বিভূতি দ্বারে ঠেকেছে, তার নাম উত্তরা সুষুন্না। এই উত্তরা সুষুন্নাতে মূলমন্ত্র জপ করতে থাক কিংবা এই যে আমি ক্রিয়াটি দেখিয়ে দিচ্ছি, এই ক্রিয়াটির অনুষ্ঠান করতে থাক, আপনা হতেই প্রাণবায়ু মূর্ধ্বাদেশে প্রবেশ করে, অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রে ওঁকারের টঙ্কার তুলবে। আর একবার তিনি ক্রিয়াটি দেখিয়ে দিলেন।

ধীরে ধীরে আমি তলিয়ে যেতে লাগলাম, সত্বার গভীরে ডুবে গেলাম। মনে হল আমার শরীর হতে আমি পৃথক হয়ে পড়ছি এবং আমি ক্রমে বৃহৎ হতে বৃহত্তর হতে হতে আকাশব্যাপী হয়ে পড়লাম। সর্বত্র জ্যোতির অথৈ পাথার, সর্বত্র ওঁকারের ধ্বনি, ধ্বনি পরিবর্তিত হল অগ্নিতে। এ কি রকম অগ্নি? এত স্নিগ্ধ, এত মধুময়! ওঁ অয়মগ্নি সর্বেষাং ভূতানাং মধু। অস্য অগ্নে সর্বাণি ভূতানি মধু। যশ্চায়মস্মিন্ অগ্নৌ তেজোময়ঃ অমৃতময়ঃ পুরুষঃ। অয়মেব সঃ —
সোহয়মাত্মা ইদং ব্রহ্ম অমৃতমিদং সর্বং স্বাহা॥

যখন চেতনা এল, ধীরে ধীরে চোখ খুললাম। সামনেই দেখলাম সেই হোমকুণ্ডের অগ্নি জ্বলছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি সূর্যকিরণে সমগ্র তপস্থলী উদ্ভাসিত, নর্মদার জল, পাহাড়, গাছপালা, আমার সম্মুখস্থ হোমাগ্নি সর্বত্র যেন ওঁকারের বাজনা বাজছে, অসহ্য পুলকে মন ভরে আছে। আনন্দের নেশায় আবার চোখ বন্ধ করলাম। প্রলয়দাসজী সামনে উপস্থিত হয়ে বললেন — ব্যস্ করোজী, ঔর উন্‌কী রস লেনেকা জরুরৎ নেহি। উঠিয়ে, আপকা পাঁজিকো হিসাব মেঁ, আজ বৈশাখ মাহিনা কা বার তারিখ, এতোয়ার (রবিবার)

হ্যায়, পরশোঁ শুক্রবারমেঁ সামকা বখৎ আপ ক্রিয়া মেঁ বৈঠে থে। আভি চলিয়ে নর্মদা মেঁ!

আমি হোমাগ্নি এবং তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি হোম কুণ্ডটিকে গুহার ভিতরে রেখে এলেন। নর্মদাতে নেমে অনেকক্ষণ ধরে স্নান করলাম। আজও পাহাড়ের গুহা মুখ দিয়ে নর্মদার জলে দুটো নারকেল এবং চার পাঁচটা কলা ভেসে এসেছে। প্রলয়দাসজী সেগুলো হাতে নিয়ে জলের মাঝখানে ছুঁড়ে দিলেন, বিড়বিড় করে বলতে লাগলেন — বাচ্চা দো রোজ কুছ খায়া নেহি। মায়ী ! আপ্‌কা কোঈ বিচার নেহি। আজভি ক্যা উনোনে নারিয়েল চিবাকর বীতায়েগা! তাঁর সঙ্গে স্নান করে উঠে ভগবান পতঞ্জলিদেব এবং যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদের গুহায় তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে এলাম। আজ একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করলাম উভয় গুহাভ্যন্তর হতে মেঘবিজড়িত ক্ষীণ সূর্যরশ্মির মত আলোর আভাস বাইরে এসে ঠিকরে পড়ছে।

প্রলয়দাসজীর গুহাতে পৌঁছে আমি বাইরে বসলাম। তিনি ভিতরে চেলে গেলেন, একটু পরে বাইরে এসে আমার সামনে শালপাতায় ঢাকা একদলা চরু রেখে খল্‌খল্ করে হাসতে লাগলেন। কলকণ্ঠে বলতে লাগলেন — নর্মদামায়ী আপ্‌কো লিয়ে খানা রাখকে গিয়া। মা নর্মদে, তুমহারা সদৈব জয় হো। লেও, খানা সুরু করো।

একখানা ছোট পুঁথির আমার হাতে দিয়ে বললেন এই বই যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ লিখিত 'অদ্বৈতানুভূতিঃ'। খাবার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম করবে। এই প্রদীপ থাকল এই প্রদীপ সন্ধ্যা হলে আপনা হতেই জ্বলে উঠবে, রাতভোর জ্বলবে। সকালে অরুণোদয় হলে আপনা হতেই নিভে যাবে। এই উত্তরঢালের কোণে একটি এবং পূর্বঢালে জঙ্গলের মধ্যে আরও দু'টি গুহা আছে। ওদিকে তুমি কোনমতেই যাবে না। এখান থেকে পশ্চিমঢালের পতঞ্জলির গুহা এমনকি দক্ষিণঢালের শৈলতট পর্যন্ত পদচারণ করতে পার। কোঈ ডর নেহি। কাল সবেরে ফিন্ ভেট হোগা।

এইবলে তিনি গুহার ভিতরে ঢুকে গেলেন।

আমি খেতে বসে শালপাতার ঢাকনা খুলে দেখি সেই চরু তখনও হাতে গরম লাগছে। দুধ চাল কিসমিস্ ও ঘি দিয়ে তৈরি খাবার যেমনই সুস্বাদু, তেমনি সুগন্ধি যুক্ত। খাবার পর নর্মদার জলে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। মৃগচর্মে শুয়ে শুয়ে 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' পড়তে লাগলাম।

বইটিতে মোট পঁচাশীটি শ্লোক। বইটির প্রথমেই আছে একটি দু'লাইনের মন্ত্র —

বিজ্ঞেয়োহক্ষরঃ সন্মাত্রো জীবিতঞ্চাপিচঞ্চলং
বিহায় সর্বশাস্ত্রাণি যৎ সত্যং তদুপাস্যতাম্।১

অর্থাৎ সত্যস্বরূপ অক্ষর পুরুষই একমাত্র বিজ্ঞেয়তত্ত্ব, নিত্যচঞ্চল এই অস্থির জীবনে সর্বশাস্ত্র পরিত্যাগ করে একমাত্র সেই সত্যেরই উপাসনা কর।

তার পরেই দু' নম্বর শ্লোকে বলা হয়েছে—

যস্য প্রসাদাৎ অহমেব বিষ্ণুঃ ময্যেব সর্বং পরিকল্পিতঞ্চ
ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং তস্যাঙ্ঘ্রিযুগ্মং প্রণতোহস্মি নিত্যম্॥ ২

যাঁহার প্রাসাদে আমি হই বিষ্ণুরূপ,
আমাতে কল্পিত সব বিশ্বনাম রূপ।
আত্মরূপী গুরুদেব জানিবে নিশ্চয়,
প্রণাম তাঁহার পাদপদ্মে সবিনয়॥

অহমানন্দ সত্যাদি লক্ষণঃ কেবলঃ শিবঃ।
অনানন্দাদি রূপং যত্তন্নাহমত্তচলোহদ্বয়ঃ॥ ৩
আমি সদানন্দ স্বয়ং সত্যাদি লক্ষণ।
শিব শান্ত দ্বন্দ্বাতীত বিশ্ব বিলক্ষণ॥
অনানন্দ নহি মিথ্যা যেবা দৃশ্যময়।
অচল আনন্দ আমি অক্ষয় অদ্বয়॥ ৩
অক্ষিদোষাদ্যথৈকোহপি দ্বয়বদ্ভাতি চন্দ্রমাঃ
একোহপ্যাত্মাতথা ভাতি দ্বয়বন্মায়য়া মৃষা॥ ৪
একচন্দ্র চক্ষুদোষে দ্বৈতভান তায়।
তথা আত্মা এক দ্বৈত মায়াতে দেখায়॥ ৪
অক্ষিদোষবিহীনানামেক এব যথা শশী।
মায়াদোষবিহীনানাম্ আত্মৈকৈবস্তথা সদা॥ ৫
চক্ষুদোষ নাশে যথা এক চন্দ্রা ভাসে।
মায়ার বিলয়ে এক চৈতন্য প্রকাশে॥ ৫

পুঁথিটির শেষে লেখা আছে — ইতি শ্রীমৎভগবৎ পূজ্যপাদ গোবিন্দপাদাচার্য — পরিব্রাজব —পরমহংসস্বামিবিরচিতাদ্বৈতানুভূতিঃ সমাপ্তা॥ ওঁ তৎসৎ ওঁ। এই বুঝলাম, পুঁথিটি আচার্য গোবিন্দপাদের স্বহস্ত লিখিত নয়। মূল পুঁথি হতে এটা হয়ত ভূর্জপত্রে কপি করা হয়েছে। তাঁর নিজের হাতের লেখা হলে কখনই পুঁথির শেষে 'শ্রীমৎভগবৎ পূজ্যপাদ' প্রভৃতি শব্দ প্রয়োগ করতেন না। হয়ত প্রলয়দাসজীর নিজের হাতের লেখা। পুঁথির মর্ম অনুধ্যান করতে করতে আমি বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙতেই গুহার বাইরে বেরিয়ে এলাম। বেলা শেষ হয়ে আসছে। বড় গাছপালা এবং লতাবিতানে ছায়া ক্রমশঃ ঘনীভূত হচ্ছে। আস্তোন্মুখ সূর্যের ম্লান আলো পড়েছে সামনের নর্মদা বক্ষে।

আমি তট ধরে বেড়াতে লাগলাম। পাহাড়ের বায়ুকোণে আমাদের গুহা। আমি পশ্চিমঢালের শৈলতট ধরে যেখানে ভগবান পতঞ্জলিদেবের গুহা সেই নৈঋত কোণের দিকে হাঁটতে লাগলাম। সেই গুহা এবং গোবিন্দপাদজীর গুহাকে যুক্তকরে প্রণাম জানিয়ে এসে তট ধরে হাঁটতে লাগলাম উত্তরঢালের ঈশান কোণের দিকে। সেখানেও একটি গুহা দেখতে পাচ্ছি, গুহার কাছে পৌঁছাতে আর হয়ত বিশ-পঁচিশ ফুট বাকী আছে, এমন সময় পূর্বঢালের প্রান্ত হতে বাঘের বিকট হুঙ্কার শুনতে পেলাম। সেই গর্জনে যেন সমগ্র তপস্থলী কেঁপে উঠলো। আমি ভয়ে পাথরের উপর বসে পড়লাম। আমার বুকের মধ্যে গুরগুর করছে, সমস্ত শরীর কাঁপছে। মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁকারেশ্বর ঝাড়িতে লাখড়াকোটের জঙ্গলে আমি বাঘের ডাক অনেকবার শুনেছি, 'সন্তশিরোমণি' পাতিরামকে বাঘে টেনে নিয়ে গেল তাও নিজের চোখে দেখেছি কিন্তু এত কাছ হতে বাঘের আকাশভেদী হুঙ্কার এর আগে শুনিনি। আমি চোখ বন্ধ করে বাবাকে স্মরণ করছি, সহসা মনে পড়ল, আমাকে এদিকে আসতে প্রলয়দাসজী নিষেধ করে গেছেন। তিনি বলেছেন, হিংসাশূন্য এই তপোবনে কোন হিংস্র শ্বাপদ নাই। বুঝলাম, তাঁর নিষেধবাক্য ভুলে গেছলাম বলেই এই ভয়ঙ্কর দৈবসংকেত আমাকে সাবধান করে দিল! আমি ঐ তিনিটি গুহা এবং গুহাবাসীদের উদ্দেশ্যে প্রণাম

জানিয়ে নিজেদের গুহার দিকে ফিরে হাঁটতে লাগলাম। গুহাতে পৌঁছে দেখি প্রলয়দাসজীর সেই প্রদীপ সন্ধ্যা হওয়া মাত্রই জ্বলে উঠেছে!

আমি এক কমণ্ডলু জল ঢক্‌ঢক করে গিলে ফেললাম। চুপ করে ঘন্টাখানিক শুয়ে থেকে উঠে বসলাম। সন্ধ্যা রাত্রিকেই মনে হচ্ছে নিশুতি রাত। কোথাও কোন শব্দ নাই, এই হাঁফধরা নির্জন পরিবেশও অপূর্ব শান্ত স্নিগ্ধ এবং সুরভিত হয়ে উঠেছে অলৌকিক দিব্য গন্ধে। মনে হচ্ছে যেন কাছাকাছি কোথাও হাজার হাজার গোলাপ, রজনীগন্ধা, শিউলী কিংবা কুন্দফুল ফুটে আছে। আমি নর্মদার ঘাটে সাবধানে নেমে হাত মুখ ধুয়ে এলাম। প্রলয়দাসজীর নির্দেশিত পন্থায় মুর্ধাদেশে অন্ত্যবিষ্ণুব ক্ষেত্রে ওঁকারতত্ত্ব মননে উদ্যোগী হলাম। ধীরে ধীরে ডুবে গেলাম ক্রিয়াতে, সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্নায়ু শিরার মধ্যে মধুর আবেশ, রসাবেশের স্ফুরণ হচ্ছে, বেশ অনুভব করতে পারছি। একটু পরেই মস্তিষ্ককোষে ওঁঙ্কারের টঙ্কার সুরু হয়ে গেল। শরীর থেকে আলাদা হয়ে যাচ্ছি। আমার শরীরের অনুরূপ আর এক শরীর বেরিয়ে এসে মূর্ধাদেশে ভেসে উঠল; জ্যোতির্ময় সেই শরীর আকাশ পথে উঠছে, তার মুখে উচ্চারিত হচ্ছে বজ্রগম্ভীর ওঁ-ওঁ-ওঁ।

কতক্ষণ যে এইভাবে কাটল তা আমি ধারণা করতে পারিনি। যখন চেতনা এল, তখন ধীরে ধীরে চোখ খুললাম, কিন্তু আনন্দের ঘোরে আবার চোখ বন্ধ করলাম। পুনরায় যখন চোখ খুললাম, তখন প্রথমেই বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি সর্বত্র চিদাগ্নির শিখা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছে। শিখার মধ্যে ছন্দে ছন্দে বেজে চলছে ওঁকারের বাজনা। বসে বসেই উঁকি মেরে দেখলাম পূর্ব ও পশ্চিমঢালের গুহামুখগুলো স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরে আছে। আবার জ্ঞান হারালাম।

ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ শব্দে জেগে উঠে দেখি প্রলয়দাসজী হাসতে হাসতে বলছেন — আটটা বেজে গেছে, কত বেলা হয়েছে দেখ, তুমি গুহামুখ ঘিরে এমনভাবে শুয়ে আছ যে, আধঘন্টা হল আমি গুহাতে ঢুকতে পারছি না। তুমি ক্রিয়াটি ভালভাবে শিখে নিতে পেরেছ দেখে আমি খুব খুশী হয়েছি। রাত্রি কেমন কাটল, বল। এই সিদ্ধস্থানে অলৌকিক কিছু চোখে পড়েছে কি?

— শেষ রাত্রিতে ক্রিয়ার শেষে দেখেছিলাম পতঞ্জিদেবের গুহা, গোবিন্দপাদজীর গুহা এবং পূর্বতটের গুহাতে জ্যোতির্ময় দীপ্তির প্রকাশ।

— ঠিকই দেখেছ। এখানকার সবগুহাতেই মহাতপা যোগেশ্বররা বিরাজিত আছেন।

— জ্যোর্তিময় দীপ্তি ছাড়া তাঁদের কাউকে ত দেখতে পেলাম না। দিনের বেলাতে ত গুহাগুলি লক্ষ্য করি, কোথাও ত কোন প্রাণের সাড়া পাই না।

— তুমি কি ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত সাংখ্যকারিকা পড়েছ? তাতে একটি শ্লোক আছে —

অতিদূরাৎ সামীপ্যাৎ ইন্দ্রিয়ঘাতাৎ মনোহনবস্থানাৎ সৌক্ষ্ম্যাৎ ব্যবধানাৎ
অভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ সৌক্ষ্ম্যাৎ তদনুপলব্ধির্নাভাবাৎকার্যতস্তদুপলব্ধেঃ॥

অর্থাৎ যা তোমার ইন্দ্রিগ্রাহ্য হচ্ছে, চোখে দেখতে পাচ্ছ না, তা নাই একথা বলতে পার না। কারণ ঃ (ক) অতিদূরে থাকলে, (খ) অতি নিকটে থাকলে (গ) কোন কারণে যেমন আধি-ব্যাধির কারণে ইন্দ্রিয় বিকল হলে (ঘ) মনঃসংযোগ না থাকলে (ঙ) দ্রষ্টব্য বস্তু বা ব্যক্তি বায়ুর ন্যায় সূক্ষ্ম হলে (চ) দ্রব্যান্তরের ব্যবধান থাকলে (ছ) সূর্যালোকে গ্রহনক্ষত্রাদির মত অন্য বস্তুর দ্বারা অভিভূত হলে (জ) জলে জল মিশ্রনের মত সমান আকার পেলে (ঝ)

কিংবা কেবলমাত্র সূক্ষ্ম যোগদৃষ্টির গোচর হলে, সাধারণ মানুষ পঞ্চেন্দ্রিয়ের মারফৎ তা বুঝতে পারে না।

এখন চল আমরা স্নান করে আসি।

স্নান ও তর্পণাদি শেষ করার পর তিনি বললেন — স্নান, তর্পণ, ইষ্টমন্ত্র জপ কিংবা বিশেষ কোন যোগাভ্যাসই নর্মদাতটে যথেষ্ট নয়। তুমি এই জলের ধারে সাষ্টাঙ্গ প্রণামের ভঙ্গিতে শুয়ে পড়ে ডান হাতটি জলে ডুবিয়ে রেবামন্ত্র ১০০৮ বার ভক্তিভরে জপ করতে থাক। আমি একটু পরেই আসছি।

তিনি কোথায় গেলেন জানি না, আমি তাঁর নির্দেশ মত সাষ্টাঙ্গে মাথা ঠুকতে ঠুকতে ১০০৮ বার রেবামন্ত্র জপ করলাম। জপ সেরে উঠে দেখি, তিনি পূর্বদিকের ঢাল, যেখানে গতকাল আমি ভয়ঙ্কর ব্যাঘ্র গর্জন শুনেছিলাম, তিনি সেই জঙ্গলাকীর্ণ গুহার দিক হতে উত্তরদিকে শৈলতট ধরে আমার কাছে এলেন। আমাকে চোখের ইশারায় তাঁকে অনুসরণ করতে বলে নিজেদের গুহা ছাড়িয়ে পশ্চিমঢালের আচার্য গোবিন্দপাদজীর বন্ধ গুহার মুখে এসে বসলেন। আমাকে প্রণাম করতে বলে নিজেও প্রণাম করলেন। প্রণাম করে উঠে বললেন — ভারত-ভাস্বর শংকরাচার্যের গুরু আচার্য গোবিন্দপাদের এটি সাধনগুহা, একথা তোমায় পূর্বেই বলেছি। যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদের গুরু ছিলেন গৌড়পাদ। আক্ষরিক অর্থে ঋষি বলতে যা বোঝায় গৌড়পাদ ছিলেন সেইরকম ঋষি, ক্রান্তদর্শী। তাঁর দুজন প্রিয় শিষ্য ছিলেন — একজন মালব দেশের এই যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ এবং অপরজন তোমাদের গৌড়দেশের শাক্ত বেদান্তী ব্রহ্মানন্দ ঠাকুর। আমরা গুরুপরম্পরা হতে জানি যে এঁরা উভয়েই শ্রী বিদ্যার উপাসক ছিলেন। তোমাকে যে এরণ্ডী সংগমে মন্মথেশ শিবমন্দিরে এরণ্ডী বিগ্রহ দর্শন করিয়েছি, সেই বিগ্রহ শ্রী বিদ্যার যন্ত্রের উপর অধিষ্ঠিতা আছেন। কাশীর অন্নপূর্ণা এবং জম্মুদেশস্থ বৈষ্ণোদেবীও শ্রী বিদ্যার যন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিতা। আচার্য শংকরও শৃঙ্গেরী মঠে শ্রী বিদ্যার যন্ত্র স্থাপন করে গেছেন। শ্রী বিদ্যার কৃপা ছাড়া শিবতত্ত্ব বা অদ্বৈততত্ত্বে প্রতিষ্ঠার কথাই বল আর যে কোন যোগসম্পত্তি লাভ করাই বল, তা কদাপি কারও পক্ষে সম্ভব নয়। বালক শংকরাচার্য গুরু অন্বেষণে বন পর্বত পাহাড় ডিঙিয়ে অভূতপূর্ব তীর্থ পরিক্রমা করতে করতে সুদূর দাক্ষিনাত্যের কালাডি গ্রাম হতে যখন নর্মদাতটের ওঁকার দ্বীপের এই সাধনগুহাতে এসে পৌঁছলেন, তখন গোবিন্দপাদজী সমাধিমগ্ন ছিলেন। শংকরপন্থী সন্ন্যাসী বহু অদ্বৈত বেদান্তমূলক গ্রন্থের টীকাকার আনন্দগিরিজীর মতে তখন নাকি (খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী) এই স্থানের নাম ছিল ব্যাঘ্রপুর। যাই হোক আচার্য শংকর গুহামুখে দাঁড়িয়ে সংস্কৃত শ্লোকে আচার্য গোবিন্দপাদের বন্দনা করতে লাগলেন এই বলে যে, পূর্বকালে আপনি অনন্তদেব ছিলেন, তারপর আপনি পতঞ্জলি হয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হন এবং এখন যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ রূপে আপনাকে দর্শন করে নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনি আমাকে কৃপা করুন। এই স্তুতিবাক্যে তুষ্ট হয়ে গোবিন্দপাদজী তাঁকে প্রশ্ন করেন — কস্ত্বম্ — তুমি কে?

এর উত্তরে দশটি শ্লোকে ব্যাখ্যা করলেন পরমাত্মা অর্থাৎ পরম 'আমি'র প্রকৃতি। এই দশটি শ্লোক 'দশশ্লোক' নামে বিখ্যাত। দশশ্লোকের সারমর্ম হল সংসারের সকল ক্রিয়ার পর যে সত্তা অবশিষ্ট থাকে তাই হল অদ্বৈতসত্তা। জাগ্রত অবস্থায় জগতের যে ক্রিয়া প্রত্যক্ষ হয়, স্বপ্নকালে তা তিরোহিত হয় আবার স্বপ্নাবস্থার কল্পনাজগৎ গভীর নিদ্রাকালে অন্তর্হিত হয়। কিন্তু তন্ময় ও মন্ময় এই দুই জগতের অবর্তমানেও সেই সত্তা সিদ্ধচিৎ অবস্থায় প্রোজ্জ্বল।

যখন সব লুপ্ত হয় তখনও এই সিদ্ধাচিৎ অবস্থা অর্থাৎ অহম্ সত্তা অনাহত থাকে। উপনিষদে এই চিরস্থির অপরিবর্তনীয় সত্তাকেই বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা আত্মা।

অদ্বৈততত্ত্বের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা শুনে গোবিন্দপাদ শংকরকে পরমহংস সন্ন্যাস ধর্মে দীক্ষিত করেন। গোবিন্দপাদজীর দীক্ষাবীর্য গুণে আচার্য শংকর নিজেই কেবল অদ্বৈততত্ত্বের উদ্ভাসিত চৈতন্য শিখরে উন্নীত হন নি, তিনি সমগ্র ভারতবর্ষে তৎকালীন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিপক্ষকে পরাজিত করে অদ্বৈতচিন্তার ঢল নামিয়েছিলেন। সেই অদ্ভুতকর্মা এবং অদ্ভুত মনীষার অধিকারী সন্ন্যাসীর অদ্বৈতচিন্তাকে কেন্দ্র করে সারা পৃথিবীতে প্রায় যাবতীয় প্রধান ভাষায় হাজার হাজার পুস্তক শিষ্য প্রশিষ্য ক্রমে লেখা হয়েছে। সে সম্বন্ধে আর নূতন করে কি পরিচয় দিব? সংক্ষেপে বলতে গেলে এক কথায় বলতে হয় অদ্বৈতবেদান্ত বললে শংকরাচার্যকে বুঝায় এবং শংকরাচার্য বললে অদ্বৈতবেদান্তকে বুঝায়। তবুও সত্যের খাতিরে আমি একথা বলতে বাধ্য যে, এই অদ্বৈতবেদান্তের পৃথক প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শংকরের পরমগুরু ঋষি গৌড়পাদ। তাঁর রচিত মাণ্ডুক্যকারিকা (খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দী) অদ্বৈতবেদান্তের সর্বপ্রাচীন প্রামাণিক গ্রন্থ, ভাষার প্রাঞ্জলতায় এবং ভাবের গভীরতায় মাণ্ডুক্যকারিকা পরবর্তী সকল বৈদান্তিক আচার্যদের হৃদয় জয় করেছে। যে রকম ভাবে উপস্থাপিত করলে বেদ ও শ্রুতি নিহিত অদ্বৈতবাদ তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে, তার প্রথম পথ প্রদর্শক ছিলেন আচার্য গৌড়পাদ। মাণ্ডুক্য উপনিষদকে ভিত্তি করে মাণ্ডুক্যকারিকায় গৌড়পাদ যে সকল কথা বলে গেছেন, শংকরাচার্য তাকে বিশদ রূপে সকলের নিকট উপাদেয় করে তুলেছেন। পরমগুরু রচিত মাণ্ডুক্যকারিকার এই অতুলনীয় ভাবসমৃদ্ধ তত্ত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন বলেই আচার্য শংকর গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ সর্বপ্রথম মাণ্ডুক্যকারিকার ভাষ্য লেখেন। এই ভাষ্যের সমাপ্তি শ্লোকে তিনি পরমগুরুর উদ্দেশ্যে বলেছেন — আচার্য গৌড়পাদ প্রাণিগণকে জন্ম-মৃত্যু রূপ হিংস্র জীবজন্তু সমাকুল ভীষণ সংসার সাগরে নিমগ্ন দেখে তাঁদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে বোধিরূপ মন্থনদণ্ডের সাহায্যে বেদবারিধি মন্থন করে দেবগণের দুর্লভ বেদান্ততত্ত্ব জ্ঞানরূপ সুধা আহরণ করেছিলেন। সেইজন্য পূজ্যগণেরও পূজনীয় সেই পরমগুরুকে তাঁর চরণে পতিত হয়ে প্রণাম করছি —

যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোহস্মি।

এস আমরাও আচার্য গৌড়পাদের উদ্দেশ্যে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি। উভয়ে প্রণাম করলাম। প্রণাম করে উঠেই তিনি বললেন — আমি নিজে শিবাদ্বৈতবাদের সমর্থক বা শৈবাগমতত্ত্ব আমার প্রাণের বস্তু বলে বলছি না, আমি গুরুপরম্পরাক্রমে নিশ্চিতভাবেই জানি যে আচার্য গৌড়পাদও শ্রীবিদ্যার উপাসক ছিলেন। ছান্দোগ্য উপনিষদের সপ্তম প্রপাঠকে পড়েছ ত — তস্মৈ মৃদিতকাষায়ায় তমসস্পারং দর্শয়তি ভগবান্ সনৎকুমারঃ —অর্থাৎ ভগবান সনৎকুমার যেমন রাগাদিদোষ হতে বিমুক্ত দেবর্ষি নারদকে অন্ধকারের পার দেখিয়েছিলেন, তেমনি আদ্যাশক্তি শ্রীবিদ্যাও যে সেইরকম শংকরাচার্যের পরমগুরুকে তমসাচ্ছন্ন সংসারের পরপারস্থিত ব্রহ্মানন্দের চরম ও পরম অনুভূতি দান করেছিলেন তা যেকোন তত্ত্বানুসন্ধিৎসু মাণ্ডুক্যকারিকার এই শ্লোকটি পরীক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন —

ন নিরোধো ন চোৎপত্তি র্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষু র্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥

অর্থাৎ যা ব্রহ্মানন্দে অবস্থান (পরমার্থতা) বলে অনুভূত হয় তাকে নিরোধ বলা যায় না

কারণ নিরোধের সময় অবিদ্যার্জনিত প্রতীতির সংস্কার বর্তমান থাকে। একে উৎপত্তি বলা যায় না অর্থাৎ এইবার ধর্মমেঘ সমাধি উদিত হচ্ছে এইরকম অবস্থান্তর প্রাপ্তিও নয়, এটি বদ্ধ অবস্থাও নয়; কারণ বন্ধমাত্রেই আপেক্ষিক জ্ঞান বর্তমান থাকে এবং চরম ব্রহ্মজ্ঞানে আপেক্ষিকতা কখনই থাকতে পারে না। আমি যদি পৃথিবীতে বদ্ধ হই, পৃথিবী যদি সৌরজগতে গ্রথিত থাকেন এবং সৌরজগৎ যদি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অংশবিশেষ হয়, তাহলে এই সমস্ত জ্ঞান কি আপেক্ষিক নয়? ব্রহ্মানন্দে স্থিত হলে সাধকের আপেক্ষিক জ্ঞান সম্ভবপর নয়, কারণ চরম ব্রহ্মজ্ঞানে উপাস্য উপাসকদের কোন সম্বন্ধই থাকতে পারে না। এই মুমুক্ষুর অবস্থা নয় কারণ দুঃখ সংস্কার না থাকলে জিহাসার (জয়ের ইচ্ছা) প্রবৃত্তিই হতে পারে না এবং চরম ব্রহ্মজ্ঞান কে কোথায় কিসের জন্য কাকে পরিত্যাগ করবে? এটি জীবন্মুক্তির অবস্থাও নয়, কারণ ব্যবহারিক দশায় জীবন্মুক্তের দ্বৈতভান অত্যন্ত বিগলিত নয় অর্থাৎ কিছু না কিছু দ্বৈতভান থেকেই যায়।

মাণ্ডুক্যকারিকার এই শ্লোক আস্বাদন করে বুঝতে পারছ আচার্য গৌড়পাদের তত্ত্বজ্ঞান এবং যোগসম্পদ কত উচ্চকোটির কিন্তু এহ বাহ্য। তুমি শুনে আনন্দ পাবে এবং গর্ববোধ করবে যে এই গৌড়পাদ তোমাদের গৌড়দেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন অর্থাৎ তিনি বাঙালী ছিলেন। তিনি যে বাঙালী ছিলেন তা শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য সুরেশ্বরাচার্যই স্বীকার করে গেছেন। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধির চতুর্থ অধ্যায়ে অদ্বৈত বিষয় বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন — এবং গৌড়ে দ্রাবিড়ৈর্ন পূর্বৈঃ অয়ম অর্থঃ প্রভাষিতঃ। অজ্ঞানমাত্রোপাধেঃ সন্নহমাদিদৃগীশ্বরঃ। অর্থাৎ ঈশ্বর পরমাত্মা হলেও তিনি যে অহংকারাদি অজ্ঞানোপাধির দ্রষ্টা, তা আমাদের পূর্বে গৌড় এবং দ্রাবিড় কর্তৃক সম্যকরূপে প্রকটিত হয়েছে। এই শ্লোক সম্বন্ধে 'চন্দ্রিকা' নামক টীকায় চিৎসুখাচার্যের গুরু জ্ঞানোত্তম আচার্য বলেছেন —'গৌড় কর্তৃক অর্থাৎ গৌড়পাদ আচার্য কর্তৃক এবং দ্রাবিড় কর্তৃক অর্থাৎ শংকরাচার্য কর্তৃক ।'

আচার্য শংকর জন্মেছিলেন কেরলে। কেরল দ্রাবিড় দেশের অন্তর্গত। একটি দেশের নামোল্লেখ করে তদ্দেশীয় কোন প্রসিদ্ধ লোককে নির্দেশ করার প্রথা সর্বজনস্বীকৃত। যদি বলা হয় এই কথা কৈলাস কর্তৃক সমর্থিত, তাহলে বুঝতে হবে তা কৈলাসপতি দেবাদিদেব কর্তৃক সমর্থিত, এই কথাই বক্তা বলতে চাচ্ছেন। কাজেই সুরেশ্বরাচার্য 'দ্রাবিড়ৈঃ' শব্দ ব্যবহার করে লক্ষণাতে শংকরাচার্যকেই লক্ষ্য করছেন, এ কথা বোঝা যায়।

টীকাকার জ্ঞানোত্তম আচার্যের এই সমীক্ষা যুক্তিপূর্ণ একথা স্বীকার করতেই হবে। তিনি একই শ্লোকের 'দ্রাবিড়ৈঃ' শব্দে অর্থ করলেন দ্রাবিড় দেশীয় শংকরাচার্য। কিন্তু একই বাক্যের 'গৌড়ৈঃ' শব্দে দেশ না বুঝিয়ে সরাসরি কেটি নির্দিষ্ট নাম উল্লেখ করলেন কেন? হয়ত ভারতের অত্যুজ্বল রত্ন এই মহামনি সদৃশ মনীষীকে গৌড়দেশবাসী বলতে কোন অজ্ঞাতকারণে তাঁর আপত্তি ছিল। টীকাকারের আপত্তি থাকলেও আমি তাঁরই সূত্র ধরে দেশের উল্লেখ করে সেই দেশের প্রসিদ্ধ শ্রেষ্ঠ মানুষকে সূচিত করার রীতি অনুয়ায়ী সুরেশ্বরাচার্য কর্তৃক ব্যবহৃত 'গৌড়ৈঃ' শব্দে 'গৌড়দেশীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত এবং শিবকল্প মহাযোগী গৌড়পাদকে স্মরণ করছি। মহাজ্ঞানী অতীশ দীপঙ্করের মতই গৌড়পাদও বাঙালী ছিলেন, মহাজ্ঞানী ছিলেন।

এখন চল আমরা নিজেদের গুহায় ফিরে যাই। গুহায় পৌঁছে আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে বসলাম, এটি যেন গুহার বর্হিবাটি ; তিনি গুহার ভিতরে চলে গেলেন; মিনিট দশেক পরেই গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আমার জন্য শালপাতায় ঢাকা খাবার রাখলেন। বললেন — লে

লেও বেটা, ইসকো পা লেও। বলেই এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না, ভিতরে চলে গেলেন। উপরের শালপাতা খুলে দেখি, পাতায় লাড্ডু এবং পায়েস আছে। খাওয়া শেষ করে, পাতাগুলো ফেলে এলাম গুহার পেছনে একটি খাদে। হাত মুখ ধুয়ে বসেছি , প্রলয়দাসজী গুহার মধ্য থেকে পুনরায় বেরিয়ে এলেন। তাঁর এক হাতে কয়েকখানা বালি কাগজ অন্য হাতে পাথরের দোয়াত ভর্তি কালি এবং একটা ফাগের কলম।

— ইস্‌মে গোবিন্দপাদজীকা 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' লিখ্ লো। ফিন্ সামকা বখত্ ভেট হোগা।

এই বলে তিনি ভিতরে চলে গেলেন। আমি কিছুক্ষণ মৃগচর্মের উপর গড়িয়ে নিলাম। কিছুক্ষণ বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, জেগে উঠে দেখি দুটো হরিণ গুহার সামনেই ঘুরে বেড়াচ্ছে। একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ভগবানের সৃষ্ট এই দুটি নিরীহ সুন্দর প্রাণীর দিকে। উঠে বসতে ইচ্ছা হচ্ছে না, পাছে তারা পালিয়ে যায়। কিছুক্ষণ পরে তারা আপনা হতেই পূর্বদিকে চলে গেল। আমি উঠে বসে 'অদ্বৈতানুভূতিঃ' টুকতে লাগলাম। আদ্যন্ত যখন টোকা হল, তখন মনে হল পাঁচটা বা সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। আমি বাইরে বেরিয়ে এসে বেড়াতে লাগলাম তট ধরে। গতকালকার অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়তে আজ আর পূর্বঢালের দিকে গেলাম না, ভগবান পতঞ্জলির গুহার দিকে হাঁটতে লাগলাম, দক্ষিণঢালেও গেলাম। মনে মনে ভাবছি, রামদাসজী আমাকে বারবার বলেছিলেন সাবধানে থাকবে, 'লু' না লেগে যায়। কিন্তু এখানে গরম কোথায়, পাহাড়ঘেরা জঙ্গলাবৃত এ বনস্থলীতে মনে হচ্ছে চিরবসন্ত বিরাজমান।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে দেখে প্রলয়দাসজীর গুহার দিকে ফিরলাম। গুহাতে এসে দেখি, মহাত্মা তাঁর সেই অদ্ভূত প্রদীপটি রেখে গেছেন, তা জ্বলছে। নর্মদাতে গিয়ে সান্ধ্য স্নান সেরে এসে চুপচাপ বসে থাকলাম। আজ বাবার কথা বিশেষ করে মনে পড়ছে। মেদিনীপুর জেলার এক পল্লীতে বসে তিনি কি করে বুঝেছিলেন যে তপোভূমি নর্মদার তটে তটে এত রোমাঞ্চকর রহস্য লুকিয়ে আছে। তাঁর দয়াতেই আমি আজ এখানে আসতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি।

পায়ের শব্দে চমকে উঠলাম। প্রলয়দাসজী সামনে এসে বসেছেন।

— পিতাজীকো আচ্ছিতরেসে স্মরণ মনন করিয়ে। অন্ত্যেবিষুব ক্ষেত্রমেঁ ওঁকারতত্ত্ব মনন করনেসে হি পিতাজীকো দর্শন মিলেগা। হরবখৎ আপ্ উনকা নজরমেঁ হ্যায়। পিতৃচিন্তাসেই শিবচিন্তা ★ হোতা হৈ। পিতা ঔর শিব দোনো বরাবর একই তত্ত্ব হ্যায়। আপ্‌ত হরবখৎ পিতাজীকো লিয়ে রোতে হ্যায়। হর আদমীকো জন্মদাতা পিতা সগুণ ব্রহ্মস্বরূপ হ্যায়। যব উনিকা দর্শনকা চাহ জ্যাদা হোগা, হম্, জো তরিক্কা দেখা দিয়া, উসী তরিক্কাসে উত্তরা সুষুম্নাকী তটপর চলা যাইয়ে, উত্তরা সুষুম্নাকী মহাতটকো আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণসে নর্মদামায়ীকা ধারা সমঝো। উধর আপকো মহাগুরুকো দর্শন মিলেগা।

— আপনি আশীর্বাদ করুন, আমি যেন পিতাজীর দর্শন পাই।

— হাঁ, হাঁ, মূর্ধামেঁ ওঁকারতত্ত্ব স্মরণ করো। দর্শন মিলেগা।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। তিনিও নীরবে বসে থেকে আমাকে কাঁদতে দিলেন কিছুটা ধাতস্থ হতেই পুনরায় বলে উঠলেন — মূর্ধামেঁ যব ওঁকারতত্ত্ব মনন করেগা বিচ্‌বিচ্‌মে

★ পিতাই যে শিব, সেই তত্ত্ব লেখক প্রণীত 'পিতরৌ' গ্রন্থে বিশ্লেষণ করা আছে।

পিতাজী ছোড়কে দুসরী কিসীকো দর্শনকী লালচ মৎ করো। ইহ্ বাত হরবখত ইয়াদ রাখিয়েগা। হম্ আশীর্বাদ দেতা হুঁ।

আবার তিনি নীরব হলেন।

কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম — শংকরাচার্য যে নির্বিশেষ পরব্রহ্ম তত্ত্বের উপর এত জোর দিয়ে গেছেন, তাঁর মতবাদ হতে উদ্ভূত বিবর্তবাদ তথা মায়াবাদের বিরুদ্ধে দ্বৈতবেদান্তীদের গ্রন্থ বিশেষতঃ দ্বৈতবাদীদের শিরোমণি অসাধারণ বিচারমল্ল ব্যাসরাজের 'ন্যায়ামৃত' পড়েছি, তাঁর মিথ্যাত্ব লক্ষণ-খণ্ডন, জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব খণ্ডন এবং বিশ্বপ্রপঞ্চের সত্যতা সাধন আমার কাছে খুবই উপাদেয় বলে মনে হয়েছে। শান্তশ্রীমণ্ডিত পবিত্র তপোবনে বসে আমি কোন বিচার বিতর্কমূলক প্রসঙ্গ উত্থাপন করতে চাই না। এই মুহূর্তে সে প্রবৃত্তিই আমার জাগছে না। আমি কেবল আপনার চরণতলে বসে জানতে চাই, অদ্বৈতবাদের তত্ত্ব যতই চরম পরম হোক না কেন, সাধারণ লোকে এই শুষ্ক তত্ত্বের চুলচেরা 'নেতি নেতি' বিচারে কতটুকু রস পাবে? আত্মস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য ভক্তিপথের কি কোন অবদান নাই?

— কে বলল যে নাই? আচার্য শংকর ত নিজেই বলে গেছেন —

ভক্তি প্রসিদ্ধা ভব মোক্ষনায়
নাত্র ততো সাধনমস্তি কিঞ্চিৎ।। (বিবেকচূড়ামণিঃ)

সাধনার সুরু ভক্তি দিয়ে, শেষও হয় ভক্তিতে। পরাভক্তি এবং পরাজ্ঞান একই মুদ্রার এপিঠ, ওপিঠ। এ সম্বন্ধে আচার্যের জীবনের একটি ঘটনা বলছি শোন। কাশীতে শংকরাচার্য যখন বাস করছিলেন, তখন একদিন সশিষ্যে পথ চলতে চলতে দেখলেন, একজন প্রবীণ পণ্ডিত তাঁর শিষ্যদেরকে পাণিনি ব্যাকরণের একটি কঠিন সূত্র ব্যাখ্যা করে বুঝাচ্ছেন। আচার্য তাঁর কাছে গিয়ে বললেন, ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ করার জন্য জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট না করে তাঁর উচিত ভগবৎ সেবা এবং শ্রীভগবানের মহিমা কীর্তন করা। এই বলে তৎক্ষণাৎ আচার্য সেই বৈয়াকরণকে গোবিন্দ স্তোত্র রচনা করে শোনাতে লাগলেন। বারটি শ্লোকের ভক্তি সুরভিত বারটি পুষ্পে অর্থাৎ বারটি শ্লোকে আচার্য এই মালাটি গাঁথলেন। এই মধুর সংস্কৃত গান 'দ্বাদশ মাঞ্জরিক স্তোত্র' নামে প্রসিদ্ধ। এই গানের ধুয়া — 'ভজ গোবিন্দ'। স্তোত্রটি অদ্বৈতবেদান্তের দর্পণ স্বরূপ। শ্রুতিমধুর এই স্তোত্রে তিনি বৈয়াকরণকে বোঝালেন — প্রভুর প্রতি ভক্তিমান হও। নশ্বর বস্তুর প্রতি আসক্তি মুক্তির পথে বাধা; নিত্যবস্তুর প্রতি ভক্তিই মুক্তির একমাত্র উপায়। সসীম পৃথিবীর উপকরণ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখবে এই চিন্তা ভ্রান্তিমূলক ! এ রকম মানুষ প্রকৃতপক্ষে মূঢ়মতি। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে ভগবৎ চিন্তা করব, এ চিন্তাও বিভ্রান্তিকর। যদি সারাজীবন ধরে অবিরাম ধ্যান ও ভক্তির রসসিঞ্চনে মনকে প্রস্তুত করে তোলা না যায়, তাহলে মানুষ মৃত্যু আসন্ন দেখে শেষ সময়ে তার মনকে ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত করতে পারে না।

বৈয়াকরণ তাঁকে মুক্তির সঠিক পথ কি জিজ্ঞাসা করায় শংকর বললেন — মঙ্গলের সংসর্গে মঙ্গল হয়। মঙ্গলস্বরূপ শিবচিন্তায় সাংসারিক অনিত্য বস্তুর প্রতি নিরাসক্তি জন্মে। নিরাসক্তি থেকে মোহমুক্তি। মোহমুক্তি থেকে অনন্যচিত্ততা এবং অনন্যচিত্ততাই জীবন্মুক্তি।

'প্রভুর প্রতি ভক্তিমান হও' — বৈয়াকরণের প্রতি এই উক্তিই কি প্রমাণ করে না যে,

আচার্য ভক্তিপথকে একেবারে উড়িয়ে দিতে পারেন নি? মুমুক্ষু সন্ন্যাসীকে তিনি নিষ্কল ব্রহ্মবাদের দীক্ষা দিলেও গৃহীদের বেলায় সবকুছ্ ঝুট্ হ্যায়' 'সব মায়া হ্যায়' — একথা বলে যান নি। তাই ত এই নিষ্কল নিরুপাধিক অদ্বৈতবাদীর কণ্ঠেও শোন গেছে অন্নপূর্ণা প্রশস্তি শিবাষ্টক, শোনা গেছে — ভজ গোবিন্দ, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।

শংকরাচার্যের সাক্ষাৎ শিষ্য প্রশিষ্যরা, তাঁর যে একাধিক জীবনীগ্রন্থ লিখে গেছেন, তা থেকেই তোমাকে আর একটি উদাহরণ দিচ্ছি। শিষ্যরা কল্পনার রং মিশিয়ে অনেক অলৌকিক কথা লিখে ফেলতে পারেন, তবে গুরু পরম্পরা যে ঘটনাটি শুনে আসছি এবং আমি নিজেও যে ঘটনাকে সত্য বলে জেনেছি, তা তোমাকে বলছি শোন!

একবার বারাণসীতে বাসকালে শংকর অতি প্রত্যুষে মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছিলেন, তখন দেখতে পেলেন এক যুবতী তার মৃত পতির মাথাটি কোলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করতে করতে শব সৎকারের জন্য সকলের কাছেই অর্থভিক্ষা করছেন। শবটি আড়াআড়িভাবে পথ জুড়ে থাকায় আচার্য থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সদ্যবিধবা সেই তরুণীকে তিনি বললেন — 'মা শবটি যদি একটু সরিয়ে নেন তাহলে আমি গঙ্গার ঘাটে গিয়ে নামতে পারি।' কিন্তু স্ত্রীলোকটি শোকে এতই আত্মহারা যে শংকরের কথার কোন জবাব দিলেন না। তিনি সমানে রোদন করে চলেছেন। বিপন্ন শংকর তাঁকে বারবার অনুনয় বিনয় করতে থাকলেন। অনেকক্ষণ পরে সহসা স্ত্রীলোকটি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলে উঠলেন — আপনিই শবটিকে সরে যেতে বলুন না? আপনার অনুরোধ শুনে তার অভিরুচি হলে নিজে সে একপাশে সরে গিয়ে আপনাকে পথ করে দিতে পারে!

শংকর তখন বললেন — মা শোকে কি আপনার মাথা খারাপ হয়ে গেল? শব নিজে কখন সরে যেতে পারে? তার আর কি কোন শক্তি আছে যে সরে যাবে?

— কেন সন্ন্যাসী! আপনি ত সর্বত্রই বলে বেড়াচ্ছেন যে শক্তিনিরপেক্ষ একমাত্র ব্রহ্মেরই জগৎকর্তৃত্ব! নিষ্কল নিরুপাধিক নির্গুণ এক ব্রহ্ম ছাড়া আর কেউ নাই! কিছু নাই! সবই মায়া!

সামান্যা রমণীর মুখে এইরকম কথা শুনে আচার্য স্তম্ভিত হলেন। মুহূর্তকাল পরেই দেখলেন, সেই রমণী আর শব সবই অন্তর্হিত হয়ে গেছে। বিস্ময়বিমূঢ় শংকর এই দৈবীলীলার রহস্য বোঝবার জন্য ধ্যানস্থ হতেই বুঝতে পারলেন, এই অলৌকিক লীলার নায়িকা স্বয়ং শ্রীবিদ্যারূপিনী অন্নপূর্ণা। তিনি অনুভব করলেন যে বিশ্বজুড়ে সেই আদ্যাশক্তি মহামায়ার চিৎশক্তি সবকিছুর মূলে। ভূলোক দ্যুলোক তাঁর কটাক্ষেই স্পন্দিত হচ্ছে। তিনি দরবিগলিত অশ্রু হয়ে সেই ভবগেহিনী শ্রীবিদ্যার স্তব করতে লাগলেন —

ঈষৎ স্বভাব কলুষা কতি নাম সন্তি ব্রহ্মাদয়ঃ প্রতিদিনং প্রলয়াভিভূতাঃ।
এক স এব জননি স্থিরসিদ্ধিরাস্তে যঃ পাদয়ো স্তব সকৃৎ প্রণতিং করোতি॥

সমস্ত দেবদেবীর স্বরূপ চিন্তা করলে তাঁদের কিছু না কিছু অপূর্ণতা চোখে পড়বে। এমন কি স্বয়ং ব্রহ্মাও প্রলয়কালে অভিভূত হয়ে পড়েন। চিন্ময়ী মাগো, একমাত্র তুমিই নিত্যজাগ্রতা নিত্যপূর্ণা। যদি একটিবার কেউ তোমার এই মহিমা স্মরণ করে চরণকমলে প্রণত হয় এবং শরণাগত হয়, তাহলে তোমার কৃপা কটাক্ষে সে সকল সিদ্ধিই লাভ করে থাকে।

এইবার মহাত্মা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন — এবার ক্রিয়ায় বস। আমি গুহাতেই থাকলাম,

সকালে যথাসময়ে দেখা হবে।

তিনি গুহার অভ্যন্তরে ঢুকে গেলেন । আমি কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলাম । বাইরে নীরন্ধ্র অন্ধকার, গাছপালা কিছু দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আজও গত দুদিনের সুগন্ধ ভেসে আসছে। জানি না, এই পর্বতকন্দরে কোথাও কোন অজানা ফুল ফুটেছে তারই সৌরভ ভেসে আসছে কিনা। আবার এও হতে পারে এই সিদ্ধ তপস্থলীতে যদি কোন মহাত্মা আমার অজ্ঞাতসারে তপোমগ্ন থাকেন, এ তাঁর বা তাঁদের অঙ্গসৌরভও হতে পারে। আর যদি বাস্তবিক কোন ফুলই হয়ে থাকে , তাহলে অন্ধকারের মধ্যে নির্জন আকাশতলে তার এই প্রাণঢালা আত্মনিবেদন নিশ্চয়ই ব্যর্থ নয়। আমরা ত কৈ এভাবে নিজেদেরকে সম্পূর্ণভাবে প্রভুর চরণে ঢেলে দিতে পারি না! আমি গুহার বাইরে এসে প্রদীপশিখার আলোকবিচ্ছুরিত পথে সাবধানে পা ফেলে ফেলে নর্মদার ঘাটে নামলাম। নর্মদা স্পর্শ করে এসে প্রণাম করলাম তপোবনস্থ মহাপুরুষদের উদ্দেশ্যে। চারিদিকে তাকিয়ে এই নির্জন অরণ্যানির স্থির গম্ভীর শোভা দৃষ্টির প্রদীপে অনুভব করতে লাগলাম। উপরে ঝক্‌মকে তারা ছিটানো আকাশ, চার ধারেই শৈলশ্রেণী, বড় বড় বনস্পতি, মাঝে মাঝে দু-একটা রাতজাগা পাখীর ডাক; সর্বোপরি একটা গহন গভীর রহস্য যেন এই রাত্রে এই বনভূমির অঙ্গে অঙ্গে মাখানো। এমনি রাত্রি শোয়ার জন্য নয়, ভাবুক কবি বা নিছক প্রকৃতি পূজারীর মত শুধুই সৌন্দর্য সন্দর্শনের জন্যও নয়, তপোবন তপস্যার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। যাই গিয়ে ক্রিয়াতেই বসি । গুহামুখে ঢোকার পূর্বে অভ্যাস বশে ভগবান পতঞ্জলির গুহার দিকে দৃষ্টি পড়তেই রোমাঞ্চিত হলাম, এ কি ? কি দেখছি আমি? দেখছি আমার প্রাণের দেবতা বাবা নামাবলি গায়ে জড়িয়ে যেমন ভাবে ঠাকুর ঘর থেকে পূজা ও চণ্ডীপাঠ সেরে বেরিয়ে আসতেন, সেইভাবেই সেই একইভাবে বাবা পশ্চিমঢাল ধরে হাসতে হাসতে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন। যে শরীর একদিন আমার চোখের সামনে চিতানলে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, সেই শরীর এখন এখানে থাকবে কি করে? এ কি আমার দৃষ্টিভ্রম? চোখ দুটো একবার রগড়ে নিলাম, কিন্তু না বাবাই এগিয়ে আসছেন, তাঁর তপোক্লিষ্ট দেহ, সেই প্রশস্ত ললাট, দীপ্তিময় আয়ত চক্ষু, কাঁধে লম্বমান শুভ্র উপবীত.....আমি জ্ঞান হারালাম, আমি এখন আলোর রাজ্যে, মনে হচ্ছে চারিদিকে জ্যোতির ঢল নেমেছে। ক্রমেই সেই জ্যোতি ঘনীভূত হয়ে বাবার অবয়ব ধারণ করল।

গায়ে যেন কার স্পর্শ অনুভব করছি , আঠা দিয়ে কেউ যেন আমার চোখ দুটোকে এঁটে দিয়েছে, কিছুতেই চোখ খুলতে পারছি না। কানে শুনতে পাচ্ছি, কেউ যেন আমার পিঠে হাত দিয়ে বলছেন — আরে তুম্ ইধর ক্যায়সে আ গিয়া? আমার গা থেকে জ্যোতির ধারা ধীরে ধীরে যেন ভাঁটার টানে তর তর করে নেমে যাচ্ছে।জ্যোতি দ্রুত অদৃশ্য হয়ে গেল। চোখের সেই আঁটোসাটো জমাট ভাব আর নেই। প্রলয়দাসজী আমাকে ধরে সোজা করে তুলে বসিয়ে দিলেন। চোখ খুলে দেখি, সম্মুখের শৈলচূড়ার অন্তরাল হতে বালসূর্য নিজের মহিমায় ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে, পর্বতের বড় বড় শিখরগুলোতে কেউ যেন সিঁদুর আর সোনার রেণু ছড়িয়ে দিল। যেদিকে চাই সেদিকেই চোখে পড়ছে অজানা কোন আকাশপরীর অদৃশ্য হস্তের ইন্দ্রজাল। বড় সুন্দর বড় সার্থক এই তপোবনের সুস্নিগ্ধ প্রভাত। প্রলয়দাসজী আমার হাত ধরে গুহার মধ্যে এনে মৃগচর্মের উপর বসিয়ে দিলেন। আমার শরীর খুব হাল্কা মনে হল। মনে হল আমার শরীর যেন তুলার মত হয়ে গেছে, মহাত্মা যে হাত ধরে আমাকে

গুহার মধ্যে আনলেন, আমার পা যেন পাথরের উপর পড়েনি বলেই মনে হল। আমি বাবাকে দেখেছি, তাঁর স্থূল শরীর এবং সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় শরীর প্রত্যক্ষ করেছি, অনাস্বাদিত পূর্ব আনন্দের স্রোত বইছে শরীরে । প্রলয়দাসজী বললেন চুপচাপ বৈঠো, আনন্দকী রস লেতে রহো। আমি একটা গাছের পাতা আনছি। রাত্রি ৯টা নাগাদ তোমার পিতাঠাকুরকে দর্শন করে তুমি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে গেছলে পাথরের উপর। তোমার চোখ মুখ থেঁতো হয়ে গেছে ; চাপ চাপ রক্ত জমে মুখ, নাক ও কপাল ঢেকে গেছে। তোমার এই পিতৃদর্শন সম্বন্ধে লৌকিক অলৌকিকের কোন প্রশ্ন তুলো না। সাধারণ লৌকিক শক্তি ও বুদ্ধির বাইরে যা তাকেই অলৌকিক বলা হয়। লৌকিক জগৎ যেমন সত্য, আলৌকিক জগৎও তেমনি বাস্তব সত্য। তোমার পিতাঠাকুর দেহধারণ করেও বিদেহ ছিলেন, লোকবাসী হয়েও লোকোত্তর ছিলেন। জীবন্মুক্ত পুরুষরা বিদেহ হয়েও দেহধারন করতে পারেন, লোকোত্তর হয়েও লোকবাসীরূপে নিজেকে প্রকট করতে পারেন । এই যোগবিজ্ঞানের সূক্ষ্ম রহস্য পরে ধীরে ধীরে জানতে পারবে। তোমার মনের ব্যাকুলতার জন্য তিনি তোমাকে স্বেচ্ছায় দর্শন দিয়ে গেলেন। আমি গাছের পাতা আনতে যাচ্ছি ।

এই বলে তিনি চলে গেলেন। পাঁচ সাত মিনিট পরেই কয়েকটা পাতা হাতে নিয়ে এসে বললেন, তোমার মুখে নাকে হাত দিয়ে দেখ ত একবার। হাত বুলাতেই দেখলাম, কালো রক্ত হাতে লাগলো, নাকটা খুব ব্যথা মনে হল। তিনি আমারই কমণ্ডলুর জলে পাতাগুলো ধুয়ে থেঁতো করে তার রস মুখে নাকে লাগিয়ে দিয়েই বললেন — এইবার আর একবার হাত বুলিয়ে দেখ ত ? দেখ, হাতে আর রক্তও লাগছে না, ব্যথাও সেরে গেছে! এখন শুয়ে থাক। পারলে ঘুমিয়ে পড়। এই বলে গুহার ভিতরে চলে গেলেন।

ঘুমাবার চেষ্টা করলাম, ঘুম কিন্তু হল না , গুহার মুখে বসে আমি পতঞ্জলির গুহার দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলাম, কাল রাতে ঐ পথ দিয়েই বাবাকে আসতে দেখেছিলাম, আমার এই অপার সৌভাগ্যের তুলনা কোথায় যেখানে আমার বাবার পদরজঃ পড়েছে সে পথে গোড়ালুটি খেতে ইচ্ছা হয়। আমি দণ্ড দিতে দিতে পশ্চিমঢালের দিকে এগোতে লাগলাম। দণ্ড কাটতে কাটতেই মনে হল কারও দিব্যপ্রকাশ যখন ঘটে সেখানে পদরজঃ পড়বে কি করে? চুলোয় যাক এই জ্ঞানবিচার, scepticism (সংশয় বাক্য) এর টুঁটি চেপে আমি দণ্ড কাটতে কাটতে গোবিন্দপাদজীর গুহা পেরিয়ে ভগবান পতঞ্জলির গুহাদ্বারে গিয়ে মাথা ঠুকতে লাগলাম। প্রণাম করে দাঁড়াতেই সূর্যের প্রসন্ন কিরণ আমার মুখে চোখে যেন স্নিগ্ধ পরশ বুলিয়ে দিল।

আমি হাত জোড় করে সূর্যবন্দনা আরম্ভ করলাম —

ওঁ হিরণ্যপাণিমূর্তয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে। স চেত্তা দেবতা পদম্ ওঁ॥

(ঋ ১/২২/৫)

আজকে এস মোদের মাঝে স্বর্ণপানি হে সবিতা ।
রক্ষা কর মোদের তুমি পরমপদের জ্ঞাপয়িতা॥

আমার মন্ত্রধ্বনি শেষ হতে না হতেই দেখি প্রলয়দাসজী তাঁর গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দ্রুত আমার দিকে আসতে আসতে বলছেন — ঔর ভি বলো। হম্ ছে নম্বর ঋক্ বলতা

হুঁ, মেরে সাথ কণ্ঠ মিলাও, ইহ হ্যায় মেধাতিথি দৃষ্ট মন্ত্র, গায়ত্রী ছন্দমেঁ ইহ্ বেদমন্ত্রকো স্ফূর্তি ঘটেগা। তুমহারা কণ্ঠস্বরমে থোড়া দোষ হ্যায়। বলো হম্ যিস্ ঢংসে বোলরহা হুঁ —

ওঁ অপাংনপাতমবসে সবিতারমুপস্তুহি। তস্য ব্রতান্যুশ্মসি ওঁ।।
স্তুতি করি আমরা আজি অপাংনপাৎ★ সবিতারি
ব্রত তাঁহার ভিক্ষা করি তিনিই মোদের রক্ষাকারী।।
ওঁ বিভক্তারং হবামহে বসোশ্চিত্রস্য রাধসঃ। সবিতারং নৃচক্ষসম্ ওঁ।।
হবন করি সবিতারি নরলোকের চক্ষু যিনি।
বিচিত্র ও রমণীয় বিভাগ করেন ধন যে তিনি।।
ওঁ সখায় আ নিষীদিত সবিতা স্তোম্যো নু নং। দাতা রাধাংসি শুম্ভতি ওঁ।।
ঐ যে শোভেন সবিতৃদেব অভীষ্ঠ ধন দেবার লাগি
- শীঘ্র এস হে সখাগণ স্তোত্রে তাঁহার কৃপা মাগি।।

প্রলয়দাসজীর কণ্ঠ স্তব্ধ হল, আমি সূর্যপ্রণাম করে পাশেই তাঁর দিকে তাকিয়ে দেখি , তাঁর শরীরের চারিদিকে একটি জ্যোতির্মণ্ডল সৃষ্টি হয়েছে। সূর্যকিরণকে ছাপিয়ে একটা আভা (Aura) ছড়িয়ে পড়েছে। স্তব্ধ বিস্ময়ে আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। রামদাসজী বলেছিলেন প্রথম যেদিন আমি একে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে ওঁকার মাহাত্ম্য পড়ে শোনাচ্ছিলাম সেদিন তিনিও নাকি এঁর সিদ্ধ অঙ্গের চারপাশে আভার বিচ্ছুরণ দেখেছিলেন। এই দেব মানবকে আমি যতই দেখছি ততই আমি অবাক হচ্ছি। কিছুক্ষণ পরে তাঁর শরীরে স্পন্দন দেখা গেল। আমি হাত ধরে গুহায় নিয়ে এলাম।

একটুখানি আমার কাছে বসে তিনি গুহার ভিতরে গেলেন। আমি বসে বসে ভাবতে লাগলাম, আমরা মুখে বলি বেদমন্ত্র চিন্ময় , কিন্তু তার অমোঘ কার্যকারিতা অনেক সময়ই উপলব্ধি করতে পারি না। আমরা বেদমন্ত্র মুখে উচ্চারণ করি মাত্র, কিন্তু তা কেবলই উচ্চারণ মাত্র। নির্দিষ্ট ছন্দে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করলে তবেই বোঝা যায়, প্রত্যেকটি বেদমন্ত্রই গান — মহাসঙ্গীত। সেই সঙ্গীত আজ শুনে আমি ধন্য হলাম। দু'একদিনের মধ্যেই হয়ত এই রহস্যময় মানুষটির কাছ হতে চলে যেতে হবে, জীবনে হয়ত আর দেখা হবে না । আর আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র লোককে ইনি স্মরণ করবেন এ চিন্তা করাও আমার পক্ষে বাতুলতা।

— কেঁও আপ্ 'বাতুল আতুল' শোচতে হো! চমকে উঠেছি তাঁর কথায়, গুহাভ্যন্তর থেকে বেরিয়ে তিনি আমার সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন, দেখিয়ে আপ্‌কা ভাবনা কী জবাব হম্ বেদমন্ত্রসে দেতা হুঁ, আপ্ সমঝ লো।

নহি মে অক্ষিপচ্চনাচ্ছাংৎসুঃ পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোম্যাপামিতি ।।"

(ঋ১০/১১৯/৬)

অর্থাৎ পঞ্চ জনপদের যত মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখন আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেকবার সোমপান করেছি।

আমি তাঁর কথার কি উত্তর দেব? তাঁর বক্তব্য অনুধ্যানের বস্তু। আমি কেবল এইভেবে স্বস্তি পেলাম যে আমি এই অন্তর্যামী পুরুষের চোখে চোখে থাকব।

★ অপাংনপাৎ শব্দের সাধারণ অর্থ জলের শোষক। অধ্যাত্মিক অর্থ চিত্তের সকল তরল ও চঞ্চলবৃত্তির নাশকারী।

— চলিয়ে, আভি আস্নান করেঙ্গে। সাড়ে দশ বাজ গিয়া হোঙ্গে।

অনেকক্ষণ ধরে উভয়ে স্নান করলাম। স্নান করতে করতে দেখি একটি বড় বেল নর্মদার জলে ভাসছে। অন্ধ সেজে থাকা এই পুরুষ-প্রবর সঙ্গে সঙ্গে তা ধরে নিয়ে আমাকে বললেন — দেখিয়ে আজ নর্মদামায়ী তুমহারে লিয়ে এহি বরাদ্দ কিয়া। হম্ গুহামেঁ যাতা হৈ। তুম্ পিতৃপুরুষয়োঁকা তর্পণ করিয়ে। ঋষি তর্পণ ভি করিয়েগা।

তর্পণাদি সেরে আসার পরেই তিনি বেলটি এনে আমার হাতে দিয়ে বললেন — বেল খেয়ে ঘুমিয়ে নেবে। আজ রাত্রে তোমাকে দিয়ে আদি ওঁকারেশ্বরজীর পূজা করাবো, রাত্রে হয়ত ঘুমাতেই পাবে না। আমি বেলটি ভেঙে খেতে আরম্ভ করলাম, এত সুস্বাদু বেল আমি জীবনে খাইনি। তিনি কাছে বসে রইলেন। তাঁর ত আর খাওয়া দাওয়ার প্রয়োজন হয় না। তিনি নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন — কুছ পুছনা হ্যায় ত আভি পুছ লিজিয়ে।

আমি বললাম — আপনি আমাকে পিতৃদর্শন করিয়েছেন, ইচ্ছামত যাতে আমার সেই প্রেমিক ঠাকুরের দর্শন পাই, তার 'তরিক্কাও' বলে দিয়েছেন। আমি আমৃত্যু আপনাকে স্মরণ করব; এ ঋণ আমি কোনদিনই শোধ করতে পারব না। আপনার আদেশ আমি অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলব। একটাই মাত্র জিজ্ঞাস্য আছে আপনি যে মূর্ধ্বাতে ওঁকার-মননের রহস্য বলে দিয়েছিলেন তা কি আজীবন করে যেতে হবে? যদি কোন কারণে তার ছেদ ঘটে, তাহলে তখন কি করব?

— সাময়িক ছেদে কোন হানি নাই। আজীবনও করবার দরকার হয় না। ওঁকার রহস্যের অর্ন্তর্নিহিত মর্ম এবং তা উপলব্ধি করার পন্থা সম্বন্ধে যা বলছি, তা ভালভাবে মনে গেঁথে নেবে। যোগেশ্বর যাজ্ঞবাক্য বলেছেন —

যথাপর্ণ পলাশস্য শঙ্কুনৈকেন ধার্যতে ।
তথা জগদিদং সর্বমোঙ্করে নৈব ধার্যতে।।
জপেন দহেত পাপং প্রাণায়ামৈস্তথা সমম্।
ধ্যানেন জন্মর্নিজাত ধারনা শক্তিরুচ্যতে।।

অর্থাৎ যেমন পলাশফুলের দলসমূহ একটি মাত্র শঙ্কুমধ্যে ধরা থাকে তেমনি সমগ্র জগৎ ওঁকারের দ্বারা ধৃত। ওঁ জপ করলে সমস্ত পাপ দগ্ধ হয়ে যায়, ওঁ এর প্রাণায়াম করলে অন্তরে সমতা আসে, চিত্তবৃত্তি শান্ত হয়, ধ্যান করলে পুনর্জন্মের নিবৃত্তি ঘটে এবং ধারণা করতে পারলে শক্তিলাভ করা যায়, সমূহ যোগ সম্পত্তি আয়ত্ত হয়।

এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য হল —

ওঁকারং রথমারুহ্য বিষ্ণুং কৃত্বাতু সারথিম্।
ব্রহ্মলোক পদান্বেষী রুদ্রারাধন তৎপরঃ।। (অমৃতবিন্দু উপনিষদ)

অর্থাৎ যাঁরা ব্রহ্মলোকের প্রকৃত পথ অন্বেষণ করতে ইচ্ছা করবেন, তাঁরা ওঁকাররূপ রথে আরোহন পূর্বক বিষ্ণুকে অর্থাৎ সর্বব্যাপী তত্ত্বকে সারথি করে রুদ্রদেবের অর্থাৎ জ্যোতিঃস্বরূপ মহাদেবের আরাধনায় তৎপর থাকবেন। ওঁকারই ব্রহ্মপ্রাপ্তির একটি প্রধান উপায়।

কিন্তু কতদিন এই উপায় অবলম্বন করে চলতে হবে? তোমার এই প্রশ্নের উত্তরও অমৃতবিন্দু উপনিষদ্ দিয়েছেন, এ সম্বন্ধে শ্রুতিবাক্য —

তাবদ্রথেন গন্তব্যং যাবদ্রথ — পথিস্থিতঃ।
ছিত্ত্বা রথপথস্থানং রথমুৎসৃজ্য গচ্ছতি।।

অর্থাৎ যতক্ষণ গন্তব্যস্থানে পৌঁছানো যায়, ততক্ষণ যেমন রথে চড়ে ক্রমে ক্রমে পথ অতিক্রম করতে হয়, গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেলে যেমন আর রথের প্রয়োজন হয় না, তেমনি যতদিন না ব্রহ্মবিদ্যার আবির্ভাব ঘটে; ততকাল ওঁকারতত্ত্বের সাধনা করে যেতেই হবে। ব্রহ্মানুভূতি হওয়ার পর আর উপাসনার আবশ্যকতা নাই।

আশা করি, আমার কথা তুমি হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছ। আভি লেট্ যাইয়ে। পাঁচ বাজে হমলোক আদি ওঁকারেশ্বরজীকো তরফ যাত্রা করেঙ্গে। শিবং ভূয়াৎ।

আমি গাঢ় ঘুমে আচ্ছন্ন হয়েছিলাম। বোধহয় পাঁচটাতেই তিনি আমাকে ঘুম থেকে জাগালেন। বললেন — যাও, নর্মদা স্পর্শ করে এস। এই তপোবনের এবং তপোবনবাসী দৃষ্ট ও অদৃষ্ট তপোসিদ্ধ ঋষিবর্গের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে এস। তাঁকে দেখলাম, একহাতে লাঠি, একহাতে কমণ্ডলু কাঁধে একটা ঝোলা নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কপালের চামড়া ঝুলে চোখকে ঢেকে রেখেছে বলে একখণ্ড গৈরিক বস্ত্রে চামড়াকে টেনে কপাল ও মাথার চারপাশে বেঁধেছেন। আমি তাড়াতাড়ি নর্মদা স্পর্শ ও প্রণামাদি করে এসে কমণ্ডলু ও লাঠি হাতে তুলে নিলাম। তাঁর পিছনে হাঁটতে হাঁটতে যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদ ও ভগবান পাতঞ্জলিদেবের গুহার মধ্যবর্তী স্থানে একটা সরু পায়ে চলার দাগ ধরে চড়াই এর পথে নিস্তব্ধ, ঈষৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন ঘন বনের মধ্যে প্রবেশ করলাম। এবড়ো খেবড়ো পাথর ডিঙিয়ে লাঠি ঠুকে ঠুকে ক্রমশঃ উপরের দিকে উঠছি। বনের মধ্যে ঢুকেই মনে হল, এতক্ষণ অরণ্যানীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিনি, যা দেখেছিলাম তা বাইরে থেকে, তপোবনের শৈলতটে দাঁড়িয়ে। এ যেন একটি ভিন্ন জগৎ — সুউচ্চ সোজা খাড়া সেগুন, শাল, বেল, কেঁদ এবং বারম প্রভৃতি বড় বড় গাছের ঘন সন্নিবেশে মনে হয় মধ্যাহ্নেও এইস্থানে সূর্যের আলো ঢুকতে দেয় না। এইজন্য এই পার্বত্যপথ আর্দ্র এবং বেশী শীতল, গাছের গোড়ায় লতাগুল্মের অভাব নাই। কোথা থেকে ঝর্ণার জলও চুইয়ে চুইয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে। তার ফলে পথ বেশ পিচ্ছিল। প্রলয়দাসজী আমার কমণ্ডলুসহ বাঁ হাতটা জাপটে ধরে অতি সন্তর্পণে চড়াই এর পথে উঠতে লাগলেন।

মিনিট পাঁচেক পরে পাহাড়ী জঙ্গলের এমন একটা জায়গায় এলাম, যেখানে লম্বা লম্বা ঘাস ছাড়া আর কিছু নাই। প্রলয়দাসজী বললেন — আমরা সেই আর্দ্র ও পিচ্ছিল পথ পেরিয়ে এসেছি। যেখান পাহাড়ের অংশ খুব শুকনো হয় সেইখানেই এইরকম লম্বা লম্বা ঘাস গজিয়ে ওঠে। ঔর পাঁচ মিনট চড়াই করনেসে হমলোগ অধিত্যকামেঁ আ জাবেগা। লাঠি দিয়ে চার পাঁচ হাত লম্বা লম্বা সেইসব ঘাস ঠেলে ক্রমাগত চড়াইয়ের পথে হাঁটার ফলে আমি হাঁপিয়ে গেছি, কিন্তু এই লোলচর্ম বৃদ্ধের কোন ক্লান্তি দেখছি না। ঘাস বন পেরিয়ে সত্য সত্যই পাঁচ মিনিট উঠতেই আমরা পর্বতের শীর্ষদেশে উঠে এলাম। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, কিন্তু অস্তগামী সূর্যের লাল আভা পর্বতশীর্ষের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ায় অপরূপ শোভা ধারণ করেছে। পেছন ফিরে একবার তপোবনের দিকে তাকালাম, যাবার সময় পর্বতের শিরালা ধরে নামতে নামতে দেখেছিলাম পাহাড় বেষ্টিত বড় বড় বনস্পতি পাহাড়ের গায়ে যেন থরে থরে উঠে এসেছে। সূর্যের লাল আভা সেইসব বনস্পতির শিরোদেশে পড়ায় পাহাড় বেষ্টিত এই খাদে যেন হোমকুণ্ড জ্বেলে প্রকৃতিদেবী যজ্ঞ করতে বসেছেন! যজ্ঞাদির অজস্র শিখাই যেন দেখছি! প্রলয়দাসজী বললেন — ঔর একদফে ইস তপোবনকো প্রণাম করলেও বেটা। ইস্ তপোবনকা বারেমেঁ ইধর কিসিকো কুছ মৎ বোলনা।

— তুমি ত আরো একমাস থাকবে, নিজে এদিকেও কখনও আসতে চেষ্টা করবে না। শিব রক্ষিত স্থান এটি। এলে সেদিন আমার অনুপস্থিতি কালে তপঃস্থলীর পূর্বঢালে যাবার উপক্রম করতেই বাঘের বিকট গর্জন যেমন শুনেছিলে, সেইরকম চতুর্দিক হতে ভয়ঙ্কর গর্জন শুনতে পাবে। আরো নানা দৈব বিপত্তি দেখা দেবে। অন্ধকার হয়ে গেছে, চল এবার, আদি ওঁকারেশ্বরের চরণতলে পৌঁছাই গিয়ে।

সাবধানে পা ফেলে ফেলে, পা টিপে টিপে, উৎরাইএর পথে তাঁকে অনুসরণ করতে লাগলাম। তিনি মাঝে মাঝে বলে চলেছেন — হুঁশিয়ার, পত্থল হ্যায়! আমি দু'একবার হোঁচট খেতেই তিনি তাঁর লাঠিটা বগলদাবা করে লাঠির শেষভাগটা ধরে হাঁটতে বললেন। আমি যেন চক্ষু থেকেও অন্ধ বালক, আর উনি বাহ্যতঃ অন্ধ হলেও প্রকৃতপক্ষে চক্ষুষ্মান ব্যক্তি তা ভাল করেই বুঝিয়ে দিলেন। এইভাবে মিনিট কুড়ি পঁচিশ হাঁটার পরেই অপেক্ষাকৃত সমতল ভূমিতে পৌঁছলাম। অগ্নিকোণের দিকে তাকিয়ে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের চূড়ায় ইলেকট্রিক আলোর অত্যুজ্জ্বল শিখা চোখে পড়ল।

অন্ধকারের মধ্যে কোথা থেকে কোন্ পথে যে মহাত্মা আমাকে নিয়ে এলেন তা বুঝতে পারলাম না, হঠাৎ দেখি মোটা মোটা পাথরের চওড়া একটা সিঁড়ির কাছে দাঁড় করিয়ে তিনি বললেন — আদি ওঁকারেশ্বরজীকী চরণেমেঁ হম্‌লোগ আ গয়া। পহেলে ত একদফে তুম্ আয়েথে, তাঁর সঙ্গে উঁচু সিঁড়ি বেয়ে উঠলাম মন্দির চত্বরে।দেখলাম, একটি প্রদীপ জ্বলছে, প্রদীপের ক্ষীণ শিখায় লাল পাথরের পূর্বদৃষ্ট স্তম্ভগুলি চোখে পড়ল। দেখলাম স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে ঘিরে চারদিকে চারজন অতিবৃদ্ধ জটাজুট সাধু পূজা করছেন। প্রলয়দাসজী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন, অমিও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম সিদ্ধেশ্বর নামে বন্দিত আদি ওঁকারেশ্বরকে। সেই সাধুরা একে একে পূজা করলেন। লক্ষ্য করলাম, তাঁদের প্রদত্ত চন্দনসিক্ত বিল্বপত্র এক একটি শিবলিঙ্গের মাথায় দেওয়া মাত্রই তা ঠিকরে ঠিকরে পড়তে লাগল একহাত দূরে। তাঁরা প্রণামাদি সেরে চলে গেলেন। যাওয়ার পূর্বে তাঁরা 'হর নর্মদে হর' বলে প্রলয়দাসজীকে অভিবাদন করে গেলেন। বুঝলাম, এঁরা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের পরিচিত।

সেই মহাত্মারা চলে যেতেই প্রলয়দাসজী নিজের কমণ্ডলুর জল দিয়ে আদি ওঁকারেশ্বরের গাত্র মার্জনা করলেন বেদমন্ত্র পড়তে পড়তে—

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং তং দেবতানাং পরমং চ দৈবতম্।
পতীং পতীনাং পরমং পরস্তাদ্ বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যম্।।

অর্থাৎ হে মহেশ্বর! তুমি নিয়ন্তাদের পরম নিয়ন্তা, দেবগণের পরম দেবতা এবং প্রভুগণের পরম প্রভু। তুমি বিদ্যা অবিদ্যার অতীত, পরমপূজ্য, স্বয়ংজ্যোতি। তোমাকে আমরা যেন জানতে পারি।

আমার দিকে তাকিয়ে বললেন — এই যে সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গের চারদিকে একটি অস্পষ্ট রেখা বেষ্টন করে আছে, একটু আগে মহাত্মাদের পূজাকালে যেমন দেখলে তাঁদের প্রদত্ত প্রত্যেকটি বিল্বপত্র রেখার বাইরে ঠিকরে পড়ল তেমনি তোমার দেওয়া বিল্বপত্রও যদি ঐভাবে ঠিকরে আসে তাহলে বুঝবে আদি ওঁকারেশ্বর তোমার পূজা গ্রহণ করলেন, নতুবা বুঝবে মহাদেব তোমার পূজা গ্রহণ করলেন না।

ঝোলা হতে প্রচুর বিল্বপত্র, বনফুল বের করে একটা শালপাতায় রাখলেন, একটা তামার কৌটায় চন্দন ভর্তি করে এনেছিলেন। সেগুলি এবং নিজের কমণ্ডলুটি আমার সামনে

রেখে বললেন — যে কোন স্বয়ম্ভুলিঙ্গের পূজার একটি বিশেষ বিধি আছে, মনে হয় তোমার বাবার কাছে তা শেখনি। তাঁর অজানাও থাকতে পারে। এখন তুমি ঠিক কর, তোমার বাবার কাছে যেমন শিখেছ তেমনভাবেই করবে, না, আমি শিখিয়ে দেব?

তাঁর এই কথায় আত্মাভিমানে লাগল। বিশেষ করে তাঁর কথায় বাবার সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ কটাক্ষ থাকায় হঠাৎ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলাম। আমি তাঁর কথার কোন উত্তর না দিয়ে আচমন করে নিজেই শিবপূজায় উদ্যোগী হলাম।

পিতৃদত্ত সপ্তাক্ষর শিববীজ কিছুক্ষণ জপ করে আমি প্রার্থনা করতে লাগলাম।

স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভিতে সূক্ষ্মমার্গে
শান্তে স্বান্তঃ প্রলীনে প্রকটিত বিভবে দ্যোতরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তদ্‌ব্রহ্মবাচ্যং সকল তনুগতং শংকরং ন স্মরামি
ক্ষন্তব্যোমেহপরাধঃ শিবঃ শিবঃ শিবঃ ভো শ্রীমহাদেব শম্ভো।।

অর্থাৎ পদ্মাসনে উপবেশন করে প্রণব উচ্চারণ করতে করতে প্রথমে প্রাণবায়ুকে সুযুম্নাপথে নিরুদ্ধ করে, অন্তঃকরণকে শান্ত করার ফলে প্রণব যখন স্বমহিমায় আত্মপ্রকাশ করে তখন তাকে জ্যোতির্ময় পরব্রহ্মরূপী সাক্ষীচৈতন্যে প্রলীন করে, হে মহাদেব, প্রত্যেক শরীরে যে তুমি অর্ন্তযামী রূপে অবস্থিত, সমাধিস্থ হয়ে তা কোনদিন উপলব্ধি করার চেষ্টা করিনি। হে শিবশম্ভু, তুমি আমার সেই অপরাধ মার্জনা কর। কাতরভাবে কাঁদতে কাঁদতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গের উপর মনে মনে ইষ্টবীজ স্মরণ করে একটি চন্দনলিপ্ত বেলপাতা দিলাম। অনেকক্ষণ ধরে জপ করলাম। বেলপাতা ঠিকরে এল না।

তারপর ওঁ ঈশানং সর্ববিদ্যানামীশ্বরঃ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাধিপতির্ব্রহ্মণোহধিপতি — ইত্যাদি মন্ত্র উচ্চারণ করে ক্রমে ক্রমে ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর, বামদেব, সদ্যোজাত প্রভৃতি রুদ্ররূপেরও অর্চনা করলাম। কিন্তু বেলপাতা লিঙ্গের মাথায় পূর্ববৎ থেকেই গেল।

ত্র্যম্বকং যজা মহে .... ইত্যাদি যত বেদমন্ত্র আমার জানা আছে সে সবই উচ্চারণ করে করে কাঁদতে লাগলাম।

ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলে ১১৪ নম্বর সূক্তে ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট রুদ্রদেবতার যে এগারটি মন্ত্র আছে, তাও পাঠ করে করে ফুলচন্দন সিদ্ধেশ্বরের মাথায় উঁচু করে চাপিয়ে দিলাম। এমনভাবে যত্ন করে ফুল ও বেলপাতা চূড়ো করে সাজিয়ে দিলাম যে আশা করেছিলাম, আশুতোষ আমার চোখের জলে করুণার্দ্র হবেন, অন্ততঃ একটি ফুল ঠিকরে আসবে। কিন্তু না তবুও ফুল পড়ল না। গায়ে দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে, বুকের ভেতরটা খুব ফাঁকা লাগছে। নিজেকে বড় অসহায় বোধ হচ্ছে। উন্মুক্ত আকাশতলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ জ্বল্‌জ্বল্ করছেন, উর্ধ্বাকাশে ঝিকমিক করছে সহস্র সহস্র তারা। নির্জন গম্ভীর গভীর রাত্রিতে একা আমি বসে আছি প্রভু তোমার চরণতলে। হে পতিতপাবন, দীনদয়াল, তুমি দয়া করে আমার পূজা গ্রহণ কর। আমি নতজানু হয়ে শিবলিঙ্গের কাছে মাথা ঠুকতে ঠুকতে বলতে লাগলাম —

ওঁ ইদং পিত্রে মরুতামুচ্যতে বচঃ স্বাদোঃ স্বাদীয়ো রুদ্রায় বর্ধনম্।
রাস্বা নো অমৃত মর্ত্যভোজনং ত্মনে তোকায় তনয়ায় মৃড় (ঋ৬। ১ম। ১১৪সূ)

মধুর চেয়ে মধুমাখা স্তোত্র জানাই রুদ্র লাগি।
মরুদ্‌গণের পিতা প্রভু তোমার নিকট বৃদ্ধি মাগি।
মৃত্যুবিহীন রুদ্র তুমি অমৃত দাও মর্ত্যজনে,
সুখী কর আমায় প্রভু, ঋদ্ধি এবং সিদ্ধিদানে।।

ভগবান কুৎস ঋষি দৃষ্ট বেদমন্ত্রও ব্যর্থ হল। আমার সমস্ত শরীর অবশ হয়ে আসছে। বুকের ভেতরটা ধড়ফড় করছে, ঘামে নেয়ে গেছি আমি। সমানে ইষ্টমন্ত্র জপ করে যাচ্ছি, এমন সময় দেখলাম, আরও দুজন মহাত্মা এলেন। তাঁদের দুজনেই দিব্যকান্তি তরুণ, সম্পূর্ণ দিগম্বর। আমি তাঁদেরকে পূজা করার সুযোগ দেবার জন্য একটু সরে বসব কিনা ভাবছি, তাঁদের দুজন এক সঙ্গেই বলে উঠলেন — বাচ্চা আপ্ আসন মৎ ছোড়িয়ে, হম্‌লোগ্ ইধরই বৈঠকে পূজা করেঙ্গে, মধ্যাহ্নক্ষণ বীত গয়া, আভি তক্ আপ্‌কো পূজা নেহি হুয়া? তাঁদের 'বাচ্চা' সম্বোধন আমার কানে বেসুরো ঠেকল, কারণ তাঁদেরকে আমার সমবয়সী এমনকি আমার চেয়ে বরং কিছুটা কম বয়সীই বলে মনে হল। তাঁদের কারও দাড়ি চুল এখনও গজায় নি। তাঁরা আমার বিপরীত দিকে অর্থাৎ যোনিপীঠের সামনে বসে সিদ্ধেশ্বরের মাথায় কমণ্ডলুর জল ঢালতে ঢালতে, ঋগ্বেদের ১ম মণ্ডলের ১১৪ সূক্তের কুৎস ঋষি দৃষ্ট যে যে এগারটি মন্ত্রে রুদ্র দেবতার স্তুতি আছে, যা আমি দরবিগরিত অশ্রু হয়ে এখানে বারবার বলেও ওঁকারেশ্বরের করুণা পেলাম না, তাঁরা সেই একই সূক্তের একাদশতম মন্ত্রটি পড়তে লাগলেন —

অবোচাম নমো অস্মা অবস্যব শৃণোতু নো হবং রুদ্রো মরুত্বান্।
তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তামদিতিঃ সিন্ধু পৃথিবী উত দ্যৌ॥

শরণ যাচি তোমার রুদ্র ডাকছি প্রাণের নমস্কারে,
মরুৎসহ ডাকছি তোমায় আহ্বান করি বার বারে।
পালন করুন মিত্রবরুণ, পালন করুন মা অদিতি,
পালন করুন সিন্ধুসাগর, পালন করুন মা অদিতি॥

শিবকে স্নান করিয়েই যে যার কমণ্ডলুর ভেতর হতে একটি করে বেল পাতা বের করে আমারই ইষ্টমন্ত্র সপ্তাক্ষর মহাবীজ স্পষ্ট উচ্চারণ করে আদি ওঁকারেশ্বরের মাথায় অর্পণ করলেন। মুহূর্ত্তকালও বিলম্ব হল না, উভয়েরই বেলপাতা ঠিকরে গিয়ে পড়ল। তাঁরা যে যার বেলপাতা কুড়িয়ে নিয়ে 'বম্-বম্-ববম্-বম্' শব্দে গালবাদ্য করতে করতে তিনবার স্বয়ম্ভু লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন। আমি তাঁদের যাত্রাপথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে মিলিয়ে গেলেন বুঝতে পারলাম না, শুধু দেখলাম দুটো জোনাকীর আলো জ্বলছে আর নিভছে! আমি এই ভেবে স্বস্তি পেলাম যে আমার পিতৃদত্ত সপ্তাক্ষরী নিশ্চয়ই মহাসিদ্ধবীজ। এই মাত্র সাধু দুজনও ত ঐ বীজেই পূজা করে সিদ্ধ মনোরথ হলেন। ওঁকারেশ্বরই যেন ঐ দুজন দিব্যকান্তি তরুণ সাধুকে পাঠিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন যে, নিজ ইষ্টবীজের ওপর অবিচলিত নিষ্ঠা রাখ।

পরক্ষণেই আমার মনে এই চিন্তা জাগল যে, যে কোন দেবপূজায় আসন শুদ্ধির প্রয়োজন। এইমাত্র যাঁরা পূজা করে গেলেন, তাঁদের উপবেশন স্থলই হয়ত কোন কল্পান্তস্থায়ী মহাযোগীর সিদ্ধাসন হতে পারে। আমি পুষ্পপাত্র চন্দনের কৌটা এবং প্রলয়দাসজীর কমণ্ডলুটি হাতে নিয়ে যোনিপীঠের সামনে বসলাম। নিজের কমণ্ডলুর জল অনেক আগেই শেষ হয়ে গেছে। পুনরায় আচমনাদি করে ইষ্টমন্ত্র জপ করলাম। ঐ তরুণ সাধুদের মতই আমি কুৎস ঋষি দৃষ্ট একাদশ মন্ত্রটি উচ্চারণ করতে করতে ওঁকারেশ্বরের মাথায় জল ঢাললাম, সপ্তাক্ষর বীজে চন্দনলিপ্ত বিল্বপত্র ভক্তি ভরে অর্পণ করলাম, বম্-বম্-ববম্-বম্ ধ্বনিতে গালবাদ্য করতে

করতে তিনবার প্রদক্ষিণও করলাম। হা হতোহস্মি! বেলপাতা ঠিকরে এসে পড়ল না!

আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে স্তব পাঠ করতে করতে উন্মাদের মত প্রলাপ বকতে সুরু করলাম। বলতে লাগলাম, এই মুহূর্তে তোমাকে আশুতোষ বলে আদর করতে ইচ্ছা করছে না । জটার জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন জটীল 'কপর্দী' নামই তোমার উপযুক্ত নাম হওয়া উচিত। তোমার হৃদয় পাষাণ, তাই ত এই পাষাণলিঙ্গই তোমার যথোপযুক্ত বিগ্রহ! বুঝতে পারছি না, কোন্‌গুণে মহাপুরুষরা তোমাকে বলে গেছেন —

ওঁ শান্তঁ পদ্মাসনস্থং শশধরমুকুটং পঞ্চবক্ত্রং ত্রিনেত্রং
শূলং ব্রজঞ্চ খড়্গং পরশুমপি বরং দক্ষিণাঙ্গে বহন্তং।
নাগং পাশঞ্চ ঘন্টাং ডমরুকসহিতম্ চাঙ্কুশং বামভাগে
নানালঙ্কারদীপ্তং স্ফটিকমণিনিভং পার্বতীশং ভজামি॥

অর্থাৎ তুমি নাকি স্বরূপতঃ শান্ত, পদ্মাসনে নিয়ত ধ্যানমগ্ন, চন্দ্রমুকুটধারী, পঞ্চানন ও ত্রিনয়ন; তোমার দক্ষিণহস্ত সমূহে নাকি শূল বজ্র, খড়্গ, কুঠার ও বর ধারণ করে থাক আর বামহস্ত সমূহে নাগপাশ, ঘন্টা ও ডম্বরু সহিত অঙ্কুশ ধারণ কর। মহাপুরুষরা তোমার দ্বারা বিড়ম্বিত এবং প্রতারিত হয়েছিলেন বলেই বলতে পেরেছিলেন — 'এ হেন নানালঙ্কারে ভূষিত, স্ফটিকমণিসদৃশ পার্বতীপতিকে ভজনা করি।' মিথ্যা! মিথ্যা! এসব রোচক বাক্যমাত্র! আমি হাঃ হাঃ করতে করতে অট্টহাস্যে ফেটে পড়লাম। উত্তেজনার ঘোরে মনে হচ্ছে আমার মাথার শিরা ছিঁড়ে যাবে। আমি দু'হাত প্রসারিত করে এগিয়ে যাচ্ছি শিবলিঙ্গের দিকে, গর্জাতে গর্জাতে বলছি , কি করব আমার সাধন ভজন নাই, যদি ভৃগু দুর্বাশার মত শক্তি থাকত তাহলে ওঁকারেশ্বর তোমাকে অভিসম্পাত দিতাম! নতুবা তোমার এই বিগ্রহকে সমূলে উৎপাটিত করে নর্মদার জলে নিক্ষেপ করতাম। ক্রোধে আমার দাঁত কিড়মিড় করছে। সহসা মনে হল, সেই বিশাল চত্বরসহ শিবলিঙ্গ কাঁপছেন। আমার প্রদত্ত ফুল ও বিল্বপত্র ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে। উপরের দিকে তাকিয়ে দেখি, একখণ্ড সাদা মেঘ যেন কুণ্ডলীকৃত হয়ে আমার মাথার উপরে নেমে এসেছে। সেই সাদা মেঘের মধ্যে বাবার জ্যোতির্ময় শরীর ভেসে উঠল, তাঁর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। তিনি যুক্তকরে উদাত্ত কণ্ঠে প্রার্থনা করছেন —

ওঁ বন্দে দেবমুমাপতিং সুরগুরুং বন্দে জগৎ কারণং
বন্দে পন্নগভূষণং মৃগধরং বন্দে পশূনাং পতিং।
বন্দে সূর্যশশাঙ্কবহ্নিনয়নং বন্দে মুকুন্দপ্রিয়ং
বন্দে ভক্তজনাশ্রয়ঞ্চ বরদং বন্দে শিবং শংকরম্॥

অর্থাৎ বাবা বলছেন — হে স্বপ্রকাশ উমাপতি, তুমি দেবতাদেরও গুরু, তোমাকে বন্দনা করি, সর্পভূষণ মৃগধরকে বন্দনা করি ; হে পশুপতি, তুমি চন্দ্রসূর্য ও বহ্নিরূপ ত্রিনয়নধারী এবং মুকুন্দপ্রিয়, তোমাকে বন্দনা করি; ভক্তজনের আশ্রয়, বরদাতা হে মঙ্গলময় মহাদেব তোমাকে বন্দনা করি।

আমি জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেলাম। কতক্ষণ যে এইভাবে পড়েছিলাম জানি না, প্রলয়দাসজীর কণ্ঠস্বরে আমি চোখ মেলে তাকালাম। তিনি আমার চোখে মুখে জল ছিটিয়ে দিচ্ছেন। ভোর হয়ে গেছে, এখনও অরুণোদয় হয়নি। সর্বাঙ্গে ব্যথায় কোনমতে মহাত্মার হাত ধরে উঠে বসলাম। লেও, থোড়া পানি পি লিজিয়ে। আপ্ পূজা কিয়ে থে, ন পাগলপণ কিয়ে থে?

তকদীরকা খেলমেঁ এ্যায়সা পিতাজী আপ্‌কো মিল গয়ে থে, উনোনো তুরন্ত্ আকর আপ্‌কো বাঁচা দিয়া। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলতে আরম্ভ করলেন — এদিকে যোল আনা পণ্ডিতি আছে! বই দেখে দেখে কোন্ শিবলিঙ্গের কি লক্ষণ তার স্বরূপ নির্ণয়ে তৎপরতা অনেক দেখিয়েছ। যখন প্রথমবারে এসেই কৃতনিশ্চয় হয়েছিলে যে আদি ওঁকারেশ্বর স্বয়ম্ভূলিঙ্গ, তখন স্বয়ম্ভূলিঙ্গের সামনে এইরকম পাগলামি কেউ করে? শুধু শাস্ত্র অধ্যয়ন করলেই কি সব জানা যায়? এইজন্য মহাপুরুষরা বলে গেছেন —

অধীত্য চতুরো বেদান্ ধর্মশাস্ত্রান্যেকশঃ।
ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি দর্ব্বীঃ পাকবসংযথা॥

অর্থাৎ চারিবেদ এবং অনেক ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেও ব্রহ্মতত্ত্ব শিবতত্ত্ব জানা যায় না। বহু অধীতী পণ্ডিতদের দশা দর্বী অর্থাৎ পায়েস রান্নার হাতা বা খুন্তীর মত। হাতা বা খুন্তী পায়েসের মধ্যে বারবার ওঠানামা করলে তা যেমন পায়েসের আস্বাদান পায় না, তেমনি কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন করেও কেউ কখন শিবতত্ত্বের আস্বাদ পায় না। মহাদেব আশুতোষ বলেই ত তোমার উন্মাদের মত আচরণ সত্ত্বেও তোমার পূজা গ্রহণ করেছেন, তোমার ফুল বেলপাতা রেখা অতিক্রম করে ঠিকরে ঠিকরে পড়ে গেছে। তুমি মুখে বল বেদমন্ত্র চিন্ময় ও নিত্যসিদ্ধ। এটা তোমার অন্তরের কথা নয়, তা যদি হত, তাহলে তুমি বুঝতে পারতে ভগবান কুৎস দৃষ্ট বেদমন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ভক্তবৎসল রুদ্রদেবতা জাগ্রত হয়েছিলেন। কর্ম্মমল, মায়িকমল এবং আণবমল পরিশুদ্ধ না হলে সর্বব্যাপ্ত ঠাকুরের ঠাকুরালি, তাঁর আশুতোষ বরদ রূপ ইচ্ছামাত্রই অনুভব করবে কি করে? এখন বীরপুরষ, উঠে গিয়ে সিদ্ধেশ্বরকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে এস। আমার সঙ্গে নর্মদায় চল, স্নান করে এসে আমার নির্দেশ মত পূজায় বসবে। তোমার বাবা আমাকে অনুরোধ করে গেছেন।

নতমস্তকে আমি তাঁর ভর্ৎসনা বাক্য এবং শ্লেষ নীরবে হজম করলাম। গতরাত্রে আমার উদ্ভট প্রলাপ বাক্য স্মরণ করে আমার মন অনুশোচনায় ভরে গেল। আমি ওঁকারেশ্বরের (সিদ্ধনাথ) কাছে গিয়ে ধূল্যবলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করে এলাম।

সূর্য উঠে গেছে। প্রলয়দাসজী আমাকে নর্মদার ঘাটে নিয়ে চললেন। আমি দূর থেকে সেই ভৈরবশিলা এবং মান্ধাতা গ্রামের রাজবাড়ী দেখতে পাচ্ছি। ঘাটে পৌঁছে তিনিও আমার সঙ্গে স্নান করতে নামলেন। আমি তাঁকে বললাম — আপনার দয়ায় দু'বার আমার পিতৃদর্শন ঘটল।

— নেহিজী, নেহিজী, সবকুছ্ নর্মদামায়ীকা কিরপাসে হোতা হ্যায়। আচ্ছিতরেসে নাহা লিজিয়ে। তুমহারা দিমাগ্ ঠাণ্ডা হোগা। তর্পণাদি করিয়ে, হম্ থোড়া বিল্বপত্র চন্দন বগেরাকে লিয়ে যাতা হুঁ। তুরন্ত্ আ জাবেগা।

কিছুক্ষণ পরেই প্রলয়দাসজী পাতায় মুড়ে কিছু বিল্বপত্র নিয়ে হাজির হলেন। আমি তাঁর সঙ্গে আদি ওঁকারেশ্বরের মন্দিরের দিকে যেতে লাগলাম। যেতে যেতে তিনি বললেন — যে কোন দেবায়তনে জাগ্রত দেববিগ্রহ থাকলে বুঝবে তৎ তৎ দেবতার পূজার নির্দিষ্ট কোন বিধি আছে। যাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে দেবতা প্রকট হন, দেবতা তাঁরই কাছে পূজা রহস্য প্রকট করে থাকেন। তারপর বংশ পরম্পরা সেই বিধি প্রচলিত থাকে। এজন্য মন্দিরের পুরোহিত ও পাণ্ডাদের ধারাও পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। নবাগত পূজক যত বিদ্বান ও তপস্বী হোক না কেন, মন্দিরের পুরোহিত বা পাণ্ডার সাহায্য নিয়ে তাঁর পূজা করা উচিত। তবেই পূজা সিদ্ধ

হয়। তেমনি আদি ওঁকারেশ্বরেরও একটি প্রকৃষ্ট পূজাবিধি আছে। যেকোন স্বয়ম্ভুলিঙ্গ এবং সদা জাগ্রত বাণলিঙ্গেরও এই বিধিতে পূজা করলে দেবাদিদেব মহাদেব নিজে কৃপা করে এই পূজা গ্রহণ করেন। তাঁর কখন যে কার ওপর কৃপা হবে, তা মনুষ্য বুদ্ধির অগোচর। কৃপার কোন কার্যকারণ ব্যাখ্যা করা যায় না।

কথা বলতে বলতে আমরা আদি ওঁকারেশ্বরের পাদপীঠে পৌঁছে গেলাম। উভয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে পুষ্পপাত্র সাজিয়ে নিলাম। প্রলয়দাসজী তাঁর ঝোলা হতে একখণ্ড চন্দনকাঠ বের করে পাথরের উপর চন্দন ঘষে নিতে বললেন। নিজের কমণ্ডলুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন,— এতে পঞ্চামৃত আছে, আগে আচমন করে আমি যা বলব তা মন দিয়ে শুনবে, তারপর আমি ইঙ্গিত করলে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে 'ত্র্যাম্বকং যজামহে' মন্ত্রে স্নান করাবে। আমি তখন ভাবছি, মিনিট দশেকের মত তিনি আমার কাছ হতে বিল্বপত্র চয়নের জন্য কোথায় গেলেন। এরমধ্যে কিভাবে তিনি পঞ্চামৃত সংগ্রহ করলেন! দেখছি, এই অদ্ভুতকর্মা সাধুর পক্ষে সবই সম্ভব!

যাইহোক, আমি আচমন করতেই তিনি বললেন — আমি যা বলছি মন দিয়ে শোন। সত্যযুগে তণ্ডি নামক এক মহর্ষি কঠোর শিব তপস্যা করেছিলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে মহাদেব তাঁকে দর্শন দেন। তণ্ডি তাঁর চরণে প্রণত হয়ে বলেন, সাংখ্যচার্যেরা যাঁকে একমাত্র ধ্যেয় বলে থাকেন, যোগীরা অনন্ত প্রধান পুরুষ প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা যে ঈশ্বরকে ধ্যান করেন, পণ্ডিতেরা যাঁকে জগতের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বলে উল্লেখ করেন এবং দেবতা অসুর এবং মুনিগণের যাঁর অপেক্ষা কেউ প্রধান নাই, জন্মবিহীন, অনাদিনিধন আনন্দময় নিষ্পাপ ও প্রভাবশালী সেই মহাদেবের আমি শরণাপন্ন হলাম — অত্যন্ত সুখিনং দেবমনঘং শরণং ব্রজে।

মহাদেবের কৃপাকটাক্ষে মুহূর্তকালের মধ্যে মহর্ষি তণ্ডির বোধিক্ষেত্রে জ্যোতিষ্মতী ও মধুমতী প্রজ্ঞার উদয় হল। সেই প্রজ্ঞাদৃষ্টি বলে তাঁর কাছে শিবতত্ত্ব উদঘাটিত হয়, তখন তিনি যেভাবে সেই তত্ত্বের ব্যাখ্যা করেন, ভগবান, বেদব্যাস তাঁর মহাভারতের অনুশাসন পর্বের পঞ্চদশ অধ্যায়ে তা লিপিবদ্ধ করেন। তুমি কার কাছে পূজার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হয়েছ তা অনুভব করার জন্য তাঁর দু' চারটি মন্ত্র শোনাচ্ছি, ভক্তি সহকারে শোন।

তণ্ডি বলছেন —

যং জ্ঞাত্বা ন পুনর্জন্ম মরণং চাপি বিদ্যতে।
যং বিদিত্বা পরং বেদ্যং বেদিতব্যং ন বিদ্যতে।। ৪১
যং লব্ধা পরমং লাভং নাধিকং মন্যতে বুধঃ।
যাং সূক্ষ্মাং পরমাং প্রাপ্তিং গচ্ছন্নব্যয়মক্ষয়ম।। ৪২
যং সাংখ্যা গুণতত্ত্বজ্ঞাঃ সাংখ্যশাস্ত্র বিশারদাঃ।
সূক্ষ্মজ্ঞানতরা সূক্ষ্মং জ্ঞাত্বা মুচ্যন্তি বন্ধনৈঃ।। ৪৩
যঞ্চ বেদবিদো বেদ্যং বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতম্।
প্রাণায়াম পরা নিত্যং যং বিশন্তি জপন্তি চ।। ৪৪
ওঁকাররথমারুহ্য তে বিশন্তি মহেশ্বরম্।
অয়ং স দেবযানামাদিত্যো দ্বারমুচ্যতে।। ৪৫

(মহাভারত, অনুশাসনপর্ব, পঞ্চদশ অধ্যায়)

অর্থাৎ যাঁকে জেনে আর জন্ম বা মৃত্যু হয় না এবং যাঁকে পেলে আর কোন জ্ঞেয় পদার্থ জানতে হয় না, জ্ঞানীলোক যাঁকে লাভ করে অধিকতর আর কিছু জানবার আছে বলে মনে করেন না এবং যে সূক্ষ্ম পরম পদার্থ প্রাপ্তির পর হ্রাস ও নাশহীন পরমব্রহ্মে লয় প্রাপ্তি ঘটে, সত্ত্বাদিগুণ ও চতুর্বিংশতি তত্ত্বে অভিজ্ঞ, সাংখ্যশাস্ত্রে বিশারদগণ যে সূক্ষ্মজ্ঞানের ফলে সংসার সাগরের পারে গিয়ে বন্ধনমুক্ত হন, প্রাণায়ামপর যোগী, বেদজ্ঞ এবং বেদান্তজ্ঞানে পরিনিষ্ঠিত মহাত্মারা যাঁর মন্ত্র জপ করে অন্তিমে যাঁতে গিয়ে প্রবিষ্ট হন, তপোসিদ্ধগণ ওঁকাররূপ রথে আরোহণ করে সেই মহেশ্বরে লয় প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। ইনিই সেই শিব যিনি সূর্যরূপে দেবযানের দ্বার স্বরূপ হয়ে থাকেন।

অয়ঞ্চ পিতৃযানানাং চন্দ্রমা দ্বারমুচ্যতে
এযকাষ্ঠা দিশশ্চৈব সংবৎসর যুগাদি চ ॥ (৪৬, ঐ)

এই মহাদেবই চন্দ্র হয়ে পিতৃযানের দ্বার হন এবং এই মহাদেবই স্বল্পকাল, অনন্তকাল, দিক, বৎসর ও যুগ প্রভৃতি।

রাত্র্যহঃ শ্রোত্রনয়নঃ পক্ষমাসশিরোভুজঃ।
ঋতুবীর্যস্তপোধৈর্যো হ্যব্দগুহ্যোরুপাদবান্॥ (৫১, ঐ)

রাত্রি ও দিন মহাদেবের কর্ণ ও চক্ষু, পক্ষ ও মাস তাঁর মস্তক ও বাহু, ঋতু তাঁর বীর্য, তপস্যা তাঁর ধৈর্য্য এবং বৎসর তাঁর গুহ্যদেশ উরু ও চরণ।

প্রলয়দাসজী আমাকে বললেন — বেদবিৎ মহর্ষি তণ্ডি কর্তৃক উদ্‌ঘাটিত রহস্য থেকে বুঝতে পারছ, সেই স্বরাট বিরাট সর্বব্যাপ্ত মহাদেবকে দর্শন করা কলিহত জীবের পক্ষে কত দুঃসাধ্য? মহর্ষি তণ্ডি কলিহত জীবকে নিষ্কল পরমব্রহ্মস্বরূপ মহাদেবকে প্রাপ্তির জন্য 'নেতি নেতি' বিচার করতে বা দুশ্চর দুঃসাধ্য তপস্যায় মগ্ন হতে বলেন নি।

তিনি বলেছেন —
যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ
তোযামেবাত্মনাত্মানং দর্শয়ত্যেয হৃচ্ছয়ঃ॥ (৪০, ঐ)

অর্থাৎ ভক্তিযোগ সম্পন্ন যেসব লোক মহাদেবকে আশ্রয় করেন, জীবরূপে হৃদয়বর্তী এই মহাদেব তাঁদের নিকট নিজেই নিজেকে দেখিয়ে থাকেন।

যাইহোক, মহর্ষি তণ্ডি মহাদেবের যখন দর্শন পান, তখন তাঁর হৃদয়ে মহাদেবের এক সহস্র সিদ্ধনাম স্ফূরিত হয়। তিনি সেইসব নাম ব্রহ্মাকে বলেন। ব্রহ্মা তা স্বর্গলোকে প্রচার করেন। মহর্ষি তণ্ডিই সর্বপ্রথম মর্ত্যলোকে ঐ গুহ্যাতিগুহ্য নামসকল অবতারিত করেছিলেন। তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মর্ষি উপমন্যু লাভ করে তাঁর শিষ্য কৃষ্ণকে বলেন, কৃষ্ণ তা যুধিষ্ঠিরের কাছে বর্ণনা করেন, ভগবান বেদব্যাস মহাভারতের অনুশাসন পর্বে তা ব্যক্ত করেছেন।

একবার শ্রীকৃষ্ণ তপস্যার জন্য হিমালয়ে গিয়ে ব্রহ্মর্ষি উপমন্যুর দর্শন পান। আট দিন যাবৎ তিনি উপমন্যুর কাছে শিবরহস্য শোনার পর তাঁর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। সে সম্বন্ধে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের উক্তি —

দিনেঽষ্টমে তু বিপ্রেণ দীক্ষিতোঽহং যথাবিধি।
দণ্ডী মুণ্ডী কুশী চীরী ঘৃতাক্তো মেখলীকৃতঃ॥

অর্থাৎ হে যুধিষ্ঠির! অষ্টম দিনে ব্রাহ্মণ উপমন্যু যথাবিধানে আমাকে দীক্ষিত করলেন এবং দণ্ডধারণ, মস্তক-মুণ্ডন, কুশাসনোপবেশন, কৌপীন পরিধান, ঘৃতস্নান এবং মেখলাবন্ধন

করালেন।

তারপর আমি ফলমাত্র ভোজন করে এক মাস, জলমাত্র পান করে দ্বিতীয় মাস এবং বায়ুমাত্র ভোজন করে তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম মাস অতিবাহিত করে এক পায়ে দাঁড়িয়ে উর্ধ্ববাহু সতর্ক হয়ে অবশেষে আকাশে সহস্র সূর্যের তেজ দেখতে পেলাম, সেই সূর্যজ্যোতির মধ্যে পার্বতী ও মহেশ্বরের রূপ আমার কাছ প্রকট হল।

আমি ব্রহ্মর্ষি উপমন্যুর দয়ায় মহাদেবের যে সহস্রনাম জানতে পেরেছি, তা তোমাকে বলছি শোন। মহাদেবের এই সহস্রনাম সমস্ত পাপনাশক এবং চারিবেদের সমতুল্য — সর্বপাপহরমিদং চতুর্বেদ সমন্বিতং। মানুষ যে স্তব জেনে অন্তিমকালে পরমগতি লাভ করে সেই স্তবরূপ এই সহস্রনাম নিজের ও পুত্রাদির পক্ষে মঙ্গলজনক। পুষ্টিকারক রাক্ষসনাশক এবং পরম পবিত্র-মাঙ্গল্যং পৌষ্টিকং চৈং রক্ষোঘ্নং পাবনং মহৎ।

প্রলয়দাসজী এইসব তত্ত্ব ও তথ্য বলবার পর তাঁর ঝোলা হতে একটি পুস্তিকা বের করে আমার সামনে রেখে বললেন — এই হল মহর্ষি তণ্ডি বর্ণিত সহস্রনাম। ★ তুমি পঞ্চামৃতে স্বয়ম্ভুলিঙ্গকে স্নান করিয়ে, এই স্তবরাজ ভক্তিভরে পাঠ করে পাঁচটি করে বেলপাতা চন্দন মাখিয়ে প্রথমে তোমার পিতৃদত্ত সপ্তাক্ষর বীজে পরে আর পাঁচটি বেলপাতা কপিলধারা আশ্রমে তোমার কাছে যে মন্ত্র প্রকট হয়েছিল, সেই বীজে মহাদেবকে অর্পণ কর এবং তার ফল অবিলম্বে প্রত্যক্ষ কর।

আমি তাঁর নির্দেশ পেয়ে স্বয়ম্ভু সিদ্ধেশ্বরের মাথায় যজুর্বেদের সেই বিখ্যাত মন্ত্রটি পড়তে পড়তে ধীরে ধীরে পঞ্চামৃত ঢালতে লাগালাম —

ওঁ ত্র্যম্বকং যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং।
উর্বারুকমিব বন্ধনাৎ মৃত্যোর্মুক্ষীয় । মা অমৃতাৎ। ওঁ নমো শিবায়।।

হে মহাদেব! তুমি স্থূল-সূক্ষ্ম-কারণ-জগৎ ব্যাপ্ত করে অম্বা অর্থাৎ মায়ের হৃদয় নিয়ে বিরাজমান অর্থাৎ মাতৃবৎ তোমার স্নেহ ও করুণা ঝরে পড়ছে জীবের উপর। আমি তোমার আরাধনা করতে বসেছি। যজামহে অর্থাৎ তোমার সঙ্গে যুক্ত হতে চাই। তুমি আমার মধ্যে দিব্যগুণ স্ফূরিত কর, দেবগুণের সুরভিতে যেন আমার অন্তর ভরে ওঠে। তুমি আমার স্থূলদেহই নয়, সূক্ষ্মদেহ এবং কারণদেহেরও পুষ্টিবর্ধন কর। একটি শসা পাকলে তার যেমন আপনা হতেই বোঁটা খসে যায় তেমনই স্বাভাবিকভাবে তোমার করুণায় আমার জীবভাব খসে গিয়ে যেন আমি শিবচেতনাতে জাগ্রত হই। আমার মর্ত্যজীবনের নির্মোক খসে পড়ুক, মৃত্যুর বন্ধন হতে মুক্ত কর আমায় — কিন্তু অমৃত থেকে নয় অর্থাৎ আমি যেন অমৃতত্বে প্রতিষ্ঠিত হই।

আমার মধ্যে যেন নূতন চেতনার সঞ্চার হচ্ছে। আমি ওঁকারেশ্বরকে স্নান করিয়েই পড়তে লাগলাম মহর্ষি তণ্ডি কর্তৃক প্রকটিত সহস্রনাম—

ওঁ স্থিরঃ স্থানুঃ প্রভুর্ভীমঃ প্রবরো বরদো বরঃ।
সর্বাত্মা সর্ববিখ্যাতঃ সর্বঃ সর্বকরো ভবঃ।। ৩১
জটী চর্মী শিখণ্ডী চ সর্বাঙ্গঃ সর্বভাবনঃ।
হরশ্চ হরিণাক্ষশ্চ সর্বভূতহরঃ প্রভুঃ।। ৩২

★ মহাভারতে অনুশাসন পর্বের ষোড়শ অধ্যায়ে মহাদেবের সহস্র সিদ্ধনাম লিপিবদ্ধ আছে। তণ্ডি বর্ণিত মহাদেবের সহস্র সিদ্ধনাম পাঠককুলের ইচ্ছানুসারে পরিশিষ্টে লিপিবদ্ধ করলাম — প্রকাশক

প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ নিয়তঃ শাশ্বতো ধ্রুবঃ ।
শ্মশানবাসী ভগবান খচরো গোচরোঽর্দনঃ॥ ৩৩
... ...
ঈশান ঈশ্বরঃ কালো নিশাচারী পিনাকবান্।
নিমিত্তস্থো নিমিত্তং চ নন্দির্নন্দিকরো হরিঃ ॥ ৭৫
নন্দীশ্বরশ্চ নন্দী চ নন্দনো নন্দিবর্ধনঃ ।
ভগহারী নিহন্তা চ কালো ব্রহ্মা পিতামহঃ ॥ ৭৬
চতুর্মুখো মহালিঙ্গশ্চারুলিঙ্গস্তথৈব চ।
লিঙ্গাধ্যক্ষঃ সুরাধ্যক্ষ্যো যোগাধ্যক্ষো যুগাবহঃ॥ ৭৭
... ...
ব্রহ্মদণ্ডবিনির্মতো শতঘ্নী পাশ শক্তিমান্।
পদ্মগার্ভো মহাগর্ভো ব্রহ্মগর্ভো জলোদ্ভবঃ॥ ১৩৩
গভস্তির্ব্রহ্মকৃদ্ ব্রহ্মী ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণো গতিঃ।
অনন্তরূপো নৈকাত্মা তিগ্মতেজাঃ স্বয়ম্ভুবঃ॥ ১৩৪
... ...
পীতাত্মা পরমাত্মা চ প্রযতাত্মা প্রধানধৃক্।
সর্বপার্শ্বমুখস্ত্রাক্ষো ধর্মসাধারণো বরঃ॥ ১৩৮
চরাচরাত্মা সূক্ষ্মাত্মা অমৃতো গোবৃযেশ্বরঃ।
সাধ্যর্ষির্বসুবাদিত্যো বিবস্বান্ সবিতামৃতঃ ॥ ১৩৯
... ...
অভিরামঃ সুরগণো বিরামঃ সর্বসাধনঃ।
ললাটাক্ষো বিশ্বদেবো হরিণো ব্রহ্মবর্চসঃ॥ ১৫০
স্থাবরাণাং পতিশ্চৈব নিয়মেন্দ্রিয়বর্ধনঃ।
সিদ্ধার্থঃ সিদ্ধভূতোঽর্থোঽচিন্তঃ সত্যব্রতঃ শুচিঃ॥ ১৫১
ব্রতাধিপঃ পরং ব্রহ্ম ভক্তাণাং পরমাগতিঃ।
বিমুক্তো মুক্ততেজাশ্চ শ্রীমাণ্ শ্রীবর্ধনো জগৎ॥ ১৫২

এই সহস্রনামের স্তবরাজ পাঠ করতেই অনেকক্ষণ সময় লাগল। সব শিবের নাম, তাঁর বিভিন্ন মহিমা জ্ঞাপক নাম, এই দেখে আশ্চর্য হলাম, যে এই নামাবলী কতকগুলি নামের শুষ্ক ফর্দমাত্র নয়, প্রত্যেক নামের মধ্যে এমনভাবে চৈতন্যশক্তি অনুস্যুত আছে যে প্রত্যেকটি নাম উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে আমার মনে যেন তড়িৎকণার উদয় হচ্ছে। আমার শরীরকে ঘিরে যে অশ্রু পুলক রোমাঞ্চ শিহরণ প্রভৃতি ভাবের সঞ্চার হচ্ছে, তা অর্থবোধের অপেক্ষা রাখছে না।

শেষ নামটি উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রলয়দাসজী বলে উঠলেন — পহেলে আপ্‌কা ইষ্টমন্ত্র সিমরণ করকে বিল্বপত্র দিজিয়ে, পাঁচঠো দিজিয়ে গা; উসকা বাদ পাঁচঠো দেনা মাতৃপিতৃবীজ সিমরণ করকে।

আমি ভাল করে চন্দন মাখিয়ে সপ্তাক্ষরবীজ মনে মনে উচ্চারণ করে আদি ওঁকারেশ্বরের

মথায় অর্পণ করলাম। অর্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে এক একটি করে বেলপাতা রেখা বেষ্টনীর বাইরে এসে ঠিকরে পড়ল। অপার বিস্ময়ে এবং আনন্দে আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। বৈশাখ মাসের কররৌদ্রে আমি বসে আছি। শেষ বিল্বপত্রটি অর্থাৎ পঞ্চম বিল্বপত্রটি ঠিকরে আসার পরই মনে হল কেউ যেন আমাকে বাতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে এইমাত্র বসিয়ে দিলেন। আমার প্রাণের মধ্যেও স্নিগ্ধ শান্তির পরশ।

মাতৃ-পিতৃবীজ সিমরণ করে এইবার আরও পাঁচটি বিল্বপত্র অর্পণ করতে হবে। বিল্বপত্রে চন্দন মাখাচ্ছি, প্রলয়দাসজী বললেন সপ্তাক্ষরমেঁ শান্তি ঔর ইস্ এ্যক্ষরমে শ্রীবিদ্যাকা একাক্ষর বীজভি হ্যয়, ইসলিয়ে ইসমেঁ তেজকা প্রকাশ হোগা । আমি ভক্তিভরে এক একটি চন্দনসিক্ত বিল্বপত্র মৃদুকণ্ঠে অস্ফুটস্বরে উচ্চারণ করতে করতে স্বয়ম্ভূলিঙ্গে অর্পণ করতে লাগলাম। পঞ্চমটি দিয়ে দেবার পরই এক একটি বিল্বপত্র ঠিকরে এসে পড়ল। রৌদ্র কিরণকে ছাপিয়ে একটা জ্যোতির গোলক আমাকে ঘিরে ধরল। উর্ধ্ব অধঃ সর্বত্র ব্যপ্ত করে যেন জ্যোতির প্রবাহ নেমে আসছে। আমি জ্ঞানে জেগে উঠেছি, আমি ধ্যানে জেগে উঠেছি, আমি তখন প্রাণে জেগে উঠেছি, বেদে জেগে উঠেছি, আমি অমৃতে জেগে উঠেছি.........।

অনেক, অনেকক্ষণ পরে মনে হল, আমার ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে মেরুদণ্ডের নিচের দিকে যেন আঙুল দিয়ে কেউ যেন দলে দিচ্ছেন। ধীরে ধীরে চেষ্টা করে চোখ খুললাম সামনে আদি ওঁকারেশ্বর আপন মহিমায় স্থিত আছেন, পেছনে দাঁড়িয়ে প্রলয়দাসজী। তিনি বললেন — তিন বাজ গিয়া। হমারা হাত পাকড়কে প্রদক্ষিণ করো। তিনি আমার হাত ধরে তিনবার এই জ্যোতির্লিঙ্গকে প্রদক্ষিণ করালেন। তাঁর সঙ্গে আমিও সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম।

— অব্ দেখা ত মহর্ষি তণ্ডিকৃত ইস্ সহস্রনামকা প্রতাপ! শূলপাণি ঝাড়িমেঁ যব পাথর গিরিজী কা আশ্রম মেঁ পুছে গা — কৌন বিধিসে আদি ওঁকারেশ্বরকো পূজা কিয়া?

— আপ্ জবাব দেগা — মহাদেওকা সহস্রনাম পাঠ করকে অর্চন কিয়া।

— যাঁহা যাঁহা আপকা মোকা মিলেগা, রেবাসংগম তক্, বিশেষতঃ শূলপাণিজী ঔর বিমলেশ্বরজী কো পাশ ইহ্ সহস্রনাম পাঠ করনা চাহিয়ে। অব চলো হমলোগ লোটেঙ্গে।

তাকিয়ে দেখলাম কোথাও কোন জনমানব নাই। খাঁ খা করছে চারিদিক। সাতপুরা পর্বতমালা এবং এই শৈলদ্বীপের বৈদূর্য পর্বত রৌদ্রতাপে যেন ঝলসে উঠছে। ভৈরবশিলা দেখতে এসে মঙ্গলদাসজীর সঙ্গে যে পথে হেঁটেছিলাম, ইনি সেই পথ ধরেই চলেছেন। ক্রমে আমরা শম্ভুনাথের পরিত্যক্ত কুটীর অতিক্রম করে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে এসে পৌঁছে গেলাম। মন্দিরের প্রধান সিঁড়ি বাদ দিয়ে পূর্বদিকের চত্বরে ছায়াতে বসলাম। বসেই তিনি বললেন — আভি তো করীব দেড় মাহিনা ইধর ঠারেঙ্গে। হররোজ এহি ওঁকারেশ্বর মন্দির মেঁ উহ্ সহস্রনাম পাঠ করিয়েগা। এই বলে তাঁর ঝোলা থেকে মহাভারতের ষোড়শ অধ্যায়ের সহস্র শিবনামের অংশটি (যা তাঁর কাছে পৃথকভাবে সেলাই করা আছে) আমার হাতে দিলেন। বললেন — কোঈ সঙ্কোচ কা বাত্ নেহি, ইস্ সহস্রনাম হমারা হৃদয়স্থ হো গিয়া। আমি বইটি নিলাম। কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকে আবার বললেন — পরিক্রমা বখৎ যিস্ রোজ থক্ জাবেগা, উস্‌রোজ মূর্ধামে ওঁকারতত্ত্ব মননকে জরুরৎ নেহি, গর্মীকা বখৎ ভি জ্যাদা মৎ করনা। আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। বুঝলাম, আসন্ন বিদায়ের পূর্বে তিনি হয়ত কিছু ভাবছেন। কিন্তু এই মুক্তপুরুষের কোন উচ্ছ্বাস বা আবেগ আছে বলে ত মনে হয় না। চোখে যে মনের

ভাবের ছায়া ফেলে সে চোখও ত বন্ধ! কিছু বোঝার উপায় নেই। আমারই বুকে কান্না যেন ডুকরে ডুকরে উঠছে। মাত্র কয়েক দিনের পরিচয়, তবুও মনে হচ্ছে যেন জন্মজন্মান্তরের বন্ধু তিনি, কত যেন আপনজন্! আমি বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলাম — আবার কবে আপনার দর্শন পাবো? তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

দু' মিনিট কাল চুপ থেকে আবার বললাম — প্রতিদিন মন্দিরে এসে যতদিন এখানে আছি, মহর্ষি তণ্ডির ঐ সহস্রনাম নিশ্চয়ই পড়ব। প্রতিদিন বিকালে রামদাসজী বলেছেন তুলসীদাসজীর 'রামচরিতমানস'পড়াবেন।

— কোঈ হরজা নেহি। আচ্ছাই হোগা। রামনাম ত ওঁকারই হ্যায়। তারকব্রহ্ম নাম 'রাম' শব্দ ঔর 'ওঁ' বরাবর একই চিজ্ হ্যায়।

— ক্যায়সে ?

— ক্যায়সে? দেখিয়ে হম্ সমঝা দেতা হুঁ।

এই বলে তাঁর ঝোলা থেকে একখণ্ড চকখড়ি বের করলেন। আমি আশ্চর্য হলাম এই ভেবে যে এই মহাযোগীর ঝোলাতে কোন বস্তুরই বা অভাব?

তিনি বললেন —

যথৈব বটবীজস্থ প্রাকৃতশ্চ মহাদ্রুমঃ।
তথৈব রামমন্ত্রস্থ বিদ্যতে চরাচরং জগৎ।।

অর্থাৎ যেমন বটগাছের একটি বীজের মধ্যে ঐ বিরাট মহীরুহের শাখা প্রশাখা পাতা ও ফল সুপ্ত থাকে, তেমনি রাম শব্দের মধ্যে এই বিশ্ব চরাচর সুপ্ত আছে।

তিনি চাথালের এক কোণে চকখড়িতে লিখে 'রাম' শব্দ বিশ্লেষণ করতে লাগলেন —

রাম = র্ + আ + ম্ + অ।
= র্ + অ + অ + ম্ + অ।।

তুমি ত জান স্বরবর্ণ মাত্রই পুংলিঙ্গ এবং স্বাধীন। আর ব্যঞ্জনবর্ণ মাত্রই স্ত্রীলিঙ্গ, পরাধীন। 'আদ্যন্ত বিপর্যয়শ্চ' — পাণিনির এই সূত্রানুসারে বিশ্লেষিত 'রাম' শব্দের 'অ' সামনে এল। তাহলে দাঁড়াল — অ + র্ + অ + অ + ম্। ব্যাকরণের নিয়ম হচ্ছে যে, যদি কোন শব্দের 'র' বর্ণের পূর্বভাগে এবং উত্তরভাগে যদি 'অ' বসে তবে তার 'র' বর্ণ 'উ' বর্ণে পরিণত হয়।

ফলে রাম শব্দের অন্ত্যভাগের র্ + অ = উ হয়ে যায়।

∴ অ + র্ + অ = উ
অর্থাৎ উ + অ = ও হল।।
ও + ম্ = ওম্ বা ওঁ হয়ে গেল।।

এইভাবে রাম শব্দের মধ্যে ওঁ লুক্কায়িত আছে। তাই ঋষিদের উপলব্ধি ওঁকারতত্ত্ব মনন করলে যেমন কোন বস্তুই অপ্রাপ্ত থাকে না, 'রাম' শব্দ মনন করলেও কোন বস্তুই অপ্রাপ্ত থাকে না। ওঁকার যেমন মোক্ষ দান করে 'রাম' এই সিদ্ধ শব্দও মোক্ষ দান করে। তাই রামমন্ত্রকে বলা হয় তারকব্রহ্ম নাম।

কমণ্ডলুর জল দিয়ে খড়ির দাগ ঘষে ঘষে ধুয়ে দিয়েই উঠে দাঁড়ালেন। তাড়াতাড়ি আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে বললাম — আবার আপনার সঙ্গে কবে দেখা হবে? কিভাবে দর্শন

পারো ?

— অন্ত্যবিষুব ক্ষেত্রমেঁ য্যায়সে আপকো পিতাজীকো দর্শন করেগা, শিউজীকো দর্শন করেগা, এ্যায়সাই হম্ ভি কভি কভি ঝিলিক মারেঙ্গে। আরে, আপ্ এ্যাতনা রোতে হোঁ কেঁও। হম্ ত আপ্‌কো বোল দিয়া,—

ন হি অক্ষিপচ্চনাচ্ছাংৎসু পঞ্চকৃষ্টয়ঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥

অর্থাৎ এই পঞ্চজন পদে যে সব মনুষ্য আছে, তারা কেউ কখনও আমার দৃষ্টি অতিক্রম করতে পারে না। আমি অনেকবার সোমপান করেছি। হম্ আপ্‌কা সাথ হরবখৎ রহুঙ্গা। পরন্তু আপ্ হামকো দর্শনকে লিয়ে কোসিস্ মৎ করনা। জব জরুরৎ হোগা হম্ ক্ষুদ্ আপকা সাথ ভেট করুঙ্গা। এই বলে তিনি আমার দুই হাত ধরে চিবুক স্পর্শ করে দুলতে দুলতে বলতে লাগলেন —

নহি মে রোদসী উভে অন্যপক্ষং চন প্রতি। কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥
অভি দ্যাং মহিনা ভুরমভী মাং পৃথিবীং মহীম্। কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥
হন্তাহং পৃথিবাসিনাং নি দধানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥
ওষমিৎ পৃথিবীমহং জঙ্ঘনানীহ বেহ বা। কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥
দিবি মে অন্যঃ পক্ষো ধো অন্যমতী কৃষম্॥ কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥
অহমস্মি মহামহোহভিনভ্যমুদীষিতঃ। কুবিৎসোমস্যাপামিতি॥ ★

অর্থাৎ দুই দ্যাবাপৃথিবী মিলিত হয়ে আমার এক অংশেরও সমান হবে না। আমি অনেকবার সোমপান করেছি। আমার মহিমা স্বর্গলোককে এবং বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে অতিক্রম করে। আমি বহুবার সোমপান করেছি। আমার এরূপ ক্ষমতা যে যদি বল, তবে এ পৃথিবীকে একস্থান হতে অন্যস্থানে সরিয়ে রাখতে পারি। আমি বহুবার সোমপান করেছি। এ পৃথিবীকে আমি দগ্ধ করতে পারি। যে স্থান বল, সেই স্থানকেই আমি ধ্বংস করতে পারি। আমি বহুবার সোমপান করেছি। আমার একটা পাশ আকাশে আছে, অন্যপাশ নিচের দিকে অর্থাৎ পৃথিবীতে রেখেছি। আমি বহুবার সোমপান করেছি। আমি মহতের মহৎ, আমি আকাশের দিকে উঠেছি। আমি বহুবার সোমপান করেছি।

দুলতে দুলতেই তিনি বেদমন্ত্রমুখে কথাগুলি বলছিলেন, ক্রমে তাঁর শরীর বেতসপত্রের মত কাঁপছে, কাঁপতে কাঁপতেই তিনি ধপ করে বসে পড়লেন। তাঁর শরীর অস্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, শরীরে কোন চেতনা আছে বলে মনে হল না। তাঁর একটি হাত বাঁকাভাবে কোলে পড়েছিল, সেই হাতটা ঠিকভাবে রাখবার জন্য হাত দিতে গিয়ে দেখি আমি যেন ডি সি কারেন্টের মুখে হাত দিয়ে ফেলেছি, ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত ঠিকরে পড়লাম প্রায় দু'হাত দূরে। আমি চুপচাপ তাঁর দিকে তাকিয়ে বসে রইলাম। ক্রমে মন্দিরের পূর্বদিকের চত্বরে বসেই অনুভব করলাম যে মন্দিরের প্রধান দরজা খুলেছে। আমি বসে বসে মহাত্মার কণ্ঠোচ্চারিত বেদমন্ত্রগুলির ভাবার্থ বোঝার চেষ্টা করতে লাগলাম। এই মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা লবরূপী ইন্দ্রদেবতা। ইন্দ্র শব্দের বৈদিক অর্থ পরমাত্মা। লব শব্দের সাধারণ অর্থ কণা বা বিভাজ্য অঙ্ক, ভগ্নাংশে সমান অংশে বিভক্ত রাশির যে কয়েক অংশ গৃহীত হয়। লব

★ এই মন্ত্রগুলি ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত ১১৯ নম্বর সূক্তে আছে। বলরূপী ইন্দ্রদেবতা এই মন্ত্রগুলির দ্রষ্টা। তিনিই ঋষি।

শব্দের বিশেষ অর্থ অতি সূক্ষ্ম কালাংশ। পূর্ণের কখনও অংশ হয় না, পূর্ণ থেকে অংশ নিলে তাও পূর্ণ, পূর্ণ নিলে পূর্ণই থাকে (from Infinity if you take Infinity, Infinity remains)। তাহলে বোঝা যাচ্ছে, মহাত্মা বিশ্বাত্মা দৃষ্টিতে এই কথাগুলি বলেছেন, এই মুহূর্তে তিনি বিশ্বাত্মার সঙ্গে যুক্ত। লব শব্দের ব্যুৎপত্তি হল — লূ + অল্ ভাবে। লূ ধাতুর অর্থ ছেদন, উচ্ছেদ, বিনাশ এবং বিলাস। মহাত্মার জীবভাবের এখন উচ্ছেদ বা অবলুপ্তি ঘটেছে। তিনি এখন শিবাত্মা, পরমব্রহ্মে চিদ্‌বিলাসের রসাস্বাদান করছেন, তাই বারবার মন্ত্রমুখে বলছেন -- আমি অনেকবার সোমপান করেছি। সূর্যাস্ত হয়ে গেছে, মন্দির শীর্ষে আলো জ্বলে উঠল, খুব গরম পড়েছে। কোটিতীর্থের ঘাটে নেমে স্নান করতে ইচ্ছা হল, কিন্তু এঁকে এই অবস্থায় একা রেখে স্নান করতে গেলাম না। মন্দিরে গেলাম না। মন্দিরে আরতির ঘন্টা বেজে উঠেছে, স্তব ও ভজন গানের সুর ভেসে আসছে। এঁর স্থির স্তব্ধ শরীরে কোন স্পন্দন দেখছি না। বসে বসেই বুঝতে পারছি, আরতি শেষ হল, একে একে ভক্তরা 'জয় ওঁকারেশ্বর, জয় ওঁকারেশ্বর, হর্ নর্মদে হর' ইত্যাদি বলতে বলতে চলে গেলেন। মন্দিরের প্রধান দরজাও বন্ধ হল, তার শব্দও শুনতে পেলাম। তার মানে রাত্রি আটটা বেজে গেছে। মন্দিরের এদিকটায় সাধারণতঃ দিনের বেলাতেই কেউ আসেন না, সন্ধ্যার পরে ত নয়ই। শান্ত, নির্জন পরিবেশ। আকাশে অজস্র তারা ঝিক্‌মিক করছে। সামনে বয়ে যাচ্ছে কলনাদিনী নর্মদা। আমার হঠাৎ মনে হল, এই মুহূর্তে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের মধ্যে রূপার দোলনায় ঘুমাচ্ছেন না, এই মহাত্মার মূর্তিতে আমার সামনে বিরাজিত ! নর্মদার দিকে তাকিয়ে দেখি উল্কার মত একটা 'আলো আকাশ চিরে নর্মদার বুকে পড়ল। কোথা থেকে একটা বিরাট কালো কুকুর এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। তার চোখ দুটো ভাঁটার মত জ্বলছে। সে এসে আমাদের কাছ হতে কিছুটা দূরে স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভীমকায় কুকুরটাকে দেখে প্রথমে আমার মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েছিল; পরক্ষণেই ভেবে নিলাম, এই কুকুরটা যেন ভৈরবেরই প্রতিমূর্তি। তন্ত্রের দেশ বাংলার ছেলে আমি, তন্ত্রের ক্লেদাক্ত সংস্কারের বীজ মনের মধ্যে সুপ্ত আছে। বাল্যকাল হতেই নানা তন্ত্রপীঠ এবং তান্ত্রিক সাধুর গল্প শুনে শুনে তা কোন না কোন সময় অপুষ্ট ও পরিপক্ক মনে যে ছায়া ফেলেছিল তা এত সহজে কি যায়। এদিকে আমার খুব প্রস্রাব পেয়েছে, প্রস্রাবের বেগ কিছুতেই সামলাতে পারছি না, অগত্যা কুকুরটার দিকে তাকিয়ে পরিহাসের সুরে মৃদুকণ্ঠে বললাম — ওহে ভৈরব! তুমি মহাত্মার পাহারায় থাক, আমি প্রস্রাব করে আসি। মন্দিরের সীমা ছাড়িয়ে অনেকটা দূরে গিয়ে প্রস্রাব করে এলাম, নর্মদায় নেমে পেটপুরে জলও খেয়ে এলাম। এসে দেখি কুকুরটা মহাত্মার আরও কাছে গিয়ে এমন আড়াআড়িভাবে শুয়ে আছে যে, আমার আর তার কাছে যাওয়ার উপায় নাই অথচ আমাকে তাঁর কাছে যেতেই হবে, নতুবা শুতে পারব না। যেখানে তিনি বসে আছেন সেই অংশটাই কতকটা সমতল। বাকী অংশ ঢালু। মহাত্মার দিকে তাকিয়ে দেখি, যেমন অবস্থায় তাঁকে দেখে গেছলাম, ঠিক তদবস্থায় তিনি নাই। একই নিস্পন্দ অবস্থায় পূর্বের মতই বসে আছেন বটে, কিন্তু এখন দেখেছি তাঁর শরীরে স্পষ্টতঃই জ্যোতির আভা ফুটে বেরোচ্ছে!

আজ আমার মন আনন্দে ভরে আছে। উচ্চকোটির কোন মহাত্মার এইরকম সমাধিস্থ অবস্থা স্বচক্ষে দেখার সৌভাগ্য ক্বচিৎ কদাচিতই ঘটে থাকে। আমি কুকুরটার দিকে তাকিয়ে বললাম — ওহে , তোমাকে এখান থেকে উঠে যেতে হবে। আমি বেদভাষ্যকার তান্ত্রিক

মহীধর নই যে 'নমঃ শ্বভঃ' এই যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রের কদর্য শ্বানঃ কুকুরান্তদরূপেভ্যো নমঃ ইতি বলে কুকুররূপী ভৈরব বা ভগবান বলে নমস্কার জানাব! অতএব তুমি এখান থেকে কেটে পড়।

আমার কথায় কুকুরটার কি মনে হল জানি না, আমার দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গর্‌গর্‌ করতে করতে সরে গেল। আমি প্রলয়দাসজীকে প্রণাম করে পূর্বের জায়গাতেই বসলাম। বসার পরেই মনে অনাবিল আনন্দের স্রোত যেন বইতে লাগল। ঘন্টার পর ঘন্টা এইভাবেই কেটে গেল। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি মনে নাই। ঘুমের মধ্যে দেখছি, চারদিকে জ্যোতির সমুদ্র, সেই জ্যোতিঃ ভূলোক দ্যুলোক ব্যাপ্ত করে যেন অনন্ত আকাশ পানে ধেয়ে চলেছে। অনেক, অনেক উচ্চে গিয়ে সেই জ্যোতিঃ কুণ্ডলীকৃত হয়ে এক বিরাট জ্যোতির পদ্মে পরিণত হল আর সেই জ্যোতির্ময় পদ্মে বসে আছেন প্রলয়দাসজী !

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, ঘুম ভাঙতেই দেখি আকাশে শুকতারা জেগে উঠেছে। বুঝলাম, সকাল হতে আর বেশী দেরী হবে না। প্রলয়দাসজীর দেহ একই অবস্থাতে আছে, জীবনের চিহ্ন কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমি আচমন করে হিরণ্যস্তূপ ঋষি দৃষ্ট দুটি বেদমন্ত্র মৃদুকণ্ঠে গাইতে লাগলাম —

ওঁ হ্বয়ামি অগ্নিং প্রথমং স্বস্তয়ে হ্বয়ামি মিত্রবরুণৌ ইহাবসে।
হ্বয়ামি রাত্রীং জগতো নিবেশনীং হ্বয়ামি দেবং সবিতারম্ ঊতয়।। (১ম। ৩৫ সূঃ। ১)

স্বস্তি চেয়ে অগ্নিদেবে আজকে ডাকি যাগে,
রক্ষা লাগি মিত্রাবরুণ আসুন পুরোভাগে।
বিরামদাত্রী রাত্রিদেবী শুনুন আহ্বান অদ্য,
সবিতারে আহ্বান করি, রক্ষা করুন সদ্য।।

যে তে পন্থা সবিতঃ পূর্ব্যাসোহরেণবঃ সুকৃতা অন্তরিক্ষে।
তেভি র্নো অদ্য পথিভিঃ সুগেভী রক্ষা চ নো অধি চ ব্রুহি দেব।। (ঐ, ১১)

পন্থা তোমার সুবিস্তৃত অন্তরীক্ষ মাঝে,
নাইকো ধূলি, শুধুই জ্যোতিঃ পূর্ব হতেই রাজে।
সে পথ বেয়ে আজকে এস মোদের রক্ষা দিতে
জাগাও জাগাও এই ঋষিরে করুণাময় চিতে।।

নিত্যসিদ্ধ বেদমন্ত্রের অমোঘ প্রভাব আর একবার প্রত্যক্ষ করলাম। মন্ত্র দুটি গাওয়া শেষ হতেই তাঁর শরীরে স্পন্দন ও কম্পন দেখা দিল। প্রায় আধঘন্টা লাগল তাঁর স্বাভাবিক হতে। ওঁ তৎসৎ, ওঁ তৎসৎ বলতে বলতে তিনি ব্যুত্থিত হলেন। আমাকে বললেন — এক মিনিটকে লিয়ে হমারা নিদ আ গয়ে থে। আমি বুঝলাম — নিদ্রাই বটে ! মন্দিরে মঙ্গল আরতির বাজনা বাজছে। তিনি বললেন — মেরা হাত পাকড়ো, প্রভুজীকা আরতি দর্শন করুঁ। আমি হাত ধরে তাঁকে ধীরে ধীরে মন্দিরে নিয়ে এলাম। আরতি ও বন্দনা যখন শেষ হল, বাইরে বেরিয়ে এসে দেখি সকাল হয়ে গেছে।

— অব্ হম্ চলেঙ্গে। হরবখৎ তুম্ হমারা নজরমেঁ রহেগা বেটা। শিবমস্তু! শিবমস্তু! আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে চলে গেলেন। আমি একদৃষ্টে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকল। চড়াই উৎরাই পথে

পাথর ডিঙিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। তাঁকে দেখবার জন্য মন্দিরের দরজার কাছে সর্বোচ্চ ধাপে গিয়ে দাঁড়ালাম। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলাম। কিছুক্ষণ পরে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে কোটিতীর্থের ঘাটে নামলাম স্নান করতে। বারবার চোখে জল নিতে লাগলাম। চোখের জল তবুও বিরাম মানছে না। বুকের ভেতরটা বড় ফাঁকা লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে নর্মদাতে স্নান করলাম। সূর্যার্ঘ্য এবং তর্পণাদি সেরে মন্দিরে ঢুকে প্রলয়দাসজী প্রদত্ত মহাভারতের অংশটি নিয়ে মহর্ষি তণ্ডিকৃত শিবের সহস্রনাম পাঠ করতে লাগলাম। প্রায় দুঘন্টা সময় লাগল পাঠ শেষ করতে। ওঁকারেশ্বরজীর পূজা ও প্রণাম সেরে হাঁটতে লাগলাম ভজন আশ্রমের দিকে। ভাবলাম — ১০ই বৈশাখ শুক্রবার এখান থেকে প্রলয়দাসজীর সঙ্গে গেছলাম, বলে গেছলাম চারদিন থাকব, আজ ১৭ই বৈশাখ শুক্রবার অর্থাৎ অষ্টমদিনে ফিরছি। না জানি রামদাসজী কতই ভাবছেন। ভজন-আশ্রমে যখন ঢুকলাম তখন বেলা ১০টা বেজে গেছে। আমাকে দেখতে পেয়ে রামদাসজীসহ সকলেই যে যার ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

— আমার ফিরতে দেরী হয়ে গেল!

— কোঈ বাত্ নেহি, কোঈ বাত নেহি। উহ্ বুঢ্ঢা মহাত্মা চৌথে দিনমেঁ ইধর আকর ষড়ঙ্গীকো বোলকে গিয়া জো আপ্ আজ পধারেঙ্গে। উস্ বখৎ হম্ ভজনমেঁ থে, হমারা সাথ উনকা ভেট নেহি হুয়া।

আর একবার চমকে উঠলাম রামদাসজীর কথা শুনে। যেদিন প্রলয়দাসজী এখানে এসেছিলেন বলে বলছেন, হিসাব করে দেখলাম, সেদিন ত তিনি নিজের গুহাতেই ছিলেন। জিজ্ঞাসা করলাম — তিনি কখন এসেছিলেন?

— করীব বেলা নয় বাজ গয়া থা।

একটু চিন্তা করতেই বুঝলাম, এ কি করে সম্ভব? সে সময় ত তিনি আমার সঙ্গে সেই তপোবনস্থিত নর্মদাতে স্নান করছিলেন। একি তাহলে কায়ব্যূহ। যোগশাস্ত্রে আছে, যাঁরা যোগেশ্বর তাঁরা কায়ব্যূহ অর্থাৎ যুগবৎ বহু শরীর নির্মাণ করে নিজেকে বহুরূপে বিভক্ত করতে পারেন, একই কালে বহুস্থানে নিজেকে প্রকট করতে পারেন। এই অচিন্ত্যশক্তিধর মহাযোগীর পক্ষে সবই সম্ভব! সবই সম্ভব!

আশ্রমদেবতাকে প্রণাম করে নিজের ঘরে গিয়ে বসে থাকলাম চুপ করে। একটু পরেই রামদাসজী এক গ্লাস মাঠা হাতে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন। বললেন — এটা খেয়ে নাও, তোমার শরীর খুব উজ্জ্বল হয়েছে দেখছি। তবে মুখখানি এত শুকনো লাগছে কেন? এই দেখ, মহাত্মা সুমেরদাসজীর চিঠি, তিনি তোমার খবর জানতে চেয়ে পত্র দিয়েছেন। তুমি যেদিন গেলে সেদিনই পত্রটি এসেছে। কিন্তু তুমি এক অন্ধ বৃদ্ধ সাধুর সঙ্গে কোথাও গেছ লিখলে তিনি আবার উদ্বিগ্ন হবেন। তাই আমি উত্তর দিইনি। আমার ইচ্ছা, তুমি নিজের হাতে একখানা পত্র লেখ।

এই বলে তিনি মঙ্গলদাসজীকে ডাক দিলেন। তিনিও একটি পত্র হাতে করে আনলেন। বললেন — শম্ভুনাথ ভাই স্ত্রী-পুত্রের কাছে গিয়ে আনন্দে আছে। আপনাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে। লিখেছে, আপনি এখানে থাকতে থাকতেই বিন্নী ও কিষেণকে নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি দখান পত্রই একধারে রেখে বললাম — এখন

থাক, পরে পড়ব, বড় ক্লান্ত লাগছে। একটু ঘুমিয়ে নিই।

তাঁরা যে যার ঘরে চলে গেলেন। আমি শুয়ে পড়লাম। এত গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম যে, কখন যে ভোগ নিবেদন হয়েছে, আরতি হয়েছে, ঘন্টা খোল করতালের বাজনা বেজেছে, তা আমি জানতে পারিনি। যখন ঘুম ভাঙল, তখন দেখি আমার ঘরের সামনে রামদাসজী বসে আছেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। আমার জন্য সবাই বসে ছিলেন, আমরা একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। খেতে বসে কেবলই ভাবছি, আমি এ কয়দিন কোথায় ছিলাম, কিভাবে সময় কাটল, রামদাসজী জিজ্ঞাসা করলে কি উত্তর দেব? শেষ পর্যন্ত কি নর্মদাতীর্থের এই শ্রেষ্ঠ তীর্থস্থানে বসে মিথ্যা কথা বলতে হবে? সেই তপোবন, ভগবান পতঞ্জলি ও যোগীন্দ্র গোবিন্দপাদজীর গুহা সম্বন্ধে কিছু বলা চলবে না? প্রলয়দাসজীর নিষেধ আছে। সংকল্প করলাম, শেষ পর্যন্ত কেউ যদি জিজ্ঞাসাই করেন, তবে স্পষ্ট বলে দেব, 'মাপ করবেন, এ সম্বন্ধে আমি কিছুই বলতে পারব না।কিন্তু নর্মদামায়ীর কি দয়া, এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জিজ্ঞাসা করলেন না। এখানকার আশ্রমিকদের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, এঁরা কোন বিষয়েই কোন অনাবশ্যক কৌতূহল প্রকাশ করেন না।

প্রসাদ প্রাপ্তির পর ঘরে বসে রামদাসজীকে লেখা সুমেরদাসজীর পত্র ও শম্ভুনাথজীর পত্র পড়লাম। মঙ্গলদাসজীকে শম্ভুনাথের পত্রের উত্তর দিতে হবে বলে একটি খাম ও কাগজ চেয়ে নিয়ে সুমেরদাসজীকে নিজ হাতে পত্র লিখতে বসলাম। পরিক্রমার সবকিছু বিবরণ লিখে ধাঁধাঁয় পড়লাম প্রলয়দাসজীর বিবরণ লিখব কিনা কলম হাতে নিয়ে ভাবছি, এমন সময় দীনদয়াল 'সাপ সাপ' বলে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এল। যে যার ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এসেছে, মঙ্গলদাসজীর হাতে একটা বড় লাঠি, আমিও কাগজ কলম রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ব্যাপারটা হল, দীনদয়ালকে সাপ কামড়ায়নি, কুটীরের জানালা দিয়ে সাপকে ঢুকতে দেখেই সে সোরগোল তুলেছে। রামদাসজী মঙ্গলদাসকে লাঠি ছুঁড়ে ফেলতে বললেন উঠোনে। নিজেই ঘরে ঢুকে সাপের দিকে তাকিয়ে যুক্তকরে বলতে লাগলেন, রামজী! তোমার করুণার অন্ত নেই। আমরা তোমার কোন সেবা পূজা করতে পারিনি। আমরা কি এতই অধম যে আমাদের কাউকে দংশন না করে তোমার ক্রোধ শান্ত হবে না? যদি দংশন করতেই হয় আমাকেই কর। দীনদয়াল বালক, তার বাপ মা পরম বিশ্বাসে তোমার এই আশ্রমে তাকে রেখে গেছে।

এইবলে রামদাসজী নতজানু হয়ে বুক পেতে দিলেন। প্রথমে রামদাসজী ঘরে ঢুকতেই কালকেউটে তার ফণা বিস্তার করেছিল কিন্তু তাঁর ঐ কথাগুলিতে কি এমন যাদু ছিল জানি না, দেখলাম সাপটা ধীরে ধীরে ফণা নামিয়ে জানালা দিয়েই বেরিয়ে গেল। রামদাসজী দীনদয়ালকে বললেন — যদি তোমার ভয় করে, আজ থেকে তুমি আমার ঘরে শোও, আমি এই ঘরে থাকব। দীনদয়াল জানাল, তার আর ভয় করছে না, সে এই ঘরেই থাকবে। রামদাসজী বলতে লাগলেন — দেখ, আমাদের রামভক্তির বড় অভাব। প্রভুর চরণে সর্বাবস্থাতে বিশ্বাস থাকলে বিপদবারণ প্রভু রক্ষা করেন, একথা ধ্রুব সত্য বলে জানবে। এই প্রসঙ্গে মহাসাধিকা মীরাবাঈ এর কথা স্মরণ কর। মীরাবাঈ দিবারাত্র গিরিধারীর সেবায় ও ভজনে মত্ত থাকতেন বলে তাঁর স্বামী এবং মেবার রাজপ্রাসাদের লোকজন তাঁর ওপর খুব অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। বারবার তাঁরা মীরাকে কৌশলে হত্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু

কৃষ্ণগতপ্রাণা মীরাকে তাঁর প্রভু বারবার রক্ষা করেন। মীরার ভজনে সে কাহিনীর বর্ণনা আছে! এইবলে রামদাসজী গান ধরলেন —

সাঁপ পিটারা রাণা ভেজিয়ো,
মীরা হাথ দিয়ো জায়,
হ্নায় ধোয় দেখন লাগি
শালিগ্রাম গঈ পায়।
জহরকা পেয়ালা রাণা ভেজিয়ো
অমৃত দীহ্ন বনায়।
হ্নায় ধোয় জব্ পীবন লাগী
হো অমর অঁচায়।
মীরা কে প্রভু সদাই সহাঈ,
রাখে বিঘন ঘটায়।
ভজনভাব মেঁ মস্ত ডোলতী,
গিরধর পৈ বল জায়।।

অর্থাৎ মীরা বলছেন — রাণা পাঠিয়েছেন বিষাক্ত সাপের ঝাঁপি, মীরা স্নান করে এসে দেখতে লাগলেন, পেয়ে গেলেন শালগ্রাম শিলা। রাণা পাঠালেন বিষের পেয়ালা, সেটা হয়ে গেল অমৃত রসায়ন, মীরা স্নান করে তা খেয়ে নিলেন। প্রিয়ের অমৃতস্পর্শে বিষ পরিণত হল অমৃতে। মীরার প্রিয়তম গিরিধারী তাঁর সহায় তিনি তাঁকে সব বিঘ্ন থেকে রক্ষা করছেন। মীরা ডুবে আছে তাঁর প্রিয়তমেরই নাম গানে, মন পড়ে আছে প্রভুরই ওপর।

রামদাসজী যে অপূর্ব ভজন গানও গাইতে পারেন, আজ তার পরিচয় পেলাম। ঘরে ঢুকে সুমেরদাসজীকে চিঠি লেখা শেষ করে খামের মধ্যে ভরে মুখ এঁটে দিলাম। প্রলয়দাসজীর প্রসঙ্গ লিখতে যেতেই যখন বাধা পড়ল, তখন আর লিখলাম না। বাবা বলতেন — মহাপুরুষ যখন কোন কিছু করতে আদেশ করেন, তখন সেই আদেশ প্রতিপালন করার সার্মথ্য দান করেন। আবার যখন কোন বিষয়ে নিষেধ করেন, তা করবার উদ্যোগ করলেই তাতে অজস্র বাধাও সৃষ্টি করে থাকেন। গুরু বা গুরুস্থানীয় মহাযোগীরা এইভাবেই মনমুখী জীবের প্রতিটি কাজ নিয়ন্ত্রণ করে চলেছেন।

আজ আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হল না। সন্ধ্যাবেলা মন্দিরে গিয়ে একটা রূপোর দোলনা দুলিয়ে সেই শূন্য দোলনায় ওঁকারেশ্বরকে ঘুম পাড়ানোর যে অভিনয় করা হয়, তা প্রতি সন্ধ্যায় গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হল না। সন্ধ্যা হতেই ঘরে বসে প্রদীপের আলোয় প্রলয়দাসজীর সেই রহস্যময় তপোবনের স্মৃতিচারণ করতে করতে ডায়েরীতে সব কথা লিখে ফেললাম। আজ বড় ক্লান্ত লাগছে। শরীর ও মন অবসাদে ভরে আছে। শুয়ে পড়বার উদ্যোগ করছি, এমন সময় ষড়ঙ্গী মহারাজ এসে সুমেরদাসজীকে লেখা চিঠিটা ডাকঘরে ফেলবেন বলে, আমার কাছ হতে চেয়ে নিলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — যে জরাজীর্ণ বৃদ্ধ সাধুটি আপনার খবর দেবার জন্য এসেছিলেন, তিনি ত একে চোখে দেখতে পান না, তার ওপর বার্ধক্যের জন্য তাঁর শরীরও প্রতিনিয়ত কাঁপছিল। আপনি কি তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন? তিনি আপনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন কিভাবে? তাঁর কঙ্কালসার শরীর দেখে আমারই খুব

মায়া হচ্ছিল।

— আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। আপনার দয়ার শরীর, স্নেহ কোমল মনও খুব মায়াবী। তাই মায়া জেগেছিল। এখন আপনি আসুন।

বড়ঙ্গী মহারাজ আর দাঁড়ালেন না। অতঃপর আর কোনদিন ঐ বিষয়ে জিজ্ঞাসাও করেন নি। শুয়ে পড়লাম বটে, কিন্তু ঘুম কি সহজে আসে? প্রলয়দাসজী এবং তাঁর সেই অদ্ভুত তপস্থলীর কথা, রহস্যময় প্রদীপ, সেই বাঘের হুঙ্কার, বিদেহ অবস্থাতেও দেহধারণ করে বাবার দর্শনলাভ — সব কথাই একে একে মনে পড়তে লাগল। অনেক রাত্রে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুমন্ত অবস্থাতেও আমার চোখে ভেসে উঠল গতরাত্রে ওঁকারেশ্বর মন্দিরের পূর্বপাশে প্রলয়দাসজীর সেই দুর্লভ সমাধি অবস্থার ছবি। আমি যেন তাঁকে প্রণাম করবার জন্য নত হয়েছি, এই অবস্থায় আমার ঘুম ভেঙে গেল। আশ্রমে তখন মঙ্গল আরতি হচ্ছে।

সকালেই উঠে গেলাম কোটিতীর্থের ঘাটে স্নান করতে। স্নান করে মন্দিরে ঢুকে নাটমন্দিরের এককোণে বসে মহর্ষি তণ্ডিকৃত শিবের সহস্রনাম পাঠ করলাম। পূজা করে ফিরে এলাম ভজন-আশ্রমে। দিনের পর দিন একই নিয়মে চলতে থাকলাম। সকালে মন্দিরে গিয়ে শিবের সহস্রনাম পাঠ বিকেলে রামদাসজীর কাছে বসে, 'রামচরিতমানসের' কঠিন কঠিন শব্দের অর্থ বুঝে নেওয়া এই ধারাতেই বৈশাখ মাস শেষ হল। প্রচণ্ড গরম। সারা ওঁকারেশ্বর পাহাড় যেন জ্বলছে। বেলা ১২টা বাজলে রাস্তায় পা ফেলাই কঠিন। কেন যে পরিক্রমাবাসীরা গরমকালে পরিক্রমা বন্ধ রাখেন, তা ভালভাবেই উপলব্ধি করছি। সারা দুপুর হাঁসপাশ করে কাটছে ঘুমোতেও পারি না। স্থির হয়ে বসে শান্ত মনে রামচরিতমানসেও মন দিতে পারি না। বাইরেও বেরোতে পারি না। সন্ধ্যা সাতটা আটটা পর্যন্ত গরম বাতাস বইতে থাকে। এই গরম বাতাসের নাম — লু, লু লাগলে বড়ই সঙ্গীন অবস্থা হয় মানুষের, প্রচণ্ড জ্বরের সঙ্গে বারবার পায়খানা হতে থাকে। রোজই শুনি, লু লেগে দু'একজন লোক মারা গেছে। রামদাসজী একদিন বলেছিলেন — নর্মদার জল এমন পবিত্র এবং স্বাস্থ্যপ্রদ, সাতপুরা ও বিন্ধ্যপর্বতের বায়ু এমনই রসায়ণ যে এখানে কারও পেটের রোগ ত নয়ই, অন্য কোনও রোগেও এ অঞ্চলের লোকরা ভোগে না। সামান্য ভুট্টা ও জোয়ারের রুটি খেয়েই এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দ্রঢ়িষ্ঠ বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য নিয়ে দীর্ঘজীবী হয়। গরমকালে একমাত্র 'লু' ই অকালমৃত্যু ঘটায়। কাজেই প্রায় প্রতিদিনই একবার করে সকলকে তিনি লু সম্বন্ধে সাবধান বাণী শোনান। জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথম সপ্তাহে একদিন মঙ্গলদাসজী খুব হাসি হাসি মুখে এসে আমাকে জানালেন — শম্ভুনাথ ভাই তাঁর স্ত্রী পুত্র নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবে বলে লিখেছে। বাচ্চাটিকে নিয়ে আসবে, তাই 'লু' এর ভয়ে গুরুজী খুব সকাল সকাল এখানে এসে পৌঁছতে তাকে লিখে দিয়েছেন। আমি বাহাতী ধর্মশালায় যাচ্ছি, শম্ভুনাথের জন্য নিচের তলায় একখানা ঘরের বন্দোবস্ত করতে। যাবেন নাকি আমার সঙ্গে? লাডলীলালজী একদিন সৎসঙ্গ করতে এসে আপনার খোঁজ করেছিলেন। আমি ভাবলাম, রামদাসজী ঐ ধর্মশালার উপরতলায় একদিন আমাকে নর্মদা — কাবেরী সঙ্গম, এরণ্ডী সঙ্গম, বিষ্ণুপুরী ইত্যাদি দেখিয়েছিলেন। তখন ত সে সব জায়গায় আমার যাওয়া হয়নি, তাই তিনি উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে সব কিছু বর্ণনা করলেও সত্যি কথা বলতে কি আমি বিশেষ কিছু বুঝতে পারি নি। এখন মোটামুটি সব দেখা হয়ে গেছে। এখন ধর্মশালার সর্বোচ্চ তলায় উঠলে স্পষ্টভাবে সব চিনতে পারব। কাজেই

মঙ্গলদাসজীর সঙ্গে আমি যেতে রাজী হয়ে গেলাম।

পথে যেতে যেতে মঙ্গলদাসজী বললেন — লাডলীলালজীর পুত্র ও পুত্রবধূ এসেছে। তাদের চার বৎসর বয়স্ক একমাত্র পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে।

— এত গরমের মধ্যে এসেছে ছোট বাচ্চা নিয়ে?

— ওঁকারেশ্বরজীর ব্রত করে ঐ ছেলেটি জ্যৈষ্ঠ মাসে জন্মেছে বলে সেই মানৎ শোধ করার জন্য জ্যৈষ্ঠ মাসেই এসেছে। ঘরের বাইরে রোদের সময় না বেরোলে লু লাগার সম্ভাবনা নেই। তা ছাড়া এখানকার জলবায়ু ত খুবই ভাল।

কথা বলতে বলতে আমরা বাহাতী ধর্মশালায় পৌঁছে গেলাম। নিচে কিছু মজুর কাজ করছে, লাডলীলালজী বলছেন — আভি নেহি, আভি নেহি, বিলকুল ফুরসৎ নেহি হ্যায়, এগারহ্ বাজনেকা পহেলে মজদুর লোগোঁসে উহ্ কাম মুঝে 'ফিনিস' করনেহি পড়েগা, জ্যায়দা ধূপ হোনেসে উহ্‌লোগ্ কামসে ছুটি কর্ দেগা। একজন মেয়ে ছেলে এবং বেটাছেলে একসঙ্গেই বলছেন বলে মনে হল — বাবুজী থোড়া ঠার জাইয়ে পাঁচ মিনট কা অন্দর ঠাণ্ডী সরবৎ রেডি হো জাবেগা। অনুমান করলাম, তিনি তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূর সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁদের কথা অগ্রাহ্য করে লাডলীলালজী দুপ্‌দাপ্ শব্দে বিশাল বারান্দা পেরিয়ে এদিকেই আসছেন বলে মনে হল। আমরা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠছি। এমন সময় শুনতে পেলাম একটা কচি বাচ্চার কণ্ঠস্বর। সে দা-দা, দা-দা শব্দ করতে করতে দৌড়ে আসছে। আমরা দোতলার ল্যাণ্ডিং-এ পৌঁছে দেখতে পেলাম, লাডলীলালজী ঘুরে দাঁড়িয়ে বাচ্চাটিকে কোলে তুলে নিয়ে সেইখানেই বসে পড়লেন। চিৎকার করে বললেন — লেও মাইজী, সরবৎ লে আও, তুরন্ত করিয়ে, ইধর পিকর যাউঙ্গা। আমি হো হো করে হেসে উঠলাম, আমার হাসির শব্দে সচকিত হয়ে তিনি আমাদেরকে দেখতে পেয়েই বললেন — আপ কব্ লৌটা হ্যায়? তাঁর ছেলে তাড়াতাড়ি আমাদের বসার জন্য আসন পেতে দিলেন। ছেলেটিকে জড়িয়ে ধরে আমাদেরকে বললেন — পোতা হ্যায়, বহুৎ বিচ্ছু হ্যায়। সুন্দর ছেলেটি, লাল টুক্‌টুক্ করছে গায়ের রঙ। কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, চোখে কাজল। আমি তাঁকে হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলাম — আমি হো হো করে হাসছিলাম কেন বলুন ত?

— সমঝ্ নেহি পাতা হৈ। আপ্ কহিয়ে।

আমি বললাম, আমাদের বাংলাদেশে একটা কথা চালু আছে যে টাকার চেয়ে টাকার সুদ মিষ্টি। ছেলের চেয়ে নাতি বেশী পেয়ারের হয়। এই একটু আগে, আপনি ছেলে ও ছেলের বৌএর অনুরোধ ঠেলে নিচে নেমে যাচ্ছিলেন, কিন্তু নাতি এসে যেই আধো আধো বুলিতে জড়িয়ে ধরল, অমনি আপনি ছুটি তৈরী করে নিলেন। এখন আপনার অঢেল অবসর! ছেলে বৌকে ধমকাতে পেরেছিলেন কিন্তু নাতির কাছে হেরে গেলেন! আপনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নাম শুনেছেন?

— হাঁ, হাঁ, তামাম্ হিন্দস্থানমেঁ ত উনোনে একমাত্র কবি হ্যায় যিন্‌কো নোবল প্রাইজ মিলা।

— ঐ অমর কবি 'ঠাকুরদাদার ছুটি' নামক কবিতায় দাদু নাতির এই মধুর স্নেহ সম্বন্ধের কি সুন্দর ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন শুনুন। ঠাকুরদাদা নাতিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন —

আমি তোমার চশমা-পরা বুড়ো ঠাকুরদাদা,
বিষয়-কাজের মাকড়সাটার বিষম জালে বাঁধা।

আমার ছুটি তোমারই ওই চপল চোখের নাচে,
তোমার ছুটির মাঝখানেতেই আমার ছুটি আছে।।
আমার ঘরে ছুটির বন্যা তোমার লাফে ঝাঁপে,
কাজ কর্ম হিসাব কিতাব থর্‌থরিয়ে কাঁপে।
গলা আমার জড়িয়ে ধর ঝাঁপিয়ে পড় কোলে —
সেই তো আমার অসীম ছুটি প্রাণের তুফান তোলে।
তোমার ছুটি কে যে জোগায় জানিনে তার রীত —
আমার ছুটি জোগাও তুমি, ওইখানে মোর জিত।।

কবিতাটি তিনি চোখ বন্ধ করে শুনলেন। আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন — ইসকা মতবল কেয়া? কৃপা করকে সমঝা দিজিয়ে।

আমি বললাম — আমার ভাঙা ভাঙা হিন্দী বুলিতে এর অর্থ আমি বললেও আপনি বুঝতে পারবেন না। এই কবিতার রস অন্তর দিয়ে আস্বাদন ও উপলব্ধি করার বস্তু। যাইহোক তাকে হিন্দীতে অনুবাদ করে বলতে লাগলাম। আমার সেই দুর্বল ও অক্ষম হিন্দী অনুবাদ শুনেও তিনি বললেন — রস মিলতি হ্যায়, থোড়া বহুৎ সমঝ লিয়া।

— এইখানেই বিশ্বকবির শ্রেষ্ঠত্ব।

এইবলে তাঁর অনুমতি নিয়ে সর্বোচ্চ তলায় উঠে গেলাম। দক্ষিণতটের বিষ্ণুপুরীর বিভিন্ন মন্দির, ঈশান কোণের দিকে কাবেরী-নর্মদা সংগম ; এরণ্ডী সংগম প্রভৃতিকে ভালভাবেই চিনতে পারলাম, কিন্তু মন্মথেশ্বর শিবের মন্দির ভালভাবে চিহ্নিত করতে পারলাম না। নমস্কার করে নীচে নেমে এলাম। ইতিমধ্যে মঙ্গলদাসজী শম্ভুনাথজীর জন্য ঘরের বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন। লাডলীলালজী নাতিকে কোলে নিয়ে মজদুরদের কাজের তদারকি করছেন।

আজকাল প্রতিদিনই বিকেলে 'রামচরিতমানস' পড়ছি, রামদাসজীর ব্যাখ্যা শুনে দুর্বোধ্য ঠেট্ হিন্দী শব্দের রসও উপলব্ধি করতে পারছি ক্রমশঃ। প্রলয়দাসজীর সেই অপূর্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ শোনার পর থেকে রাম নামই যে ওঁকার — এ বিশ্বাস ধীরে ধীরে দৃঢ় হচ্ছে। তুলসীদাসজী যথার্থ কথাই বলে গেছেন —

সংসারাময় ভেষজং সুখকরং শ্রীজানকী জীবনং।
ধন্যাস্তে কৃতিনঃ পিবন্তি সততং শ্রীরামনামামৃতং।।

সংসার রোগের একমাত্র নিরাময়কারী ভেষজ হল রামনাম — পরম সুখকর এবং আনন্দপ্রদ। যাঁরা সতত রামনামের অমৃত পান করতে পারেন, সেইসব কৃতিপুরুষরাই ধন্য।

একদিন ইচ্ছে হল, রামনামের মধ্যে যদি সত্যই ওঁ শব্দ লুক্কায়িত থাকে, তাহলে মূর্ধাতে ওঁকারতত্ত্বে মননের যে পদ্ধতি প্রলয়দাসজী শিখিয়েছেন সেই পদ্ধতিতে "রাম" শব্দ মনন করে দেখলে কেমন হয়? ভাবনা মাত্রই একদিন ক্রিয়াতে বসে গেলাম সন্ধ্যাবেলা। প্রাণবায়ুকে ঈড়া ও পিঙ্গলার সন্ধিস্থানে এনে প্রলয়দাসজীর মতে যেটি প্রকৃত অমাবস্যার ক্ষণ, সেই সময়ে ওঁএর পরিবর্তে রাম শব্দ অনুধ্যান করতে আরম্ভ করলাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হল নক্ষত্রখচিত আকাশ আমার মস্তিষ্ক প্রদেশ হতে মাত্র এক বিঘৎ উঁচুতে নেমে এসেছে। ধীরে ধীর সেই আকাশের মধ্যস্থলে পূর্ণচন্দ্রের উদয় হল। স্নিগ্ধ বিমল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত হচ্ছে সমগ্র বিশ্বচরাচর। হঠাৎ সেই পূর্ণচন্দ্রের মধ্যস্থল ভেদ করে জাগ্রত হল ওঁকার শব্দ। সেই গুরুগম্ভীর উদ্‌গীথনাদে আমি ডুবে গেলাম, আমার স্নায়ুতে স্নায়ুতে, তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে, শিরা ও ধমনীতে প্রতি রক্ত কণিকাতে শুনতে পাচ্ছি ওঁকারের ঝঙ্কার। ওঁকারের নর্তনে উচ্ছলে উঠছে মন,

মধুর রস।

সকালে যখন জেগে উঠলাম, তখন পূর্বাকাশে অরুণোদয় হচ্ছে। তখনও আমার ঘোর কাটেনি। আমি শুনতে পাচ্ছি, রামদাসজী 'অদ্বৈতসিদ্ধি' প্রণেতা বাংলার দ্বিতীয় শংকরাচার্য শ্রীমৎ মধুসূদন সরস্বতীকৃত শ্লোকে তুলসীদাসজীর বন্দনা করছেন —

আনন্দকাননেহ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসীতরুঃ।
কবিতামঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-চুম্বিতাঃ॥

অর্থাৎ বারাণসীর আনন্দকাননে তুলসীদাস হচ্ছেন একটি চলমান তুলসীবৃক্ষ। এ বৃক্ষের কবিতা-মঞ্জরী রামরূপ ভ্রমর দ্বারা চুম্বিত হচ্ছে।

আমি মন দিয়ে শুনে শ্লোকটি ডায়েরীতে টুকে নিয়ে স্নান করতে চলে গেলাম, কমণ্ডলু ও প্রলয়দাসজী প্রদত্ত মহাভারতের অংশটি হাতে নিয়ে। আজকাল কোটিশ্বর ঘাট বা ওঁকরেশ্বরের মন্দিরে এলেই মন্দিরের পূর্বদিকে যেখানে প্রলয়দাসজীর মহাচেতন সমুখানের দিব্যভাব প্রত্যক্ষ করেছিলাম, সেদিকটাতেই আগে নজর পড়ে। আমি যথারীতি স্নান তর্পণাদি সেরে মন্দিরে ঢুকে শিবের সহস্রনাম পাঠ করলাম। পাঠান্তে ওঁকারেশ্বরজীর মাথায় জল ঢেলে এসে দেখি, ভজন-আশ্রমে শম্ভুনাথজী তাঁর উপদেশ শুনছেন। শম্ভুনাথ ভাই এর কিযেণ কল্‌কল্ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীনদয়াল তাকে নিয়ে খেলা করছে। এখানে আসার পূর্বে বোধহয় বিষ্ণুপুরীর ঘাটে সবাই স্নান করে এসেছে। কেউ বাচ্চাটির নাকে কপালে ও দুই গালে চন্দন দিয়ে চিত্র বিচিত্র এঁকে দিয়েছে। অপরূপ সুন্দর দেখতে হয়েছে। আমি ঘরে ঢুকে বসার সঙ্গে সঙ্গেই রামদাসজী দীনদয়ালের হাতে সরবৎ পাঠিয়ে দিয়েই একটু পরেই তাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন —

লেও মায়ী, ইন্‌কো দশঠো প্রণাম কিজিয়ে। ইনকো নিমিত্ত করকে প্রভু রামচন্দ্রজী আপ্‌কো দুঃখ হটা দিয়া, শম্ভুনাথকা সাথ পুনর্মিলন হো গিয়া। আমি কিছুতেই প্রণাম করতে দেব না, মেয়েটিও ছাড়বে না, শম্ভুনাথও নাছোড়বান্দা। শম্ভুনাথ এবং তাঁর পত্নী নানাভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে লাগলেন। আমি বাচ্চাটিকে একটু আদর করলাম। ঘোমটার ভেতর থেকে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বিন্নীমাতা আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন — যবতক্ হম্ দোনো জিন্দা রহেগা, আপকো ভুলেগা নেহি, নর্মদামায়ী আপ্‌কো আচ্ছাই করেগা, এই বলে কাঁদতে লাগলেন। মাকে কাঁদতে দেখে কিযেণ গিয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরল।

রামদাসজী নানাভাবে তাদেরকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। বললেন — পূর্বাশ্রমে আমি আমার এক মুসলমান অধ্যাপকের কাছে কিছুকাল সূফীসাধক জালালুদ্দীন রুমীর মসনবী পড়েছিলাম। মসনবীর একটা বয়াৎ মনে পড়ছে। তাতে রুমী বলছেন —

আজ একে কূজা দিহদ
জহর ঔর আছল্।
হর একেরা দস্ত্-এ হক্
ইজ্জ ঔর জ্জল্॥

অর্থাৎ পরমেশ্বরের মঙ্গলহস্ত একই কূজা হতে প্রত্যেককে দেন — কাউকে দেন জহর (বিষ), কাউকে দেন আছল্ (মধু), পাত্রটি এক, অতএব তার মধ্যে যে পানীয় আছে, তাও এক। কিন্তু তবু কেউ পায় বিষ কেউ বা পায় মধু। তোমরা স্বামীস্ত্রী পূর্বজন্মের কোন কর্মদোষে তিন চার বছর বিষের জ্বালায় জ্বলছিলে। এখন যখন প্রভুর দয়ায় মধুরভাগ

ভাগ্যবশে পেয়ে গেলে, তখন স্বামীস্ত্রী উভয়ে মিলে প্রতিনিয়ত প্রভুকে স্মরণ করতে করতে সংসার জীবনকেই আনন্দকাননে পরিণত কর। এখন চল যাই, প্রভুজীর ভোগারতি হবে, সবাই মিলে দর্শন করি।

ভোগারতির পর সবাই একসঙ্গে বসে প্রসাদ পেলাম। শম্ভুনাথরা সন্ধ্যা পর্যন্ত আশ্রমে থেকে মঙ্গলদাসজীর সঙ্গে ওঁকারেশ্বরজীর আরতি দেখতে গেল। সেখান থেকে তারা চলে যাবে বাহাত্তী ধর্মশালায় রাত্রি বাস করতে। রামদাসজীর নির্দেশে ত্রিরাত্রি তীর্থবাস করবেন, তারপর ফিরে যাবেন নিজেদের বাড়ীতে। মঙ্গলদাসজীর কাছে শুনলাম শম্ভুনাথজী গৃহে প্রত্যাবর্তনের পর তার কাকারা সমূহ সম্পত্তি প্রত্যার্পণ করেছেন। শম্ভুনাথের যা ক্ষেতি-উতি আছে, তাতে তাঁর স্বচ্ছন্দে চলে যাবে শুনে আমার খুব আনন্দ হল।

ত্রিরাত্রি তীর্থবাসের শেষদিনে ধর্মশালা থেকে সপরিবারে শম্ভুনাথ ভজন আশ্রমে এসেছেন। কাল ভোরেই তাঁরা নিজেদের মহল্লায় ফিরে যাবেন। আজ রামদাসজীর শরীরটা ভাল নেই। বেলা চারটের সময় সৎসঙ্গ আরম্ভ হল। আজ বক্তা ষড়ঙ্গী মহারাজ। তিনি রামচরিতমানসের এক অধ্যায় ব্যাখ্যা করলেন। রামকথা অমৃততুল্য, সর্বক্ষণই উপাদেয় কিন্তু তাঁর একটি কথাও আজ আমার কানে ঢুকল না। আমার মন চলে গেছে, আমার কালিয়াড়া গ্রামে। চৈত্রমাস হতে জ্যৈষ্ঠ মাস পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে রামায়ণের আসর বসত। আমার ছোটমাসী রামায়ণ পাঠ করতেন। পাঠের পূর্বে বাবা 'দশরথের দুলালিয়া রাম' — এই ধুয়া দিয়ে রামচন্দ্রের একটি ভজন গাইতেন আর মাঝে মাঝেই বলে উঠতেন —

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ দমন রাম।
শমন-ভবন না হয় গমন, যে লয় রামের নাম॥

বাবুজেলা নামে আমাদের একজন প্রতিবেশী ছিলেন, বাবার বাল্যবন্ধু। তিনি পাঠশালার পাঠ কোনমতে শেষ করেছিলেন। বিদ্যা অল্প হলে কি হবে, তাঁর ছিল অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি, সমগ্র কৃত্তিবাসী রামায়ণ তাঁর মুখস্থ ছিল। কোন কোন দিন তিনি তাঁর স্মৃতি থেকে 'ছাঁদের পর ছাঁদ' সুর করে আউড়ে যেতেন। রামচন্দ্রের বনবাস, লক্ষ্মণ বর্জন, ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক রাম-লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্দীকরণ, অশোকবনে মা জানকীর বিলাপ প্রভৃতি করুণ কাহিনী শোনবার সময় তাঁর সেই অবিরলধারে অশ্রু মোচনের দৃশ্য সবই জীবন্ত হয়ে ভেসে উঠছে আমার চোখে। স্মৃতিচারণ করতে করতে আমি এমন তন্ময় হয়ে গেছলাম যে, বাংলা ভাষায় লেখা বলে মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত বাংলা রামায়ণ বিশাল ভারতীয় জনতার প্রাণের ভাষা হয়ে ওঠেনি, নতুবা কল্পনার বিস্তার ভাব ভাষা ও ছন্দের বর্ণাঢ্য ঐশ্বর্য ভক্তির রসঘন প্রসাদগুণে কৃত্তিবাসের কীর্তি অনেক বেশী। কৃত্তিবাসের রামায়ণও লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে। বটতলা হতে তেতলা, গরীবের পর্ণশালা হতে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত বাংলা রামায়ণের প্রভাব অব্যাহত। সহসা রামদাসজী আমার গায়ে টোকা মেরে আমাকেও সৎসঙ্গে কিছু বলতে বললেন। চিন্তাসূত্র ছিন্ন হওয়ায় আমার মন অসীম বিরক্তিতে ভরে গেল।

আমি নর্মদাতটে শিখতে এসেছি, জানতে এসেছি। আপনি দয়া করে আমাকে অব্যাহতি দিন। কিন্তু মহাত্মা কিছুতেই শুনলেন না। তাঁর চাপে পড়ে তখন বললাম, রামায়ণের প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমি যদি কোন একটা গল্প বলি, তাতে কি চলবে?

— হাঁ, হাঁ, যো কুছ হো আপ্ বলিয়ে।

আমি তখন সত্য সত্যই এক অপ্রাসঙ্গিক গল্পের অবতারণা করে বসলাম — এক রাজা ছিলেন। হঠাৎ একদিন তাঁর সংসার ত্যাগ করে বনে যেতে ইচ্ছে হল। তাঁর সংকল্পের কথা রাণীকে জানালেন। রাণী তাঁকে বাধা দিলেন। অনেক মান অভিমান চোখের জল, কোন কিছুতেই রাজা যখন নিরস্ত হতে চাইলেন না, তখন রাণী তাঁর সঙ্গে তুমুল তর্ক জুড়ে দিলেন। বললেন — অরণ্যে গিয়ে আপনার যে অধিক সুখ হবে, একথা আপনাকে কে বলেছে? শাস্ত্রে কোথায় আছে যেকোন মতে সংসার ত্যাগ করে, ঝুলি ও লোটা হাতে বনে গিয়ে বসতে পারলেই ভগবান এসে দর্শন দিতে বাধ্য! দুবিধামে দুনো গয়ে মায়া মিলে রাম! অর্থাৎ মহাজন বাক্য হল, দু'দিকে মন দিলে সংসার সুখ ভেসে যায়, রামও মেলে না। যেমন ধরুন, আপনি ঝোঁকের মাথায় সংসার ছেড়ে চলে গেলেও এতদিন যে সুখভোগ করে গেলেন তার সংস্কার আপনার মন থেকে সহজে যাবে না। অরণ্যের কষ্টে বেশী করে সংসারের সুখের দিকটা আপনার মনে পড়বে। অথচ লজ্জাবশতঃ আপনি সংসারে ইচ্ছে হলেও আর ফিরে আসতে পারবেন না। দোটানায় পড়ে আপনার একূল ওকূল দু'কূলই নষ্ট হবে। তখন আপনার অবস্থা দাঁড়াবে — ইত্‌কে না উৎকে। বিচমে খাবে কুভ্‌কে অর্থাৎ এপথেও না ওপথেও না, মাঝখান থেকে লাঠি খাওয়াই সার হবে! কষ্ট ভোগ বাড়বে! মানসিক বিপর্যয় ঘটবে। বিপর্যস্ত মন নিয়ে ঈশ্বর ভজন হয় না। কাজেই মহারাজ আপনি আপনার সংকল্প ত্যাগ করুন।

— এ আমার দৃঢ় সংকল্প রাণি! একবার ভেবেচিন্তে সংকল্প করতে হয়। একবার সংকল্প করলে সে সংকল্প আর ত্যাগ করতে নেই। এ সম্বন্ধে তোমাকে মহারাজ বিক্রমাদিত্যের একটি গল্প শোনাই শোন। তাঁর নবরত্নের মধ্যে মহাকবি কালিদাসই ছিলেন উজ্জ্বলতম রত্ন। এজন্য বাকী আটজন মহাপণ্ডিত কালিদাসকে ঈর্ষা করতেন। বিক্রমাদিত্য একথা জানতেন। একবার তিনি কালিদাসের অনুপস্থিতিকালে সেই আটজন রত্নকে ডেকে প্রশ্ন করলেন — জগতে সর্বাপেক্ষা প্রিয় বস্তু কি ? প্রত্যেকে এক একটা উত্তর দিলেন, কিন্তু কারও উত্তরই মহারাজের মনঃপূত হল না। তিনি প্রত্যেকেরই উত্তর খণ্ডন করে বললেন — আটদিন সময় দিচ্ছি। আপনারা ভাল করে চিন্তা করে সর্বজনগ্রাহ্য একটি সর্বোৎকৃষ্ট উত্তর আমার কাছে এনে পেশ করুন। আপনাদের উত্তর সন্তোষজনক না হলে আপনাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হবে। পণ্ডিতরা পড়লেন মহাফাঁপরে। তাঁদের আহার নিদ্রা ঘুচে গেল। আটদিনের দিন সন্ধ্যাবেলা কালিদাস তাঁর স্বল্পকালীন প্রবাস থেকে ফিরে এলেন। পণ্ডিতরা সবাই গিয়ে তাঁর বাড়ীতে হাজির হলেন এবং তাঁদের সমস্যার কথা বললেন। তাঁদের কাতরতা দেখে কালিদাস সন্ন্যাসী সেজে তাঁদেরকে বললেন — চল এখনই আমরা মহারাজের প্রাসাদে যাই , আমি একটা ছড়া গাইতে গাইতে যাব, তোমরাও আমার সঙ্গে গলা মেলাও ও তাল দাও। ছড়াটি হল —

দুনিয়ামেঁ মতলব পিয়ারা হ্যায়।
এ দুনিয়ামেঁ মতলব সবসে পিয়ারা হ্যায়॥

তাঁর সভার গুণীরত্নরা গান গাইতে গাইতে প্রাসাদের দরজায় অপেক্ষা করছেন এই খবর পেয়ে বিক্রমাদিত্য তাঁদেরকে কাছে ডেকে পাঠালেন। তাঁরা তখনও সমস্বরে ছড়াটি গেয়ে চলেছেন। মন দিয়ে কিছুক্ষণ শুনলেন তাঁদের গান। পরে সবাইকে নিরস্ত করে বললেন —

হাঁ আপনাদের জবাব আমার মনঃপূত হয়েছে। আপনাদের দণ্ড মকুব করলাম। এবার আপনারা যে যার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করুন।

এই গল্পটি শুনিয়ে আমাদের গল্পের নায়ক রাণীকে বললেন — ভেবে দেখ রাণি! তুমি বা আমার যত প্রিয় পরিজন, প্রজাবর্গ ভৃত্যবর্গ সবাই যে আমাকে এত ভালবাসে বা সেবা যত্ন করে, তার মূলে তোমাদের কোন না কোন সংকল্প বা মতলব আছে। তোমাদের সেই সংকল্প আমার দ্বারা সিদ্ধ হয় বলেই তোমরা আমাকে ভালবাস। সংকল্পতেই জগৎ চলছে। কাজেই এখন যখন গৃহত্যাগের সংকল্প করেছি তখন আমাকে আর কেউ রুখতে পারবে না।

— কিন্তু আপনার ত এখন বিষয়ানুরাগ আছে, সংসারের প্রতি মায়া মমতা আছে। মনের মধ্যে সেগুলি পুঁটলি বেঁধে নিয়ে গিয়ে বনের মধ্যে হরিভজনে বসলে কি আপনার ইষ্টসিদ্ধি হবে?

— হাঁ, এতেই আমার ইষ্টসিদ্ধি হবে। আমার মনে এখন বিষয়ানুরাগ নেই, মমতাও নেই।

রাজার দৃঢ়সংকল্প এবং দম্ভোক্তি শুনে রাণী ভয় পেলেন। আর কিছু বললেন না, চুপচাপ বসে রইলেন। বসে বসেই তিনি উঃ, উঃ করতে করতে যেন কত যন্ত্রণায় কাতর হয়ে পড়েছেন, এইভাবে গোঁ গোঁ করতে করতে রাণী মূর্চ্ছার ভান করলেন। রাজা সঙ্গে সঙ্গে রাণীকে জড়িয়ে ধরে তাঁর মাথাটি কোলে নিয়ে উচ্চৈঃস্বরে তাঁর ভৃত্যদেরকে ডাকতে লাগলেন — কে কোথায় আছ, তাড়াতাড়ি এস, রাজবৈদ্যকে খবর দাও। রাজা যতই উতলা হয়ে পড়েন, রাণীও ততোধিক যন্ত্রণাতে কাতরাতে থাকেন। রাজা নিজেই রাণীর চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সযত্নে নিজেই রাজবস্ত্র দিয়ে তাঁর চোখমুখ পরিপাটি করে মুছিয়ে দিতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজবৈদ্য এসে উপস্থিত হওয়ার পূর্বেই রাণী উঠে বসলেন এবং হাসতে হাসতে রাজার দিকে তাকিয়ে বললেন — মোহমুক্ত বটে ! মূর্চ্ছা দেখে যেভাবে আপনি কাতর হয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আদর করছিলেন তাতেই বুঝলাম, আপনি ইন্দ্রিয় জয়ী মহাপুরুষ! আপনার মনে কোন মায়া মমতা নেই!

রাজা নীরবে এই শ্লেষ হজম করলেন। তবু একটু পরে গম্ভীর কণ্ঠে বললেন —

এহি সংসার বড় দুঃখ দায়ী।
ইয়ামে চিত্ত গাঢ় মৎ রয়ি॥

রাজৈশ্বর্যের মধ্যে সংসারের বেড়াপাকে বাঁধা থেকে কিভাবে আমার মনে ভগবানের প্রতি প্রেম জাগবে বল?

— রাজা ! আপনার প্রেমে স্থৈর্য নেই। হরি-প্রেমের স্বরূপ আপনি এখনও চিনতে পারেননি। অরণ্যে গেলে প্রেম বাড়বে, সংসারে থাকলে কমে যাবে, এ আপনাকে কে বলল?

ক্ষণমেঁ চঢ়ে, ক্ষণমেঁ উৎরৈ, প্রেম ন কহাবে সৈ।
অঘট প্রেম পিঞ্জরমেঁ বৈঠে প্রেম কহাবে সৈ॥

যে প্রেম ক্ষণে বাড়ে, ক্ষণে কমে তাকে প্রেম বলে না। যে প্রেম হৃদয়ে সর্বাবস্থায় স্থির থাকে. মনে অনুকূল প্রতিকূল অবস্থা যাই ঘটুক না কেন, যে প্রেম সাগর জলের জোয়ার ভাটার মত হ্রাসবৃদ্ধি ঘটেনা, তাকেই প্রকৃত প্রেম বলে। আপনি প্রেমের সন্ধানে কোথায় যাবেন রাজন? প্রেম হৃদয়ের জিনিব, কোন স্থান বিশেষের ওপর তা নির্ভর করে না, বৈরাগী

সাজলেও তা বেড়ে ওঠে না। উচ্চ গিরিচূড়াতেও নয়, অতল সাগর গর্ভেও নয়, প্রেম থাকে অন্তরে। আপনার অন্তরে হরিপ্রেমের সেই স্ফূরণ এখনও ঘটেনি। হরি আছেন সর্বত্র, সর্বঘটে তিনি বিরাজমান। যাঁদেরকে পরিত্যাগ করে বৈরাগীরা বনে যায়, তাঁদের মধ্যে কি হরি নেই? হরি ত্যাগ করে হরির সন্ধান, এ বড় বিচিত্র প্রেমই বটে!

এ জগৎ হরিকী রূপ হৈ।
হরিরূপ নজরি আয়ো॥

কাজেই হরিকে পাবার জন্য অরণ্যে যাবার প্রয়োজন নেই। সংসারে থেকেও হরিকে ভালবাসা যায়, হরির সংসার ভেবে সংসারের সব ব্যক্তি বা বস্তুর মধ্যে হরির রূপ প্রত্যক্ষ করা যায়। সেই হল প্রকৃত হরিপ্রেম।

সবাইকে প্রণাম জানিয়ে সৎসঙ্গ শেষ করলাম। রামদাসজী বলে উঠলেন — লেও ভাই শম্ভুনাথ। তুম ঔর বিন্নীমাতাজীকো লিয়ে ইহ্ সৎসঙ্গ হুয়া। বৈরাগীকা আখড়ামেঁ বৈঠকর বৈরাগীয়োঁকো ভী শৈলেন্দ্রনারায়ণজী থোড়াসা ঠোক্কর দিয়া।

এইবলে হো হো করে হাসতে লাগলেন। আমি গিয়ে ঘরের ভেতর বসলাম। সন্ধ্যারতির পর আমার সঙ্গে দেখা করে শম্ভুনাথ তাঁর বিন্নী ও কিষেণকে নিয়ে বিদায় নিলেন। স্বামীস্ত্রী উভয়কে খুব উৎফুল্ল দেখলাম। এই ভেবে আমি চরিতার্থ হলাম যে ওঁকারেশ্বরজী অন্ততঃ একটি পরিবারের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলার জন্য আমার মত এক অকৃতী ব্যক্তিকে নিমিত্ত করেছেন।

সকালে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে শিবের সহস্রনাম পাঠ এবং বিকালে 'শ্রীরামচরিতমানসের' দোঁহা রামদাসজীর কাছ হতে বুঝে নেওয়া, এই করতে করতে জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হল।

আষাঢ় মাসের পয়লা। বিকালের দিকে আকাশে মেঘের সঞ্চার দেখা গেল। মেঘ দেখে আমার আনন্দ হল। ভাবলাম, যাক এইবার দু'এক পশলা বৃষ্টি হলেই লু কেটে যাবে। আমি এখান থেকে বেরুতে পারব। এখনও রেবাসংগম পর্যন্ত বহুদূর আমাকে পাড়ি দিতে হবে। পূজনীয় প্রলয়দাসজীর কাছ হতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে এই শৈলদ্বীপে আর আমার মন টিকছে না। কিন্তু না, পর্বতশীর্ষে ইতস্ততঃ সঞ্চারমান মেঘ দমকা বাতাসে ভেসে গেল। মেঘ দেখে শুধু আমি নয় এই শৈলদ্বীপের মানুষজন আকাশের দিকে তাকিয়ে কোলাহল মুখর হয়েছিল কিছুক্ষণের জন্য কিন্তু মেঘ কারও প্রত্যাশা পূরণ করল না। রামদাসজীও আমার সঙ্গে আশ্রম প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েছিলেন। দীনদয়াল তাঁর ঘরের দাওয়ায় বসে হাসতে হাসতে মন্তব্য করল — কালিদাসজীকী যুগ মেঁ আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে বরখা (বর্ষা) সুরু হোতা থা, লেকিন যুগ বীত গয়া, প্রকৃতি মাতাকী স্বভাও ভি বদল্ গয়া। আমি বললাম — কোথায় আর প্রকৃতি বদলালো। মহাকবি কালিদাসজী ত বলেননি যে আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে বৃষ্টি নেমেছিল। তিনি নির্বাসিত যক্ষের মুখ দিয়ে কেবল বলিয়েছেন —

আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং।
★ বপ্রক্রীড়াপরিণতগজপ্রেক্ষনীয়ং দদর্শ॥ (মেঘদূতম্, পূর্বমেঘ, ২)

অর্থাৎ অনন্তর আষাঢ় মাসের প্রথম দিনে তিনি (যক্ষ) দেখলেন, মেঘ আবির্ভূত হয়ে

★ বপ্র — পর্বতের সানুদেশ বা উপত্যকায় হাতী যখন দাঁত দিয়ে মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খেলা করে। এর নাম উৎখাত কেলি।

গিরিশৃঙ্গ আলিঙ্গন করেছে; বপ্রক্রীড়াপরায়ণ হাতীর মত ঐ জলদরাজ অতি সুদৃশ্য।

মহাকবি কালিদাস উপমার রাজা। পর্বতের চূড়া যখন ঘন কালো মেঘে ছেয়ে যায়, তারপর দমকা বাতাসে যখন তা কোথাও ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হতে থাকে সেই অবস্থাকে মহাকবি বলছেন — যেন হাতী তার দাঁত দিয়ে পর্বতসানুর মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে খেলা করছে। অত্যন্ত সুনির্বাচিত শব্দে কালিদাস মেঘসঞ্চারের তুলনাহীন ছবি এঁকেছেন। আমার কথা শুনে রামদাসজী মন্তব্য করলেন — 'হমারা তুলসীদাসজী ভি উপমাকী রাজ হৈ।সুপণ্ডিত সাধকের এই অন্ধভক্তি বা গোঁড়ামী আমার ভাল লাগল না।

৫ই আষাঢ় (রবিবার, ১৩৬১ সাল) শেষ রাত্রে বছরের প্রথম বৃষ্টি সুরু হল। বড় মনোরম লাগল এই বৃষ্টি। উত্তপ্ত পাহাড় এবং পার্বত্যভূমি শীতল হল। ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে নিকট বনাঞ্চল হতে ময়ূরের কেকাধ্বনি দু'একবার শুনতে পেলাম। বৃষ্টি হলেই ময়ূর পেখম মেলে নাচে, জানি না এই রাত্রিকালে বনভূমিতে শিখীনৃত্য শুরু হয়েছে কিনা। মঙ্গল আরতির বাজনা বেজে উঠল। তখনও ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি হচ্ছে। যড়ঙ্গী মহারাজের বিগ্রহ সেবা ঘড়ির নিয়মে চলে। আরতি শেষ হল। পাশের ঘর থেকে রামদাসজীর কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, তিনি তুলসীদাসজীর একটি দোঁহা আবৃত্তি করছেন —

> বুন্দন ঘাত সহহি গিরি কৈস খলকে বচন সন্ত সহ জৈসে।
> ক্ষুদ্র নদী ভরি চলীঁ তিরাই জস থোরে ধন খল ইতরাই॥
> ভূমি পরত ভা চাবর পানী জিমি জীবহি মায়া লপটানী।
> সিমিটি সিমিটি জন ভরহিঁ তলাবা জিমি সদগুণ সজ্জন পহঁ আবা।
> সরিতা জল জলনিধৈ মহঁ জাই হোহিঁ অচল জিমি জিয় হরি পাই॥

অর্থাৎ পর্বতসকল জলবিন্দুর আঘাত সইছে — সাধুলোক যেমন খলের বচন সহ্য করেন। ছোট নদী জলে ভরে উঠে উথলে পড়ছে — স্বল্প ধনে খল যেমন গরবে আত্মহারা হয়। আকাশের স্বচ্ছ জল মাটিতে পড়ে মলিন হচ্ছে — মায়ায় জড়িত হয়ে জীব যেমন নিজের নির্মলতা হারায়। জলাশয়-গুলো বিন্দু বিন্দু করে জলসঞ্চয়ে পরিপূর্ণ হয়ে উঠছে — একে একে সদ্‌গুণ অর্জনে সাধুর হৃদয় যেমন করে ভরে উঠে। জলরাশি নদীস্রোতে পড়ে সাগরে গিয়ে মিশছে — শ্রীহরিকে পেয়ে সাধুর অন্তর যেমন স্থির হয়।

তুলসীদাসজীকৃত এই কবিতা রামদাসজীর কণ্ঠমাধুর্যের গুণে আমার বেশ ভালই লাগল। ভাবলাম, দোঁহাটিতে যেভাবে উপমার ছড়াছড়ি, এই রকম উপমা ও রূপকের বাহুল্য তুলসীদাসজীর অন্যান্য দোঁহাতেও দেখেছি। এইজন্যই বুঝি রামদাসজী সেদিন সগর্বে বলেছিলেন — তুলসীদাসজী ভি উপমাকী রাজা হৈ!

তুলসীদাসজী সাধক হিসাবে যত বড়ই হোন মহাকবি কালিদাসের কাব্যের সঙ্গে তুলসীদাসজীর কবিকৃতির কোন তুলনাই হয় না। তুলসীদাসজীর উপমা বা রূপক কেবলই নীতিকথা ও তত্ত্বকথায় কন্টকিত। সেখানে কাব্যের প্রাণ কোথায়? কিন্তু মহাকবি কালিদাসের কাব্য, ভাবভাষার ললিত ছন্দে এবং রসমাধুর্যে যেন উছলে পড়ছে।

সকাল হতেই আমি কোটিতীর্থের ঘাটে চলে গেলাম। বৃষ্টি থেমেছে। বাংলাদেশে বৃষ্টি হলেই ভিজামাটির সোঁদা গন্ধ উঠে। কিন্তু পার্বত্য অঞ্চলে বর্ষণসিক্ত মাটির সেই স্বস্তিদায়ক তৃপ্তিদায়ক গন্ধ কোথা হতে পাব? তবে, সর্বত্র একটা স্নিগ্ধ স্নিগ্ধ ভাব আছে। স্নান তর্পণাদি

সেরে শিবের সহস্রনাম পাঠ করে ভজন আশ্রমে ফিরে এলাম। এসেই রামদাসজীকে বললাম — বৃষ্টি হয়েছে, এবার ত আর 'লু' এর ভয় নাই। এইবারে উত্তরতট ধরে শূলপাণি ঝাড়ির দিকে এগোতে অনুমতি দিন। এখনও প্রায় ঝাড়ি ও উপত্যকা পথ ধরে প্রায় তিনশ মাইল আমাকে অতিক্রম করতে হবে।

— বর্ষাকালটাও এখানে কাটিয়ে গেলে ভাল হত। পরিক্রমাবাসী মাত্রেই গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে পরিক্রমা বন্ধ রাখে। তোমার এমন কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নাই যে তোমাকে তার মধ্যেই পরিক্রমা শেষ করে ফিরতে হবে? তাছাড়া সামনে এবার কঠিনতম পরীক্ষার স্থল শূলপাণির ঝাড়ি পড়বে। পঞ্চাশ ক্রোশ দীর্ঘ এই ঝাড়িপথ বড়ই দুর্গম, বড়ই কষ্টদায়ক। ঘোর বর্ষা সুরু হয়ে গেলে সেই ভয়ঙ্কর ঝাড়িতে কোথায় বর্ষাকালটা অতিবাহিত করবে?

— গ্রীষ্ম এবং বর্ষাকালে যে পরিক্রমা করতে নাই, একথা আমাকে মহাত্মা শংকরনাথ বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। কাজেই নর্মদাতটে শিবমন্দিরের ত অভাব নাই, ঘোরতর বর্ষা আরম্ভ হয়েছে বুঝতে পারলেই যে কোন শিব মন্দিরে আমি আশ্রয় নিব, আপনি কোন চিন্তা করবেন না। এখানে আমার আর মন টিকছে না। পায়ে যেন চলার ছন্দ জেগেছে। পা দুটো হাঁটবার জন্য সির্‌সির্ করে উঠছে।

আমার কথা শুনে হাসতে লাগলেন তিনি। দীনদয়ালকে ডেকে পঞ্চাঙ্গ অর্থাৎ পাঁজি আনতে বললেন। পাঁজি খুলেই তিনি আঁতকে উঠলেন — আরে! আজ ত অম্বুবাচী লাগ গিয়া। আম্বুবাচী মেঁ আপ্‌কো ক্যায়সে ছোড়ুঁ?

আমি বললাম — অম্বুবাচী-ফাচী আমি মানি না। পাঁজী দেখে যাতায়াত করতে হলে ঘরে বসে থাকতে হবে, এক ঠাঁই স্থির হয়ে। পঞ্জিকাকার কোন দিনটাকে সর্বান্তঃকরণে যাত্রার পক্ষে শুভ বলেছেন, বলতে পারেন? যদি কোথাও কোন দিনটায় 'যাত্রা শুভ' লেখা থাকেও তবে তার সঙ্গে ফ্যাকড়াও থাকে — উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে নাস্তি। উত্তরে ডাকিনী, পূর্বে যোগিনী, অগ্নিকোণে বারবেলা গলায় সাঁড়াশী দেবে; বায়ুকোণে কালবেলা, মরণং ধ্রুব, যদি যেতেই হয় বেলা এতটার পর ধীরে ধীরে যাবে, খোঁড়াতে খোঁড়াতে যাবে, শ্রীহরি স্মরণ করতে করতে যাবে। তবে যদি পঞ্জিকাকার ব্রাহ্মণকে কিছু দান করে যাত্রা করা হয়, তাহলে পাঁজির সব দিনেই যাত্রা করা যায়। এখানকার পাঁজি এবং বাংলাদেশের পাঁজিতে মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। আবার এই উভয় দেশের পঞ্জাঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণীদের পঞ্জাঙ্গের মিল নাই। অতএব মাপ করবেন, পাঁজির দিন আমি মানতে পারব না। পরশু অর্থাৎ বুধবার ভোরেই আমি কোটিতীর্থের ঘাট পেরিয়ে চলে যাব। আপনি প্রসন্নমনে অনুমতি দিন। আমার কণ্ঠের ঝাঁঝ দেখে তিনি আর বাধা দিলেন না। ঘর থেকে একটা খাম এনে আমার হাতে দিয়ে মহাত্মা সুমেরদাসজীকে একটি চিঠি দিয়ে যেতে বললেন।

বিকালে দাওয়াতে বসে আছি। রামদাসজীও কাছে এসে বসলেন। বললেন — 'রামচরিতমানস'-ত অনেকখানিই পড়া হল, ভাল করে আয়ত্ত করার জন্য ঐ বইটা তুমি নিয়ে যাও। সঙ্গে থাকবে, পরিক্রমা করতে করতে অবসর সময়ে পড়বে। পড়ে তৃপ্তি পাবে, আধ্যাত্মিক কল্যাণ হবে।

— আপনার সব কথাই সত্য। তবে আমাদের বাংলায় একটা কথা আছে, 'দূরকে শোলা ভারী'। আপনি নিজ মুখেই বলেছেন এই 'শূলপাণির ঝাড়ি' নাকি মুণ্ডমহারণ্য এবং ওঁঙ্কারেশ্বর ঝাড়ির চেয়ে কঠিনতম দুর্গতম পথ। কাজেই সেই পথে আর বোঝা বাড়াব না।

— আপনে ক্যা বোলতা হৈ। 'বোঝা' মৎ বলো। ইস্‌সে গুনাহ্ হোতা হৈ।

— অপরাধ বা পাপ-টাপের ভয় আমাকে দেখিয়ে লাভ নাই। 'রামচরিতমানস' এমন কোন দুর্লভ গ্রন্থ নয়, সর্বত্রই সুলভ, আমাদের বাংলাদেশেও রামচরিতমানসের বড় বড় পণ্ডিত আছেন। তবে আপনার স্নেহের দান হিসাবে, আপনার দেওয়া বইটি নিশ্চয়ই পবিত্র স্মারক চিহ্ন হিসাবে রাখার যোগ্য। ফিরবার পথে আবার এখানে আসব। তখন সম্ভব হলে নিয়ে যাব।

আমার কথা শুনে রামদাসজী গম্ভীর মুখে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে নিজেই জিজ্ঞাসা করলেন — তোমাদের বাংলা ভাষায় কি রামায়ণ আছে? সে কি তুলসীদাসজীর রামায়ণের অনুবাদ, না, অন্য কারও লেখা?

আমাদের বাংলা ভাষায় অনেক স্বভাব কবির লেখা অনেক বাংলা রামায়ণ আছে। তার মধ্যে মহাকবি কৃত্তিবাস ওঝার লেখা কৃত্তিবাসী রামায়ণ বাঙালী মাত্রেরই প্রাণের বস্তু। কোটি কোটি বাঙালী জন্মগ্রহণ করেছে কৃত্তিবাসের রামায়ণ শুনতে শুনতে, বেড়ে উঠেছে রামায়ণী কথা শুনতে শুনতে। বাঙালী গৃহস্থ পরিবারে কোন আনন্দোৎসবের কালে রামায়ণ পাঠ হয়, আধি ব্যাধি বিপদ আপদের কালেও বাঙালী রামায়ণ পাঠ করে, বিপদবারণ রামচন্দ্রের করুণায় বিপদ হতে পরিত্রাণ পেতে। আমার নিজের জীবনেরই একটি ঘটনা মনে পড়ছে, আমার তখন বয়স পাঁচ বা ছয়, বাবা বাড়ীতে ছিলেন না, বাড়ীতে ডাকাত পড়ল। তারা যখন সদর দরজা ভাঙার জন্য ঢেঁকি দিয়ে আঘাত দিচ্ছে, তখন মা ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে দাদাকে বলেছিলেন — ওরে, একছাঁদ রামায়ণ পড়। দাদা ভয়ার্থ কণ্ঠে রামায়ণ পড়তে লাগলেন। বলা বাহুল্য, একটু পরেই ডাকাতরা চলে যায়। এই সামান্য ঘটনা আমার শিশুমনে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করে। শত শত শাস্ত্র পড়ে, শত শত সাধুসঙ্গে, তাঁদের বাণী-বচনে আমার যা লাভ হয় নি, শিশুকালের ঐ একটি ঘটনাই আমার মনে রামনামের অমোঘ কার্যকারিতায় বিশ্বাস জন্মিয়াছে। এ শুধু আমার ব্যক্তিগত জীবনে নয়, বাংলার পল্লীতে পল্লীতে এ রকম অনেক কাহিনীই আছে। মহাকবি কৃত্তিবাস এবং তাঁর রামায়ণের নাম বাঙালীর মজ্জাগত। বাঙালী পরিবারের বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা মৃত্যুকালে কৃত্তিবাসের রামায়ণ পাঠ করতে বলেন। বাঙালী পরিবারে নবজাতক শিশুর নামকরণকালে সর্বাগ্রে রামনামই অধিকাংশ লোকের মনে পড়ে, সেইভাবে নামও রাখা হয় — রামপদ, রামচরণ, রামদাস, রামদয়াল ইত্যাদি। মহাকবি কৃত্তিবাসই রামায়ণ লিখে বাঙালীর মনে এই সংস্কার গড়ে তুলেছেন যে মৃত্যুকালে কেউ যদি বিকারের ঘোরে পুত্রের নাম ধরে ডাকে তাহলে তার রামনামই করা হবে। হিন্দীভাষী আপনারা সংখ্যা গণনা করেন এই বলে যে — এক, দো, তিন্, চার, পাঁচ, ছে। কৃত্তিবাসের কল্যাণে বাঙালী গণনা করেন — রাম, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি। অর্থাৎ রাম শব্দকে একের প্রতিশব্দ করে বাঙালীকে তাঁর রামায়ণের মারফত পরোক্ষভাবে শিক্ষা দিয়েছেন — রাম হল একমেবাদ্বিতীয়ম্ অর্থাৎ এক, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম।

কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাবে এখনও গ্রামের কোন কোন পল্লীবালা কোন ব্রতচারণার কালে প্রার্থনা করেন —

সীতার মতন সতী হব
রামচন্দ্র মত পতি পাব।
লক্ষ্মণের মত দেওর হবে
কৌশল্যার মত শ্বাশুড়ী হবে॥

রামদাসজী বললেন — তবভি শ্রীতুলসীদাসজীকা সাথ কৃত্তিবাসজীকা কোঈ প্রভেদ আপ্‌কো নজরমেঁ আয়ী কি নেহি?

— তা চোখে পড়বে না কেন? আপনি কেবল তুলসীদাসজীর হিন্দীতে লেখা 'রামচরিতমানস' পড়েছেন, বাংলায় লেখা কৃত্তিবাসের রামায়ণ ত পড়েন নি। কৃত্তিবাসের রামায়ণ ত আমার নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের মত, 'রামচরিতমানস'ও মোটামুটি পড়েছি। আমি ঐ দুই রামায়ণ ও তার লেখক দুজনকে তুলনা করে বলতে পারি, তুলসীদাসজী ও কৃত্তিবাস — এই দুইজনের মধ্যে প্রভেদ হল, একজন কবি আর একজন মহাকবি।

তুলসীদাসজী কৃত হিন্দী রামায়ণ উপাদেয় সন্দেহ নাই, ভাষার প্রাঞ্জলতা ও প্রসাদগুণ সবই এতে আছে, কিন্তু উপমা ও রূপকের মোড়কে মুড়ে কেবলই নীতিকথা এবং অধ্যাত্ম-তত্ত্ব পরিবেশন করায়, এই গ্রন্থ রামভক্ত সাধকদের কাছে কাব্যগ্রন্থের চেয়ে ধর্মগ্রন্থ হিসাবে বেশী মর্যাদা পেয়েছে। রাম স্বয়ং ভগবান, পূর্ণাবতার এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করাই যেন লেখকের প্রধান উদ্দেশ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। তুলসীদাসজীর মত উচ্চকোটির মহাসাধকের উপলব্ধিজাত পরমসত্য হিসাবে এর মর্যাদা অসাধারণ সন্দেহ নাই কিন্তু তবুও 'রামচরিতমানস' কোন মতেই মহাকাব্য হয়ে উঠেনি। কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণে মহাকাব্যোচিত সমস্ত গুণই লক্ষ্য করা যায় — ভাব, ভাষা সর্বরসের পরিমিত ভিয়ান, ভাষার প্রাঞ্জলতা, সহজবোধ্যতা এবং ওজস্বিতা ; সর্বোপরি যে অধ্যাত্মসম্পদ ভারতের মর্মকথা, যে মহান সংস্কৃতিধারা এক গভীর ও প্রশস্ত খাতে প্রবাহিত হয়ে জনমানসে একতান ও একপ্রাণ করে তোলে, কৃত্তিবাস তাঁর মহাকাব্যে তার সার্থক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন। এক মহাজীবনে আলেখ্য আঁকতে গিয়ে জনজীবনের নিত্যকার সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কৃত্তিবাস। কোটি কোটি বাঙালী তার দৈনন্দিন জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পড়ে পায় আলোর ইশারা, পায় সান্ত্বনা ও শান্তি। বাংলার পল্লীতে পল্লীতে ধনী দরিদ্র, পণ্ডিত ও মূর্খ সকলের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের পঠন, পাঠন, আবৃত্তি ও আলোচনা অবিচ্ছেদে চলে আসছে। আমাদের এই বিশাল দেশের বিরাট হিন্দীভাষী অঞ্চলে তুলসীদাসের রামায়ণ লোকসাহিত্যের মর্যাদা পেয়েছে সন্দেহ নাই, কিন্তু কৃত্তিবাসী রামায়ণ শুধু লোকসাহিত্যই নয়, এটি সজীব সাহিত্য। হিন্দী রামায়ণের চেয়ে বাংলা রামায়ণে রামজীবনের আরও অনেক বেশী বিষয়ের উল্লেখ আছে। সেগুলির এমনভাবে বর্ণনা আছে যে, সেগুলি কৃত্তিবাসের ভাষার যাদুতে লোকজ্ঞানের ও মনুষ্যজীবনের অভিজ্ঞতার এক একটি অমূল্য রত্নসম্পুট রূপে গড়ে উঠেছে। মানবিকতা অনুশীলন বা মানবিক মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য এই একখানা গ্রন্থই পর্যাপ্ত।

আজকাল রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এদেশে বিদেশী ও বিজাতীয় ভাবধারার অবাধ রপ্তানীর ফলে শহরের যুব-মানস কিছুটা উন্মার্গগামী হলেও গ্রামে গ্রামে অপামর জনসাধারণের কাছে কৃত্তিবাসী রামায়ণের আবেদন অপ্রতিরোধ্য। বাংলার গ্রামে ঘরে এখনও এমন লোক দেখা যায়, যাঁরা হয়ত নাম সই করতে পারেন না, কিন্তু কৃত্তিবাসের রামায়ণ তাঁর শুনে শুনে মুখস্থ হয়ে গেছে। বাংলা রামায়ণের অনেক কথাই প্রবাদ বাক্যের মত বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের মুখে মুখে ঘোরে । আমার বাল্যকালেই দেখেছি , রামায়ণ গান শুনতে লোকের সেকি আগ্রহ, সেকি উল্লাস! কোন্ হাটচালা, গাছতলা বা বাড়ীর বৈঠকখানায় রামায়ণ পাঠ সুরু হলেই দলে দলে লোক এসে শুনে। কৃত্তিবাসের ভাষার এমনই যাদু যে, তারা হনুমানের

পঞ্চাশ যোজন লাঙ্গুল, একলাফে সাগর লঙ্ঘন, সূর্যদেবকে বগলে পুরে মাথায় করে গন্ধমাদন পর্বত বয়ে আনা, রাবণের দশমুণ্ড, কুড়ি হস্ত, কুম্ভকর্ণের একগ্রাসে শতসহস্র বানর ভক্ষণ কিংবা যুদ্ধক্ষেত্রে দুইলক্ষ ঢোল, একলক্ষ কাঁসি, এককোটি হাতী, দুইকোটি ঘোড়া, তিনকোটি রথ এবং কোটি কোটি রাক্ষসের সঙ্গে কোটি কোটি বানরের সমাবেশ নিয়ে কেউ কোন প্রশ্ন তোলে না। শ্রীরামচন্দ্রের সত্যনিষ্ঠা, লক্ষ্মণের ভ্রাতৃভক্তি, ভরতের ত্যাগ, সীতার পতিভক্তি রামায়ণ শ্রোতাদেরকে এক মহান্ ভাবে উদ্বুদ্ধ করে। তারা কৈকেয়ীর উপর রেগে উঠে মন্থরার লাঞ্ছনায় আনন্দ পায়, রামচন্দ্রের বনবাস যাত্রায় এবং সীতার পাতাল প্রবেশের কথা শুনে কেঁদে ভাসায়।

জীবনশিল্পী কৃত্তিবাস তাঁর রামায়ণে সর্বরসের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। রৌদ্ররস, শান্তরস, শৃঙ্গাররস, বীররস, করুণরস, হাস্যরস, শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গরসের সঙ্গে ওজস্বিতা কৃত্তিবাস কিভাবে ফুটিয়েছেন তা দেখবার জন্য আপনাকে অঙ্গদ রায়বারের কিছুটা যা আমার মনে আছে, আপনাকে শোনাচ্ছি। এ জিনিষ তুলসীদাসে খুঁজে পাবেন না।

রামচন্দ্র তাঁর বানর সৈন্য নিয়ে এসে লঙ্কাপুরী অবরোধ করেছেন। রাবণের আদেশে রাজপ্রাসাদের সমস্ত প্রধান দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কোন পক্ষই যুদ্ধে লিপ্ত হচ্ছেন না। এই স্থিতাবস্থার অবসান ঘটানোর জন্য অঙ্গদকে দূত হিসাবে পাঠানো হল রাবণের দরবারে। অঙ্গদ লাফ দিয়ে প্রাচীর উল্লম্ফন করে দরবার কক্ষে প্রবেশ করলেন। রাবণ মায়াবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। অঙ্গদ প্রবেশ করা মাত্রই সমস্ত পাত্রমিত্র সভাসদ্বর্গ রাবণ রূপে পরিবর্তিত হয়ে গেলেন। অঙ্গদ যেদিকে তাকান সেদিকেই রাবণ, বহুরূপে রাবণ বসে আছে। একমাত্র ইন্দ্রজিৎই স্বস্বরূপে বসে আছেন। কারণ, পুত্র হয়ে পিতার রূপ ধারণ করা অশোভন। ললাটে যজ্ঞের ফোঁটা দেখেই অঙ্গদ তাঁকে চিনতে পারলেন। তিনি তখন ইন্দ্রজিৎকেই সম্বোধন করে বলতে লাগলেন —

অঙ্গদ বলে সত্য করে কওরে ইন্দ্রজিতা।
এই যত বসি আছে সব কি তোর পিতা।।
ধন্য নারী মন্দোদরী ধন্য রে তোর মাকে।
এক যুবতী শতেক পতি ভাব কেমনে রাখে।।
কোন্ বাপ তোর চেড়ীর অন্ন খাইল পাতালে।
কোন্ বাপ তোর বাঁধা ছিল অর্জুনের অশ্বশালে।।
কোন্ বাপ তোর যম জিনিতে গিয়াছিল দক্ষিণ।
কোন্ বাপ মান্ধাতার বাণে দাঁতে কৈল তৃণ।।
কোন্ বাপ তোর জব্দ হৈল জামদগ্ন্য তেজে।
মোর বাপ তোর কোন্ বাপেরে বেঁধেছিল লেজে।।
একে একে কৈলাম তোর সব বাপের কথা।
সবারে কাজ নাই তোর যোগী বাপটি কোথা।

— হম্ ত বাংলা ভাষা জানতা নেহি। আপ্ জ্যায়সা বোলতা হৈ উস্‌মে মালুম হোতা হৈ, কৃত্তিবাসজীকি বাংলা রামায়ণ ভি আচ্ছাই হৈ। লেকিন্ বিশ্বাত্মা রামচন্দ্রজীকি মহিমা হমারা তুলসীদাসজী জ্যায়সী বর্ণন কিয়া হৈ, উসকা কৌঈ উপমা নেহি হো সক্‌তা। তামাম্

হিন্দুস্থানমেঁ তুলসীদাসজী জ্যায়সী রামভক্তি প্রচার কিয়া হৈ, এ্যায়সা কোঈ নেহি কিয়া। রামচরিতমানসকী এহি অবদান সবসে বড়া হৈ।

— আপনার এই কথা অস্বীকার করি না। তবে বাংলা ভাষায় কৃত্তিবাস যেভাবে রামভক্তি প্রচার করেছেন তারও কোন তুলনা হয় না। আদিকাণ্ড হতে উত্তরাকাণ্ড পর্যন্ত কৃত্তিবাস রামচন্দ্রকে বিশ্বাত্মা, পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ হিসাবেই দেখিয়েছেন। এমনকি শত্রুর মুখ দিয়েও তিনি রামচন্দ্রকে পূর্ণব্রহ্ম হিসাবে বন্দনা করিয়েছেন। রাবণপুত্র অতিকায় এবং বিভীষণপুত্র তরণীসেন কৃত্তিবাসের নিজস্ব সৃষ্টি। এ জিনিষ বাল্মীকিতে নাই, তুলসীদাসেও নাই।

লক্ষ্মণ যখন অতিকায়কে বধ করলেন, তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কৃত্তিবাস বর্ণনা করেছেন —

অতিকায় মুণ্ড গড়াগড়ি ভূমিতলে।
ভূমেতে পড়িয়া মুণ্ড রাম রাম বলে।।

কৃত্তিবাস অঙ্কিত তরণীসেন চরিত্রটি কিরকম তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিচ্ছি। বিভীষণ রামচন্দ্রের পক্ষে যোগ দিলেও তাঁর একমাত্র পুত্র বীর তরণীসেন রাবণের আশ্রয়েই ছিলেন। রাবণের আদেশে রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে এসে তরণীসেন প্রথমেই সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে বলতে লাগলেন —

কহিছে তরণীসেন যোড় করি হাত।
দেবের দেবতা তুমি জগতের নাথ।।
তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি মহেশ্বর।
কুবের বরুণ তুমি যম পুরন্দর।।
বিকার বিহীন দীন দয়াময় নাম।
রঘুকুলোদ্ভব নবদুর্বাদল শ্যাম।।

তরণীসেনের স্তবে তুষ্ট হয়ে ভক্তবৎসল রামচন্দ্র ধনুর্বান ত্যাগ করে বসে পড়লেন। তিনি বিভীষণকে বলতে লাগলেন —

শ্রীরাম বলেন শুন মিত্র বিভীষণ।
লঙ্কাতে এমন ভক্ত জানিনু এখন।।
কার্য নাই সীতায় না যাইব রাজ্যেতে।
কেমনে মারিব বান ভক্তের অঙ্গেতে।।
কন্টক ফুটিলে মম ভক্তের শরীরে।
শেলের সমান বাজে আমার অন্তরে।।

রামচন্দ্রকে যুদ্ধ পরিত্যাগ করতে দেখে তরণীসেনের মনে চিন্তা এল, রামচন্দ্র যদি যুদ্ধ না করেন, তাহলে ত তাঁর রাক্ষস দেহ হতে মুক্তি ঘটবে না। কাজেই তিনি ভগবানের হাতে বাঞ্ছিত মৃত্যুলাভের জন্য উঠে দাঁড়িয়েই নানাবিধ কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করে রামচন্দ্রের অঙ্গে অস্ত্র নিক্ষেপ করতে লাগলনে। অগত্যা রামচন্দ্র যুদ্ধ করতে বাধ্য হলেন, তরণীসেনের মৃত্যু হল। কৃত্তিবাস লিখেছেন —

দুই খণ্ড হয়ে বীর পড়ে ভূমিতলে।
তরণীর কাটা মুণ্ড রাম রাম বলে।।

অতিকায় ও তরণীসেনের এই ছবি এঁকে কৃত্তিবাস রামচন্দ্রের 'হতারিগতিদায়কত্ব' মহিমা

ফুটিয়ে তুলেছেন। ভগবানের হাতে নিহত হলে শত্রুও পরমগতি লাভ করে। 'হতারিগতিদায়কত্ব' একমাত্র ভগবানেরই গুণ।

আপনার যদি ধৈর্যচ্যুতি না ঘটে, তাহলে আর একটি উদাহরণ দিই। মৃগভ্রমে দশরথ যখন অন্ধকমুনির পুত্র সিন্ধুমুনিকে শব্দভেদী বান নিক্ষেপ কবে দৈবাৎ হত্যা করে ফেলেন, তখন তাঁর মন খুব অনুশোচনায় ভরে যায়। এই অনিচ্ছাকৃত পাপের দায় হতে অব্যাহতি লাভের জন্য তিনি বশিষ্ঠ ঋষির আশ্রমে যান। বশিষ্ঠ তখন আশ্রমে ছিলেন না। তাঁর পুত্র বামদেব বিধান দেন — তিনবার রামনাম উচ্চারণ করুন। তাহলেই ব্রহ্মহত্যার পাপ হতে নিষ্কৃতি পাবেন। বশিষ্ঠ আশ্রমে ফিরে যখন সকল বিবরণ শুনলেন, তখন তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে পুত্র বামদেবকে 'চণ্ডাল হও' বলে অভিসম্পাত দিলেন। বামদেবের দোষ কোথায় তার ব্যাখ্যা হিসাবে মহাকবি কৃত্তিবাস বশিষ্ঠের মুখ দিয়ে বলালেন —

একবার রাম নামে কোটি ব্রহ্মহত্যা হরে।
তিনবার রাম নাম বলালি রাজারে।।

এইভাবে বিশ্বাত্মা রামচন্দ্রের চরণে উৎসৃষ্ট ভক্তের অনুভূতি সহ মনুষ্যচরিত্র সমাজজীবন ও প্রকৃতির সৌন্দর্য — সকল বিষয়ের পর্য্যবেক্ষণ ও অনুশীলনে কৃত্তিবাসের বাংলা রামায়ণ রসোত্তীর্ণ মহাকাব্যের স্তরে উত্তীর্ণ হয়েছে। অলমিতি।

আমার কথা শুনে রামদাসজী বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছেন বলে মনে হল। তিনি গম্ভীর মুখে তাঁর ঘরে উঠে গেলেন ; মনে মনে ভাবতে লাগলাম এই মহাপ্রাণ সাধকের মনে ব্যথা দিবার জন্য কিছু বলি নি। আলোচনাকালে আমার জ্ঞান বিশ্বাস মত আমার বক্তব্য পেশ করেছি মাত্র ! তবুও এতদিন তাঁর আশ্রমে থেকে যে স্নেহ ও সমাদর পেয়েছি , তাতে তাঁকে এ সব কথা না বলাই শোভন ছিল। কিন্তু এখন ত আর উপায় নাই। ঘরে বসে চিন্তা করতে লাগলাম, কাল বাদে পরশুই ত চলে যাব, এখন থেকে যে যাই বলুন, শান্ত মনে শুনে যাব, সকলের সঙ্গে হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার করে যাব।

রাত্রি প্রভাত হল, আমি স্নানাদি সেরে ওঁকারেশ্বর মন্দিরে গিয়ে যথারীতি শিবের সহস্রনাম পাঠ করে ওঁকারেশ্বরের পূজা করে, তাঁর কৃপা প্রার্থনা করে ফিরে এলাম। রামদাসজীকে দেখলাম স্বাভাবিক হয়ে গেছেন। তুলসীদাসজী তাঁর পরম প্রিয়, 'রামচরিতমানস' তাঁর স্বাধ্যয়ের বস্তু, কাজেই আমার বক্তব্যে তাঁর মনে আঘাত লাগা স্বাভাবিক। কিন্তু ক্ষমাশীল সাধক বলে সহজেই তিনি সাময়িক ক্ষোভ কাটিয়ে উঠেছেন। তিনি রামায়েৎ সম্প্রদায়ের লোক হলেও তাঁর মধ্যে সাম্প্রদায়িক গোঁড়ামির বিন্দুমাত্র আভাস পাই নি। যাইহোক, সারাদিন সকলের সঙ্গে নানারকম হাস্যপরিহাস ও গল্প-গুজবে কাটিয়ে দিলাম। রাত্রে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলাম, নর্মদাতটের এই মহাতীর্থে এসে আমি যে মহার্ঘ্য বস্তু লাভ করেছি — সেই মহার্ঘ্য বস্তু অবশ্যই মহাত্মা প্রলয়দাসজীর পুণ্য-স্পর্শ।

শেষ রাত্রিতেই উঠে পড়েছি। মঙ্গলারতির সময় সকলের সঙ্গে আমিও তাঁদের সঙ্গে ভজনে যোগ দিলাম। আরতি শেষ হতেই আমি তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য শেষ করে এসে মহাত্মা রামদাসজীর কাছে বিদায় প্রার্থনা করলাম। তাঁকে প্রণাম করে ষড়ঙ্গী মহারাজ, মঙ্গলদাসজী এবং দীনদয়াল, সকলের সঙ্গে কোলাকুলি এবং নমস্কারাদি সেরে আবার গাঁঠরী তুলে নিলাম বগলে। বাঁ হাতে কমণ্ডলু, ডান হাতে লাঠি। রামদাসজী, মঙ্গলদাসজী, দীনদয়াল সকলেই

আমার সঙ্গে এলেন কোটিতীর্থের ঘাট পর্যন্ত। ওঁকারেশ্বরজী ও মাতা নর্মদাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করে নৌকায় উঠে বসলাম। রামদাসজী মঙ্গলদাসজী দীনদয়াল সকলের চোখেই জল দেখে অভিভূত হলাম। নৌকা চলেছে এই শৈলদ্বীপ হতে নর্মদার উত্তরতটে। নৌকা হতে দেখতে পাচ্ছি, রামদাসজী হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে আছেন। ১লা বৈশাখ এই শৈলদ্বীপে প্রবেশ করেছিলাম। আজ ৮ই আষাঢ় বুধবার। দু'মাসের অধিককাল ভজন-আশ্রমে থাকার ফলে পারস্পরিক একটা স্নেহ-সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল। এই পবিত্র আশ্রম এবং আশ্রমিকদেরকে কখনও ভুলতে পারব না। নৌকা তটে এসে ভীড়ল। মাল্লা দু'জনকে শুভেচ্ছা জানিয়ে নৌকা থেকে নামলাম। কোটি-তীর্থ ঘাটের দিকে ফিরে তাকাতেই অস্পষ্টভাবে মনে হল, রামদাসজীরা যেন এখনও দাঁড়িয়ে আছেন। আমি যুক্তকরে তাঁদের উদ্দেশ্যে নমস্কার জানালাম।